রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য এবং নাটকের গানের পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ফেব্রুয়ারী ২০১৯

গবেষক

সাবরিনা আক্তার টিনা

পিএইচ.ডি. রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৯৬

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী

সহযোগী অধ্যাপক

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে 'রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য এবং নাটকের গানের পর্যালোচনা' শীর্ষক বিষয়ের উপর গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক রচনা। এই অভিসন্দর্ভ অথবা এর অংশবিশেষ পূর্বে কোন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা কিংবা জার্নালে প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হয়নি। আমি আরও অঙ্গীকার করছি যে, গবেষণাকর্মটি সম্পূর্ণই আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিজ দায়িত্বে উপস্থাপন করেছি।

গবেষক

সাবরিনা আক্তার টিনা

পিএইচ.ডি. রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৯৬

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-১৫

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সাবরিনা আক্তার টিনা, রেজিস্ট্রেশন নম্বর-১৯৬, শিক্ষাবর্ষ- ২০১৪-১৫, সংগীত বিভাগে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য আমার অধীনে “রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য এবং নাটকের গানের পর্যালোচনা” শিরোনামে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছে। অভিসন্দর্ভটি তথ্যসমৃদ্ধ ও সরেজমিনে মাঠ-পর্যায়ে উপাদান সংগ্রহ করে রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য ও নাটকের গানের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা সমৃদ্ধ গবেষণাকর্মটি বাংলা সংগীতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার ধারণা।

ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

সহযোগী অধ্যাপক

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রসঙ্গকথা

'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি, তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি ।'– সংগীতের প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই মনোভাব ও চিন্তা মননের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সমস্ত সৃষ্টকর্মে, সাহিত্যে, কবিতায়, গল্পে, সর্বোপরি নাটকে। রবীন্দ্রনাথের গানই তাঁর সমগ্র সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে। তাঁর এই গীতিধর্মিতার সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ ঘটেছে নাটকের গানে। তিনি যেখানে সংলাপের ব্যবহারে অসমর্থ হয়েছেন, সেখানেই গানের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার করেছেন। কথার মাধ্যমে যেখানে ভাবের পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারেননি, সেখানে গানের বিকাশ তাকে পূর্ণ করেছে। আর তাই রবীন্দ্রনাথের নাট্যসম্ভারে গানের ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথের নাটক, নাটকের গান নিয়ে রবীন্দ্র সাহিত্যিক ও রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞগণ বিস্তর আলোচনা করেছেন এবং রচনা করেছেন বহু গ্রন্থ। কিন্তু সেসব আলোচনায় বা গ্রন্থে শুধু কয়েকটি প্রধান প্রধান নাটক ও নাট্যসংগীতের বিচার-বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। ধারাবাহিকভাবে একত্রে কোথাও তাঁর সমগ্র নাট্যসম্ভারে সংগীত ব্যবহারের উপযোগিতা ও তাৎপর্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় না। এই সম্পর্কে তথ্যের অপ্রতুলতার অভাব অনুভব করায় আমি আমার গবেষণার জন্য "রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য এবং নাটকের গানের পর্যালোচনা" মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্বাচন করেছি। রবীন্দ্রনাথ রচিত গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য ও নাটক মিলিয়ে ৫১টি নাটক (প্রথমে গীতিনাট্য, এরপর নাটক এবং সবশেষে নৃত্যনাট্য) রচনার কালাক্রমিক বিবর্তন অনুসারে নাটকে সংগীতের প্রয়োগবিধি, সংযোজিত সংগীতগুলোর তাৎপর্য, পর্যালোচনা, তথ্য সংযোজন ও যুক্তিনির্ভর ভাবরূপের বিশ্লেষণের সাথে ব্যবহৃত গানগুলোর নাট্যোপযোগিতা ব্যাখ্যা করে ব্যবহারের যৌক্তিকতার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম নির্ধারণ, অবয়ব গঠন ও সামগ্রিক পরিকল্পনায় আমাকে সাহায্য করেছেন সংগীত বিভাগের প্রয়াত শিক্ষক আমার প্রথম তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী। তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি জানাই অসীম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। আমার বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সংগীত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী-এর তত্ত্বাবধায়নে এই অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে গবেষণা চলাকালীন তিনি কেবল সস্নেহে উপদেশ ও নির্দেশ প্রদান করে গবেষণা কাজটি শেষ করতে উৎসাহিতই করেননি, সাথে তাঁর আন্তরিকতা, পরামর্শ এবং সাহায্য-সহযোগিতা গবেষণাটি সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ও ঋণ অপরিসীম।

সেই সাথে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার বাবা লোকমান হাকিম, মা হাফিজা বেগম এবং স্বামী মেজবাউল আলমকে যারা আমাকে এই পথ চলায় অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। স্মরণ করছি আমার শ্বশুর প্রয়াত নুরুল আলমকে, তিনি সবসময় আমাকে স্নেহপাশে বেঁধে রেখেছেন এবং উৎসাহ প্রদান করেছেন। আরো কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শাশুড়ি সেলিনা আলম এবং আমার ফুফু সুরাইয়া বেগমকে, যাঁরা গবেষণাকালীন এই দীর্ঘ সময়ে আত্মজা ফারাজা মানহা আলম ও ফারিজা মাহিরা আলমের সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। পরিশেষে, যাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সহায়তা দিয়েছেন– সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

সাবরিনা আক্তার টিনা

পিএইচ.ডি. রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৯৬

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-১৫

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচি **পৃষ্ঠা নং**

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায় **৪-১৯**

নাটক, নাট্যসংগীতের উৎপত্তি এবং রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা নাটকের ইতিহাস ৪

দ্বিতীয় অধ্যায় **২০-৬০**

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য এবং নাটকের শ্রেণিবিভাগ ২০

প্রথম পরিচ্ছদ : গীতিনাট্য (সংগীত প্রধান) ও নাট্যকাব্য ৩২-৩৩

ভগ্নহৃদয় (১৮৮১) ৩২

বাল্মীকি-প্রতিভা (১৮৮১) ৩২

রুদ্রচন্দ্র (১৮৮১) ৩৩

কালমৃগয়া (১৮৮২) ৩৩

প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৩) ৩৩

নলিনী (১৮৮৪) ৩৩

মায়ার খেলা (১৮৮৮) ৩৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ : রোমান্টিক ট্রাজেডি নাটক (কাব্য ও নাটকের সমন্বয়) ও কাব্যনাট্য ৩৪-৩৮

রাজা ও রানী (১৮৮৯) ৩৪

বিসর্জন (১৮৯০) ৩৪

বিদায়-অভিশাপ (১৮৯৩) ৩৫

চিত্রাঙ্গদা (১৮৯৩) ৩৬

মালিনী (১৮৯৬) ৩৬

গান্ধারীর আবেদন (১৮৯৮) ৩৬

সতী (১৮৯৭) ৩৭

লক্ষ্মীর পরীক্ষা (১৮৯৭) ৩৭

নরক-বাস (১৮৯৮) ৩৮

কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ (১৯০০) ৩৮

তৃতীয় পরিচ্ছদ : রূপক বা সাংকেতিক নাটক (ভাব বা তত্ত্বপ্রধান)	৩৯-৪৬
শারদোৎসব (১৯০৮)	৪০
মুকুট (১৯০৮)	৪২
রাজা (১৯১০)	৪২
অচলায়তন (১৯১১)	৪২
ডাকঘর (১৯১২)	৪৩
ফাল্গুনী (১৯১৬)	৪৩
গুরু (১৯১৮)	৪৩
ঋণশোধ (১৯২১)	৪৩
মুক্তধারা (১৯২২)	৪৪
অরূপরতন (১৯২৪)	৪৪
রক্ত করবী (১৯২৬)	৪৫
তপতী (১৯২৯)	৪৫
কালের যাত্রা (১৯৩২)	৪৫
তাসের দেশ (১৯৩৩)	৪৬
চতুর্থ পরিচ্ছদ : সামাজিক নাটক (সামাজিক পরিবেশমূলক)	৪৭-৪৮
প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯)	৪৭
গৃহপ্রবেশ (১৯২৫)	৪৭
শোধবোধ (১৯২৬)	৪৭
নটীর পূজা (১৯২৬)	৪৭
পরিত্রাণ (১৯২৯)	৪৭
চন্ডালিকা (১৯৩৩)	৪৮
বাঁশরী (১৯৩৩)	৪৮
মুক্তির উপায় (১৯৪৮)	৪৮
পঞ্চম পরিচ্ছদ : প্রহসন ও রঙ্গ নাটক (কৌতুকপ্রধান)	৪৯-৫০
গোড়ায়গলদ (১৮৯২)	৪৯
বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৬)	৪৯
চিরকুমার সভা (১৯০৪)	৪৯

হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭) ৫০

ষষ্ঠ পরিচ্ছদ : ঋতুনাট্য (ঋতুআশ্রয়ী ও গীতপ্রধান) ৫১-৫৩

বসন্ত (১৯২৩) ৫২

শেষ বর্ষণ (১৯২৫) ৫২

সুন্দর (১৯২৫/১৯২৯) ৫৩

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা (১৯২৬) ৫৩

নবীন (১৯৩১) ৫৩

শ্রাবণগাথা (১৯৩৪) ৫৩

সপ্তম পরিচ্ছদ : নৃত্যনাট্য (নৃত্যপ্রধান) ৫৪-৬০

নটীর পূজা (১৯২৬) ৫৪

শাপমোচন (১৯৩১) ৫৫

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬) ৫৫

নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা (১৯৩৬) ৫৫

পরিশোধ (১৯৩৬) ৫৫

নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা (১৯৩৮) ৫৬

নৃত্যনাট্য শ্যামা (১৯৩৯) ৫৬

তৃতীয় অধ্যায় ৬১-৩১০

রবীন্দ্রনাথের নাটক ও গানের পর্যালোচনা ৬১

প্রথম পরিচ্ছদ : ১৮৮১–১৮৯০ সাল পর্যন্ত রচিত নাটক ৬৫-৮৯

১. ভগ্নহৃদয় (১৮৮১) ৬৬

২. রুদ্রচন্দ্র (১৮৮১) ৭০

৩. বাল্মীকি-প্রতিভা (১৮৮১) ৭২

৪. কালমৃগয়া (১৮৮২) ৭২

৫. প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৩) ৭২

৬. নলিনী (১৮৮৪) ৭৮

৭. মায়ার খেলা (১৮৮৮) ৮০

৮. রাজা ও রানী (১৮৮৯) ৮০

৯. বিসর্জন (১৮৯০) ৮৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ : ১৮৯১–১৯০০ সাল পর্যন্ত রচিত নাটক ৯০-১০০

১. চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২) ৯০

২. গোড়ায়গলদ (১৮৯২) ৯১

৩. বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৬) ৯২

তৃতীয় পরিচ্ছদ : ১৯০১–১৯১০ সাল পর্যন্ত রচিত নাটক ৯৩-১২৪

১. হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭) ৯৩

খ্যাতির বিড়ম্বনা ৯৩

বিনি পয়সার ভোজ ৯৩

বশীকরণ ৯৩

২. শারদোৎসব (১৯০৮) ৯৪

৩. প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯) ১০০

৪. রাজা (১৯১০) ১০৮

চতুর্থ পরিচ্ছদ : ১৯১১–১৯২০ সাল পর্যন্ত রচিত নাটক ১২৫-১৬৭

১. অচলায়তন (১৯১১) ১২৫

২. ডাকঘর (১৯১২) ১৩৮

৩. ফাল্গুনী (১৯১৬) ১৪১

৪. গুরু (১৯১৮) ১৫১

পঞ্চম পরিচ্ছদ : ১৯২১–১৯৩০ সাল পর্যন্ত রচিত নাটক ১৫২-২৩০

১. মুক্তধারা (১৯২২) ১৫১

২. বসন্ত (১৯২৩) ১৬৩

৩. অরূপরতন (১৯২৪) ১৭০

৪. গৃহপ্রবেশ (১৯২৫) ১৮১

৫. রক্ত করবী (১৯২৬) ১৮৮

৬. শোধবোধ (১৯২৬) ১৯৭

৭. নটীর পূজা (১৯২৬) ২০০

৮. চিরকুমার সভা বা প্রজাপতির নির্বন্ধ (১৯২৬) ২০৯

৯. শেষ বর্ষণ (১৯২৬) ২১৫

১০. নটরাজ ও ঋতুরঙ্গশালা (১৯২৭) ২২১

১১. শেষরক্ষা (১৯২৮) ২২২
১২. পরিত্রাণ (১৯২৯) ২২৩
১৩. সুন্দর (১৯২৫/১৯২৯) ২২৪
১৪. তপতী (১৯২৯) ২২৫
ষষ্ঠ পরিচ্ছদ : ১৯৩১–১৯৩৯ সাল পর্যন্ত রচিত নাটক ২৩১-২৭১
১. নবীন (১৯৩১) ২৩১
২. শাপমোচন (১৯৩১) ২৩২
৩. বাঁশরী (১৯৩৩) ২৪০
৪. তাসের দেশ ২৪৫
৫. চন্ডালিকা (১৯৩৩) ২৫৫
৬. শ্রাবণগাথা (১৯৩৪) ২৫৬
৭. পরিশোধ (১৯৩৬) ২৫৭
৮. মুক্তির উপায় (১৯৩৮) ২৫৯
চতুর্থ অধ্যায় ২৭২-৩৫৪
রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের গানের পর্যালোচনা ২৭২
প্রথম পরিচ্ছদ : গীতিনাট্য ২৭৪-২৯৩
১. বাল্মীকিপ্রতিভা ২৭৪
২. কালমৃগয়া ২৮২
৩. মায়ার খেলা ২৮৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছদ : নৃত্যনাট্য ২৯৪-৩১৬
১. নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ২৯৫
২. নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা ৩০২
৩. নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা ৩০৬
৪. নৃত্যনাট্য শ্যামা ৩০৮
পঞ্চম অধ্যায় ৩১৭-৩২৬
রবীন্দ্রনাথের নাটকের মহড়া, মঞ্চায়ন ও রূপসজ্জা ৩১৭
উপসংহার ৩২৭

পরিশিষ্ট **৩৩০-৩৪৫**
সহায়ক গ্রন্থাবলি ৩৩০
সহায়ক পত্রিকা ৩৪৪

ভূমিকা

মানুষ যখন থেকে দলবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করেছে তখন থেকেই থিয়েটারের বা নাটকের জন্ম এবং সেই প্রাচীনকাল থেকেই নাটকে গানের ব্যবহার হয়ে আসছে। সেইসময় নাটকগুলো দেব-দেবতাদের মহাত্ম নিয়ে রচিত হতে থাকলেও ধীরে ধীরে নাটকের বিষয় পরিবর্তিত হতে থাকে এবং নাটকে গানের ব্যবহারেরও যৌক্তিকতা বাড়তে থাকে। নাট্যকারেরা নাটকের বিষয়বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য নাট্যে সংগীতের প্রয়োগ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এর ব্যতিক্রম নয়। পারিবারিকভাবে রবীন্দ্রনাথের বেড়ে ওঠা এক সংগীতময় পরিবেশে। তাঁদের গৃহে সবসময়ই হিন্দুস্থানী সংগীতের গুণী ওস্তাদদের আগমন ঘটত। এছাড়াও তাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪ -১৮৪৬) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীতের চর্চা ও প্রসারের ক্ষেত্রে সেইসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ও তাঁর বেলগাছিয়া ভিলা নামের বাগানবাড়িতে বহু দেশি- বিদেশি গণ্যমান্য সংগীতজ্ঞদের পাশ্চাত্য সংগীতের আসরে আমন্ত্রণ জানাতেন। এই সাংগীতিক পারিবারিক আবহাওয়ায় স্বভাবতই গান রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বের সাথে মিশে গেছে। তাই তাঁর রচিত কবিতা, নাটক, উপন্যাসেও গানের সর্বোচ্চ ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি বিচরণ করেছেন দাপটের সাথে। তৎকালীন নাট্যকারদের রচিত নাটকের সাথে তাঁর নাটকের পার্থক্য ছিল বিষয়গত ও প্রায়োগিক দিক থেকে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদিযুগে সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের অনুবাদে নাটক রচিত হতো, মধ্যযুগে এসে যুক্ত হয় দেশীয় যাত্রার প্রভাব যা প্রতিষ্ঠিত হয় গীতাভিনয়ের উপর। নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নেয়া হয় বাঙালির সামাজিক জীবনমূলক কাহিনি, ভারতের পৌরাণিক চরিত্র, ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক কাহিনি। এসময় রবীন্দ্রনাথ নাট্যরচনা শুরু করলেও সমসাময়িক নাট্যধারার সাথে তাঁর কোন যোগ ছিল না। সাহিত্য, নাটক ও গান সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় সংগীতকে অবলম্বন করে তিনি নাট্যরচনায় আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য ও নাটকে গানের যে ব্যঞ্জণাধর্মী ব্যবহার, তারই পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এই অভিসন্দর্ভের মূল বিষয়। এখানে নাটকগুলোর কাহিনি বর্ণনার সাথে গানগুলো ব্যবহারের উপযোগিতা ব্যাখ্যার পাশপাশি গানগুলোর রসরূপ ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তিনি আধুনিক নাট্যরচনার পথিকৃৎ ছিলেন। রোমান্টিকধর্মিতায় নাটক রচনা শুরু করলেও পরবর্তীকালে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি কাব্যনাটক, গীতিনাট্য, সামাজিক নাটক, সাংকেতিক নাটক, প্রহসন, ঋতুনাট্য ও নৃত্যনাট্য রচনা করেন।

গবেষণাধীন বিষয়বস্তু সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে এই অভিসন্দর্ভটি ৫টি অধ্যায়ে এবং কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে নাটক, নাট্যসংগীতের উৎপত্তি ও রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা নাটকের ইতিহাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য এবং নাটকের শ্রেণিবিভাগ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, উপস্থাপন করা হয়েছে মোট ৭টি পরিচ্ছেদে। প্রতিটি পরিচ্ছেদে শ্রেণিবিভাগের অন্তর্গত নাটকগুলোর উপর আলোচনা করা হয়েছে :

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	গীতিনাট্য (সংগীত প্রধান) ও নাট্যকাব্য
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	রোমান্টিক ট্রাজেডি নাটক (কাব্য ও নাটকের সমন্বয়) ও কাব্যনাট্য (কাব্যপ্রধান)।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	রূপক বা সাংকেতিক নাটক (ভাব বা তত্ত্বপ্রধান)
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	সামাজিক নাটক (সামাজিক পরিবেশমূলক)
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	প্রহসন ও রঙ্গ নাটক (কৌতুকপ্রধান)
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	ঋতুনাট্য (ঋতুআশ্রয়ী ও গীতপ্রধান)
সপ্তম পরিচ্ছেদ	:	নৃত্যনাট্য (নৃত্যপ্রধান)

তৃতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের নাটক ও গানের পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। নাটকের কাহিনি ও গানের ব্যবহার কালক্রমে কিভাবে পরিণত ভাবের দিকে অগ্রসর হলো তা আলাদাভাবে চিহ্নিত করে এখানে নাটকগুলোকে রচনাকালের ১০ বছরের শ্রেণিবিন্যাসে নিম্নরূপ ৬টি পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে :

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	১৮৮১ – ১৮৯০ সাল পর্যন্ত রচিত নাটক।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	১৮৯১ – ১৯০০ সাল পর্যন্ত রচিত নাটক।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	১৯০১ – ১৯১০ সাল পর্যন্ত রচিত নাটক।
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	১৯১১ – ১৯২০ সাল পর্যন্ত রচিত নাটক।
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	১৯২১ – ১৯৩০ সাল পর্যন্ত রচিত নাটক।
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	১৯৩১ – ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত রচিত নাটক।

Dhaka University Institutional Repository

নাটকের গানের পর্যালোচনা অংশে প্রত্যেক নাটক আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নাটকের কাহিনি বর্ণনা করার সাথে সাথে ব্যবহৃত গানগুলোর উপযোগিতা ও গানটির প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। কাব্য রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রমানসিকতায় একটি বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যা তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে একটি ছাপ রেখেছে। এই বিবর্তনটি তাঁর নাট্যরচনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর তাই নাটকগুলো রচনাকালীন রবীন্দ্রমানসিকতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের গানের পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে ২টি পরিচ্ছেদে। যথা :

প্রথম পরিচ্ছদ : গীতিনাট্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ : নৃত্যনাট্য

পঞ্চম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাটকের মহড়া, মঞ্চায়ন ও রূপসজ্জার বিশ্লেষণ।

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য এবং নাটক রচনা ও গান সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনার একটি সার-সংক্ষেপ উপস্থাপিত হয়েছে।

পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে সহায়ক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকার নাম।

প্রথম অধ্যায়

নাটক, নাট্যসংগীতের উৎপত্তি এবং রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা নাটকের ইতিহাস

মানব সভ্যতায় শৈশবকাল থেকেই, যখন মানুষ সবেমাত্র সংঘবদ্ধ জীবনযাপন করতে শুরু করেছে– সেই লিখিত ইতিহাসের হাজার হাজার বছর আগে থিয়েটারের শুরু। আদিম সমাজে থিয়েটারের বিকাশের অঙ্কুররূপে তিনটি প্রাথমিক শর্ত কাজ করেছে বলে জানা যায়। যথা (১) ভাষার অনুপুরণের প্রয়োজন, (২) খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত ও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন, ও (৩) বিভিন্ন ধরনের শত্রুর (হিংস্র পশু, বিপক্ষ বা অন্য গোষ্ঠী) পরাজয় নিশ্চিত করার প্রয়োজন। আদি নাটকের জন্য আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন আচার-প্রথা ও উৎসব-পার্বণ।

আদিবাসী সমাজে ভাব-বিনিময়ের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা এত অপর্যাপ্ত ছিল যে তাদের অধিকাংশ ভাব-বিনিময় হতো আকার-ইঙ্গিতের সাহায্যে। অর্থাৎ ভাষা ও ভাব প্রকাশের ভঙ্গী এ-দুয়ের সমন্বয়ে সৃষ্ট থিয়েটার নামক শিল্প অজ্ঞাতসারেই জন্ম নিয়েছে আদিম সমাজে। তখন প্রধান কর্মোদ্দেশ্য ছিল খাদ্য সংগ্রহ। অধিকাংশ আদিম নাট্যকর্মই এই নিতান্ত-বাস্তব প্রয়োজনে নিবেদিত। শিকার আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন মুখোশ পরে শিকারি পশুর অনুকরণে অভিনয় করতো। যেমন আমেরিকার মান্ডান ইন্ডিয়ানদের 'মহিষ নৃত্য'। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যেও শিকারের পূর্বে সেই পশুসম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকারের নৃত্য ও উৎসবের প্রচলন ছিল।

পূর্বে শস্যের উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু মাধ্যমে মানুষ কৃষিজীবী হলে যেসব আচার-পার্বণ অনুষ্ঠিত হতো তাকে 'ধর্ম' বলে অভিহিত করা হয়। পরবর্তীকালে 'থিয়েটার'র বিকাশে তাই ভিত্তিস্বরূপ হয় ও প্রধান ভূমিকা পালন করে যার প্রাথমিক স্তরের প্রধান উপজাত ছিল নৃত্য। ভাব প্রকাশে ভাষার বিকল্প হিসেবে হাতের ও মাথার বিভিন্ন সঞ্চালনে অজ্ঞাতসারেই ছন্দের সৃষ্টি হতো। মানুষকে তার জীবনের প্রয়োজনেই বিভিন্ন পশুর ও অন্যান্য জিনিসের চলাফেরার, যেমন বাতাসের আন্দোলিত ডাল-পালার বা নৌকার গতির অনুকরণ করতে হতো। ধীরে ধীরে মানুষ যখন ভাষাকে আয়ত্ত করতে থাকে, তখন নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত হয় সংগীত। এভাবেই আদিম যুগের নৃত্য, সংগীত ও অভিনয়ের সম্মিলনেই একটি একক শিল্পরূপ লাভ করে থিয়েটার। সমাজের বিকাশের সাথে সাথে বিভিন্নরূপ কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় ধীরে ধীরে নাট্যানুষ্ঠানগুলোতে গোষ্ঠীর

সকল ব্যক্তির পক্ষে অংশগ্রহণ দুরূহ হয়ে পড়ে।

প্রাচীন মানুষের জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে তাদের নাটক ভাবগম্ভীর ও গুরুতর বিষয়বস্তু নিয়েই গড়ে ওঠে। পরবর্তী যুগে থিয়েটারের সাথে হাস্য ও লঘু রসাত্মক উপাদানের সংযোগ ঘটে। পশুপাখির অনুকৃতির সঙ্গে অতিরিক্ত হাস্যকর উপাদান যুক্ত হতে থাকে। যেমন অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের 'রক ওয়ালাবি হান্ট' নামক শিকার অনুষ্ঠানের একটি হাস্যকর উপাদান মেলে। শিকারি বারে বারে তার শিকার হারিয়ে ফেলছে এবং সেই ব্যর্থতার জন্য অদ্ভুত ভাবভঙ্গী করে অন্যদের সহানুভূতি চাইছে। কিন্তু সঙ্গীরা তাকে গালমন্দ ছাড়া আর কিছু দিচ্ছে না। ফিলিপিনো আদিবাসীদেরও এরকম 'কমিক' শিকার-অনুষ্ঠান দেখা যায় যেখানে মধু সংগ্রহে গিয়ে মধু সংগ্রাহক বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হচ্ছে। প্রাচীনকালে মানুষের জীবনাচরণের প্রায় সমস্ত অংশই অলৌকিকত্ব ও অধিদৈবিকতা দিয়ে আচ্ছন্ন ছিল। আর তাই নাটকের উদ্ভবের মূলে প্রায় সব দেশেই ধর্মের প্রভাব দেখা যায়। মিশরীয় সভ্যতায় পৌরাণিক ও দেবজীবন-নির্ভর বিষয়বস্তু হলেও নাট্যানুষ্ঠান যথাসম্ভব বিস্তারিত ও বাস্তবধর্মী হতো। মিশরীয় নাট্যকর্ম যেমন উদ্দেশ্যের দিক থেকে, তেমনি পরিবেশনায় ছিল ভাবগম্ভীর ও আন্তরিক; কোন রচনাতেই হাস্যরসাত্মক উপাদানের উপস্থিতি ছিল না। প্রাচীন মিশরীয়রা নাট্যাভিনয়কে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। কৃষিদেবতাকে অবলম্বন করে প্যাশন প্লে-র অনুরূপ অনুষ্ঠানের ধারা প্রচীন সভ্যতায় অপ্রতুল ছিল না, দেবতার সংখ্যাও কম ছিল না। সিরিয়াতে এ্যাডোনিস ও থামুজ (পানি ও শস্যের দেবতা), ব্যাবিলনে থামুজ ও ইস্থার (উর্বরতা শক্তির দেবী ও থামুজের পত্নী), ফ্রাইজিয়ার আটিসা; এবং গ্রীসের ডিয়োনাইসাস, যাকে উপলক্ষ্য ও অবলম্বন করেই জন্ম নিলো ও বিকশিত হলো 'থিয়েটার শিল্প'। ধর্মচারণের আবেগে দেবতা ডিয়োনাইসাসের পূজা-উৎসবকে কেন্দ্র করে যে শিল্প-আঙ্গিক নাট্য বা থিয়েটার নাম নিয়ে জন্ম নিলো কালক্রমে তা গ্রিক সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গৌরবরূপে পরিগণিত হয়। ধর্মীয় কাহিনি হওয়ায় চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্য বা বৈশিষ্ট্যের কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ নাট্যকার পুরাণের সর্বজনবিদিত চরিত্রই অনুসরণ করেছেন।

মধ্যযুগের ইউরোপে যখন রেনেসাঁস আরম্ভ হলে দেবতা বা দেবানুগৃহীত ব্যক্তিকে পিছনে রেখে বিষয়বস্তু হিসেবে মানুষ সামনে এসে দাঁড়াল। অতিপ্রাকৃত প্রভাব কিছু থাকলেও মানবজীবন ও মানবচরিত্রের রহস্যোদ্ঘাটনই নাটকের প্রধান অবলম্বন হয়। এসময় শেক্সপিয়রের আবির্ভাব ঘটে

বিশাল নাট্যপ্রতিভা নিয়ে। তাঁর নাটকে অপ্রাকৃত ও আলৌকিক উপাদানের সাথে নর-নারীর চরিত্রসৃষ্টিও ছিল প্রধান লক্ষ্য। যুদ্ধ-বিগ্রহ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আড়ম্বরবহুল অনুষ্ঠান আর অন্তরের বিপুল প্যাশনের আলোড়ন রোমান্টিক কল্পনার এক অপূর্ব কাব্যময় নাটকে রূপান্তরিত করে। জার্মানির গ্যেটে ও শিলারও এই কাব্যপ্রধান নাটক সৃষ্টি করেছেন। নানা অলংকারময় ভাষায় রচিত দীর্ঘ সংলাপের কাব্যোচ্ছ্বাস নাটকীয় ঘটনা চরিত্র বিবর্তনের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক নতুন সাহিত্যরূপের সৃষ্টি হয়। এতে কাব্য ও নাটকের সাথে যোগ হয়েছে ভাব ও রূপ, বাস্তব ও আদর্শ, চিত্র ও জীবনদর্শনের অপূর্ব সম্মিলন।

বাংলা সাহিত্যে নাটকের উৎপত্তি বা সৃষ্টি এবং বিকাশ নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদের মধ্যে মতবাদ ও মতভেদের অন্ত নেই। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ পাণিনির (খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ শতাব্দী) সময়ে শুধু 'নট' শব্দই নয়, সেই শব্দ থেকে উৎপন্ন 'নাট্য' শব্দও প্রচলিত ছিল। পাণিনির একটি সূত্র হলো "পরাশর্য-শিলালিভ্যাং-ভিক্ষু-নটসূত্রয়োঃ" (৪.৩.১১০) অর্থাৎ ভিক্ষু এবং নটসূত্র অর্থে যথাক্রমে 'পারাশরিন্' ও শৈলালিন্' শব্দ সিদ্ধ। পাণিনি বলেছেন, 'পরাশর্য' শব্দটি 'ভিক্ষুসূত্র' বোঝায় এবং 'শৈলালিন্' বলতে 'বাজিকর' বোঝায়।[১] খ্রিস্টপূর্ব ২০০ শতাব্দীতে পতঞ্জলি 'নটসূত্র' বলে কোনকিছু প্রাচীন রচনায় পাওয়া যায়নি, তবে পরবর্তীকালে 'নাট্যশাস্ত্র' নামক গ্রন্থ মিলেছে।[২]

অনেকের মতে, আদি নাট্যশাস্ত্রকার ব্রহ্মা নাকি 'অমৃতমন্থন' ও 'ত্রিপুরদাহ' নামক নাটক রচনা করে রূপদান করেন। ভরত-লিখিত নাটশাস্ত্রের ইঙ্গিতে আমরা ব্রহ্মা-রচিত 'ব্রহ্মাভরতম্' নাট্যশাস্ত্রের পরিচয় পাই এবং সেই নাটককে কোন কোন সংগীত ঐতিহাসিক আদি নাটক বলেন। খ্রিস্টীয় ২য় শতকে ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্র' লিখিত হয়েছিল। এর আগে নাট্যশাস্ত্র সংকলিত হয়েছিল বৈদিক সাহিত্যের উপাদানকে কেন্দ্র করে।

'নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভষম্
জগ্রাহ পাঠ্যং ঋগ্বেদাৎ সামেভ্যোগীতমেব চ
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বনাদপি।' (নাট্যশাস্ত্র : ১।১৭) ৩

চতুর্বেদের বিভিন্ন উপাদান থেকেই নাট্যবেদের সৃষ্টি। ভারতীয় নাটকের সৃষ্টিপ্রসঙ্গ নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করলে বলা যায়, প্রচীনকালে সংস্কৃত নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল ভারতেরই মাটিতে, তার জলবায়ু, পরিবেশ ও সমাজ-আদর্শকে আশ্রয় বা কেন্দ্র করে। 'নট' ধাতু থেকেই

নাটকের সৃষ্টি। সুকুমার সেন তাঁর 'নট নাট্য নাটক' (১৩৭২) গ্রন্থে 'নাট্য' শব্দ থেকে নামধাতু 'নাটয়', অতঃপর তা থেকে 'নাটক' শব্দ বিকাশের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, ঋগ্বেদে নাটকের বীজ নিহিত থাকলেও কালিদাসের সময়েই 'নাটক' শব্দের ও নাটকের যথার্থ রূপ প্রকাশিত হতে দেখা যায়। সংস্কৃত নাটকের আসল প্রকৃতি ধর্মীয় ও নৈতিক।[৪]

সংস্কৃত নাটকের অভিনয় রীতি সম্পর্কে জানা যায়, নাটকের মাঝে-মাঝে পাত্র-পাত্রীদের পরিক্রমণের নির্দেশ দেওয়া থাকতো। পরিক্রম অর্থে বোঝায় পায়চারী করে রঙ্গমঞ্চে ঘুরে বেড়ানো। যাত্রার আসরে যেমন দর্শকরা ঘিরে বসে, আর আসরের মাঝখানে গান নাচ অভিনয় হয়, তখনও তেমনি হতো। অভিনয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সাজঘর থেকে রঙ্গভূমিতে আসার সময় কাপড় মুড়ি দিয়ে নিজেদের সর্বাঙ্গ আবৃত করে সেই 'যমনিকা' বস্ত্রখন্ড ফেলে দিয়ে অভিনয় করতো। রঙ্গভূমি থেকে বের হবার সময় আবার কাপড় মুড়ি দিত। অভিনয় পরিচালনা করতেন প্রধান নট সূত্রধার। এই সূত্রধার রঙ্গাভিনয়ের কিছু আগে নটনটীদের নিয়ে নৃত্য-গীত-বাদ্যের সঙ্গে একটি বিচিত্র অনুষ্ঠান করতেন। যার উদ্দেশ্য ছিল দেবতাদের আনন্দিত করে নির্বিঘ্নে অভিনয়-সমাপ্তির আশীর্বাদ লাভ করা। এর নাম 'নান্দী'। অভিনয় শেষ হয়ে গেলে কোনো নট আবার আর একটি শ্লোক উচ্চারণ করে দেশের দেশপালের আর দর্শকদের মঙ্গল কামনা করতেন। এই শ্লোকের নাম 'ভরতবাক্য'। 'ভরতবাক্য' উচ্চারণেই নাটকের সমাপ্তি হতো। ভরত নাট্যশাস্ত্রের ৪র্থ–৫ম অধ্যায়ের অভিনয়কর্ম আরম্ভের প্রাক্কালে ও সমাপ্তিকালে নট-নটী এবং কুতপবাদ্যকারীদের যা যা করণীয় সেসবের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

> 'অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি চোত্থাপনবিধিক্রিয়াম।
> যস্মাদুত্থাপয়ন্ত্যাদৌ প্রয়োগং নান্দিপাঠকাঃ।'
> *　　　*　　　*
> 'আশীর্বচনসংযুক্তা নিত্যং যস্মাৎ প্রবর্ততে।
> দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্ নান্দীতি সংজ্ঞিতা।
> যত্র শুষ্কাক্ষরৈরেব হ্যপকৃষ্টা ধ্রুবা যতঃ।'[৫]

অধ্যাপক আরনোট, ব্র্যাডলে, নিকোল ও অন্যান্য পাশ্চাত্য গ্রন্থকার এবং ভাষ্যকাররা গ্রিক, রোমান প্রভৃতি প্রাচীন নাট্যমঞ্চ ও অভিনয়কর্মের আলোচনার সময় অনুরূপ নাট্য-উপাদানের উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ সংস্কৃত নাটকের বিষয়বস্তু গৃহীত হয়েছে রামায়ণ, মহাভারত,

Dhaka University Institutional Repository

হরিবংশ, বিভিন্ন পুরাণ, বৃহৎকথা প্রভৃতি গ্রন্থের কাহিনি থেকে এবং ভাস, কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, বাণভট্ট, ভট্টনারায়ণ, মুরারি, রাজশেখর, ক্ষেমীশ্বর, দামোদর মিশ্র প্রমুখ বিদগ্ধ নাটক-রচয়িতাদের নাটকচরিত্র লক্ষ্য করলে তা প্রমাণ হয় ।

গুপ্ত, পাল ও সেন যুগে নাটকের সাথে নাট্যসংগীত বা নাটকীয় সংগীতের সহযোগ ছিল। মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে নাটক প্রসঙ্গে অভিনয়মঞ্চ, রঙ্গমঞ্চসজ্জা, নট-নটীদের বেশসজ্জা ও অভিনয় নৈপুণ্যের কথা শোনা যায়। নৃত্যের প্রচলনও নাটকাভিনয়ে ছিল। মহাকবি কালিদাসের পর ভাসের প্রতিমানাটক, স্বপ্নবাসবদত্তা, দূত-ঘটোৎকচ, উরুভঙ্গ, চারুদত্ত প্রভৃতি নাটকে কিছু কিছু নাট্যগীতির উল্লেখ পাওয়া যায় ।

চর্যাগীতি দিয়ে বাংলা সাহিত্যের পথচলা শুরু । চর্যাগীতিতে বুদ্ধনাটক ও নটপেটিকা কথার উল্লেখ আছে । শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, "এখানে বুদ্ধনাটক কথাটি লক্ষণীয় । এইরূপ নৃত্যগানের ভিতর দিয়া এই সব গায়ক-গায়িকা কোনও বিশেষ ঘটনাকে নাট্যরূপ দান করিতেন । এই নাচ গানের সাহায্যে নাটক করার ভিতর দিয়া কি বাঙলা নাটকের উৎপত্তি?"৬

চর্যাগীতির যুগে বুদ্ধের জীবনকাহিনি নিয়ে নাট্যাভিনয় থাকলেও বাঙালির নাট্যপ্রচেষ্টার শুরু রাধাকৃষ্ণ কাহিনি অবলম্বনে কীর্তনগানে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "বাংলা সাহিত্যে নাটকীয় অঙ্কুরের প্রথম বিকাশ হইল রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা লইয়া। এই প্রেম লইয়া যে আদি কবিরা কাব্যরচনা করিয়াছেন– জয়দেব, বড়ুচন্ডিদাস, বিদ্যাপতি সকলেই ইহার মধ্যে নাটকীয়ত্বের আরোপ করিয়াছেন।"৭ বড়ুচন্ডিদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, জয়দেবের গীতগোবিন্দ এ ধারায় রচিত। রচয়িতা জয়দেব গীতগোবিন্দকে প্রবন্ধগীতি বলেছেন। এতে নাট্য উপাদান হিসেবে রয়েছে কাহিনি ও কথোপকথন। এখানে জয়দেব ছিলেন দলের অধিকারী এবং মূল গায়ক, তার স্ত্রী পদ্মাবতী নাচ করতেন। পরাশর এবং অন্যান্যরা ছিলেন দোহার ও বায়েন। একে যাত্রাতুল্য গীতাভিনয়ের সাথে তুলনা করা হয়।৮ গীতগোবিন্দে অভিনয় ছিল গৌণ। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চন্ডীদাস অভিনয়কে মুখ্য করে তা প্রকাশ করতেন গানের মধ্য দিয়ে।

যুগে যুগে সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার কারণে সংস্কৃত থিয়েটার বা নাটকের অভিনয়-রীতি পরিবর্তিত হয়ে রাজদরবার থেকে সাধারণ মানুষের সমাজে নেমে আসার জন্য এর প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছিল। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনি সম্বলিত সংস্কৃত নাটক ধীরে ধীরে সাধারণ

Dhaka University Institutional Repository

লোকের মুখের ভাষা ও দাবির কাছে নিস্প্রভ ও প্রভাবহীন হয়ে পড়েছিল। চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি, উমাপতি ধর প্রমুখের সময়ে কীর্তনগানের সঙ্গেই পাঁচালী গান ব্যবহৃত হতো। নিবদ্ধ কীর্ত্তনের মধ্যে মূল গায়েন দোহার সহযোগে একাই অভিনয় করতেন। ক্রমে এই প্রথাই আংশিক বা পূর্ণভাবে ঢপ কীর্তন, পাঁচালী ও কৃষ্ণযাত্রায় পরিণতি লাভ করে।

পাঁচালীর পরে কবিগানের উদ্ভব ঘটে। এছাড়াও বাংলা নাটকের সূচনাপর্বে আরো একটি উপাদান কার্যকর হয়ে ওঠে, তা হলো যাত্রা। যাত্রায় সাংগীতিক প্রাধান্য ছিল কীর্তনের। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে যাত্রায় টপ্পার সংগীতকলার অনুসরণ ঘটতে থাকলেও, কৃষ্ণযাত্রার প্রাধান্যবশত পদাবলি কীর্তনের সংগীতই যাত্রার প্রধান সংগীত ভিত্তিরূপে বিবেচিত হতো। পাঁচালী, যাত্রাগান, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, কবিগান, কথকতা ইত্যাদি বাঙালি গণমানসে আনন্দ দিয়ে আসলেও অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত গণমানসে একটি পরিবর্তন আসে।

১৭৯৫ খিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর কলকাতায় বাংলাভাষায় রচিত প্রথম নাটকের অভিনয় হয়েছিল। গেরাসিম লেবেদফ (Gerasim Lebidef – ১৭৪৯-১৮১৭) নামে জনৈক রুশ নাগরিক কয়েকজন বাঙালির সহায়তায় 'দি ডিসগাইজ' (বাংলা রূপান্তর 'কাল্পনিক') নামে একটি ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর ভাষা শিক্ষক গোলোকনাথ দাস অভিনয় ও নাটক মঞ্চায়নের ব্যাপারে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। তৎকালীন জনরুচির প্রতি সংগতি রেখে লেবেদফ 'কাল্পনিক সংবদল' নামে খ্যাত সেই অনূদিত নাটকে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের (১৭১২-১৭৬০) গান সংযোজন করা হয়েছিল। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে 'প্রাণ কেমন রে, করে' এবং দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে 'গুণ সাগর নাগর রায়' গান দুটি যুক্ত করেন। একক ও সম্মেলক উভয় শ্রেণির গানই ছিল সে নাটকে। অভিনয়কে জনপ্রিয় করার জন্য নাটকে গান ব্যবহার করার প্রয়োজন ছিল। ইংরেজি নাটকের বাংলা রূপায়নের মধ্যেও এবং নাট্যাভিনয়ে অর্কেস্ট্রা হিসেবে দেশি যন্ত্রের ব্যবহার করেছিলেন। প্রাচীন যাত্রায় প্রবেশ ও প্রস্থানের রীতি অথবা অংক বিভাগের কোনরূপ নির্দেশ ছিল না। লেবেদফ নাট্যশিল্পে এই দুটি রীতির প্রয়োগ করেন।[৯] বাংলা নাটক রচনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক উৎসাহ ও প্রেরণা এসেছিল অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় স্থাপিত ইংরেজি মঞ্চগুলো থেকে। 'দি প্লে হাউজ', 'ক্যালকাটা থিয়েটার', 'মিসেস ব্রিস্টোর' থিয়েটার প্রভৃতি নাট্যশালায় তখন ইংরেজি নাটকের অভিনয় হতো।

এখানে অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিলেন ইংরেজ অথবা এ্যাংলো ইন্ডিয়ান, দর্শকও ছিলেন মূলত তারাই। কিছু কিছু ইংরেজ প্রসাদভোগী বিত্তবানেরা মাঝে মাঝে এসব দেখবার সুযোগ পেতেন।

১৮১৭ খ্রিস্টাবে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর অধ্যাপক রিচার্ডসনের শেক্সপিয়র পঠন-পাঠনে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা নাটক দেখতে আগ্রহবোধ করে। তিনি মনে করতেন ছাত্রদের নাটক বোঝাতে গেলে নাটকের অভিনয় দেখা দরকার। কলকাতার প্রথম দিকের ইংরেজি থিয়েটারগুলোর মধ্যে চৌরঙ্গী থিয়েটার ছিল বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চ। রিচার্ডসন তার ছাত্রদের এখানে নাটক দেখতে উৎসাহিত করতেন এবং কখনো কখনো টিকিটও কেটে দিতেন। কয়েকবছর ভালোভাবে চলার পর চৌরঙ্গী থিয়েটারের দুর্দিন ঘনিয়ে আসে এবং নিলামে ওঠে। ১৮৩৫ সালের ১৫ আগস্ট এই শিল্পকে রক্ষা করার জন্য প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) চৌরঙ্গী থিয়েটার নিলামে কিনে নেন এবং পুনরায় থিয়েটারটি পূর্বের মালিকদের দিয়ে দেন।[১০] চৌরঙ্গী থিয়েটারে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুর হিন্দু থিয়েটার স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে ১৮৩২ সালে 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এ বলা হয় :

> "What child of enlightenment, what men of patriotic feelings will not hail with raptures of joy that day when our hetherto degraded countrymen will turn their backs with disgust againt the gross, barbarous and obsence performance of Cobies and Yatras to relieve their aching heart by the sign of a rational and dignified performance on the stage of an Hindu theatre."[১১]

১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাংলা নাট্যপ্রয়াস হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল 'ভদ্রার্জুন' ও 'কীর্তিবিলাস'। এগুলো বিদেশি নাট্যাদর্শ প্রভাবিত ছিল। এর পাশাপাশি যাত্রা নাটকে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। যাত্রায় কীর্তনের প্রাধান্য থাকলেও উনবিংশ শতকের প্রথম দিক থেকে টপ্পার অনুসরণ ঘটতে থাকে। এইসময় যাত্রায় ব্যাপক গানের প্রচলন ছিল। নাট্য রচয়িতারা গানের যথেচ্ছা ব্যবহার পছন্দ করেননি। তারাচরণ শিকদার তাঁর 'ভদ্রার্জুন' নাটকের ভূমিকায় গানের ইচ্ছেমাফিক ব্যবহার সম্পর্কে ক্ষোভের সাথে বলেন :

> "বহুকালাবধি সকল জাতির মধ্যেই নাটক প্রচলিত আছে, এবং রঙ্গভূমিতে তৎসম্বন্ধীয় অভিনয়াদি দর্শনশ্রবণ করিয়া অনেকে আমোদ প্রকাশ করেন। এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত আছে এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও

Dhaka University Institutional Repository

হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদয় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে।"[১২]

'ভদ্রার্জুন' নাটকে তিনি ৩টি গান ব্যবহার করেন। এরমধ্যে ২টি গানই মদ্যপায়ীর, কেবল দর্শকদের আনন্দ দেবার জন্য গানগুলো রচিত হয়েছিল। এই নাটকের রাগ পরজ-কালাংরা ও ঢিমা ত্রিতালে একটি গান : কালী আমি এই ভিক্ষা চাই, গো মা।/ সুধা হ্রদে ডুবি যেন এ প্রাণ হারাই।।/ চষকে চষকে পুরি, আর পিতে নাহি পারি।'

১৮৫৫ সালে সংগীত রচয়িতা ও আদি বাঙালি যন্ত্রী আশুতোষ দেব সাতুবাবুর ঘরে বৈদ্য নন্দকুমার রায়ের অভিজ্ঞান 'শকুন্তলা' অভিনীত হয়। এ নাটকে গান থাকলেও গানের তেমন ভূমিকা ছিল না। শুরুতেই গ্রীস্মকালের শোভা বর্ণনা করে নটীর কণ্ঠে ছিল গান : 'দেখ না শিরীষ ফুল কোমল কেমন হে।/ কোমল কেশরে তার ভ্রমে অলিগণ হে।'

জাতীয় জীবনে শিক্ষা ও কৃষ্টির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা নাট্যমঞ্চে রূপান্তরিত হয়ে স্থান পেল। যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁদের রচিত নাটকে গানের ব্যবহার সীমিত রাখেন।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ-বছর ৩১ জুলাই শ্রীহর্ষের সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যমঞ্চটির দ্বারোদ্ঘাটন হয়। রামনারায়ণ তাঁর দেশীয় যাত্রা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নাটকী সংগীতগুলো রচনা করেন। নাটকটিতে তিনি বহু সংগীত যোজনা করেন। উক্ত নাটকের বিজ্ঞাপনে সংগীত যোজনা প্রসঙ্গে বলেন : "শ্রীগুরুদয়াল চৌধুরী মহোদয় দ্বারা কতিপয় সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া স্থানবিশেষে যোজনা করা গিয়াছে। যদিচ যাত্রার প্রতি আমাদিগেরও অসীম শ্রদ্ধা আছে, তথাপি এককালে সংগীত মাত্র উচ্ছেদ করা অভিমত কখনই নহে। প্রত্যুত নাটক অভিনয়ে সংগীত সম্পদ নিতান্ত পরিবর্জিত হইলেও তাহাতে রস ও সৌন্দর্যের বিশেষ হানির সম্ভাবনা।"[১৩]

এই নাটকের সংগীত পরিচালনায় ছিলেন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। গুরুদয়াল চৌধুরী নাটকটির জন্য ১২টি গান রচনা করেছিলেন। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়েছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়া বাগানবাড়িতে। বেলগাছিয়া থিয়েটারের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল এর

অর্কেস্ট্রা। পাথুরিয়াঘাটার জমিদার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এর মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আগ্রহ ও যদুপালের সহায়তায় এই নাটকের জন্য ক্ষেত্রমোহন প্রথম ঐকতান বাদন রচনা করেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বন্ধু গৌরদাস বসাকের স্মৃতিকথায় এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে :

> "The memorable Belgachia Theatre with Raja Pratap Chander Singh, Isswar Chander Singh and Maharaja Sir Jotindra Mohan Tagore and myself appeared in the field, that the native theatre took deep root and native orchestra was organized. In the construction of this orchestra Khetter Mohan Gossain, a genius in music, and Babu Jadu Nath Paul had the principal hand. It was expected that this Band which had won encomiums from unprejudiced and appreciative Europeans, naturally averse to Indian music, would continue to be the model for a pure national Band, but unfortunately the latter Pioneers of the Dramatic art have introduced some European instruments and made it a mongrel affair. To say that the Belgachia Theatre scored a brilliant success is to repeat a truism that has passed into a proverb…. The graceful stage, the superb sceneries, the stirring orchestra..."[১৪]

নাটকের গানগুলো প্রেমসংগীত, টপ্পার প্রভাবে প্রভাবিত। রাজকুমারী সাগরিকার কণ্ঠে গান : 'শুন রতিপতি করি হে তোমারে এই মিনতি।/ এ রীতি কি রীতি তব হইয়ে ভূপতি।/ আনন্দে হইয়ে কত রঙ্গ কর মনোমত/ বধিতে যুবতী/ হর কোপানলে জ্বলে গেল না কুমতি।' (ভৈরবী, আড়া)

বেলগাছিয়া নাট্যশালার পর আরও কতকগুলি নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেমন ১৮৫৭ সালের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। বিশিষ্ট লেখক কালিপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৩ সালে বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামে একটি সাহিত্যসভা গঠন করেছিলেন। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ এই সভার সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। বেণীসংহার নাটকের মধ্য দিয়ে ১৮৫৭ সালের ১১ এপ্রিল রঙ্গমঞ্চটি উদ্বোধন করা হয়েছিল।

১৮৬৭ সালে ভবভূতির সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে 'মালতীমাধব' রচনা করেন রামনারায়ণ। কলকাতার পাথুরিয়াঘাটায় ঠাকুরবাড়ির নাট্যশালায় অভিনীত এই নাটকের ভূমিকাতে জানা যায় এর সংগীত পরিচালক ছিলেন বনোয়ারীলাল এবং নাটকের প্রয়োজনে গানগুলো রচিত হয়েছিল।

টপ্পার অনুকরণে এই নাটকের একটি গান হলো : 'গেলো প্রাণ রে সজনি, তাঁরে সঁপে মন ধন ।/ পরের বেদনা পরে তো জানে না / তবু বোঝে না আমার মন ।' (খাম্বাজ, খেমটা)

১৮৬৭ সালে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্যোগে 'পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মিলিত উদ্যোগে সৃষ্টি হয় 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা' (১৮৬৫)। তবে এই নাট্যশালাগুলো অভিজাত শ্রেণি ব্যতীত জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে শহরের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের একান্ত আগ্রহে ও উদ্যমে বাগবাজারে একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথমে এর নাম ছিল 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার' (১৮৬৮), পরে নাম পরিবর্তন হয়ে 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' নামে পরিচিত হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর বাগবাজার নাট্য সম্প্রদায় মধুসূদন স্যানালের (১৮২৪-১৮৭৩) বাড়িতে একটি নতুন নাট্যশালার উদ্বোধন করেন এবং নবগোপাল মিত্র এর নামকরণ করেন 'ন্যাশনাল থিয়েটার' (১৮৭৩)।

বাংলা নাটক উদ্ভবের সময় থেকেই নাটকের মধ্যে গান ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। বাংলা-নাটকের প্রথম পর্বে যখন সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের উদ্ভব হয়েছিল তখন নাট্যকারগণ বাঙালি দর্শকের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই স্বকপোলরচিত অনেক গানের অবতারণা করেন। তবে আধুনিক নাট্যসংগীতের সূচনা মধুসূদনের নাটকে দেখা যায়। তিনি পাশ্চাত্য নাট্য সম্পর্কে গভীরভাবে অবহিত ছিলেন। সেই সঙ্গে সংস্কৃত নাটকেও ছিল উল্লেখযোগ্য জ্ঞান। তিনি নাটকে গান প্রয়োগের ক্ষেত্রে দর্শকের কথা ভেবে সংগীতবাহুল্যকে প্রশ্রয় দিতেন। তাঁর নাটকে সংগীতের ব্যবহার রস সঞ্চার করে এর উপভোগ্যতা ও গতিকে বাড়িয়ে দিত। 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৬৭) নাটকটি মধুসূদনের প্রথম বাংলা নাটক ও প্রথম বাংলা রচনা। এ নাটকের ভাষাশুদ্ধি পরীক্ষা করতে দেয়া হয়েছিল রামনারায়ণ তর্করত্নকে। যেমন 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে রাজা নেপথ্যবর্তিনী শর্মিষ্ঠার কণ্ঠে গান শোনেন : 'আমি ভাবি যারে, সে ত তা ভাবে না। / পরে প্রাণ দিয়ে পরে, হলো কি লাঞ্ছনা।'

এই সংগীত শুনেই তিনি শর্মিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট হন। এখানে গায়িকার শুধু কণ্ঠমাধুর্য নয়, গানের ব্যঞ্জিত ভাবে রাজার মনে আকর্ষণ জন্মেছিল।

মধুসূদনের সমসাময়িক নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-১৮৭৩) তাঁর নাটকে সংগীত খুব কমই ব্যবহার করেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন,' 'জামাই বারিক', 'সধবার একাদশী', 'নবীন

Dhaka University Institutional Repository

তপস্বিনী', 'লীলাবতী' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয় নাট্যমঞ্চে। দীনবন্ধু নাটকে সংগীত প্রয়োগ করেন পূর্বসূরিদের মতোই। গীতাভিনয়-রচয়িতা মনোমোহন বসুও তাঁর নাটকে ভক্তিরসাত্মক সংগীত সন্নিবেশ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশের গৌরবমন্ডিত অতীত ইতিহাসকে আশ্রয় করে নাটক রচনা করেন এবং নাটকের জন্য স্বদেশি সংগীত রচনা করেন। উদাহরণস্বরূপ 'পুরুবিক্রম' নাটকের বিখ্যাত 'মিলে সবে ভারত সন্তান একতান মনপ্রাণ' গানটি উল্লেখ করা যায়। এই নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গানটি যুক্ত করা হয়। এছাড়া 'সরোজিনি' নাটকেরও 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুন দ্বিগুন' গানটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন। এই গানগুলো রচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটকের গান রচনার হাতেখড়ি।

নাট্যসংগীতের অশেষ বৈচিত্র্য পাওয়া যায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২) নাটকে। 'সধবার একাদশী', 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতি অভিনয় করবার সময় তিনি নিজের রচিত গান ঐ-সব নাটকে জুড়ে দেন। তিনি শেক্সপিয়রের ম্যাকব্যাথের যে অনুবাদ করেন তার মধ্যেও কয়েকটি গান সংযোজন করেন। তাঁর পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে এর সংগীত। 'চৈতন্যলীলা', 'বিল্বমঙ্গল', 'নসীরাম' প্রভৃতি নাটকের ভক্তিরসাত্মক গানগুলি দর্শকের চিত্তকে ভাবে মাতোয়ারা করে দিত। বৈষ্ণবসংগীত, শাক্তসংগীত ইত্যাদি ভক্তিরসাত্মক গীতিরচনায় তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'জনা' নাটকের দুটি বৈষ্ণবগীতি উল্লেখ করা যেতে পারে :

'হামা দে পলায়, পাছু ফিরে চায় / রানী পাছি তোলে কোলে'

অথবা

'ঘরে নাইক নবনী, কেন অমন ক'রে / পরের ঘরে চুরি করিস নীলমণি।'

যাত্রায় সংগীতের ভূমিকা ছিল অবিচ্ছিন্ন স্রোতের মতো, সংলাপ ছিল মূলত গানগুলোকে পরস্পরের সাথে গ্রথিত করার জন্য। কিন্তু থিয়েটারি নাটকে গান শুধু গান নয়, নাটকের কাহিনিকে এগিয়ে নেবার জন্য এবং সংগীত রসিকদের আনন্দ দেবার জন্যই গান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর স্বদেশ প্রেমের নাটক রচনা করেন উপেন্দ্রনাথ দাস, শিশির ঘোষ, প্রমথ মিত্র প্রমুখ। এরপরে নাটকের আধুনিক রূপায়ণে এগিয়ে আসেন গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৪৪-১৯১২), বঙ্কিমচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৯৪), মনোমহন বসু, অমৃতলাল বসু (১৮৭৫-১৯২৮), রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৭৫-১৮৯৩), কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরলাল রায়, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, উপেন্দ্রনাথ দাস, উমেশচন্দ্র গুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৯৪-১৯২৬)

প্রমুখ নাট্যকারগণ।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৯৫-১৯১৩) যখন নাট্য জগতে প্রবেশ করেন তখন ভক্তিভাব ও পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে নাটক রচনার তীব্র প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নাট্যাঙ্গিক, ভাষা ও ভাব এবং সর্বোপরি নাটকে গান সংযোজনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নাট্যকারদের নাটক ও নাট্য-সংগীত রচনার থেকে সম্পূর্ণ নতুনত্ব নিয়ে আসেন। তিনি রচনা করেন বহু প্রহসন ও ঐতিহাসিক নাটক। নাটক রচনায় তিনি প্রভাবিত হন পাশ্চাত্য নাটক থেকে। তাঁর রচিত 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দূর্গাদাস' (১৯০৬), 'নূরজাহান' (১৯০৮), 'মেবারপতন' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১), 'পরপারে' (১৯১২), 'বঙ্গনারী' (১৯১৬) প্রভৃতি নাটক ছাড়াও প্রহসন ও কৌতুক নাট্যগ্রন্থগুলিতে গানের সমাবেশ নাটকে রস সঞ্চার করেছে। তবে তিনি সব নাটকে সংগীতের সমাবেশ করেননি, যেমন 'সীতা', 'তারাবাঈ' প্রভৃতি নাটকে গান নেই বললেই চলে। তাঁর রচিত 'সোহরাব-রুস্তম' সংগীত প্রধান নাটক। এই নাটকের ভূমিকায় তিনি বলেন,

> "আমাদের দেশের রঙ্গালয়ের দর্শকবৃন্দ, অশ্লীল 'হাবভাব' সমন্বিত গ্রাম্য রসিকতা শুনিবার জন্যই রঙ্গালয়ে গিয়া থাকেন,– আমি একবার আমার সাধ্যমত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই যে সুরুচিসংগত-অপেরা এখন চলে নাকি। 'সোহরাব-রুস্তম' দস্তুরমত অপেরা নয়...এক কথায় ইহা অপেরায় আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে নাটকে শেষ হইয়াছে।"[১৫]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকের জন্য রচিত গানগুলো স্বতন্ত্র গান হিসেবেও বেশ জনপ্রিয়। যেমন 'সাজাহান' নাটকের 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা' গানটি একটি দেশমাতৃকার বন্দনার জনপ্রিয় গান। এছাড়াও 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের 'আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণ-মাখা পাখা তুলে' কিংবা 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে, কি সংগীত ভেসে আসে' প্রভৃতি গান জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বাংলা নাটকের গানে তিনি পাশ্চাত্য রীতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন,

> "দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরাজী সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাকে হিন্দু সঙ্গীত থেকে বহিস্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু সঙ্গীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন, তবে সরস্বতী নিশ্চই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন। হিন্দু সঙ্গীত বলে যদি কোন পদার্থ থাকে তবে সে আপনার জাত বাঁচিয়ে চলুক, কারণ তার প্রাণ নেই তার জাতই আছে। হিন্দু সঙ্গীতের ভয় নেই– বিদেশের সংস্রবে সে আপনাকে বড়ো করেই পাবে।"[১৬]

গীতিনাট্যের ধারার (১৮৬৫ থেকে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র প্রকাশকাল ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেয়া হলো :

রচনাকাল	নাটকের নাম	রচয়িতার নাম
১৮৬৫	শকুন্তলা	অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৬৫	রত্নাবলী	হরিমোহন রায়
১৮৬৬	শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান	পূর্ণচন্দ্র শর্মা
১৮৬৭	সাবিত্রী সত্যবান	তিনকড়ি ঘোষাল
১৮৬৯	চ- কৌশিক	অজ্ঞাতনামা
১৮৭০	মালতীমাধব	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৭১	মৈথিলীমিলন	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
১৮৭২	ধ্রুবচরিত্র	নিমাইচাঁদ শীল
১৮৭৩	ভারতমাতা	কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	অক্রুর সংবাদ	হরনাথ মজুমদার
১৮৭৪	সতী কি কলংকিনী	নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	রজত গিরিনন্দিনী	হরচন্দ্র ঘোষ
	ঊষাহরণ	অন্নদা বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৭৫	পারিজাত হরণ	নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	কনকপথ	হরলাল রায়
	মানভিক্ষা	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
	পতিব্রতা	রাজকৃষ্ণ রায়
১৮৭৬	আদর্শ সতী	অতুলকৃষ্ণ মিত্র
	প্রণয় কানন	অতুলকৃষ্ণ মিত্র
	আগমনী	অতুলকৃষ্ণ মিত্র
	মাল্যপ্রদান	হারাণচন্দ্র ঘোষ
১৮৭৭	আনন্দমিলন	রামতারণ সান্ন্যাল
	আগমনী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
	অকালবোধন	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
১৮৭৮	কামিনীকুঞ্জ	গোপাল মুখোপাধ্যায়
	প্রভাত কমল	রামতারণ সান্ন্যাল
	দোললীলা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
	কনকপ্রতিমা	অতুলকৃষ্ণ মিত্র
	অনলে বিজলী	রামকৃষ্ণ রায়

Dhaka University Institutional Repository

	কৈলাস কুসুম	কুসুম দাসী
১৮৭৯	প্রেম পারিজাত	প্রমথ মিত্র
	কৈলাস কুসুম	নগেন্দ্র ঘোষ
	কনক কানন	বিনোদবিহারী দত্ত
	নিকুঞ্জ কানন	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
	বসন্ত উৎসব	স্বর্ণকুমারী দেবী
১৮৮০	আগমনী	অতুলকৃষ্ণ মিত্র
	অপ্সর কানন	অতুলকৃষ্ণ মিত্র
	ঊষাহরণ	রাধানাথ মিত্র
	বসন্তলীলা	কুঞ্জ বসু
	নন্দোৎসব	প্রিয়নাথ রায়
	দানলীলা, প্রমীলার পুরী	নগেন্দ্র ঘোষ
	রামলীলা	রামতারণ সান্ন্যাল
	মানময়ী	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮৮১	শর্মিষ্ঠা	অজ্ঞাতনামা
	কাঞ্চনকুসুম	কুঞ্জ বসু
	মায়াতরু	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
	মোহিনী প্রতিমা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
	অহল্যা হরণ	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
	বাল্মীকিপ্রতিভা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১৭]

সাধারণ আলোচনায় দেখা যায় যে, উনবিংশ শতকে নাটক রচিত হয়েছে প্রধানত রঙ্গমঞ্চের জন্য এবং নাটকের কাহিনিতে ছিল খুব সাধারণভাবে প্রেমের উপাখ্যান, ঐতিহাসিক কাহিনি বা পৌরাণিক ভক্তিরসের কথা অথবা দেশাত্মবোধের বিবরণ এবং তার সঙ্গে থাকত নৃত্য গীত ও কিছু রঙ্গ রসিকতা। রবীন্দ্রনাথ যখন কৈশোরে পদার্পণ করেন তখন বাংলাদেশে যাত্রার উন্মেষ ঘটছে। প্রাচীন যাত্রার সঙ্গে নতুন কালের পাঁচালি-তর্জা-কবি-হাফ আখড়াই প্রভৃতি মিশ্রিত হয়ে একপ্রকার সংগীতবহুল গীতাভিনয়ের সৃষ্টি হচ্ছিল যা খ্রিস্টীয় উনবিংশ শতকের শেষ কয়েক দশকেই বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঠাকুর পরিবারের নাট্যাভিনয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> "আমার ভাইরা দিনরাত নিজের ভাষায় তত্ত্বালোচনা করেছেন, কাব্যরস-আস্বাদনে ও উদ্ভাবনে তাঁরা ছিলেন নিবিষ্ট, চিত্রকলাও ইতস্তত অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে, তার উপরে নাট্যাভিনয়ে কারও কোনো সংকোচমাত্র ছিল না। আর, সমস্ত ছাড়িয়ে উঠেছিল সঙ্গীত। বাঙালীর স্বাভাবিক

Dhaka University Institutional Repository

গীতমুগ্ধতা ও গীতমুখরতা কোনো বাধা না পেয়ে আমাদের ঘরে যেন উৎসের মতো উৎসারিত হয়েছিল। ...গান বাজনা নাট্যকলাকে অক্ষুণ্ন সম্মান দেবার যে দীক্ষা পেয়েছিলাম তার একটা বিশেষ পরিচয় দিই। আমার ভাইঝিরা শিশুকাল থেকে উচ্চ অঙ্গের গান বিশেষ যত্নে শিখেছিলেন। সেটা তখনকার দিনে নিন্দার্হ না হলেও বিস্ময়ের বিষয় ছিল। আমাদের বাড়ির প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য নাট্যমঞ্চে তাঁরা যেদিন গান গেয়েছিলেন সেদিন সামাজিক হাওয়া ভিতরে-ভিতরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে তখনকারদিনের খবরের কাগজের বিষদাঁত আজকের মতো এমন উগ্র হয়নি। তা হলে অপমান মারাত্মক হয়ে উঠত। তার পরে এই জাতীয় অত্যাচার আরও ঘটেছিল। এর চেয়ে উচ্চ সপ্তকে নিন্দা পেয়েও সংকোচ বোধ করি নি। তার কারণ, কেবলমাত্র কলেজি বিদ্যাকে নয়, সকল বিদ্যাকেই শ্রদ্ধা করবার অভ্যাস আমাদের পরিবারে প্রচলিত ছিল।"[১৮]

ঠাকুরবাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবীও বিদেশি অপেরা এবং বাংলা যাত্রার মধ্যে সমীকরণ ঘটিয়ে গানের সম্মিলনে নাটকের একটি বিশেষরূপ গীতিনাট্য রচনায় উৎসাহী হন। তাছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর ঐতিহাসিক নাটকেও সংগীত ব্যবহার করেন এবং তাঁর কোনো নাটকের কঠিনতম পরিস্থিতিতে উপযুক্ত সংগীত রচনার জন্য তিনি কিশোর রবীন্দ্রনাথের সাহায্য নিতেন– এরূপ তথ্যও 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"একসময় পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল। আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান চর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।"[১৯]

এরপর বিলাত প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথ সংগীতময় নাট্যরচনার দ্বারাই নাট্যজীবন শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনের গভীর কথা স্বাভাবিকভাবে, সহজ সুরে, সত্য ও বাস্তবতার উজ্জ্বল আলোকে তাঁর নাটকে তুলে ধরেন এবং নতুন চিন্তা, জীবনদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়ে নাট্যরীতির বিবর্তন সাধন করেন।

তথ্যসূত্র

১. সুকুমার সেন, *নট নাট্য নাটক*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ৯-১০

Dhaka University Institutional Repository

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৩. রমেন্দ্রনারায়ণ নাগ, *রবীন্দ্রনাটকে গানের ভূমিকা*, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা, ১৩৮৮, পৃ. উপক্রমনিকা- ১

৪. স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, *নাট্যসংগীতের রূপায়ণ*, রামকৃষ্ণ সারদা প্রিন্টিং, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ৪-৫

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫-৬

৬. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*, কলকাতা, ১৩৭১, পৃ. ১১০

৭. শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা*, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ. ১২৮

৮. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৭৬

৯. আলো সরকার, *রবীন্দ্রনাট্য প্রসঙ্গ: সাংগীতিক প্রয়োগ*, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৭

১০. শ্রীঅশোক সেন, *রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমা*, কলিকতা, ২০০০, পৃ. ২

১১. নীলিমা ইব্রাহিম, *বাংলা নাটক: উৎস ও ধারা*, কালচারাল্ প্রেস, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ৮

১২. করুণাময় গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৯

১৩. আলো সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

১৪. দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালীর রাগ সংগীত চর্চা*, ফার্মা কে, এল, এম প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ২৮১

১৫. আলো সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

১৭. প্রণয়কুমার কুন্ডু, *রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ২৭-২৯

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঙ্গীতচিন্তা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৩, পৃ. ৭৭-৭৮

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য এবং নাটকের শ্রেণিবিভাগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন নাট্য রচনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তখন তাঁর সামনে নানা ধরনের আর্দশ ছিল। যেমন, একদিকে সংস্কৃত নাটকের ঐতিহ্য, দেশীয় যাত্রা ও গীতাভিনয়ের প্রভাব, অন্যদিকে পাশ্চাত্য নাটকের ধারা। বাংলা নাটক, মঞ্চ, প্রযোজনা, দর্শক– সবই একটি সুশৃঙ্খল পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। সংস্কৃত নাটক, পাশ্চাত্য নাট্যশালা, গীতাভিনয় ও যাত্রা এসবের ঐতিহ্যের সম্মিলনে ততদিনে বাংলা নাটক একটি বৈশিষ্ট্যময় ভিত্তির উপর সুসংগঠিত রূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে উইলিয়াম শেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকটি অনুবাদ করেন মাত্র ১৩ বছর বয়সে। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি উল্লেখ করেন :

> "আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বাড়িতে আমাদের শিক্ষক ছিলেন। ইস্কুলের পড়ায় তখন তিনি কোন মতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া 'কুমার-সম্ভব' পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা 'ম্যাকবেথ' আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম, ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেটি হারাইয়া যাওয়াতে কর্মফলের বোঝা ঐ পরিমাণে হালকা হইয়াছে।"[১]

নাট্যকাব্য রচনার যুগ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য নাটক দিয়ে প্রভাবিত ছিলেন। আর তাই 'ম্যাকবেথ' নাটকটির অনুবাদ তাঁর নাট্যরচনার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে আছে। তাঁর প্রথমদিকের নাটকে শেক্সপিয়ারের অনুসরণে পঞ্চাঙ্ক নাটক দেখা যায়, যেমন 'মালিনী', 'রাজা ও রানী' ও 'বিসর্জন'। শেষোক্ত নাটক দুটি শেক্সপিয়ারের নাটকের মতোই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ধীরে ধীরে তিনি নিজস্ব রীতির নাটক রচনা করেন এবং স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর স্থাপন করেন। শেক্সপিয়ারের নাটক সম্পর্কে তিনি 'মালিনী' নাটকের ভূমিকায় বলেন, "শেক্সপিয়ারের নাটক আমাদের নিকট বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।"[২] 'মালিনী' নাটক সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন, "তারপর একদিন ট্রেভলিয়ানের মুখে এর সম্বন্ধে মন্তব্য শুনলুম। তিনি কবি এবং গ্রীক সাহিত্যের রসজ্ঞ। তিনি আমাকে বললেন, এই নাটকে তিনি গ্রীক নাট্যকলার প্রতিরূপ দেখেছেন।"[৩]

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ নাট্যজগতে প্রবেশ করেন নাট্যরচয়িতা, অভিনেতা ও প্রযোজকরূপে। সেইসময় গিরিশচন্দ্র সেন নাটকে সংগীতের ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানি গানের আলাপ, তান বাদ দিয়ে মধুরভাবে গানে সুরযোগে একধরনের মঞ্চসংগীতের প্রচলন করেন। এই গানের আবার কিছু পরিবর্তন করেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনি রাগসংগীতে বিলিতি ঢং আরোপ করে কোরাস গানের প্রচলন করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত নাট্যসংগীতের অনুকরণ না করে নিজস্ব নাট্যরীতির প্রবর্তন করেন যাতে যাত্রাগানের নাট্যরীতি মর্যাদা লাভ করে।

তিনি নাটকে গানের প্রয়োগ সম্পর্কে 'সঙ্গীতচিন্তা' গ্রন্থে "শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সঙ্গীতের স্থান" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন :

> "বাংলা সাহিত্যে গান যখন-তখন যেখানে-সেখানে অনাহূত অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না। এতে অন্যদেশীয় অলংকারশাস্ত্র সম্মত রীতিভঙ্গ হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের রীতি আমাদেরই স্বভাবসঙ্গত। তাকে ভর্ৎসনা করি কোন প্রাণে? সেদিন আমাদের নটরাজ শিশির ভাদুরীমশায় কোনো শোকাবহ অতি গম্ভীর নাটকের জন্য আমার কাছে গান ফরমায়েশ করে বসলেন। কোনো বিলতী নাট্যেশ্বর এমন প্রস্তাব মুখে আনতেন না, মনে করতেন এটা নাট্যকলার মাঝখানে একটা অভ্যুৎপাত। এখনকার ইংরেজী পোড়োরাও হয়ত এরকম অনিয়মে তর্জনী তুলবেন; আমি তা করিনে, আমি বলি আমাদের আদর্শ আমাদের নিজের মন আপন আনন্দের তাগিদে স্বভাবতই সৃষ্টি করবে। সেই সৃষ্টিতে কলাতত্ত্বের সংযম এবং ছন্দ বাঁচিয়ে চলতে হবে, কিন্তু তার চেহারা যদি সাহেবী ছাঁচের না হয় তবে তাকে পিটিয়ে বদল করতেই হবে এ কথা বলতে পারবো না। বিদেশী অলংকারশাস্ত্র গড়বার বহু পূর্ব থেকে আমাদের নাট্য, যাকে আমরা যাত্রা বলি, সে তো গানের সুরেই ঢালা।"[৪]

রবীন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কিছু রচনা করেননি। তাঁর নাট্যরচনার প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সাহিত্যপদবাচ্য। তবে নাটকে সংগীতের ব্যবহার সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় গীতধর্ম ও সুরধর্মকেই রবীন্দ্রনাট্য কলার প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন : "নাটকের মধ্যে নাটকীয় ধর্ম তত নাই যত আছে গীতধর্ম ও সুরধর্ম।"[৫] এ প্রসঙ্গে অরুণকুমার বসুর মূল্যায়ন হলো : "রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংগীতগুলিকে সাধারণত দুই শ্রেণীতে স্থূলভাবে ভাগ করা যায়। প্রথম, নাটকের প্রয়োজনে রচিত এবং দ্বিতীয়, পূর্বে অন্য কোন উপলক্ষে রচিত, পরে প্রাসঙ্গিক ভাবসূত্রে নাটকে সংযোজিত।"[৬]

Dhaka University Institutional Repository

আলো সরকার নাটকের আঙ্গিক ও বিবর্তনের পরিণামে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র নাট্যরচনাকে নিম্নরূপ পূর্বভাগ ও উত্তরভাগে বিন্যস্ত করেছেন :

পূর্বভাগ : নিরীক্ষার যুগ

গীতিনাট্য : ১. বাল্মীকিপ্রতিভা (১৮৮১)
২. কালমৃগয়া (১৮৮২)
৩. মায়ার খেলা (১৮৮৮)

তত্ত্বপ্রধান নাটক : ১. প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪)

রোমান্টিক নাটক : ১. রাজা রানী (১৮৮৯)
২. বিসর্জন (১৮৯০)

প্রহসন : ১. গোড়ায় গলদ (১৮৯২)
২. ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭)

উত্তরভাগ : নাট্যসংগীত রচনায় বৈচিত্র্য ও সিদ্ধি

তত্ত্বনাটক : ১. শারোদোৎসব (১৯০৮)
২. প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯)
৩. রাজা (১৯১০)
৪. ডাকঘর (১৯১২)
৫. অচলায়তন (১৯১২)
৬. ফাল্গুনী (১৯১৬)
৭. মুক্তধারা (১৯২২)
৮. রক্তকরবী (১৯২৬)

সামাজিক নাটক : ১. গৃহপ্রবেশ (১৯২৫)
২. বাঁশরী (১৯৩৩)

সামাজিক প্রহসন : ১. চিরকুমার সভা (১৯২৬)
২. শোধবোধ (১৯২৬)
৩. মুক্তির উপায় (১৯৩৯)

Dhaka University Institutional Repository

ঋতুনাট্য : ১. ঋতুরঙ্গ : বসন্ত (১৯২৩)

২. সুন্দর (১৯২৩)

৩. শেষবর্ষণ (১৯২৯)

৪. নবীন (১৯৩১)

৫. শ্রাবণগাথা (১৯৩৪)

গীতি আলেখ্য : ১. ঋতুরঙ্গ (১৯২৭)

২. নটরাজ (১৯২৭)

নৃত্যনাট্য : ১. নটীর পূজা (১৯২৬)

২. শিশুতীর্থ (১৯৩১)

৩. শাপমোচন (১৯৩১)

৪. তাসের দেশ (১৯৩৩)

৫. চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬)

৬. চন্ডালিকা (১৯৩৮)

৭. শ্যামা (১৯৩৯)[৭]

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলোর শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর নাট্যরসানুভূতির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন,

> "রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি হলেও নাট্যরসানুভূতি যে একেবারে ঊষাকাল থেকেই তাঁর কাব্যপ্রতিভার সঙ্গে জড়িত আছে তা সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে। বস্তুতঃ কবির নিতান্ত কিশোর বয়সের যে রচনাগুলিকে সচরাচর আমরা গাঁথা বা Ballad বলে ছেড়ে দি সেগুলি মূলতঃ নাট্যধর্মী। সমস্ত শৈশব ও কৈশর কাল ধরে তার লেখনীমুখে এই নাট্যধর্মী কাব্যের বান ডেকে চলেছিল। রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার ইতিহাসে এটিকে আদি পরীক্ষা-যুগ বা First experimental stage বলা যেতে পারে। এই সময়ে যে সমস্ত নাট্যধর্মী কাব্য তিনি রচনা করেছিলেন সেগুলি সংখ্যায় কম নয়।"[৮]

তিনি রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনাকে কালোল্লেখসহ শ্রেণি বিভাগ করেছেন। তাঁর লেখা আদি পরীক্ষারযুগের শ্রেণি বিভাগটি নিম্নরূপ :

১. পৃথ্বিরাজের (পৃথ্বিরাজের) পরাজয় : অপ্রকাশিত রচনা; রচনাকাল ১৮৭২-৭৩ (১২৭৯-

৮০)।

২. বনফুল : প্রথম প্রকাশ : ১৮৭৫-৭৬ (১২৮২-১২৮৩) : প্রথম প্রকাশের আধার : 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব'।

৩. কবি কাহিনী : ১৮৭৮ (ভারতী, পৌষ-চৈত্র ১২৮৪)।

৪. প্রতিশোধ : ১৮৭৮ (ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৫)।

৫. লীলা : ১৮৭৮ (ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫)।

৬. ফুলবালা : প্রথমাংশ : ১৮৭৭ (আর্যদর্শন, চৈত্র ১২৮৩)।

দ্বিতীয়াংশ : ১৮৭৮ (ভারতী, কার্তিক ১২৮৫)।

৭. অপ্সরা প্রেম : ১৮৭৯ (ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৫); রচনাস্থল- বিলাত।

৮. ভগ্নতরী : ১৮৭৯ (ভারতী, আষাঢ় ১২৮৬); রচনাস্থল- বিলাত।

৯. ভগ্নহৃদয় : সম্পূর্ণ গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৮৮১, জুন। প্রথম ছয় সর্গ : ১৮৮০-৮১ (ভারতী, কার্তিক-ফাল্গুন ১২৮৭); রচনাস্থল বিলাত ও বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনকালে জাহাজে।)

১০. রুদ্রচন্ড: ১৮৮১, জুন।

১১. বিষ ও সুধা : ১৮৮২; প্রথম প্রকাশ 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে। রচনাকাল সম্ভবত আরও পূর্বে।

উপরোক্ত এগারোটি কাহিনিমূলক কাব্য বা নাট্যধর্মী রচনা ছাড়াও এই আদি পরীক্ষারযুগে রবীন্দ্রনাথ দুইটি বিশেষ সংগীত-নাটক রচনা করেন। এ-দুটিকে তিনি প্রথমস্তরের গীতিনাট্য হিসেবে অভিহিত করেছেন। নাটক দুটি হচ্ছে :

১. বাল্মীকিপ্রতিভা (প্রথম সংস্করণ) : ১৮৮১ (১২৮৭); দ্বিতীয় সংস্করণ : ১২৯২ (১৮৮৬)।

২. কালমৃগয়া : ১৮৮২ (১২৮৯, অগ্রহায়ণ)।

দ্বিতীয়স্তরের গীতিনাট্য হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল নিম্নের নাটকগুলোকে চিহ্নিত করেছেন :

১. প্রকৃতির প্রতিশোধ : প্রকাশকাল : ১২৯২; রচনাকাল : ১২৯০/১৮৮৩।

২. নলিনী (প্রথম গীতিনাট্য): ১২৯১/১৮৮৪।

৩. বাল্মীকিপ্রতিভা (২য় সংস্করণ) ১২৯২/১৮৮৫।

৪. মায়ার খেলা ('নলিনী' নাটকের গীতিনাট্যরূপ) : ১২৯৫/১৮৮৮।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন 'রাজা ও রানী' (১২৯২) নাটক থেকে। এখানে তৃতীয় স্তরে 'রাজা ও রানী' রচনা থেকে পরবর্তী নাট্যরচনাগুলোর একটি কালক্রমিক হিসেব দেয়া হলো :

১. রাজা ও রানী : (১২৯৬/১৮৮৯) (কিছু পরিবর্তিত ২য় সংস্করণ- ১৩০১ এবং পুনরায় কিছু পরিবর্তিত ৩য় সংস্করণ- ১৩০৩); এই নাটকটি প্রধানত পদ্যে লেখা। যদিও কিছু কিছু গদ্যাংশ আছে। পরে মূল গল্পাংশ অবলম্বন করে পৃথক একখানি গদ্যনাট্য রচিত হয় 'তপতী' নাম দিয়ে, রচনাকাল ১৩৩৬।

২. বিসর্জন : (১২৯৭/১৮৯০); পরিবর্তিত ২য় সংস্করণ ১৩০৩; 'রাজর্ষি' (১২৯৩) উপন্যাসের প্রথমাংশ অবলম্বনে রচিত।

৩. চিত্রাঙ্গদা : (১২৯৯/১৮৯১) নাট্যকাব্য। ৪র্থ সংস্করণে কিছু কিছু পরিবর্তন আছে (১৩১১)। পরে এটিকে নৃত্যোপযোপী গীতিনাট্যের রূপ দেওয়া হয় (১৩৪২)।

৪. গোড়ায় গলদ : (১২৯৯/১৮৯২) এই প্রহসনজাতীয় নাটকটিকে ভেঙে পরে 'শেষ রক্ষা' (১৯২৮) নাটকটি রচিত হয়।

৫. মালিনী : প্রথম প্রকাশ ১৩০৩/১৮৯৬।

৬. বৈকুণ্ঠের খাতা : ১৩০৩/১৮৯৬।

৭. চিরকুমার সভা বা প্রজাপতির নির্বন্ধ : (১৯০৪, ১৯০৮ সনে প্রজাপতির নির্বন্ধ নামে প্রকাশিত); মুদ্রিত গ্রন্থাকারে (হিতবাদী সংস্করণ) প্রথম প্রকাশ : ১৩১১/১৯০৪; পরবর্তী নাট্যীকৃত রূপ : ১৩৩২/১৯২৬।

৮. হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গওকৌতুক : (১৯০৭) সংলাপময় রঙ্গব্যঙ্গ রচনা।

৯. শারদোৎসব : (১৯০৮) প্রথম অভিনয় ১৩১৫, আশ্বিন। পরে এর আর একটি অভিনয়যোগ্য পরিবর্তিত রূপ 'ঋণশোধ' (১৯২১)।

১০. মুকুট : (১৯০৮) এই নামের গল্পের (১২৯২) নাট্যরূপ।

১১. প্রায়শ্চিত্ত : (১৯০৯) বউ-ঠাকুরানীর হাট (১৮৮৩) অবলম্বনে রচিত; 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের পরবর্তীকালের পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে 'পরিত্রাণ' (১৯২৯)।

১২. রাজা : (১৯১০) এর পরবর্তী ক্ষুদ্রতর রূপ হচ্ছে 'অরূপরতন' (১৯২০)। 'শাপমোচন' (১৯৩১) নামক নৃত্যনাট্যের কাহিনিতে 'রাজা' নাটকের কাহিনির প্রভাব আছে।

১৩. অচলায়তন : (১৯১১) পরবর্তী নাট্যরূপ 'গুরু' (১৯১৮)।

১৪. ডাকঘর (১৯১২)

১৫. ফাল্গুনী (১৯১৬)

১৬. গুরু : (১৯১৮); উপরে 'অচলায়তন' দ্রষ্টব্য ।

১৭. অরূপরতন : (১৯২০) উপরে 'রাজা' দ্রষ্টব্য ।

১৮. ঋণশোধ : (১৯২১) উপরে 'শারদোৎসব' দ্রষ্টব্য ।

১৯. মুক্তধারা : (১৯২২) এর মধ্যেও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের কিছু প্রভাব আছে। উপরে 'প্রায়শ্চিত্ত' দ্রষ্টব্য ।

২০. বসন্ত : গীতিনাট্য (১৯২৩) ।

২১. গৃহপ্রবেশ : (১৯২৫) 'শেষের রাত্রি' নামক গল্পের (১৩২১) নাট্যরূপ ।

২২. শেষ বর্ষণ : গীতিনাট্য (১৯২৬) ।

২৩. সুন্দর : (১৩৩১) কয়েকটি গানের সমষ্টিমাত্র। পরে ১৩৩৩ সালে 'ঋতু উৎসব' নামক নাট্যসঙ্কলন-পুস্তকে যখন এটি সঙ্কলিত হয়, তখন এর গানের সংখ্যা ২৪টি ।

২৪. ঋতু উৎসব : (১৩৩৩) নাট্যসঙ্কলন, এরমধ্যে 'শেষ বর্ষণ', 'শারদোৎসব', 'বসন্ত', 'সুন্দর' ও 'ফাল্গুনী' এই পাঁচখানি রচনামাত্র স্থান পায় ।

২৫. চিরকুমার সভা : (১৯২৬) উপরে 'চিরকুমার সভা' বা 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' দ্রষ্টব্য ।

২৬. রক্তকরবী : (১৯২৬) 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ ১৯২৪ (আশ্বিন, ১৩৩১) ।

২৭. নটীর পূজা : (১৯২৬) 'কথা ও কাহিনী' (১৯০৮)-র 'পূজারিনী' কবিতার আখ্যানভাগ অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত হয় ।

২৮. নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা : (১৯২৭) প্রথম প্রকাশ 'বিচিত্রা', আষাঢ়, ১৩৩৪; 'নটরাজ' ও 'ঋতুরঙ্গ' নামেও এই ঋতুনাট্যের খন্ডাংশের অভিনয় হয়েছে ।

২৯. শেষ রক্ষা : (১৯২৮) উপরে 'গোড়ায় গলদ' দ্রষ্টব্য ।

৩০. পরিত্রাণ : (১৯২৯) উপরে 'প্রায়শ্চিত্ত' দ্রষ্টব্য ।

৩১. তপতী : (১৯২৯) উপরে 'রাজা ও রানী' দ্রষ্টব্য ।

৩২. নবীন : (১৯৩১) গীতিনাট্য ।

৩৩. শাপমোচন : (১৯৩১) গীতিনাট্য। কথিকার ভিত্তিতে রচিত। উপরে 'রাজা' দ্রষ্টব্য ।

৩৪. কালের যাত্রা : (১৯৩২) ['রথযাত্রা' (১৩৩০) নামে একখানি নাটিকাকে কবি স্বয়ং 'রথের রশি' (১৩৩৯) নামে পরিবর্তিত করেন এবং 'শিবের দীক্ষা' (১৩৩৫) নামে আর

একখানি নাটিকারও নতুন নামকরণ হয় ‘কবির দীক্ষা’। অবশেষে ‘রথের রশি’ ও ‘কবির দীক্ষা’ নাটক দুখানি একত্রে নাম পায় ‘কালের যাত্রা’।]

৩৫. চন্ডালিকা : (১৯৩৩) গদ্যনাটক, পরে নৃত্যনাট্য ‘চন্ডালিকা’ রূপে এটি প্রকাশ পায় (১৩৪৪)।

৩৬. তাসের দেশ : (১৯৩৩) ‘গল্পগুচ্ছ’র ‘একটি আষাঢ়ে গল্প’ (১২৯৯) নামক রূপক গল্পটিকে অবলম্বন করে এই নাটকটি রচিত হয়।

৩৭. বাঁশরী (১৯৩৩)।

৩৮. শ্রাবণ-গাথা (১৯৩৪)।

৩৯. নৃত্যনাট্য ‘চিত্রাঙ্গদা’ (১৯৩৬)।

৪০. ‘চন্ডালিকা’ নৃত্যনাট্য : (১৯৩৮) উপরে ‘চন্ডালিকা’ দ্রষ্টব্য।

৪১. মুক্তির উপায় : (১৯৪৮) গল্পগুচ্ছের ‘মুক্তির উপায়’ (১৯২৮) নামক গল্প অবলম্বনে এই নাটকটি রচিত হয়।

৪২. ‘শ্যামা’ : (১৯৩৯) নৃত্যনাট্য, ‘কথা ও কাহিনী’ (১৯০৮) গ্রন্থের ‘পরিশোধ’ নামক কবিতায় আখ্যানবস্তু অবলম্বনে এই নাটকখানি গঠিত।

রবীন্দ্রনাথ নাটক রচনায় বিষয়বস্তু এবং সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও সমসাময়িকদের থেকে একেবারেই ভিন্ন ছিলেন। নাটকের বিষয়, উপস্থাপনা, পরিবেশনা, সংগীত রচনা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই তিনি নতুনত্ব দেখিয়েছেন এবং সফল হয়েছেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রথম প্রতিনিধি তিনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য, ব্যক্তিত্বের সাহচর্য ও বিলেতের নাট্য ও সংগীত অভিজ্ঞতা এবং জানার প্রবল আগ্রহ থেকে স্বতন্ত্র ধারার নাটক রচনায় সাফল্য দেখিয়েছেন।

সংগীতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ চিরকালের। এই গীতিপ্রাণতার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে তথা নাট্য-সম্ভারে। তিনি যেখানে নাটকের ভাব প্রকাশে অসমর্থ হয়েছেন, সেখানেই সংগীত যোজনা করেছেন। তিনি রচনার শুরু থেকেই গানকে নাটকের বিষয়ের সাথে যুক্ত করেছেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গানের চর্চার সাথে নাটক অভিনয়ের প্রচলন ছিল। রবীন্দ্রনাথের সংগীত চর্চার পাশাপাশি নাট্যাভিনয় দেখার সুযোগ হয়েছিল আর তাই তিনি সংগীতকে খুব সহজেই সাবলীলভাবে নাটকে সন্নিবেশ করেছেন। গীতিকাব্য বিষয়ে তিনি বলেন:

“গান জিনিসটা নিছক সৃষ্টিলীলা। ইন্দ্রধনু যেমন বৃষ্টি আর রৌদ্রের জাদু, আকাশের দুটো

খামখেয়ালি মেজাজ দিয়ে গড়া তোরণ, একটি অপূর্ব মুহূর্তটি তার রঙিন উত্তরীয় উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল– তার বেশি আর কিছু নয়। মেজাজের এই রঙিন খেলাই হচ্ছে গীতিকাব্য। ঐ ইন্দ্রধনুর কবিটিকে পাকড়াও করে যদি জিজ্ঞাসা করা যেত 'এটার মানে কী হল', সাফ জবাব পাওয়া যেত 'কিছুই না'। 'তরে?' 'আমার খুশি।' রূপেতেই খুশি - সৃষ্টির সব প্রশ্নের এই হল শেষ উত্তর।"[৯]

সংগীতচিন্তায় 'পশ্চিমা যাত্রীর ডায়ারী'তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর ধর্মের স্বরূপটি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, "গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয়, এমন আর কিছুতে হয় না। এমন নেশায় ধরে যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে যায়, বড়ো বড়ো দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়, কর্তব্যের দাবিগুলোকে মন একেবারে নামাঞ্জুর করে দেয়।"[১০]

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী তাঁর 'রবীন্দ্র সঙ্গীতের ত্রিবেণী সংগম' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের বিলাত বাসকালীন সংগীত জীবনের কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "আমরা মায়ের সঙ্গে অনুমান ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গিয়ে পৌঁছই (বিলাতে)। পরে বাবা ও রবিকাকা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আসেন। সেই সময় থেকেই বিলিতী সঙ্গীতের সাথে তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) পরিচয় হয়, এবং শুনেছি তাঁর সুরেলা, জোরালো তার সপ্তকের চড়াগলা, যাকে ও দেশে বলে টেনর শুনে ওরা মুগ্ধ হত।"[১১]

রবীন্দ্রনাথ ১৮৮০ সালে পাশ্চাত্য নৃত্যগীতের নানাবিধ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে দেশে ফিরে আসেন । বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি নাটকের গানে পাশ্চাত্য সুরের প্রয়োগ করেন। তিনি বাংলা নাটকের প্রচলিত ধারা গ্রহণ না করে বাঙালি ঐতিহ্য ও ভারতীয় ধারার সাথে পাশ্চাত্য নাট্যভাবনাকে সঙ্গী করে নাটক রচনা করেছেন। নিজের নাটকে গান লেখার আদিপর্বে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বর্ণকুমারী দেবীর নাটকে অনেক গান লিখেছিলেন। জোড়াসাঁকোয় তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' (১৮৮০) গীতিনাট্যটি অভিনীত হওয়ার জন্য প্রস্তুত। এই গীতিনাট্যটির জন্য রবীন্দ্রনাথ 'আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি' সংগীতটি রচনা করেন। গীতিনাট্যের শেষ দিকে গানটি যুক্ত হয়। অবশ্য এর পূর্বে তিনি বালক বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী'র জন্য একটি গান রচনা করেন– 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ'।

রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক মঞ্চে মাত্র ষোল বছর বয়সে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'হঠাৎ নবাব' নাটকে (মলিয়ের লা বুর্জোয়া জাঁতিরোম অবলম্বনে রচিত) ও পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই 'অলিকবাবু' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। তাঁর গান

রচনার ভাঙ্গাগড়ার খেলায় একটি সুরকে অনেকভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন ‘কালমৃগয়া’ গীতিনাট্যের ‘সমুখেতে বহিছে তটিনী’ গানটির সুরে ‘হাসি কেন নাই ও নয়নে’ গানটি রচিত হয়েছে। ‘বুঝেছি বুঝেছি সখা ভেঙ্গেছে প্রণয়’ গানটি ‘স্বপ্নময়ী’ নাটকের তৃতীয় অঙ্ক ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে সুমতির গান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার এই গানটিই ‘ভগ্নহৃদয়’ নাটকের উনবিংশ সর্গে ললিতার গান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘খড়গ-পরিণয়’ গাঁথাতে রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছেন। ‘তারে দেহ গো আনি’ গানটি গাঁথায় ব্যবহৃত হলেও গ্রন্থে সেটিকে বাদ দেয়া হয়েছিল। গানটি পরে ‘রবিচ্ছায়ায়’ সংকলিত হয়েছিল এবং ইন্দিরাদেবী স্বরলিপি লিপিবদ্ধ করেন যা ‘স্বরবিতান ৩৫’ খন্ডে সংরক্ষিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিমানস নিতান্তই স্বতন্ত্রতায় সমুজ্জ্বল। বস্তুজগতের প্রতি অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কল্পনার রঙে সাহিত্যে উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে সংগীতকে তিনি উপযুক্ত সারথী হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যা তাকে সময়ে সময়ে সংকট থেকে উত্তরণের পথকে সহজ করে দিয়েছে। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন :

> “তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিরিক কবি বা গীতিকবি এবং তাহার প্রতিভার স্বরূপই হইতেছে লিরিক্যাল বা গীতিধর্মী। আত্মস্বভাবমূলক গীতিকবিতা বা গান তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত বিকাশস্থল। তাঁহার কবি-মানস একান্তভাবে স্বতন্ত্রধর্মী। একটা নিবিড় Subjectivity বা মন্ময়তাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিগত ভাব ও অনুভূতির দর্পণে তিনি জগৎ ও জীবনকে দেখিয়াছেন। বস্তুজগৎ তাঁহার অনুভূতি কল্পনার বিচিত্র বর্ণে রূপান্তরিত হইয়া তাঁহার একান্ত মনোজগতের জিনিস হইয়া গিয়াছে। গীতধর্মী প্রতিভার রহস্যই এই যে, যাহাকেই উহা সাহিত্যের বিষয়ীভূত করে তাহাকেই মনোরাজ্যের বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত করে এবং যে সুর সেই মনোরাজ্যে বাজে, সেই সুরই তাকে ঝংকৃত করে। সাহিত্যিক জীবনের প্রথম হইতেই দেখা যায়, তাঁহার সন্ধানপর দৃষ্টি বস্তুর মধ্য অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া বাহ্যরূপের অন্তরাল ভেদ করিয়া ভাব, আদর্শ বা তত্ত্বের একটা বৃহত্তর প্রতিষ্ঠাভূমি কামনা করিয়াছে। একটা বিশিষ্ট অনুভূতি, সংস্কার, ধারণা, ভাব, চিন্তা, তত্ত্ব বা আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত মনের দ্বারে যখন বাহিরের বস্তু বা ঘটনা উপস্থিত হয় তখন গায়ে সেই মনের রঙ লাগিয়া যায়; তাহাদের নিজস্ব সত্তা অবিকৃত থাকে না। রবীন্দ্রনাথের এই একান্ত আত্মভাব-কল্পনা প্রধান গীতিধর্মী কবিমানস তাঁহার প্রায় সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে।”[১২]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য রচনার কালকে ভাগ করলে তাঁর রচনার ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতার বৈশিষ্ট্যগুলো খুব সহজেই চোখে পড়ে। ভাবগত দিক দিয়ে সমান্তরালভাবেই তাঁর কাব্য রচনার যুগ ও নাট্যরচনার যুগ এক ছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের অঙ্কুর কালের রচনা 'কবি-কাহিনী', 'বনফুল', 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচন্ড' ইত্যাদি। এসব লেখায় তখনও কবির স্বীয় প্রতিভার ছাপ পড়েনি, তবে বেদনাবিধুর মানসিকতার ছাপ রয়েছে, যা এই নাটকগুলোর মূল সুর। এসময়কার কাব্যগ্রন্থ *'প্রভাত সংগীত'*, *'ছবি ও গান'*, *'কড়ি ও কোমল'*। *'ছবি ও গান'* নবযৌবনের নেশার ফসল উল্লেখ করে তিনি বলেন, "সত্যি কথা বলতে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। ছবি ও গান পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে উঠে, এমন আমার কোনো পুরোনো লেখায় হয় না।"[১৩] তবে তিনি তাঁর মৌলিকতা-চিহ্নিত কাব্যগ্রন্থ হিসেবে *'সন্ধ্যাসংগীত'*-এর কথা বলেছেন, যেটি ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯১৫ সালে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যাসংগীত সম্পর্কে লিখেছেন, "সন্ধ্যাসংগীত হইতেই আমার কাব্যস্রোত ক্ষীণভাবে শুরু হইয়াছে। এইখান হইতেই আমার লেখা নিজের পথ ধরিয়াছে। পথ যে তৈরি ছিল তাহা নহে– গতিবেগে আপনি পথ তৈরি হইয়া উঠিয়াছিল।"[১৪] এসময়কার রচনায়ও বেদনার সুর লক্ষ্য করা যায়, যা তার নাটকেও প্রকাশিত। এই ধারাটি *'সোনার তরী'*, *'মানসী'*, *'চিত্রা'* কাব্যগ্রন্থ রচনার আগ পর্যন্ত এই ভাগকে বিস্তৃত করা যায়। একে উন্মেষকালও বলা যায়।

'সন্ধ্যাসংগীতের' কবিতা এবং গীতিনাট্যগুলো একই সুরে গাঁথা ছিল। এরপরই রবীন্দ্র সাহিত্যের সমৃদ্ধতম যুগের শুরু। তা হলো 'মানসী-সোনার তরী-চিত্রা'র যুগ। নাটকের ক্ষেত্রেও 'কালমৃগয়া', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'মায়ার খেলা', 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'গোড়ায় গলদ'র মতো শ্রেষ্ঠ রচনাগুলো রচিত হয়েছিল। 'গল্পগুচ্ছ' তিন খন্ড ও 'ছিন্নপত্রাবলী' এসময়কার রচনা। এই যুগে তিনি পল্লিবাংলায় বসবাস করার সুযোগে সেখানকার সাধারণ মানুষের খুব কাছাকাছি আসতে পারায় তাঁর সাহিত্য এক নতুন দিশা পায়। মানবপ্রেমের সাথে প্রকৃতি প্রেমও যুক্ত হয় তাঁর রচনায়। *'মানসী'*, *'সোনার তরী'* ও *'চিত্রা'*র কবিতাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র মধ্য দিয়ে তিনি সাহিত্যে মানুষের প্রতি সহজাত করুণাবোধ দেখিয়েছেন যার ধারা এই পর্বের শেষ নাট্যকাব্য 'মালিনী' পর্যন্ত বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। প্রথমযুগের রচনা রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক চিন্তার ফল, কিন্তু এ-যুগের রচনা তাঁর প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতার

ফল। রবীন্দ্রনাথের মতে, মানসী তাঁহার সর্বপ্রথম কাব্যপদবাচ্য রচনা।[১৫]

এরপর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি কাব্যগ্রন্থ *'চিত্রা'*র যুগ অতিক্রম করে *'খেয়া'*র যুগে প্রবেশ করেন। এর ভিতর দিয়েই তিনি *'গীতালি'*, *'গীতিমাল্য'* ও *'গীতাঞ্জলি'* রচনা করেন। কাব্যগ্রন্থগুলো হলো *'চৈতালি'*, *'কণিকা'*, *'কথা ও কাহিনী'*, *'কল্পনা'*, *'ক্ষণিকা'*, *'নৈবেদ্য'*, *'স্মরণ'*, *'শিশু'*, *'উৎসর্গ'*, *'খেয়া'*, *'গীতাঞ্জলি'*, *'গীতিমাল্য'* ও *'গীতালি'*। এসময় রবীন্দ্রকাব্যে ঋতুসন্ধি, এই সময়কালকে তাঁর রচনার বিকাশকাল বলা যায়। রচিত নাটকের মধ্যে রয়েছে 'মালিনী', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'শারদোৎসব', 'ঋণশোধ', 'মুকুট', 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'পরিত্রাণ', 'রাজা', 'অরূপরতন', 'ডাকঘর', 'অচলায়ন' ও 'গুরু'। আরো পরে 'কথা ও কাহিনী'র 'কথা'র 'পূজারিনী' ও 'পরিশোধ' কবিতার গল্পাংশের অবলম্বনে 'নটীর পূজা' ('৩৩৩) ও 'নৃত্যনাট্য শ্যামা' (১৩৪৬) রচনা করেন।

পরবর্তীকালে আমরা পাই তাঁর পরিণতি যুগের রচনা। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো *'বলাকা'*, *'পূরবী'*, *'মহুয়া'* ইত্যাদি। এ পর্যায়ের নাটক 'গৃহপ্রবেশ', 'শোধবোধ', 'ফাল্গুনী', 'মুক্তধারা', 'চিরকুমার সভা', 'তপতী', 'নটীর পূজা', 'ঋতুরঙ্গশালা', 'শেষ বর্ষণ', 'বসন্ত' ও 'নবীন'। 'ফাল্গুনী' নাটকের ভিতর দিয়ে তিনি *'বলাকা'*র ভাবটি প্রকাশ করেন। শেষ যুগের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *'বনবানী'*, *'পুনশ্চ'*, *'নবজাতক'*, *'সানাই'*, *'শেষলেখা'* প্রভৃতি। *'সানাই'* গ্রন্থের অনেকগুলি ছোটো ছোটো কবিতা স্বতন্ত্র সংগীত রূপে প্রচলিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের এ-কাব্যপর্বের রোমান্টিকতা ও দার্শনিকতার স্থানে ফুটে ওঠে বাস্তবধর্মিতা। রচনা করেন নাটক 'শাপমোচন', 'কালের যাত্রা', 'তাসের দেশ', 'চণ্ডালিকা', 'বাঁশরী'; নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'শ্যামা'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত সাহিত্যের ছন্দ ও বাক্যবিন্যাস সুসম্পন্ন করতে সংগীতের প্রয়োগকে অপরিহার্য জ্ঞান করতেন। এমনকি না বলতে পারা কথাকে সংগীত অনায়াসে অসামান্য করে তোলে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন, যা স্থবিরতাকে এনে দেয় দূরন্ত গতি। এ-সম্পর্কে তিনি "সাহিত্যের তাৎপর্যে" বলেছেন :

"ছন্দে বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যকে সংগীতের আশ্রয় তো গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোনো মতে বলিবার জো নাই এই সংগীত দিয়াই তাহা বলা চলে। অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎসামান্য, এই সংগীতের দ্বারাই তাহা অসামান্য হইয়া উঠে। কথার মধ্যে বেদনা এই সংগীতই সঞ্চার করিয়া দেয়।"[১৬]

প্রথম পরিচ্ছদ

গীতিনাট্য (সংগীত প্রধান) ও নাট্যকাব্য

গীতিনাট্য হচ্ছে গীতি ও নাট্যের মিলন। কোন নাটকীয় ঘটনা গান ও নাটকের মাধ্যমে অভিনীত হলে তাকে গীতিনাট্য বলে। অনেকটা ইউরোপের অপেরার মতন। রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' অপেরা মতো গীতসবর্স্ব নাটক, তবে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া'য় নাট্যই মুখ্য, নানান নাট্যঘটনাকে গানের সূত্রে গাঁথা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের এক নতুন ধারা বা সৃষ্টি নাট্যকাব্য। গান ও নাটকের মিশ্রণে রচিত হয়েছে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া', আবার নাটক ও কাহিনির মিশ্রণে 'ভগ্নহৃদয়', 'নলিনী' ও 'রুদ্রচন্ড' রচিত হয়েছে। এদের আকৃতি নাটকের মতন হলেও প্রকৃতিটা কাহিনি কাব্যের।

ভগ্নহৃদয় (১৮৮১)

'ভগ্নহৃদয়' থেকেই রবীন্দ্রনাথের নাট্যগীতি রচনার সূচনা। ১৮৮১ সালে প্রকাশপ্রাপ্ত এই নাট্যকাব্যের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কান্ড, শাখা, পত্র এমনকি কাটাঁটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, দৃষ্টান্তরূপেই ফুলের উল্লেখ করা হইল।"[১৭]

তিনি সমসাময়িক কলকাতার পরিবেশ এবং নিজের পারিবারিক অভিজ্ঞতা থেকে এই নাটকটি রচনার উৎসাহ পেয়েছিলেন।

বাল্মীকিপ্রতিভা (১৮৮১)

১২৮৮ বঙ্গাব্দে বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি নাটকের গানে পাশ্চাত্য সুরের প্রয়োগ করেন এবং বাংলা নাটকের প্রচলিত ধারা গ্রহণ না করে বাঙালি ঐতিহ্য ও ভারতীয় ধারার সাথে পাশ্চাত্য নাট্যভাবনাকে সঙ্গী করে নাটক রচনা করেন। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য রচনার প্রথম প্রয়াস। এর আখ্যানভাগ 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' থেকে নেয়া। এই গীতিনাট্য থেকেই সূচনা হয় তাঁর সংগীতের সাথে নাটককে মিলিত করার প্রয়াস। সমগ্র বিষয়বস্তু এই নাটকে কেবল সুরের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে।

রুদ্রচন্দ্র (১৮৮১)

'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনার পর রবীন্দ্রনাথ ১৮৮১ সালের জুন মাসে ক্ষুদ্র নাট্যকাব্য বা গীতিনাট্য 'রুদ্রচন্দ্র' রচনা করেন। দ্বিতীয়বার বিলেত যাবার পূর্বে এই গ্রন্থটি রচিত হয়, কিন্তু জীবনস্মৃতি কিংবা অন্য কোন রচনায় 'রুদ্রচন্দ্র' সৃষ্টির প্রকৃত প্রেক্ষাপট স্পষ্ট নয়।

কালমৃগয়া (১৮৮২)

'বাল্মীকিপ্রতিভার' নতুন পন্থায় উৎসাহ বোধ করে রবীন্দ্রনাথ 'কালমৃগয়া' নামে আরেকটি গীতিনাট্য রচনা করেন। এর নাট্যবিষয় রামায়ণে বর্ণিত রাজা দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুবধ। এটিও বিদ্বজ্জনসমাগম সভার অধিবেশনে অভিনয় হবার উপলক্ষ্যে রচিত হয় এবং জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তেতালার ছাদে মঞ্চ বেঁধে এর অভিনয় হয় (২৩ ডিসেম্বর ১৮৮২, শনিবার)।

প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৩)

নাটকটি ১৬টি দৃশ্যে বিভক্ত এবং অমিত্রাক্ষর ও গদ্যের সংমিশ্রণে রচিত। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যের সন্ন্যাসী চরিত্রকে কাহিনি পরিকল্পনার কেন্দ্রমূলে রাখা হয়েছে। কিন্তু 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচনাকালে জগৎ-জীবন সম্পর্কে কবির দার্শনিক চেতনা জাগ্রত হয় বলে সন্ন্যাসীকে তিনি লোকালয়ে নিয়ে আসেন। ১৬টি দৃশ্যে নির্মিত নাটকটি বাল্মীকিপ্রতিভার মতো গীতসর্বস্ব করে রচিত নয়।

নলিনী (১৮৮৪)

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগে রচিত গীতিনাট্যগুলোর মধ্যে 'নলিনী' একমাত্র নাটক যা গদ্যে রচিত হয়েছিল। এর গল্প রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী গীতিনাট্য 'ভগ্নহৃদয়'-এর সমধর্মী এবং পরবর্তী গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'র অনুরূপ।

মায়ার খেলা (১৮৮৮)

সখীসমিতির জন্য ১৮৮১ সালে রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যটি রচনা করেন যার বিষয়বস্তু তরুণ-তরুণীর রুদ্ধ হৃদয়াবেগ ও অসফল প্রেমের তীব্র বেদনা। ৬৩টি কাব্যগীতির সন্নিবেশে এই নাটকটি রচিত। এর প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্য-নাটিকার সহিত এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারই সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।"[১৮]

উল্লেখ্য, 'কবিকাহিনী' (১২৮৪), 'ভগ্নহৃদয়' (১২৮৭), 'নলিনী' (১২৯১) এবং 'মায়ার খেলা' (১২৯৪) এই ৪টি নাটকেরই বিষয়বস্তুর দিক থেকে মিল রয়েছে। এমনকি তাঁর রচিত 'বনফুলের' (১২৮২/১২৮৩) গল্পাংশের সাথেও এই কাহিনি অংশের মিল পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

রোমান্টিক ট্রাজেডি নাটক (কাব্য ও নাটকের সমন্বয়) ও কাব্যনাট্য

কাব্য নাটক সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "যেখানে কাব্যগুণ নাট্যগুণকে অতিক্রম না করিয়া উহার সমশক্তি সম্পন্ন কিংবা অনুগত হয়েছে তাই কাব্যনাটক।"[১৯]

রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শে রোমান্টিক ট্রাজেডির নাটক রচনা করেছেন। 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', 'মালিনী' এই পর্যায়ভুক্ত। গান রচনায় তাঁর অপরিমিত ক্ষমতা আর প্রয়োগগুণের দক্ষতায় নাটককে ঘটনা দিয়ে না সাজিয়ে তিনি গান দিয়ে ভুলিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের রচনাগুলো আকারে নাটক হলেও এগুলো গীতপ্রধান, এতে রয়েছে ভাবের দ্বন্দ্ব। পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মধ্যে দিয়ে একটি বিশিষ্ট কবিমনেরই বিচিত্র ভাবের প্রকাশ পেয়েছে। তবে মালিনী নাটকে কোন গান ছিল না।

কাব্য ও তত্ত্বের মূর্তি রবীন্দ্রনাথের নাটকের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং নাটকের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোতে তিনি সংগীতের মাধ্যমে একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করেছেন। এজন্য সংগীত রবীন্দ্রনাথের নাটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে আছে। 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' ও 'চিত্রাঙ্গদায়' আছে রূপের সাথে হৃদয়ের সৌন্দর্য, উর্বশীর সাথে লক্ষ্মীর দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধানই কাব্যনাট্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। 'বিদায়-অভিশাপে' রয়েছে আত্মবিলোপ কর্তব্যনিষ্ঠার সাথে প্রেমের দ্বন্দ্ব। 'কাহিনী'-কাব্যের অন্তর্গত 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ', 'সতী', 'নরকবাস' প্রভৃতি কাব্যনাট্যে ধর্মের বিভিন্ন আদর্শের দ্বন্দ্ব রূপায়িত হয়েছে। ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ সমাজ-ধর্ম বা লৌকিক ধর্ম বা ব্যবহারিক ধর্মের সাথে নিত্য-সত্য মানবধর্ম এসব কাব্যনাট্যের পাত্র-পাত্রীর চিন্তায় ও কর্মে ব্যক্ত হয়েছে। নাটকের মধ্যে তিনি যেমন আদর্শমূলক চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন তেমনি অনেক বাস্তবধর্মী চরিত্রকেও আদর্শায়িত করেছেন।

রাজা ও রানী (১৮৮৯)

রাজা ও রানী নাটকটি ১৮৮৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। নাটকটির কাহিনি অবলম্বনে পরবর্তীকালে ১৯২৯ সালে 'তপতী' নামে আরেকটি নাটক প্রকাশিত হয়।

বিসর্জন (১৮৯০)

'রাজা ও রানী' রচনার অল্প কিছুদিন পরে 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথমাংশ অবলম্বনে 'বিসর্জন' নাটকটি রচিত হয়। 'রাজর্ষি' প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে, অন্যদিকে 'বিসর্জন' ১৮৯০ সালে রচিত হয়। 'রাজর্ষি' রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"স্বপ্ন দেখিলাম, কোন এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রাজচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'বাবা, এ কী! এ যে রক্ত!' বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে।...এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমানিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া রাজর্ষির গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে 'বালকে' বাহির করিতে লাগিলাম।"[২০]

নাটকটি রচনারও একটি পটভূমি ছিল। মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে ঠাকুরবাড়িতে নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা হতো। এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধক্রমে সাহাজাদপুরের জমিদারিতে গিয়ে 'বিসর্জন' নাটক রচনা করেন। 'বিসর্জন' নাটক রচনার ইতিহাস সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর *ঘরোয়া* গ্রন্থে বলেন,

"তখন বর্ষাকাল, রবিকাকা আছে পরগণায়।...'বউ ঠাকুরানী'র হাটের বর্ণনাগুলি বাদ দিয়ে কেবল কথাটুকু নিয়ে খাড়া করে তুলেছি নাটক করব।...এমন সময় রবিকাকা কী একটা কাজে ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন...না, এ চলবে না।...এর কিছুদিন বাদেই রবিকাকা শিলাইদহে গেলেন, আট দশ দিন বাদে ফিরে এলেন, 'বিসর্জন' নাটক তৈরি।"[২১]

বিদায়-অভিশাপ (১৮৯৩)

কবি পাবনা জেলার কালীগ্রামে জমিদারি-কাছারিতে থাকার সময় **১৮৯৩** সালে 'বিদায় অভিশাপ' নাটকটি রচনা করেন। মূল ঘটনাটি মহাভারতের বৃহস্পতিপুত্র কচ ও শুক্রাচর্যকন্যা দেবযানীর প্রণয় ও বিচ্ছেদভিত্তিক। তিনি এই কাব্যনাট্যটির কাহিনিসূত্র সম্পর্কে বলেছেন,

"শুক্রাচার্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনীবিদ্যা লিখিবার নিমিত্তে বৃহস্পতির পুত্র কচকে দেবতারা দৈত্যগুরুর আশ্রমে পেরণ করেন। সেখানে কচ সহস্রবর্ষ নৃত্য-গীত-বাদ্য দ্বারা শুক্রতনয়া দেবযানীর মনোরঞ্জন করিয়া সঞ্জীবনীবিদ্যা লাভ করিলেন। অবশেষে যখন বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল তখন দেবযানী তাঁহাকে প্রেম জানাইয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। দেবযানীর প্রতি অন্তরে আসক্তি স্বত্বেও কচ নিষেধ না মানিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। গল্পটুকু এই। মহাভারতের সহিত একটুখানি অনৈক্য আছে, কিন্তু সে সামান্য।"[২২]

নারী পুরুষের উভয়ের জীবনেই প্রেম আসে কিন্তু তা সুখের না হয়ে দুঃখের বাণীও বয়ে আনতে পারে। পুরুষ তার দায়িত্ব কর্তব্যের প্রয়োজনে প্রেমকে অস্বীকার করতে কতটা কঠোর হতে পারে আর নারী তাকে কিভাবে দেখে এই দুই ভিন্নমুখী প্রবণতার দ্বন্দ্ব 'বিদায়-অভিশাপ'কে নাটকীয়

পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই কাব্যনাটকে কোন গান নেই।

চিত্রাঙ্গদা (১৮৯৩)

ক্ষুদ্র কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' রবীন্দ্রনাথের অপরূপ এক সৃষ্টি। মহাভারতের আদিপর্বের অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার পরিণয়ের কাহিনির ছায়া অবলম্বন করে তার সাথে কল্পনার যোগে এই আখ্যানভাগ রচনা করা হয়েছে। এই নাটকটি রচিত হয় উড়িষ্যার জমিদারি তদারকি কাজে পাণ্ডুয়ার কুঠিতে অবস্থানকালে। নারী সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়ী জৈব উদ্দেশ্য অতিক্রম করে অন্তরের চিরন্তন ও শাশ্বত সত্যের পরিচয় ব্যক্ত করার জন্যে চিত্রাঙ্গদার রূপায়ণ।

মালিনী (১৮৯৬)

'মালিনী' নাটকটি মোট চারটি দৃশ্যে বিভক্ত। এতে কোন অঙ্ক বিভাজন নেই। কবি উড়িষ্যায় অবস্থানকালে এটি রচনা করেন। মালিনী উপাখ্যানটি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থ থেকে নেয়া। তবে রবীন্দ্রনাথ মূল নাটকের থেকে কাহিনি পরিবর্তন করেছেন। কবি এখানে কেবল নাটক লেখার জন্যই একটি ঘটনাকে বেছে নেননি বরং একটি বিশেষ প্রেরণা থেকে নিজস্ব ভাবনা ও কবিসত্তার উপলব্ধিতে এটি প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা দেন, "মালিনী নাটিকা উৎপত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্নঘটিত। কবিকঙ্কনকে দেবী স্বপ্নে আদেশ করেছিলেন তার গুণ-কীর্তন করতে। আমার স্বপ্নে দেবীর আবির্ভাব ছিল না, ছিল হঠাৎ মনের একটা গভীর আত্মপ্রকাশ ঘুমন্ত বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে।"[২৩]

'মালীনি'র সমসাময়িককালে রচিত হয়েছে *'চিত্রা'*, *'চৈতালি'* প্রভৃতি কাব্যের কবিতাসমূহ এবং 'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'নরকবাস', 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' প্রভৃতি নাটক-নাটিকা। 'চিত্রা' কাব্যের বিচিত্র ভাবময় কবিতার জীবনদেবতা ভাবের কবিতা, স্নেহপ্রীতি, কর্তব্যনিষ্ঠা, মৃত্যু প্রভৃতি কবিতা কবির জীবনবোধের যে পরিচয় বহন করে তার সাথে মালীনি নাটকের কিছু সাদৃশ্য আছে। ঘটনার দ্রুতগতি ও সাদৃশ্যে এবং কাব্যসম্পদের উৎকর্ষে একে রোমান্টিক ট্রাজেডির পর্যায়ে ফেলা যায়, আবার ভাববস্তু ও ভাষার সাদৃশ্যে এবং কাব্যসম্পদের ঐশ্বর্যে একে কাব্যনাটকের অন্তর্গত করা যায়। এ নাটকে কোন গান নেই। চৈতালী কবিতাগুচ্ছ রচনার মধ্য-ভূমিতে 'মালিনী'র জন্ম।

গান্ধারীর আবেদন (১৮৯৮)

'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যনাট্য শ্রেণির রচনা। রবীন্দ্রনাথ এটি শান্তিনিকেতনে বাসকালে রচনা করেন এবং ড. গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক বসন্ত অনুষ্ঠানে (১ ফাল্গুন) তিনি এটি প্রথম পাঠ করেন। এর কাহিনি মহাভারত আশ্রিত। ধর্মশীলা তেজস্বিনী গান্ধারী পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে মানবধর্মে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এই কাহিনিই তিনি নাটকে উপস্থাপন করেছেন।

ক্ষমতাসীনের অত্যাচারের কথা 'গান্ধারীর আবেদন' নাটকটির মূল বক্তব্য। সুতরাং ধরে নেয়া স্বাভাবিক এই নাটকটি রচনার পেছনে সমসাময়িক ইংরেজ শাসকের চরিত্র ও আচরণ রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। কারণ উল্লেখ্য যে, সেই বছরটি রাজনৈতিক দিক দিয়ে বাংলা তথা ভারতের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এসময় ইংরেজ সরকার একদিকে বিশেষত বোম্বাই প্রদেশে দমনমূলক পীড়ন আরম্ভ করে, অন্যদিকে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য সুপ্রিম লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে Mr. Chalmers (ভারতের আইন সদস্য)-এর দ্বারা সিডিশন বিল আনয়ন করে। জনসাধারণ ও দেশীয় সংবাদপত্রগুলোর প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও সিডিশন বিল আইনে পরিণত হয়। এসব ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করে। নাটকটিতে কোন গান নেই।

সতী (১৮৯৭)

'সতী' কাব্যনাট্যে একটি নাটকীয়ত্ব রয়েছে। নাটকটির সমস্ত ঘটনার শেষ পরিণাম একটি যুদ্ধোত্তর শ্মশানদৃশ্যে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। এই নাটকের আখ্যানভাগ মারাঠী গাঁথা থেকে নেয়া। বিপরীতমুখী ভাবের সংঘর্ষে পাত্র-পাত্রীর চিত্ত-দ্বন্দ্ব চরমে উপনীত হয়ে একটি মর্মান্তিক ঘটনায় পরিণতি লাভ করেছে। এই নাটকেও কোন গান নেই।

লক্ষ্মীর পরীক্ষা (১৮৯৭)

'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' দুই দৃশ্যে সম্পন্ন নারীচরিত্র নির্ভর গানবিহীন একটি কাব্যনাট্য। রবীন্দ্রনাথ এটি শান্তিনিকেতনে বসবাসকালে রচনা করেন। এটি রবীন্দ্রনাথের একটি অভিনব সৃজন। ইতিহাস-পুরাণ ত্যাগ করে তিনি এখানে রূপকথার ভাবকে অবলম্বন করেছেন। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'য় একজন রানীর উদারতা ও তার গৃহপরিচারিকার স্বপ্ন প্রাধান্য পেয়েছে। কবির জীবনের এই পর্বকে শ্রী প্রমথনাথ বিশী 'প্রাচীন ভারতে মানসভ্রমণের পর্ব' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন,

"কল্পনায় প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যলোকের বার্তা; নৈবেদ্য প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মলোক

বার্তাবাহী আর কথা ও কাহিনী প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক মহত্বের বার্তাবহনকারী। আলোচ্য কাব্যনাটকগুলিকে, বিশেষভাবে গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস, কর্ণ-কুন্তী-সংবাদকে এই পর্বের অনাগত করিয়া দেখিতে হইবে; এইগুলিতে প্রাচীন ভারতের আদর্শের মহত্ত্বকে স্থাপিত করিবার সেই একই চেষ্টা। চিত্রাঙ্গদা ও বিদায়-অভিশাপের সচেতন সৌন্দর্যলোক কল্পনা কাব্যের প্রেরণার অনুবর্তী। আর গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরকবাস ও কর্ণ-কুন্তী-সংবাদের বিরলসৌন্দর্য, অন্তমহৎ গম্ভীর আদর্শ বৈদ্য কাব্যের অনুষঙ্গ।"[২৪]

নরক-বাস (১৮৯৮)

'নরক-বাস' একদৃশ্যে সম্পন্ন একাঙ্কিকা শ্রেণির নাটক। শান্তিনিকেতনে বাসকালে রবীন্দ্রনাথ এটি রচনা করেন। এর কাহিনি পুরাণ থেকে গৃহীত। ধর্মচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ মূলত মুক্তমন ছিলেন যার পরিচয় 'নরক-বাস' রচনায় পাওয়া যায়। নাটকটিতে কোন গান নেই।

কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ (১৯০০)

'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' অল্প আয়তনে পুরাণভিত্তিক কাব্যনাট্য। রবীন্দ্রনাথ এটি কলকাতা থাকাকালীন রচনা করেন। গান ছাড়া কাব্যনাট্যটি 'কাহিনী' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। মহাভারতের বর্ণিত কাহিনি রবীন্দ্রনাথ অতি সংক্ষেপে অত্যন্ত সংযমের সাথে বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
রূপক বা সাংকেতিক নাটক (ভাব বা তত্ত্বপ্রধান)

রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী যুগে রূপক বা সাংকেতিক শ্রেণির নাটক বাংলা সাহিত্যে ছিল না, সমসাময়িক যুগেও ছিল না। তাঁর এই শ্রেণির রচনাগুলো বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি। রবীন্দ্র পরবর্তী যুগেও এই ধারা কেউ অনুসরণ করেননি। ১৯০৮ সাল থেকে তিনি রূপক বা সাংকেতিক নাটক লেখা শুরু করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই ধরনের নাটক অনেক আগে থেকেই জনপ্রিয়। উনিশ শতকের শেষ দশকে (১৮৯০ থেকে ১৮৯৯) পাশ্চাত্যে প্রচুর রূপকধর্মী নাটক প্রকাশিত হয়।

সংকেত-পূর্বযুগের নাট্যরচনায় ভাবের সৃষ্টিতে কবি একটি সুনির্দিষ্ট আখ্যানভাগকে অবলম্বন করেছেন। সাধারণ নাটকের পথ ছেড়ে তিনি নিগূঢ় ভাব ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির একটা রসরূপ দেবার জন্য রূপক-সংকেত নামে এই নতুন শিল্পরীতি অবলম্বন করেছেন।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে বাস্তবরীতির সাথে সংকেতরীতির প্রয়োগও সমানভাবে প্রচলিত এবং রসিকজন সমাদৃত। নাট্যশিল্পীরা সংকেতকে পরিত্যাগ করেননি বরং প্রয়োজনবোধে ব্যবহার করেছেন। জার্মান নাট্যকার হাউপট্‌ম্যান প্রথমে ছিলেন বাস্তবরীতির নাট্যকার, শেষে তিনি রূপক-সাংকেতিক রীতি গ্রহণ করেছেন। রুশ-নাট্যকার আন্দ্রিভের 'The Life of Man' যখন প্রথম মঞ্চস্থ হয়, দর্শকরা এতটাই বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়েন যে, তারা লেখকের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কেন তিনি এই নতুনভাবে নাটক লিখেছেন? পাশ্চাত্য নাট্যসমালোচক Elizabeth Drew বলেন,

> "There are always two ways in which human experience can be represented in art : the way of realism and the way of the symbolism. in drama this means that it can be represented directly in actual figures of flesh and blood, or it can be suggested obliquely by way of creation of significant images."[২৫]

"শকুন্তলা" (১৯০২) প্রবন্ধে রূপকনাট্য সম্পর্কে কবি লিখছেন, "প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপকনাট্য রচিত হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া

তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধন করাইয়া লওয়া, এ তো অন্যত্র দেখি নাই।"[২৬] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের নাট্যচেতনার এই পালাবদল সম্পর্কে বলেন, "গানাৎ পরতরং নহি। গানই শেষ কথা। ভাষা যেখানে থেমে দাঁড়ায়, অর্থ যেখানে অতৃপ্তি আনে, সেখানে গান ছাড়া আর কালকে আশ্রয় করা যাবে? সংকেত খানিকটা এগিয়ে দেয় সন্দেহ নেই; তারপরেই আসে গান। সে সংকেতেরও সংকেত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের নাটকে গানকে আসতে হল, আসতে হলো অনিবার্যতার দাবিতেই।"[২৭]

শারদোৎসব (১৯০৮)

প্রকৃতির সৌন্দর্যে মানুষ যে উৎসবানন্দ অনুভব করে, উপভোগ করে, তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় অভিব্যক্ত হয়েছে 'শারদোৎসব' নাটকে। নাটকটি ঋতু উৎসবের প্রথম অর্ঘ্য। নাটকটি রচনার সময় তিনি 'গোরা' উপন্যাসটি রচনা করেন। সমসাময়িক ঘটনা উপন্যাসে যেভাবে ব্যক্ত হচ্ছিল, নাটকে তা করেননি। বরং শারদোৎসব রচনার সময় কবি আশ্রমের ছেলেদের উপযোগী নাটক রচনার কথা ভাবছিলেন। জগদানন্দ রায় বলেন,

> "তখন গুরুদেব ছেলেদের সঙ্গে লাইব্রেরীর উপরকার দোতলায় খড়ের ঘরে থাকিতেন। সেই ঘরের ছেলেরা বড়ো উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাঁহাকে কিছুকাল সেখানে থাকিতে হইয়াছিল। হয়তো ছেলেদের মনোরঞ্জন করিয়া সংযত রাখিবার জন্য ওই ঘরে বসিয়া তিনি একখানি নাটক লেখা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দিনে দিনে নতুন নতুন সুরে গান রচনা হইতে লাগিল, সন্ধ্যার পর সেখানে বসিয়াই ছেলেদের সেইসব গান শিখাইতে লাগিলেন। আনন্দের আর সীমা রহিল না। আশ্রমে যে একটা থমথমে ভাব ছিল তাহা কাটিয়া গেল। ইহাই সেই সুপ্রসিদ্ধ 'শারদোৎসব' নাটক। এই নাটকটি যেদিন আশ্রমবাসী সকলকে ডাকিয়া আগাগোড়া শুনানো হয়, তাহাও মনে পড়ে। তখন সবে নাট্যঘরের মাঝের অংশটা নির্মিত হইয়াছে। গুরুদেব সেই ঘরে সভা করিয়া একদিন 'শারদোৎসব' পড়িয়া শোনাইলেন।"[২৮]

নাটকটি রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে কি ধরনের অনুভূতি কাজ করছিল সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> "শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ঐ একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে শারদোৎসব করার জন্যে। তিনি খুঁজছেন তার সাথী। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছেন। কিন্তু একটি ছেলে

ছিল–উপনন্দ–সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যে নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তার সত্যকার সাথী মিলেছে। কেননা ঐ ছেলের সঙ্গেই শরৎপ্রকৃতির সত্যিকার আনন্দের যোগ– ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করছে– সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বই যে এই দুঃখতপস্যায় রত; অসীমের যে দান সে নিজের মধ্যে পেয়েছে, অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের শোধ করছে। প্রত্যেক ঘাটতি নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করেছে। এই যে নিরন্তন বেদনায় তার আত্মোৎসর্জন। এই দুঃখই তো তার শ্রী, এই তো তার উৎসব, এতেই তো সে শরৎপ্রকৃতিকে সে সুন্দর করেছে। আনন্দময় করেছে।...যেখানে আপন সত্যের ঋণশোধে শৈথিল্য সেখানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই কদর্যতা, সেইখানেই নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, এই জন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে। ভয়ে কিংবা আলস্যে কিংবা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে জগতে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটি এই, ওতো গাছতলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনাবার কথা নয়।” [২৯]

প্রকৃতির মাঝে শারদোৎসব পালন করার মানসে কিভাবে নাটকটি রচিত হয়েছে সে বর্ণনা দিতে গিয়ে শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন,

“বর্ষা গেল, খুব ভালো করিয়া শারদোৎসব করিবার জন্য কবি উৎসুক হইলেন। আমাদিগকে বলিলেন, বেদ হইতে ভালো শারদশোভার বর্ণনা খুঁজিয়া বাহির করিতে। সংস্কৃত সাহিত্যের নানা স্থানে খোঁজ চলিল। কবি লাগিয়া গেলেন শরৎকালের উপযুক্ত সব গান রচনা করিতে। একে একে অনেকগুলো গান রচিত হইল। ক্রমে তাঁহার মনে হইল গানগুলিকে একটি নাট্যসূত্রে বাঁধিতে পারিলে ভালো হয়। তাহার পর তৈয়ারি হইয়া উঠিল শারদোৎসব নাটক।”[৩০]

শারদোৎবের প্রথম পান্ডুলিপিটি রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে দান করেন। নাটকে অভিনয় সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন বলেন,

“ইতিমধ্যে আশ্রমে আমার ঠাকুরদাদা নামটি চলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কবি ভাবিয়াছিলেন আমি ভালো গাহিতে পারি, সেইজন্য শারদোৎসবে ঠাকুরদার ভূমিকাটি আমাকে দেয়া হইবে স্থির করিয়া তাহাতে অনেকগুলি গান ভরিয়া দেওয়া হয়। যখন আমি বলিলাম, গান আমার দ্বারা চলিবে না, তখনও কবির সংশয় দূর হইল না। তিনি অগত্যা অজিতবাবুকে ঠাকুরদাদার ভূমিকা গ্রহণ করিতে বলিয়া আমাকে সন্ন্যাসীর পাট করিবার আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও গান আছে, যদিও সংখ্যায় অল্প। তাহা লইয়াও বিপদ বাধিল কিন্তু গান থাকিলেও সন্ন্যাসীর অভিনয় আমি করিব। ঠিক হইল, গানের সময় বাহিরে আমার অভিনয় চলিলেও ভিতর হইতে রবীন্দ্রনাথ গান করিবেন। শারদোৎসব নাটকটি দেখিয়া সকলেই প্রীত হইলেন। সকলেই

বলিলেন, এতদিনে এমন একজন লোক পাওয়া গেল, যিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন। সহজে এই কৃতিত্ব লাভ করিয়া খুব খুশি হইলাম বটে, কিন্তু পরে এইজন্য আমাকে বহু দুঃখ সহিতে হইয়াছিল।"[৩১]

মুকুট (১৯০৮)

১২৯২ সালে 'মুকুট' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল 'বালক' পত্রিকায়। সেই কাহিনিটিই নাটকে রূপান্তরিত করে ১৯০৮ সালে 'মুকুট' নাটকটি রচনা করেন। নাটকটি বালকদের জন্যই লেখা এবং স্ত্রী চরিত্র বর্জিত। তাই স্কুলের ছাত্ররা সহজেই নাটকটি অভিনয় করতে পারে।

রাজা (১৯১০)

'রাজা' নাটকটি ১৩১৭ সালের পৌষ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে নাটকে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়। পরবর্তী সংস্করণের সূচনায় এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এই 'রাজা' প্রথমে খাতায় যেমনটি লিখিয়াছিলাম তাহার কতকটা কাটিয়া ছাটিয়া বদল করিয়া ছাপানো হইয়াছিল [প্রথম সংস্করণ]। হয়তো তাহাতে কিছু ক্ষতি হইয়া থাকিবে এই আশঙ্কা করিয়া মূল লেখাটি অবলম্বন করিয়া বর্তমান সংস্করণ ছাপানো হইল।"[৩২]

এই নাটকটির ক্ষুদ্রতর রূপ হচ্ছে 'অরূপরতন' (১৯২০)। পরবর্তীকালে রাজারই বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বনে 'শাপমোচন' (১৮৩১) নামক নৃত্যনাট্য রচনা করেন। 'রাজা' নাটকে ঈশ্বরানুভূতির এক অভিনব রূপ ও তার সমস্যা প্রকটিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর অসাধারণত্বে ও গৌরবে, অনুভূতির তীব্রতায়, সংকেতের অব্যর্থ প্রয়োগ করে অতীন্দ্রিয় রহস্যময় আবহ সৃষ্টিতে বিশ্ব নাট্য-সাহিত্যের ধারায় 'রাজা' অনন্য। রাজা নাট্যরূপের কাহিনি বৌদ্ধ সাহিত্যের কুশ-জাতক অবলম্বনে পরিকল্পিত।

অচলায়তন (১৯১১)

'রাজা' নাটক রচনার দুই বছর পরে ১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' তত্ত্ব নাটকটি রচনা করেন। নাটকটির পরবর্তী নাট্যরূপ 'গুরু' (১৯১৮)। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বাস করার সময় এটি রচনা করেন। তিন মাস পর সেটি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্গত *'দিব্যাবদানমালা'* গ্রন্থের 'পঞ্চকাবদান' নামক নীতিমূলক কাহিনির ভিত্তিতে রচিত 'অচলায়তন'। নাটকে অচলায়তন বলতে বোঝানো হয়েছে অচলগৃহ। এখানে সবকিছু নিয়মে বাঁধা। এই নিয়ম থেকে বের হওয়া এবং সব নিয়ম ভেঙে নতুন করে স্বাধীনভাবে গড়ে তোলাই হচ্ছে এই নাটকের

মূলভাব। সীতা দেবীর পুণ্যস্মৃতি ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *রবিরশ্মি* ২ থেকে জানা যায় যে প্রকাশের আগে নাটকটি রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বাড়িতে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। সেখানে স্বয়ং গানগুলিও গেয়েছিলেন।

ডাকঘর (১৯১২)

'ডাকঘর' নাটকটির কাহিনি গদ্যের ভাষায় রচিত। এই নাটকের পরিবেশ তৈরি করার জন্য রবীন্দ্রনাথ এটিতে একটি সংগীতও যোজনা করেননি, আর তাই এই 'গীতময়তার আভাস' নাটকের সংলাপকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছে। তবে নাটকের ক্ষেত্রে সংগীত অপরিহার্য না হলেও নাটক অভিনয়ের সময়ে সংগীতের প্রয়োজন যে অনস্বীকার্য তার প্রমাণ 'ডাকঘর' অভিনয়কালে সংযোজিত গানগুলি। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৪ বোলপুর থেকে মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানান, "আমি ছোট একটি নাটক লিখেছি। তার গন্ধটুকু কারো নাকে পৌঁছবে কিনা জানিনে কিন্তু আমার নিজের ভালো লেগেছে, সেই পুরস্কারটা পাওয়া গেছে। নাটকটির নাম ডাকঘর।"[৩৩]

ফাল্গুনী (১৯১৬)

ফাল্গুনী নাটক ১৯১৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন সুরুলের বাড়িতে ছিলেন। ১৯১৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি নাটকটি লেখা শুরু করেন এবং দু'সপ্তাহের মধ্যে নাটকটির পাণ্ডুলিপি সম্পন্ন করেন। তিনি নাটকটি রচনা করেন মূলত বসন্তোৎসবকে কেন্দ্র করে। তিনি বলেন, "ইতিমধ্যে আমার স্কন্ধে কবিতা ভর করেছে। আমার আশ্রমের ছেলেবুড়ো সবাই ধরেছে বসন্তউৎসবের উপযোগী একটা ছোট নাটক রচনা করে দিতে হবে। আমি কথা দিয়েছি এবং সুরুলের নির্জন ঘরে লিখতে বসে গেছি। গানের সুরগুলো মস্তিষ্কের মৌচাকটার মধ্যে গুনগুন করতে লেগে গেছে।"[৩৪] পাণ্ডুলিপি লেখা শেষ হলে এর নাম দেন 'বসন্তোৎসব', তবে প্রকাশের (প্রথম প্রকাশ 'সবুজপত্র'র চৈত্র সংখ্যায়) আগে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'ফাল্গুনী'।

গুরু (১৯১৮)

'গুরু' নাটকটি 'অচলায়তন' নাটকটির সহজ সংস্করণ। নাটকটি ১৩২৪ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ঋণশোধ (১৯২১)

১৯০৮ এর 'শারদোৎসব' নাটকটি ১৯২১ সালে 'ঋণশোধ' নাটকে রূপান্তরিত করা হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "শারদোৎসবকে লইয়া কাটাছাঁটা জোড়াতোড়া দিয়ে 'ঋণশোধ' নাটক লিখেছিলেন এবং পূবকাশের পূর্বে অভিনয় করিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কবিশেখরের ভূমিকা গ্রহণ করেন।...পূজাবকাশের পূর্বদিন (১৩২৮ আশ্বিন) সন্ধ্যায় নাট্যঘরে অভিনয় হইয়াছিল; সে ঘর এখন নাই। রবীন্দ্রনাথ কবিশেখর, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরদা, সন্তোষচন্দ্র রাজা, জগদানন্দ রায় লক্ষেশ্বরের ভূমিকা গ্রহণ করেন।"[৩৫]

মুক্তধারা (১৯২২)

'মুক্তধারা' নাটকটির মধ্যেও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের কিছু প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুক্তধারা নাটকে বন্ধনমুক্ত মানবাত্মার আনন্দলীলার কথা বলেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে (১৯১১-১৯১৭) রচিত নাটকটি রবীন্দ্রনাথের সমকালীন দেশ-কালের অভিজ্ঞতার সার্থক প্রতিবিম্ব। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনীতি, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও নিষ্ঠুর যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের সামগ্রিক জীবনবোধকে যেভাবে লাঞ্ছিত ও বিধ্বস্ত করেছে তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কাহিনি 'মুক্তধারা'। ১৯২১ সালে কালিদাস নাগকে লিখিত একটি চিঠিতে (২১ বৈশাখ ১৩২৯) রবীন্দ্রনাথ মুক্তধারা সম্বন্ধে লিখেছেন :

> "আমি 'মুক্তধারা' বলে একটি ছোটো নাটক লিখেছি, এতদিনে প্রবাসীতে সেটা পড়ে থাকবে। তার ইংরেজী অনুবাদ 'মডার্ন রিভিউ'তে বেরিয়েছে। তোমার চিঠিতে তুমি machine সম্বন্ধে যে আলোচনার কথা লিখেছ সেই machine এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করেছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিত ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষমশোচনীয়তা আছে - কেননা যে-মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে - তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। আমার নাটকে অভিজিত হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ।...যন্ত্রী হচ্ছে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্ছেন ধনঞ্জয়, আর মানুষ হচ্ছে অভিজিত।"[৩৬]

অরূপরতন (১৯২৪)

'অরূপরতন' নাটকটি 'রাজা' নাটকের অভিনয়ের জন্য রচিত সংক্ষিপ্ত রূপ। নাটকটি ১৩২৬ সালে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অভিনয় উপলক্ষ্যে ১৩৪২ সালে অরূপরতনের পুনঃপরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই পাঠই বর্তমানে প্রচলিত।

রক্তকরবী (১৯২৬)

‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ ১৯২৪ সালে (আশ্বিন ১৩৩১)। ১৯২৩ সালের বৈশাখ মাসে শিলংয়ের শৈলাবাসে রবীন্দ্রনাথ ‘রক্তকরবী’ রচনা করেন। রচনাকালে ‘যক্ষপুরী’ নামটি তিনি নির্দিষ্ট করেছিলেন; কিন্তু পাণ্ডুলিপি অবস্থায় পরবর্তীকালে নতুন নামকরণ করেন ‘নন্দিনী’। অতঃপর ১৯২৬ সালে প্রবাসী পত্রিকা আশ্বিন সংখ্যায় নাটকটি প্রকাশিত হলে এর নতুন নামকরণ হয় ‘রক্তকরবী’। এর পটভূমিতে রয়েছে সমসাময়িক কালের বস্তুবাদী ধনতন্ত্রবাদ ও ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শৃঙ্খলে আবদ্ধ লুব্ধ ও উৎকট সংগ্রহী সমাজব্যবস্থা। সমকালে পাশ্চাত্যে বাণিজ্য পুঁজি, শিল্প পুঁজির প্রসারে মানুষের ঐশ্বর্যরিপা ও বিত্তশালীদের অর্থলোলুপতা মানবিক জীবনকে কীভাবে পর্যুদস্ত করেছিল তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যক্ষপুরীর স্বর্ণ উত্তোলনের ঘটনায় প্রকাশিত হয়েছে।

তপতী (১৯২৯)

১৩৩৬ বঙ্গাব্দে ভাদ্র মাসে ‘তপতী’ নাটকটি প্রথম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। সোলপুরে অবস্থানকালে রচিত নাটকটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তপতীর ভূমিকায় বলেন :

> “অনেকদিন ধরে রাজা ও রানীর ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে। কিছুদিন পূর্বে শ্রীমান গগেন্দ্রনাথ যখন এই নাটকটি অভিনয়ের উদযোগ করেন তখন এটাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করে একে অভিনয়যোগ্য করবার চেষ্টা করেছিলুম। দেখলুম এমনতরো অসম্পূর্ণ সংস্কার দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তখনই স্থির করেছিলুম এ নাটককে আগাগোড়া নতুন করে না লিখলে এর সদগতি হতে পারে না। লিখে বইটার সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব শোধ করেছি।”[৩৭]

কালের যাত্রা (১৩৩৯/১৯৩২)

দুটি ক্ষুদ্র নাটক ‘রথের রশি’ ও ‘কবির দীক্ষা’ একসাথে করে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র গ্রন্থটির নামকরণ করেছেন ‘কালের যাত্রা’। গ্রন্থটি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৫৭তম জন্মোৎসবে কবির সস্নেহ উপহার।

১৩৩০ সালে ‘প্রবাসী’তে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ‘রথযাত্রা’ নামে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটক প্রকাশিত হয়। ‘রথের রশি’ তারই পরিবর্তিত এবং আগাগোড়া পুনর্লিখিত রূপ। ‘কবির দীক্ষা’, ‘শিবের ভিক্ষা’ নামে ১৩৩৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা মাসিক ‘বসুমতী’তে নাটক দুটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

কালের রথে ইতিহাস বিধাতা মহাকাল বসে আছেন। রথযাত্রার দিনে রথ চলছে না। অমঙ্গলের আশায় রথ চালাতে একে একে এসেছে সৈন্য, ক্ষত্রিয়েরা, এসেছে শেঠের দল, বৈশ্যরা কিন্তু রথ অনড়। শেষে এসেছে অন্ত্যজ শূদ্র দল এবং তাদের টানেই চলেছে রথ। নাটকটির মূল বক্তব্য হচ্ছে, জাতি-শ্রেণি-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের টানেই রথ চলবে। মানুষের পরস্পর-সম্পর্কের সামঞ্জস্যপূর্ণ শক্তিই রথের রশি বা দড়ি। 'কবির দীক্ষা' নাটকটির মূল উপনিষদের 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' শ্লোকটি। প্রাচীন-ভারতের শিক্ষা, সাহিত্য, সাধনা ও সংস্কৃতির মধ্যে কবি এই তত্ত্বের প্রয়োগ দেখিয়েছেন। ভোগের জন্য সঞ্চয় করে পরে ত্যাগের দ্বারা নিঃস্ব হওয়া।

তাসের দেশ (১৯৩৩)

'*গল্পগুচ্ছ*'র অন্তর্গত 'একটি আষাঢ়ে গল্প' (১২৯৯) নামক রূপক গল্পটিকে অবলম্বন করে 'তাসের দেশ' নাটকটি রচিত হয়। এর সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ (বর্তমান সংস্করণ) রবীন্দ্রনাথ নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। নাটকটির উৎসর্গ পত্রে কবি লিখেছেন-

"কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুভাষচন্দ্র,

স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকাটি উৎসর্গ করিলাম।"[৩৮]

গান, সংলাপ ও দৃশ্য-যোজনার মাধ্যমে একে নাটকে রূপায়িত করা হয়েছে। 'শারদোৎসব' থেকে আরম্ভ করে 'রাজা', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী'র মধ্য দিয়ে 'তাসের দেশ' পর্যন্ত এই রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলো আত্মপ্রকাশ করেছে। এই পর্যায়ের রচনায় তিনি ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পারিবারিক মানস-চরিত্রের সংঘাত থেকে বের হয়ে বিশ্বজগতের সাথে চরিত্রগুলোকে বিশ্বজনীন করে তোলেন। বাংলার নাট্যসাহিত্যে এই নাটকগুলো রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান।

চতুর্থ পরিচ্ছদ

সামাজিক নাটক (সামাজিক পরিবেশমূলক)

সামাজিক নাটক বলতে সাধারণত বাস্তব সমাজের পরিবেশে যে-সামাজিক সমস্যামূলক ও অন্তর্দ্বন্দ্বের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের নাটক বোঝায়, রবীন্দ্রনাথের সামাজিক নাটক তা নয়। একটি পরিবারের বা নির্দিষ্ট সমাজের নরনারীর ব্যক্তিগত ঘটনাই সামাজিক নাটকের বিষয়বস্তু।

প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯)

'বউ-ঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩) অবলম্বনে ১৯০৯ সালে রচিত হয় 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক। পরবর্তীকালে নাটকটির পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে 'পরিত্রাণ' (১৯২৯)।

গৃহপ্রবেশ (১৯২৫)

'শেষের রাত্রি' গল্পের (১৩২১) নাট্যরূপ গৃহপ্রবেশ নাটকটি।

শোধবোধ (১৯২৬)

'কর্মফল' নামক গল্প থেকে নাটকাকারে রূপায়িত 'শোধবোধ' নাটকটি লঘুরসের সামাজিক নাটক। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর 'স্টার' থিয়েটারে প্রথম অভিনয় হয় ২৩ জুলাই ১৩২৬ সালে। সাহেবিয়ানার অনুকরণ-প্রিয়, ফ্যাশন-সর্বস্ব, ইংরেজি-শিক্ষিত, ধনশালী এক সংকীর্ণ সমাজে নরনারীর ভাবাদর্শের সাথে মধ্যবিত্ত, দেশীয়-আদর্শনিষ্ঠ নরনারীর ভাবাদর্শের সংঘাত ও তজ্জনিত বিচিত্র পরিস্থিতিই এ নাটকের বিষয়বস্তু।

নটীর পূজা (১৯২৬)

'কথা ও কাহিনী'র (১৯০৮) 'পূজারিণী' কবিতার আখ্যানভাগ অবলম্বনে 'নটীর পূজা' নাটকটি রচিত হয়। ১৩৩৩ সালের ২৫ বৈশাখ সন্ধ্যাবেলা শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নাটকটি প্রথম অভিনিত হয়। প্রথমবার অভিনয়ের সময় উপালী চরিত্রটি ও সূচনা অংশটি ছিল না। দ্বিতীয়বার ১৩৩৩ সালের মাঘ মাসে জোড়াসাঁকোতে অভিনয়কালে সূচনা এবং উপালী চরিত্রটি যোজিত হয়। উপালী চরিত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেন।

পরিত্রাণ (১৯২৯)

'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৬) নাটকটি পরিবর্তিত হয়ে 'পরিত্রাণ' নামে প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে। 'বৌ

ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস থেকে এর বিষয়বস্তু নেয়া হয়েছে।

চন্ডালিকা (১৯৩৩)

১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চন্ডালিকা' নাটকটি রচনা করেন। রচনা করার সময় নাটকটির নাম ছিল 'চন্ডালিনী'। নাটকটির কাহিনিতে রয়েছে বৌদ্ধযুগের চন্ডাল সমাজের দুটি নারী চরিত্রের কথোপকথন।

বাঁশরী (১৯৩৩)

'ললাটের লিখন' গল্প অবলম্বনে **১৯৩৩** সালে 'বাঁশরী' নাটকটি রচিত হয়। এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও ভালোবাসার সামান্য পার্থক্য সৃষ্টি করেছিলেন যেখানে ভালোবাসার নিত্য সম্পর্ক অসম্পূর্ণ থেকে প্রেমের সম্পর্কেরই প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছে। শেষের কবিতা রচনার পাঁচ বছর পরে বাঁশরীতে কবিকে আবার প্রেম-পরিণয় সমস্যার সম্মুখীন হতে দেখা যায়। 'দুই বোন' (১৩৩৯) ও 'মালঞ্চ' (১৩৪০) রচনার সমসাময়িক হলো 'বাঁশরী'। এই দুটি ক্ষুদ্র উপন্যাসের সাথে 'বাঁশরী'র এক যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়।

মুক্তির উপায় (১৯৪৮)

'গল্পগুচ্ছ'র অন্তর্গত 'মুক্তির উপায়' (১৯২৮) নামক গল্প অবলম্বনে **১৯৪৮** সালে 'মুক্তির উপায়' নাটকটি রচিত হয়। এ গল্পে রবীন্দ্রনাথ গানের ব্যবহারে আরও সংযত হয়েছিলেন।

দেখা যাচ্ছে এ নাটকগুলোর অধিকাংশই তাঁর রচিত কোন উপন্যাস, ছোটগল্প বা কবিতার নাট্যরূপ। 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'পরিত্রাণ' নাটকের বিষয়বস্তু 'বৌঠাকুরানীর হাট' থেকে নেয়া। 'শেষের রাত্রি', 'গৃহপ্রবেশ' ও 'কর্মফল'র গল্প 'শোধবোধ' নাটকে রূপায়িত হয়েছে। 'কথা ও কাহিনী'র কবিতা 'পূজারিণী' অবলম্বনে রচিত হয়েছে 'নটীর পূজা'; 'মুক্তির উপায়' একই নামের গল্পের রূপান্তর; রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বৌদ্ধসাহিত্য থেকে নেয়া হয় 'চন্ডালিকা'র কাহিনি। কেবল 'বাঁশরী' কবির মৌলিক রচনা।

পঞ্চম পরিচ্ছদ

প্রহসন ও রঙ্গ নাটক (কৌতুকপ্রধান)

কৌতুকরসের সাধারণত তিনটি ধারা। একটি বিশুদ্ধ হাস্যরস (Humour); আর একটি সংস্কৃতি-মার্জিত তীক্ষ্মবুদ্ধির বাক্চাতুর্য, যাকে বলা হয় wit; অপরটি ব্যঙ্গ বা শ্লেষ, যাকে satire বা irony বলে। এই তিনপ্রকার হাস্যরসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনায় wit-জাতীয় হাস্যরসই প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে কোন কোন নাটকে humour-এর অংশও সামান্য কিছু দেখা যায়। প্রহসন ও রঙ্গনাটকের মধ্যে রয়েছে 'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমার সভা', 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' প্রভৃতি। এই নাটকগুলোতে যেমন হাস্যরস আছে তেমনি রয়েছে তীব্র ব্যঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপহীন, স্বচ্ছ, অনাবিল, হাস্যরস প্রহসনের প্রবর্তক।

গোড়ায় গলদ (১২৯৯/১৮৯২)

এটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রহসন নাটক। প্রধানত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'সংগীত-সমাজ'-এ অভিনয়ের উদ্দেশ্যে এই নাটকটি রচিত হয়। এই প্রহসন জাতীয় নাটকটিকে ভেঙে পরে তিনি 'শেষ রক্ষা' (১৯২৮) নাটকটি রচনা করেন।

বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৬)

১৩০৩ সালে 'সঙ্গীত-সমাজ' এর জন্য 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকটি লেখা হয়। তবে 'খামখেয়ালী'র কোন একটি আসরে এটি পড়া হয়েছিল। এই নাটকটি শেষ হয়েছে মাত্র তিনটি দৃশ্যে। 'গোড়ায় গলদ' নাটকে হাস্যরসের কেন্দ্র ছিল ঘটনার বিপর্যয়; 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় হাস্যরস সৃষ্টি চিত্র নির্মাণে।

চিরকুমার সভা (১৯০৪)

'চিরকুমার সভা' নাটকটি প্রথমে উপন্যাসরূপে প্রকাশিত হয়। ১৩০৭ সালের বৈশাখ থেকে শুরু করে ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত 'ভারতী' পত্রিকায় নিয়মিত ছাপা হতো। সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩১১ সালে 'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী'র অংশরূপে হিতবাদী কার্যালয় থেকে। ১৩১৪ সালের গদ্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয় *'প্রজাপতির নির্বন্ধ'* নামে। ১৩৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর প্রহসন-উপন্যাসটিকে অনেকখানি পরিবর্তন করে, নতুন গান সন্নিবেশন করে নাট্যরূপে রূপায়িত করেন এবং নামকরণ করেন 'চিরকুমার সভা' ।

হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭)

সংলাপময় রঙ্গব্যঙ্গাত্মক এই রচনাগুলি প্রধানত শিশুদের কাছে হাস্যরস পরিবেশনের উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছে তবে কতগুলি ক্ষুদ্র নাটকে সমসাময়িক নব্যহিন্দুধর্ম আন্দোলন সম্বন্ধে কবির মনোভাব ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে আত্মপ্রকাশ করেছে। শিশুদের জন্য রচিত হলেও বড়দের জন্যও হাস্যরসের খোরাক আছে এতে । বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম ব্যঙ্গ কিন্তু বিদ্রুপহীন, স্বচ্ছ, অনাবিল, হাস্যরস প্রহসন নাটকের প্রবর্তক । এই ক্ষুদ্র নাটকগুলি 'বালক' ও 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় । পরে ১৩২৪ সালে 'হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক' নামে গ্রন্থাকারে বের হয় । এর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :

> " এই ক্ষুদ্র কৌতুকনাট্য নাম ধরিয়া 'বালক' ও ভারতী'তে বাহির হইয়াছিল । য়ুরোপে শারাড্ (charade) নামক একপ্রকার নাট্য-খেলা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয় । ইহার মধ্যে হেঁয়ালি রক্ষা করিতে গিয়া লেখা সংকুচিত করিতে হইয়াছিল– আশা করি সেই হেঁয়ালির সন্ধান করিতে বর্তমান পাঠকগণ অনাবশ্যক কষ্ট স্বীকার করিবেন না । এই হেঁয়ালিনাট্যের কয়েকটি বিশেষভাবে বালকদিগকেই আমোদ দিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল ।"[৩৯]

ষষ্ঠ পরিচ্ছদ

ঋতুনাট্য (ঋতুআশ্রয়ী ও গীতপ্রধান)

ঋতুনাট্যগুলোর মূলে রয়েছে গানের সূত্রে ঋতুর অন্তর্নিহিত ভাবকে সাজিয়ে উপস্থাপন করা। এই পর্বের ঋতুসংগীতগুলো রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ঋতুসংগীত বলা হয়ে থাকে। এই ঋতুনাট্যের মধ্যে কবি মনের যে-তত্ত্বানুভূতি রূপায়িত হয়েছে, তা রবীন্দ্রসাহিত্যের সুপরিচিত তত্ত্ব। ঋতুসংগীত রচনার মধ্যে কবির একটি শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য ছিল। যেমন 'শ্রাবণগাথা' ও 'শেষবর্ষণে নটরাজ' এবং 'বসন্ত' নাটকে কবি নাট্যব্যাখ্যা করছেন, সাথে চলছে গান। আবার 'নবীন' নাটকটিতে গদ্য আছে এবং তার উদ্দেশ্যও রসব্যাখ্যা। 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'য় গদ্য নেই, কবিতাই এর পটভূমিকা। 'শারদোৎসব', 'ফাল্গুনী' প্রভৃতি নাটক ও ঋতু সম্বন্ধে বহু সংগীত তিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও শিক্ষকদের অভিনয় ও গানের জন্যই প্রথমে রচনা করেন। প্রকৃতি-চর্চা ছিল শান্তিনিকেতনের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে কবির উক্তি সাক্ষ্য বহন করে–

> "একদিন শান্তিনিকেতনে আমি যে শিক্ষাদানের ব্রত নিয়েছিলুম, তার সৃষ্টিক্ষেত্র ছিল বিধাতার কার্যক্ষেত্র– আহ্বান করেছিলুম এখানকার জল-স্থল-আকাশের সহযোগিতা। জ্ঞানসাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলুম আনন্দের বেদীতে। ঋতুদের আগমনী গানে ছাত্রদের মনকে বিশ্বপ্রকৃতির উৎস-প্রাঙ্গণে উদ্বোধিত করেছিলুম। এখানে ছেলেরা জীবনের আরম্ভকালকে বিচিত্র রসে পূর্ণ করে নেবে, এই আমার অভিপ্রায়... প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযোগে গানে অভিনয়ে ছবিতে আনন্দরস আস্বাদনে নিত্যচর্চায় শিশুদের মগ্ন চৈতন্য আনন্দের স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে উঠবে, এটাকেই লক্ষ্য করে কাজ আরম্ভ করা গেল। আমি যখন এই শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এখানে ছেলেদের আনলুম...আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার প্রভাতের আলো, শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের অন্তর স্পর্শ করতে পারে। কারণ প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তে আনন্দ সঞ্চারের দরকার আছে; বিশ্বের চারিদিককার রসাস্বাদ করা ও সকালের আলো সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করার মধ্য দিয়ে শিশুদের জীবনের উন্মেষ আপনার থেকেই হতে থাকে।...এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ আলোর অঙ্কশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম।"[৪০]

শান্তিদেব ঘোষ এই ঋতুনাট্যগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা শান্তিনিকেতনের পূর্বের, শান্তিনিকেতনের আরম্ভের ও পরের দিকের গান। তাঁর মতে, এই তিনটি ধারার মধ্যে যথেষ্ট

পার্থক্য আছে। প্রথম দিকের গানের মধ্যে প্রকৃতি বিশেষ জায়গা পায়নি, মধ্যকালে প্রকৃতি কিঞ্চিৎস্থান লাভ করেছে মাত্র, আর শেষদিকেন গানগুলি শুনে মনে হয় বিশ্বপ্রকৃতি যেন নিজেই কথা বলছে। শান্তিদেব ঘোষ মনে করেন, "তৃতীয় যুগের ঋতুসংগীতগুলিই হল তাঁর শ্রেষ্ঠ ঋতুসংগীত। লিরিককাব্যরূপে সুরের কল্পনায় এই সময়কার গানগুলি প্রকৃত পূর্ণতা পেয়েছে।"[৪১] 'শেষবর্ষণ', 'বসন্ত', 'নবীন', 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা', 'শ্রাবণ গাঁথা' প্রভৃতি এই শ্রেণির নাটক। এই নাটকগুলোতে রাজসভার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে রাজা , সভাকবি , পারিষদগণ , নাট্যাচার্য কিংবা নটরাজ আছেন, এর সাথে কোথাও কোথাও আভাসে সামজিক শ্রোতাগণও আছেন। আরেক দিকে আছে ঋতু, প্রকৃতি, নদী। নাটকগুলোর গদ্যাংশ ঘটনার সাথে পরবর্তী ঘটনার এবং গানের সাথে গানকে জোড়া দেবার ভূমিকা পালন করেছে। নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালায় কবিতার অংশ পটভূমিকা এবং অভিনয়কালে রবীন্দ্রনাথ নিজে এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করতেন।

বসন্ত (১৯২৩)

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গিত রবীন্দ্র নাটক 'বসন্ত' প্রকাশিত হয় **১৩২৯** সালের বসন্তকালে। এটি ঋতু উৎসবের তত্ত্বনাটক। রাজসভা থেকে পালিয়ে বাঁচা রাজার কাছে সভাকবি তাঁর পালা উপস্থাপিত করেছেন। বসন্ত সুরে ভরা পালা, নাটকটিতে সভাকবি নিজেই বলেছে, 'এতে মূলেই অর্থ নেই, বোঝা না বোঝার কোনো বালাই নেই, কেবল এতে সুর আছে।'

শেষ বর্ষণ (১৯২৫)

'শেষ বর্ষণ' নাটকটির রচনাকাল **১৯৩২** সাল।। ভাদ্র মাসে নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়া উপলক্ষ্যে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সংলাপহীন এই পুস্তিকায় শুধুই গান ছিল। পরে ঋতু-উৎসব (১৯২৬) গ্রন্থে সংলাপের সাথে গানসহ সম্পূর্ণ নাট্যরূপটি প্রকাশিত হয়। এটিকে ঠিক নাটক বলা যায় না, কারণ রাজা নিজে একে বলেছেন পালাগান। প্রথম গানটি বর্ষার আহ্বান। নটরাজ ধারাভাষ্য রচনা করেন এবং তারই পর্যায়ে পর্যায়ে গাওয়া হয় গান। এই পালায় শুধু বর্ষা আবাহনই নয়, এর বিদায় ও শরতের শেফালি শুভ্র লাবণ্যের বন্দনাও স্থান পেয়েছে। প্রমনাথ বিশী বলেন, "এখানে যে কেবল বর্ষার বিদায় ও শরতের আগমনে তাহা নহে, পালা সমাপ্তির মুখে দেখা গেল, বাদললক্ষ্মীই মেঘের অবগুণ্ঠন ঘুচাইয়া শরৎশ্রীরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িলেন; বাদললক্ষ্মীই অবস্থাভেদে শরৎশ্রী, ইহাই এই পালার মর্মকথা।"[৪২]

সুন্দর (১৯২৫/১৯২৯)

১৯২৫ সালে 'সুন্দর' নৃত্যগীতিটি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পুজোর দালানে পরিবেশিত হয়। আবার এই একই নামে অর্থাৎ 'সুন্দর' নামে আরেকটি ভিন্ন নৃত্যালেখ্য ১৯২৯ সালে রচিত হয়, যেটি পরিবেশিত হয় শান্তিনিকেতনে।

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা (১৯২৬)

১৯২৬ সালের বসন্তে 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' রচিত হয়। ১৩৩৪ এর আষাঢ়ে 'বিচিত্রা'য় নাটকটি প্রকাশিত হয় 'নটরাজ' নামে এবং অগ্রহায়ণে এটি কলকাতায় অভিনীত হয় 'ঋতুরঙ্গ' নামে।

নবীন (১৯৩১)

'নবীন' নাটকটিতে রয়েছে বসন্তোৎসবের পালাগান। নাটকটি ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে রচিত। সেই বছরই কলকাতায় নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে এটি মঞ্চস্থ হয়। সে উপলক্ষ্যে কথাবস্তু সম্বলিত নাটকটি একটি বই আকারে মুদ্রিত হয়। পরে আশ্বিন ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে *বনবাণী* গ্রন্থে পরবর্তীত আকারে 'নবীন' নাটকটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। এই মুদ্রণটিতে প্রথম পাঠের সাথে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

শ্রাবণগাথা (১৯৩৪)

'শ্রাবণগাথা' নাটকটি বর্ষার পালা। এখানে রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট বর্ষা সংগীতের সমাবেশ হয়েছে। নাটকটি ১৩৪১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়।

সপ্তম পরিচ্ছদ

নৃত্যনাট্য (নৃত্যপ্রধান)

ঋতুনাট্যের মতো নৃত্যনাট্যও বাংলা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের এক নতুন সৃষ্টি। ঋতুনাট্যে প্রথমে ছিল গানের প্রাধান্য; পরবর্তীকালে শেষে নাচের প্রবর্তন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্যগুলো রচনা করেছেন শেষ বয়সে। এখানে তিনি সংগীতের সঙ্গে নৃত্যকে অবলম্বন করেছেন। সুরের সঙ্গে নৃত্যের সম্মেলনে অতি সূক্ষ্মভাবকে অভিনব রূপে ও রসে প্রকাশ করেন। নৃত্যের মধ্য দিয়ে নাটকের সূক্ষ্মভাবানুভূতিকে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচিত নৃত্যনাট্যের মধ্যে রয়েছে 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', 'চন্ডালিকা' ইত্যাদি। তিনি বলেন,

"এদেশে উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ।...এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক-একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলাদেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তন গানে সে আপন আবেগ সঞ্চারের পথ পেয়েছে। এখনও সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায় তখন সে নাচিয়ে তোলে। মেয়ে নাচে পুরুষ নাচে। এখানকার যাত্রাভিনয় দেখেছি, তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলায়-ফেরায়, যুদ্ধে-বিগ্রহে, ভালোবাসার প্রকাশে এমনকি ভাঁড়ামিতে সবটাই নাচ।...সেদিন এখানকার এক রাজবাড়িতে নাচ দেখেছিলুম।...এই নাচ অভিনয়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে শাল্ব-সত্যবতীর আখ্যান। এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা-বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে তোলে...আমাদের দেশে একদিন নাট্য-অভিনয়ের সর্বপ্রধান অঙ্গই ছিল নাচ। নাটক দেখতে যারা আসে, পশ্চিম মহাদেশ তাদের বলে অডিয়েনস্। অর্থাৎ শ্রোতা। কিন্তু ভারতবর্ষে নাটককে বলেছে দৃশ্যকাব্য; অর্থাৎ তাতে কাব্যকে আশ্রয় করে চোখে দেখার রস দেবার জন্যই অভিনয়।"[৪৩]

নটীর পূজা (১৯২৬)

'কথা ও কাহিনী'র (১৯০৮) 'পূজারিণী' কবিতার আখ্যানভাগ অবলম্বনে 'নটীর পূজা' নাটকখানি রচিত হয়। পূজারিণী কবিতার সংক্ষিপ্ত কাহিনি এখানে বিস্তৃত হয়েছে এবং গীত ও নৃত্যের মাত্রা যোজিত হয়ে তা এক গীতনৃত্য নাট্যরূপ ধারণ করেছে।

শাপমোচন (১৯৩১)

‘পুনশ্চ’ গ্রন্থের একটি সুদীর্ঘ গদ্য কবিতা থেকে ‘শাপমোচন’ নাটকটির আখ্যানভাগ নেয়া হয়েছে। ‘রাজা’ ও ‘অরূপরতন’ নাটকের বিষয়বস্তুও এক। প্রকৃতপক্ষে ‘শাপমোচন’, ‘নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা’, নৃত্যনাট্য ‘চন্ডালিকা’ ও ‘শ্যামা’ যথার্থ অর্থে নৃত্যনাট্য। নটীর পূজা নৃত্যনাট্য পর্যায়ের নয় তবে এই নাটক দিয়েই নৃত্যনাট্যের সূচনা।

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬)

কাব্যনাট্যের চিত্রাঙ্গদা ও নৃত্যনাট্যের চিত্রাঙ্গদা মূলভাব মূলত একই। ভাব ও তত্ত্বের দিক দিয়ে কোন অমিল নেই, শুধু কাব্যকে সংগীতের রূপে নৃত্যের ছাঁচে ঢেলে নতুনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সংগীতের উপরই নৃত্যনাট্যটি প্রতিষ্ঠিত।

নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা (১৯৩৬)

নাটক ‘চন্ডালিকা’রই নৃত্যনাট্যরূপ হচ্ছে নৃত্যনাট্য ‘চন্ডালিকা’। কাহিনির দিক থেকে গদ্যনাটক ও নৃত্যনাট্যের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। চন্ডালিকার যে রূপান্তর, তা হলো রূপগত পরিবর্তন ও সংগীত প্রয়োগের মৌলিকতা। এছাড়া রয়েছে ফুলওয়ালী, দইওয়ালা, চুড়িবিক্রেতা প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্রের নতুন সংযোজনা। অস্পৃশ্য চন্ডালীকন্যার বুদ্ধবাণীতে অনুপ্রাণিত হবার কাহিনি এই নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর কাহিনি বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে নেয়া হয়েছে। নৃত্যভঙ্গীর সঙ্গে সংগীতের পরিপূর্ণ সমন্বয় ঘটেছে এই নাটকে।

পরিশোধ (১৯৩৬)

নৃত্যনাট্য ‘চিত্রাঙ্গদা’র সাফল্যের পর ১৯৩৬ সালের আগস্টে ‘কথা ও কাহিনী’র (১৩০৬) ‘পরিশোধ’ কবিতাটিকে নিয়ে প্রতিমা দেবী আরো একটি অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে পরিকল্পনা পৌঁছাবার পর তিনি এরও একটি নৃত্যনাট্যরূপ দেবার আয়োজন করেন। সম্পূর্ণ রচনাটি ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে ‘প্রবাসী পত্রিকা’য় ছাপানো হয়। এ নাটকটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, “পরিশোধকে প্রধানত অভিনয়মূলক নাটক বলে ব্যবহার করা যায় কেননা সমস্ত আখ্যানটি নাট্যপ্রধান। পরিশোধেই আমাদের নাচের সঙ্গে নাট্যের যথার্থ মিলন হয়েছিল। এজন্যে দক্ষিণী নাচিয়ে অনেক সাহায্য করেছে।”[৪৪]

নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা (১৯৩৮)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৭ বছর বয়সে গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা' রচনা করেন এবং ১৯৩৮ সালে ৭৮ বছর বয়সে তিনি এই গীতিনাট্যটি নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেন।

নৃত্যনাট্য শ্যামা (১৯৩৯)

'কথা ও কাহিনী' (১৯০৮) গ্রন্থের 'পরিশোধ' নামক কবিতার আখ্যানবস্তু অবলম্বনে শ্যামা নৃত্যনাট্যটি রচিত। এটি স্বরলিপিসহ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ সালের ভাদ্র মাসে। এর স্বরলিপিকার ছিলেন সুশীলকুমার ভঞ্জ চৌধুরী। বুদ্ধির সাথে হৃদয়ের, বিবেকের সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্বই বজ্রসেন-শ্যামা-আখ্যায়িকার মূলবস্তু। এই নাটকেই শান্তিনিকেতনের নৃত্য ইতিহাসে ভারতীয় প্রধান প্রধান নৃত্যধারাগুলোর অপূর্ব সম্মিলন হয়েছে। বজ্রসেনের চরিত্রের অভিনয় ভারতনাট্যম্‌ ও কথাকলি পদ্ধতিতে, উত্তীয়র নিখুঁত কথকের আদর্শে, শ্যামার অভিনয় শান্তিনিকেতনে প্রচলিত মণিপুরি ভঙ্গীতে আর প্রহরীর নাচ খাঁটি কথাকলির আঙ্গিকে।

শ্যামা এবং পরিশোধের আখ্যান-অংশ কিছুটা পরিবর্তন করে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* (published by the Asiatic Society of Bengal, 57 Part Street, 1882) গ্রন্থের মহাবস্তুদান অংশে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে গৃহীত। গদ্যাংশটি নিম্নরূপ :

> "Story of Syama and Vajrasen- The reason why Buddha abandoned his faithful wife Jasadhara is given in the following story.
>
> There was in times of yore a horse-dealer at Takshasila named Vajrasena; on his way to the fair at Varanasi, his horses were stolen, and he was severely wounded. As he slept in a deserted house in the suburbs of Varanasi, he was caught by policemen as a theif. He was ordered to the place of execution. But his manly beauty attracted the attention of Syama, the first public woman in Varanasi. She grew enamoured of the man and requested one of her handmaids to rescue the criminal at any hazard. By offering largr sums of money, she succeeded in inducing the executioners to set Vajrasena free, and execute the orders of the king on another, a banker's son, who was

an admirer of Syama. The latter not knowing his fate, approached the place of execution with victuals for the criminal, and was severed in two by the executioners.

The woman was devotedly attached to Vijrasena. But her inhuman conduct to the banker's son made a deep impression on his mind. He could not reconcile himself to the idea of being in love with the perpetrator of such a crime. On an occasion when they both set on a pluvial excursion, Vajrasena plied her with wine, and, when, she was almost senseless, smothered and drowned her. When he thought she was quite dead, he dragged her to the steps of the ghat and fled, leaving her in that helpless condition. Her mother, who was at hand came to her rescue, and by great assiduity resuscitated her. Syama first measure, after recovery, was to find out a Bhikshuni of Takshsila, and to send through her a message to Vajrasena, inviting him to her loving embrace. Buddha was that Vajrasena and Syama, Yasodhara."[৪৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সৃষ্টি নিজ হাতে গড়েছেন ভেঙেছেন এবং একটা বিশেষ সময়ে সেই ধারার অনেকগুলো নাটক পর পর রচনা করেছেন। যেমন হাস্যরসাত্মক নাটকগুলো তাঁর একটি নির্দিষ্ট সময়ের রচনা। কিছু কাহিনির প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল আর তাই তাদের বারবার ভেঙেছেন আবার গড়েছেন। যেমন 'ভগ্নহৃদয়' তাঁর প্রথম অপরিণত বয়সের রচনা, কিন্তু এই নাটকের মূলভাব নিয়ে তিনি 'নলিনী', 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য এবং শেষ বয়সে 'মায়ার খেলা' নৃত্যনাট্যও রচনা করেছেন। আবার তেমনি তাঁর 'রাজা' নাটকের ক্ষুদ্রতর রূপ হচ্ছে 'অরূপরতন', তেমনি শাপমোচন নৃত্যনাট্যেও 'রাজা' নাটকের কাহিনির প্রভাব আছে। 'অচলায়তন'র পরবর্তী নাট্যরূপ হলো 'গুরু'। 'মুক্তধারা' নাটকটিতে প্রায়শ্চিত্ত নাটকের প্রভাব আছে, আবার 'পরিত্রাণ' নাটকটিতেও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের প্রভাব দেখা যায়। 'গোড়ায় গলদ' নাটকের রূপান্তর হলো 'শেষ রক্ষা'। এভাবেই গদ্যনাটকগুলোকে তিনি নৃত্যনাট্যে পরিণত করেছেন।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ৪৫১

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ৪১৩

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৩

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঙ্গীতচিন্তা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৩, পৃ. ৭৫-৭৬

৫. নীহাররঞ্জন রায়, *রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা*, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ২৮৩

৬. অরুণকুমার বসু, *বাঙলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্র সংগীত*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৪৪১-৪২

৭. আলো সরকার, *রবীন্দ্রনাট্যপ্রসঙ্গ : সাংগীতিক প্রয়োগ*, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ২৭

৮. শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, *রবীন্দ্রনাথের নাট্য প্রতিভা*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৩৯১, পৃ. ১

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, ১৩৭৩, পৃ. ১৯৬

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১

১১. আলো সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

১২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ২৭-২৮

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ৯৫২

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫১

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫৩

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, ১৩৭৩, পৃ. ২২১

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্দশ খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ৫১২

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৯. তরুণ মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-নাট্যকলাপ*, প্যাপিরাস, কলিকাতা, ১৪১৩, পৃ. ১২

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০২

২১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*, রূপা এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৬

২২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বিতীয় খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৩

২৪. শ্রী প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ*, প্রথম খন্ড, ওরিয়েন্টবুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৩৫৫, পৃ. ১৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৫. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯ - ১৬০

২৬. শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, *রবীন্দ্রনাথের নাট্য প্রতিভা*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৩৯১, পৃ. ৩৭

২৭. নিতাই বসু, *রবীন্দ্রসংগীতের উৎস সন্ধানে*, সাহিত্যায়ন, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১১৪

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ৯৬-৯৭

৩০. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, ষষ্ঠ খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা : ১৯৮২, পৃ. ২৪

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০১

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, পঞ্চম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ৪১৫

৩৩. প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬

৩৫. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, তৃতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৪০, পৃ. ১২০

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪৩

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩২-৬৩৩

৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ২৩১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র* রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ১৫৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৪০. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৩-৪০৪

৪১. শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্রসংগীত*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৪৯, পৃ. ১৫০ - ৫১

৪২. শ্রী প্রমথনাথ বিশী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

সপ্তম পরিচ্ছেদ

৪৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৫২৫

৪৪. দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার, *রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৩৯-৪০

৪৫. প্রবীরগুহ ঠাকুরতা, *রবীন্দ্রসংগীত মহাকোষ ১*, দে’জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ২০০৮, পৃ. ৫১৮

তৃতীয় অধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের নাটক ও গানের পর্যালোচনা

> "কথা জিনিসটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। সেইজন্য কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এইজন্যে কথার সঙ্গে মানুষ যখন সুরকে জুড়ে দেয় তখন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়– সেই সুরে মানুষের সমস্তকে আকাশের জিনিস করে তোলে, তার বেদনা প্রভাতসন্ধ্যার দিগন্তে আপনার রঙ মিলিয়ে দেয়, জগতের বিরাট অব্যক্তর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বৃহৎ অপরূপতা লাভ করে, মানুষের সংসারের প্রাত্যহিক সুপরিচিত সংকীর্ণতার সঙ্গে তার ঐকান্তিক ঐক্য আর থাকে না।"[১]

সংগীতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব ও গীতপ্রাণতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে। তাঁর নাট্যসম্ভারের আয়তন বিপুল, বিষয়ের দিক থেকেও সমসাময়িক নাট্যকারদের থেকে ভিন্ন। তিনি একই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রচিত নাটকগুলো বারবার রূপান্তর ও নামান্তর করেছেন। এমনকি যে কোন নাটকের অভিনয়কালেও কখনো এক জায়গায় থেমে থাকতেন না। নাটক রচনার পর থেকে মহড়া চলাকালীন সময়ে, অভিনয়ের আগের দিন, একরাত্রি অভিনয়ের পর, কখনো কখনো নাটকটি মঞ্চে তিনি পরিবেশিত হবার আগে বা মঞ্চে কথা বা গানের পরিবর্তন করতেন। একই নাটক আবার কয়েক মাস বা কয়েকবছর পর যখন অভিনীত হতো তখনও পারিপার্শ্বিক চাহিদার কারণে বা প্রয়োজনে তিনি নাটকের সংলাপ, চরিত্র বা গানের পরিবর্তন করতেন। গান সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধে বলেন, "গান নিজের সৌন্দর্য্যেই বড়ো– বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে।"[২]

আর একারণেই তাঁর নাটকে গানের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সব সময়ই দুর্বল ছিলেন। এই দুর্বলতার বিষয়ে তাঁর নিজের অভিব্যক্তি :

> "কখনো কখনো যখন আপন মনে গান গেয়েছি,...জিজ্ঞাসা করেছি– একি একটা মায়ামাত্র, না এর কোন অর্থ আছে? গানের সুরে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেম, আর সব জিনিসের মূল্য যেন এক মুহূর্তে বদলে গেল। যা অকিঞ্চিৎকর ছিল তাও অপরূপ হয়ে উঠল। কেন? কেননা, গানের

সুরের আলোয় এতক্ষণে সত্যকে দেখলুম। অন্তরে সর্বদা এই গানের দৃষ্টি থাকে না বলেই তুচ্ছ হয়ে সরে যায়। সত্যের ছোটো বড়ো সকল রূপই যে অনির্বচনীয় তা আমরা অনুভব করতে পারিনে। নিত্য আভাসের স্থূল পর্দায় তার দীপ্তিকে আবৃত করে দেয়। সুরের বাহন সেই পর্দার আড়ালে সত্যলোকে আমাদের নিয়ে যায়, - সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না, সেখানে যাবার পথ কেউ চোখে দেখেনি।"৩

রবীন্দ্রনাথ নাট্যরচনা শুরু করেন ভগ্নহৃদয় নাটকটি দিয়ে। এরপর বিলেত থেকে ফিরে তিনি রচনা করেন 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'নলিনী', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও 'মায়ার খেলা'। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' নাটকগুলোর গানের বৈশিষ্ট্য মূলত বিভিন্ন ধরনের সংগীত পদ্ধতির অনুকরণে। যেমন : পাশ্চ্যাত্য সংগীত, হিন্দুস্থানী সংগীত প্রভৃতি। এটি শিক্ষানবিশীর যুগ তাই হিন্দুস্থানী সংগীতের রাগরূপের নিয়ম মেনেই তিনি নাটকে গানগুলো ব্যবহার করেন। সাথে ছিল দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে শেখা পাশ্চাত্য সংগীতের ভাবধারা। দেশি ও বিলেতি চর্চার মধ্যে এ নাটকগুলোর জন্ম। নলীনি, প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকে বেশির ভাগই পূর্বে রচিত কোন না কোন নাটকের গান (যেমন 'বিবাহ উৎসব, ভগ্নহৃদয়) ব্যবহৃত হয়েছে। বেশকিছু গান পদাবলীর অনুকরণেও রচিত। এরপর রচনা করলেন 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য, এই নাটকটির গান রচনায় রবীন্দ্রনাথ অন্য সংগীতকলার প্রভাবমুক্ত হয়ে নিজস্ব ধারায় সংগীত রচনা শুরু করলেন। এরপর তিনি আর গীতিনাট্য লেখেননি কিন্তু নাটকের সর্বাঙ্গ ভরে দিয়েছিলেন গানে। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা' লেখেন। এসময় তিনি বেশকিছু প্রহসন রচনা করেন। 'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমার সভা' বা 'প্রজাপতির নির্বন্ধ', 'হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক'– এগুলো থিয়েটারের আদলে রচিত। গান থাকলেও তার ব্যবহার গৌণ।

এরপর তিনি রচনা করেন 'শারদোৎসব' নাটকটি। তিনি তাঁর সংগীত রচনার সর্বোত্তম ব্যবহার করেন এই সময়কার রচনাগুলোর মধ্যে। তাঁর তত্ত্ব নাটক যেমন : 'রাজা', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন', 'ফাল্গুনী', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি এই সময়কার রচনা। এ পর্যায়ের নাটকগুলোতে স্বাতন্ত্র্যতা দেখা যায়। এই নাটকগুলো রচনা এবং গানের ব্যবহারে ক্ষেত্রে তিনি তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণা ও সৌন্দর্য-চেতনার পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এ সময় তিনি জমিদারি কাজে শিলাইদহ থাকাতে প্রকৃতির খুব কাছাকাছি ছিলেন বলে এই নাটকগুলোতে প্রকৃতির কথা বারবার এসেছে। শরৎ ও বসন্ত ঋতু নাটকের পরিবেশ রচনায় প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এতে প্রকৃতির সুন্দর ও রুক্ষ দুই রূপেরই প্রকাশ দেখা যায়। 'অচলায়তনে' গ্রীষ্মের দাবদাহের পর বর্ষার আগমন, শরতের নির্মল সৌন্দর্যে প্রকাশিত 'শারদোৎসব', শরতের করুণ রসে 'ডাকঘর', শীতের রিক্ততায় 'রক্তকরবী', বসন্তের বাহারের সমারহে 'রাজা' ও

‘ফাল্গুনী’ রচিত। একমাত্র ‘ডাকঘর’ নাটক রচনার সময় তিনি কোন গানের ব্যবহার না করলেও পরে নাটকটি অভিনয়কালে ৭টি গান যুক্ত করেছিলেন।

‘মুক্তধারা’ ও ‘রক্তকরবী’তে এসে রবীন্দ্রনাথ গানের ব্যবহারে সংযমতা অবলম্বন করেন। তবে এই নাটকগুলো রচনার পর তিনি নতুন ধারায় একধরনের নাটক রচনা করেন যাকে ‘ঋতুনাট্য’ বলা হয়। এগুলো মূলত গীতিকাব্য। এতে তিনি গানের মাঝে মাঝে বাণীর ব্যবহার করেছেন একটি অখন্ড ভাবসূত্রে গানগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য। এ পর্যায়ের নাটকগুলো হচ্ছে ‘বসন্ত’, ‘সুন্দর’, ‘শেষবর্ষণ’, ‘নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা’, ‘নবীন’, ‘শ্রাবণগাথা’। এর মাঝে তিনি রচনা করেন ‘বাঁশরী’ নাটকটি। এটি একটি সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত নাটক। সংগীতের প্রয়োগকৌশলের আরেকটি নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি করলেন তিনি গানে-নাচে-কথায় ‘নটীর পূজা’ নৃত্যনাট্য ধারা প্রবর্তনের মাধ্যমে। এটি নৃত্যনাট্য না হলেও সংগীতের সাথে নৃত্যের ব্যবহারের প্রথম প্রয়াস। এরপর তিনি রচনা করেন নৃত্যনাট্য ‘চিত্রাঙ্গদা’, ‘চন্ডালিকা’, ‘শ্যামা’। গীতিনাট্যগুলোকেও তিনি শেষের দিকে নৃত্যনাট্যে রূপ দেবার চেষ্টা করেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু চিন্তাকে বাস্তবকর্মের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন। কাব্যের ভাবকে রূপ দেবার জন্য তিনি রচনা করেন নাটক ও সৃষ্টি করেন নানা চরিত্রের। তাই তাঁর কাব্য এবং নাটকের সম্পর্ক অনেকটা অবিচ্ছেদ্য। কাব্যের ভাব দিয়েই তিনি নাটককে সৃষ্টি করেছেন। দুই একটি নাটক হয়তো বিচ্ছিন্ন, কিন্তু বেশিরভাগ নাটকেই সমসাময়িক কাব্য ভাবনার প্রতিফলন। ড. প্রণয়কুমার কুন্ড ‘মায়ার খেলা’র পর থেকে প্রাক্-শিশুতীর্থ পর্যন্ত পর্বটিকে (আনুপূর্বিক ১৮৯০ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ) গীতিনাট্য থেকে নৃত্যনাট্যে উত্তরণের মধ্যবর্তী আয়োজন পর্ব বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন গৌণভাবে নাটক ও গান, মূলত কাব্য পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করেছে এই পর্বে। গীতিনাট্যের যুগে রবীন্দ্রকাব্য সবেমাত্র প্রবেশিকা শ্রেণি অতিক্রম করলেও এইসময়ে কাব্যকেই কবিমনের প্রধান বাহনরূপে দেখা যায়। এইপর্বেই রবীন্দ্রনাথ সাংকেতিক বা ঋতুনাট্যও রচনা করেছেন। *মানসী* রচনার কালে বা প্রাক-গীতাঞ্জলি যুগে রবীন্দ্রনাথের মন ছিল রোমান্টিক চেতনার ভারে ভারাক্রান্ত; দ্বন্দ্ব ও অকারণ বিশ্ববোধের ব্যাকুলতায় কবিমন ছিল দ্বিধা-বিভক্ত। *‘কড়ি ও কোমলে’* তাঁর রচনার আঙ্গিকের দুর্বলতা, ভাবগত শৈথিল্য ও ছন্দের অপরিণত ভাব কেটে যায়। ‘সোনার তরী’, ‘যেতে নাহি দেব’, ‘বসুন্ধরা’ এবং ‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’ প্রভৃতি কবিতাগুলোর মধ্যে কবির যাত্রাপিপাসু মনের দ্যোতকচিত্র কল্পিত হয়েছে। চিত্রাতে জীবনদেবতার উপস্থিতি দেখা যায়, এই যাত্রার কথাই গতিশীল ব্যক্তি-স্বরূপের কল্পনার মধ্যে। ‘চৈতালি’ কাব্যের অন্যতম দিক প্রকৃতিপ্রীতি। ‘নৈবদ্য’ ও ‘খেয়া’তেও কবি সুদূরের পিয়াসী। ‘গীতাঞ্জলী’তে অরূপানুভূতি তীব্র হয়ে চরম বিকাশ লাভ করে। ‘বলাকা’য় পাওয়া যায় গতিশীল

জীবনবোধ। শেষ পর্যায়ের কাব্য ‘পরিশেষ’ থেকে ‘শেষ লেখা’তে তিনি বহির্জীবন সম্পর্কে সমস্ত সংশয়, সন্দেহ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ক্ষোভ, অবিশ্বাস ত্যাগ করে কবিহৃদয়ের অনুরাগ কিন্তু কবিমানসের নির্লিপ্ত মন দিয়ে বিশ্ব ও বিশ্বমানবকে দেখেছেন। কাব্যক্ষেত্রের এই মানসিকতার বিবর্তন তাঁর নাট্য রচনার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

প্রথম পরিচ্ছদ

১৮৮১–১৮৯০ সাল পর্যন্ত রচিত নাটক

এসময়কার রচনা 'ভগ্নহৃদয়', 'নলিনী', 'মায়ার খেলা' নাটকগুলোর কাহিনির দিক থেকে মিল রয়েছে। পূর্বে রচিত 'কবি কাহিনী'তেও নায়িকা ছিল 'নলিনী'। নাটকগুলোর কাহিনির সারাংশ মূলত এক। 'নলিনী' নাটকের কাহিনি নিয়েই গীতিনাট্যের আকারে 'মায়ার খেলা' রচিত হয়। 'ভগ্নহৃদয়' ও 'নলিনী' নাটকের নলিনী চরিত্রটিকে পাওয়া যায় 'মায়ার খেলা' নাটকে শান্তা চরিত্রে। 'প্রভাত সংগীত' থেকে 'কড়ি ও কোমল' রচনাকালে কবির মনে যে রোমান্টিকতার আনাগোনা চলে, তারই পটভূমিতে ওই নাটকগুলো রচিত। গান নিয়ে কবির এইসময়কার মনোভাব সম্পর্কে ড. অরুণকুমার বসু বলেছেন, "সন্ধ্যাসংগীতে ৫৮ বার এবং প্রভাতসংগীতে ৫৪ বার গান শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' কবি বলেছেন, 'এত কথা আছে এত গান আছে এত প্রাণ আছে মোর'। এই জাতীয় চরণে 'গান' 'কথা' 'প্রাণ' একই উচ্ছ্বাসের বৃন্তে প্রকাশের বেদনা পল্লব। কবিতা, গান, সুর রবীন্দ্রনাথের প্রায় সারাজীবনের রচনাতেই সমার্থক হয়ে ওঠে, একই দ্যোতনা বহন করে।"[৪]

'সন্ধ্যা-সংগীতের' মধ্যে যে বেদনার সুর ধ্বনিত হয়েছে তাঁর রচিত গীতিনাট্যগুলোতে সেই সুর পাওয়া যায়। বিলেত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং হার্বার্ট স্পেনসরের মতবাদে প্রভাবিত হয়ে তিনি গীতিনাট্য 'বাল্মীকিপ্রতিভা' এবং 'কালমৃগয়া' রচনা করেন। তবুও প্রত্যেকটি কাহিনিতে রয়েছে অবরুদ্ধ অবস্থার বেদনা, সকরুণ পরিণতি। '*মানসী*'র পটভূমির শুরুর সময় 'রাজা ও রানী' এবং শেষের দিকে 'বিসর্জন' রচিত। এসময়কার অনেকগুলো কবিতা তিনি পরবর্তীকালে সুরারোপ করেন। '*কড়ি ও কোমল*' কাব্যগ্রন্থ রচনার সময় কবি মনে যে রোমান্টিক ভাবের উদ্ভব ঘটে তারই সৌন্দর্য চেতনার বিকাশরূপ 'মানসী' কাব্য। '*ছবি ও গান*' এ সময় লিখেন। প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত একটি পত্রে (১৮৯০) রবীন্দ্রনাথ 'ছবি ও গান' সম্পর্কে বলেন,

> "আমার ছবি ও গান আমি যে কী মাতাল হয়ে লিখেছিলুম...আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম। আমার সমস্ত বাহ্যলক্ষণে এমন-সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে, তখন যদি তোমরা আমাকে প্রথম দেখতে তো মনে করতে এ ব্যক্তি কবিত্বের খেপামি দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মতো এসে পড়েছিল।...সত্যি বলতে

কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। ছবি ও গান পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, এমন আমার কোনো পুরোনো লেখায় হয় না।"[৫]

নাটকের সাথে কাব্য এবং কাব্যের সাথে নাটকের মিশ্রণরীতিতে রচিত হয়েছে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'রাজা ও রানী' ও 'বিসর্জন' প্রভৃতি নাটক। এ পর্যায়ের নাটকগুলোতে গীতকবিতা, নাট্যগীতি এবং গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য পর্যায়ের গানের প্রধান্য বেশি। আর রয়েছে প্রেম পর্যায়ের গান।

১. ভগ্নহৃদয় (১৮৮১)

ভগ্নহৃদয় কবির কৈশোর পার হওয়া অপরিণত প্রতিভার প্রথম হৃদয়াবেগের গাথাঁকাব্য, নাটকীয়তা এবং গীতিধর্মিতার সাথে রচিত। কবির প্রথম জীবনে রচিত গানগুলোর বৈশিষ্ট্য এই গানগুলোতে রয়েছে। তবে ভগ্নহৃদয়ের গানে পাশ্চাত্য সংগীতের কোন প্রভাব পড়েনি যেমনটা পড়েছিল 'বাল্মীকিপ্রতিভায়'। ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রসদনে ভগ্নহৃদয়ের যে পাণ্ডুলিপি দান করেন, তার পাঠ ও মুদ্রিত ভগ্নহৃদয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। গীতবিতানে মুদ্রিত প্রচলিত পাঠটি সংক্ষিপ্ত। তিনি কাব্যনাট্যটি উৎসর্গ করেছিলেন কাদম্বরী দেবীকে। এখানে উপহার শিরোনামে একটি উৎসর্গ পদ্য রয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী' গ্রন্থে এ গান সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, "ভারতী ১২৮৭ কার্তিক ভগ্নহৃদয় উপহার রাগিণী ছায়ানট, শ্রীমতী হে-কে ভারতীতে প্রকাশকালে ১০ পঙ্‌ক্তির গান মুদ্রিত। ভগ্নহৃদয় পুস্তকাকারে প্রকাশকালে (১২৮৮ বৈশাখ) এই গানটি পরিবর্তে পাঁচ স্তবকের ত্রিশ পঙক্তির কবিতা রচিত হয়। পরে প্রথম ৮ পঙক্তি ব্রহ্মসংগীতরূপে ১২৮৭ সালের মাঘোৎসবে গীত হয়। রাগিণী আলহিয়া, তাল ঝাঁপতাল।"[৬] 'ভগ্নহৃদয়'র 'উপহার' রূপে উৎসর্গপদ্যের প্রথম স্তবকটি হচ্ছে : 'হৃদয়ের বনে বনে সূর্যমুখী শত শত/ ওই মুখপানে চেয়ে ফুটিয়া উঠেছে যত।'

এই কাব্যটিকে পরবর্তীকালে আরেকটি কবিতা সুর যোজনায় গানে রূপান্তরিত করেন এবং গানটি ছিল এর চেয়ে অনেক চমৎকার : 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা/ এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা॥/ যেথা আমি যাই নাকো/ তুমি প্রকাশিত থাকো/ আকুল নয়নজলে ঢালো গো কিরণধারা॥'

গানটিতে নরনারীর প্রেমের ভাষা মনে হলেও এটিকে মাঘোৎসবে ব্রহ্মসংগীত হিসেবে গাওয়া হতো। এখানে ঈশ্বর প্রেম ও মানব প্রেম এক হয়ে গেছে। মানবপ্রেমের গানকে তিনি মাটি থেকে

উঠিয়ে নিয়ে আকাশের অনন্তে মিলিয়ে দিয়েছেন। অনিলের সাথে ললিতার প্রণয়। তাদের ফুলসজ্জা আজ। ললিতাকে সাজাতে গিয়ে চপলা মুরলাকে কি যেন ভাবতে দেখে জিজ্ঞেস করে সে কাকে ভালোবাসে, সারাদিন কার চিন্তায় ধ্যাণে থাকে। মুরলা গানে গানে জানায় : 'ক্ষমা করো মোরে সখী শুধায়ো না আর/ মরমে লুকানো থাক্ মরমের ভার।'

চপলার বার বার অনুরোধে মুরলা কবির নাম স্বীকার করে। অন্যদিকে কবির চোখে মুরলা বনদেবীর মতন। ছোটবেলা থেকে একসাথে হেসে খেলে বড় হয়েছে। তারও জিজ্ঞাসা, কি হয়েছে মুরালার? কবিও কাকে যেন ভালোবাসে। কিন্তু কেউ কাওকে কিছু বলে না। মুরলা গাইতে থাকে : 'কতদিন একসাথে ছিনু ঘুমঘোরে,/ তবু জানতেম নাকো ভালোবাসি তোরে।/ মনে আছে ছেলেবেলা কত খেলিয়াছি খেলা,/ ফুল তুলিয়াছি কত দুইটি আঁচল ভোরে!/ ছিনু সুখে যতদিন দুজনে বিরহহীন/ তখন কি জানিতাম ভালোবাসি তোরে? .../ তখন জানিনু, সখি, কত ভালোবাসি।'

গানটিতে মুরলার কবির প্রতি তার সেই ছোটবেলার প্রেম উঠে এসেছে। নলিনী ও সখীরা ব্যস্ত সাজসজ্জায়। মুরলা অনিলকে কবির প্রতি তার ভালোবাসার কথা জানায়। অন্যদিকে বিপাশার তীরে কাকে দেখে যেন কবির মন আবেগে উথলিত হয়, প্রতিদিন দেখে গিয়ে। এক পর্যায়ে তার নাম জানায় 'নলিনী', যাকে সে ভালোবাসে। সেদিন অনিল, ললিতা, নলিনী, সখীগণ, বিজয়, সুরেশ, বিনোদ, প্রমোদ, অশোক ও নীরদ সবাই আছে। কাননের এক পাশে বসে অনিল ললিতার জন্য গান গাইছে : 'সারাদিন বনে বনে ভ্রমিছি আপন মনে/ সন্ধ্যাকালে শ্রান্ত বড়ো বউ, কথা কও।'

অনিল চায় ললিতা তাকে ভালোবাসে কথাটি বারবার বলুক। কিন্তু ললিতা লজ্জার কারণে বলতে পারে না। নলিনী ও বিজয় বসে গল্প করছে। এদিকে বিজয়, প্রমোদ, সুরেশ, বিনোদ অশোক সকলেই নলিনীকে ভালোবাসে। সবাই তাকে পেতে চায়, প্রেম নিবেদন করে; কিন্তু নলিনী সকলের সাথে কথা বললেও কারো প্রেমে সাড়া দেয় না। বিজয় চলে যেতেই প্রমোদ নলিনীর কাছে এসে গায় : 'আঁধার শাখা উজল করি / হরিত পাতা ঘোমটা পরি/ বিজন বনে মালতীবালা/ আছিস কেন ফুটিয়া ॥'

প্রত্যুত্তরে নলিনী জানায় সে তাদের চতুরামি জানে, মন ভুলানো বচনে ভুলবে না এবং অশোককে

জিজ্ঞেস করে, প্রেম না করে শুধু বন্ধু হয়ে থাকবে নাকি? অশোক প্রত্যাখিত হবার পর আর ফিরতে চায় না। কবি ও মুরলা পূর্ণিমার রাতে দুজন বসে গান গাইছে : 'নীরব রজনী দেখ মুগ্ধ জোছনায়/ ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো।'

অন্যদিকে মুরলার বিষণ্নতা দেখে কবি তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করে এবং তাকে তার মনের গোপন কথা জানাতে চায়। মুরলার বারবার জিজ্ঞাসার জবাবে কবি জানায় নলিনীকে ভালোবাসে কিন্তু সংশয় যদি সে ফিরিয়ে দেয়। এসময় নলিনী সেখানে প্রবেশ করে। কবি তাকে 'পূর্ণিমারূপিণী বালা' নামে সম্বোধন করেন। মুরলাকে জিজ্ঞেস করে, এমন সুন্দর রূপ কখনো দেখছো নাকি? এতে মুরলার মনে দীর্ঘশ্বাসের সৃষ্টি হয়। সেই মুহূর্তে চপলা গান গেতে গেতে প্রবেশ করে : 'সখী ভাবনা কাহারে বলে/ সখী যাতনা কাহারে বলে?'

মুরলাকে মাথা নিচু করে বসে থাকতে দেখে চপলার বারবার জিজ্ঞাসে মুরলা জানায় কবি নলিনীকে পছন্দ করে। কিন্তু চপলা জানায় নলিনীর মুখাবয়ব সুকোমল হলেও তার হৃদয় পাষাণ এবং কঠিন। সে সকলের সাথে ছল করে। তবুও মুরলা বলে কবি যাকে ভালোবেসে ভালো থাকে তাই থাকুক। চপলা গান ধরে : 'যে ভালোবাসুক সে ভালোবাসুক/ সজনি লো, আমরা কে!/ দীনহীন এই হৃদয় মোদের/ কাছেও কি কেহ ডাকে?'

অন্যদিকে নলিনী গাইতে থাকে : 'কি হলো আমার? বুঝি বা সজনী/ হৃদয় হারিয়েছি।'

নলিনী মনে মনে কবিকে ভালোবাসতে শুরু করেছে। সখীদের জিজ্ঞেস করে, কখন কবি বিপাশার তীরে যায়? সে জানায়, তার সামনে সে চোখ তুলে তাকাতে পারে না, কথা বলতে পারে না। এই গানগুলির মধ্য দিয়ে অস্ফুট হৃদয়বেদনায় জর্জরিত কতগুলো নরনারীর মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে। যা কবির নবযৌবনবিহ্বল রুদ্ধহৃদয়াবেগের প্রতিফলন। মুরলা কবির জন্য হতাশ। এরমধ্যে কবি জানায় নলিনী তার জন্য গান গাইছে। কবি তার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে : 'কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার?/ ঢালিতেছ এত সুখ, ভেঙ্গে গেল– গেল বুক/ যেন এত সুখ হৃদে ধরে না গো আর!'

এরমধ্যে ললিতার সাথে অনিলের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। নলিনী কাউকে মন দিতে পারে না, তার ধারণা হয় সবাই রূপের মোহে আসে। কবির বিরহে মুরলা সন্ন্যাসে চলে যায়। ললিতা কিংবা অনল কেউ কাউকে বুঝতে পারেনি। গানে গানে ললিতার প্রকাশ : 'বুঝেছি বুঝেছি সখা, ভেঙ্গেছে প্রণয়,/ ও মিছা আদর তবে না করিলে নয়?/ ও শুধু বাড়ায় ব্যথা– সে-সব পুরানো কথা/ মনে

করে দেয় শুধু, ভাঙ্গে এ হৃদয় ।.../ আর কারে ভালোবেসে সুখী যদি হও শেষে/ তাই ভালোবাসো নাথ, না করি বারণ ।'

দুজনের মান-অভিমান, বলা-না-বলা কথা প্রকাশ পেয়েছে গানে। অনিল চলে যায় এবং ললিতা মূর্ছা যায়। কবি নলিনীর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, মুরলাকে খুঁজে বেড়ায়। শেষ দৃশ্যে কবি মুরলাকে মৃত্যুসজ্জায় খুঁজে পায় এবং কবি তার আসল ভালোবাসা বুঝতে পারে, সেখানেই ফুল সাজিয়ে বিয়ে করে। আর ললিতার শয়নসজ্জায় অনিল প্রবেশ করে কিন্তু ললিতা তাকে ফিরিয়ে দেয়। নাটকটিতে নাটকের পাত্র-পাত্রীরা ভালোবাসার স্বরূপ বুঝতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'এরা ভুলে যায়, কারে ছেড়ে কারে চায়'। গানগুলো দিয়ে নাটকের আবহ, মানসিক দ্বন্দ্ব সবকিছু ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

'কতদিন একসাথে ছিনু ঘুমঘোরে' গানটি নাটকটিতে 'কে গো বলে দেবে এ কেমন ভাব' গানটির জায়গায় স্থান পায় এবং ১২টি গান নাটকে গান বলে আখ্যায়িত থাকলেও গীতবিতানে সংকলিত হয়নি, গীতকবিতা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[৭]

এটি নাট্যকাব্য হওয়ায় এর গানগুলিতে কথোপকথনের ভাব রয়েছে। কিছু গান শেষ পর্যন্ত কাব্যে গৃহীত হয়নি, যেমন 'ভাল যদি বাস সখি কি দিব গো আর', 'ওই কথা বল আর বার', 'ও কথা বোল না সখি - প্রাণে লাগে ব্যথা', 'কতদিন একসাথে ছিনু ঘুম ঘোরে' এবং 'কি হবে গো বল সখি ভালবাসি অভাগারে' গানগুলির প্রত্যেকটিতেই নাটকীয়তা রয়েছে; এগুলো উক্তি-প্রত্যুক্তির ঢঙে রচিত, কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র দ্বিতীয়টি 'ভগ্নতরী' গাঁথায় ও চতুর্থটি 'ভগ্নহৃদয়' নাট্যকাব্যে গ্রহণ করা হয়েছে। অপর তিনটির মধ্যে শুধু প্রথম দুটির পর 'রবিচ্ছায়া'য় সংকলিত হয়, অন্য দু'টি সম্পূর্ণ বর্জিত। 'নাচ, শ্যামা তালে তালে' গানটি 'ভগ্নহৃদয়ে'র দ্বিতীয় সর্গে নলিনীর পাখি 'শ্যামার প্রতি গান' হিসেবে পরিচিতি। এই গানটি তৎকালীন সমালোচকদের মুগ্ধ করেছিল এবং এর দীর্ঘ অংশ গ্রন্থ সমালোচনায় উদ্ধৃত হয়েছিল। গানটি *গীতবিতানে* সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলিত হয়েছে এবং 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে 'কৈশোরক' অংশে 'শ্যামা' নামে কবিতা হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে।[৮]

'বলি ও আমার গোলাপ বালা', 'আঁধার শাখা উজল করি', 'নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়', ও 'শুন নলিনী খোল গো আঁখি' গানগুলো রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিলেত যাবার আগে মুম্বাইয়ে এবং আহমেদাবাদে রচনা করেছেন। পরে এগুলোকে ভগ্নহৃদয় নাটকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 'বলি ও আমার গোলাপ বালা' গানটি প্রকাশিত হয় ১২৮৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। গানটি

'গোলাপবালা' নামে এবং 'কাছে যদি তার যাই যদি' গানটি 'লাজময়ী' নামে 'শৈশবসংগীত' কাব্যগ্রন্থে ১৮৮৪ সালে কবিতা হিসেবে সংকলিত হয়। 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "গানটি এমনি আর এক রাত্রে লিখিয়া বেহাগ সুর বসাইয়া গুনগুন করিয়া গাহিয়া বেড়াইতে ছিলাম। প্রকাশের সময় অনুযায়ী বলি ও আমার গোলাপবালা নীরব রজনী দেখ-র থেকে প্রবীণ।"[৯]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচনাবলীতে কাব্য বা নাট্য হিসেবে 'ভগ্নহৃদয়'কে স্থান দিতে না চাইলেও এর গানগুলো নানাভাবে ব্যবহার করেছেন পরবর্তী রচনায়। এ নাটকের গানগুলো রোমান্টিক, এখানে ব্যক্তিগত আবেগ যেভাবে ফুটে উঠেছে তাতে নাটকের গানগুলোতে যৌবনুভূতির উত্তাপ পাওয়া যায়। গানগুলোতে প্রেম ব্যক্তিগত সম্পর্কের সীমাকে অতিক্রম করার চেষ্ঠা করেছে। একাধিক গানের ভাষা ও সুরে সমকালীন ও পূর্ববর্তী গীতিকারের গানের ধারা লক্ষ্য করা যায়, যেমন নিধুবাবু, হরু ঠাকুর, রাম বসু, শ্রীধর কথক, মনোমোহন বসু, জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক, অক্ষয় চৌধুরী প্রভৃতি কবির গানের ধারা দেখতে পাওয়া যায়।

২৯টি গানের মধ্যে ১১টি গীতকবিতা, ১৬টি নাট্যগীতি এবং ১টি প্রেম পর্যায়ের গান। ১টি গানের কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

কাব্য সৃষ্টির প্রথম লগ্নে কবি ছিলেন রোমান্টিক। 'প্রভাতসংগীত' থেকে 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত তাঁর মনে ছিল রোমান্টিক ভাব-বিহ্বলতা। তারই ছাপ পাওয়া যায় এ নাটকের কাহিনিতে। ১৮৮৪-তে নলিনী নামটি নিয়ে রচিত একটি কবিতা রয়েছে কৈশোরক বিভাগে প্রভাতী শিরোনামে। এটিকে পরে গানে রূপ দেয়া হয়। গানটি হলো 'শুন নলিনী খোল গো আঁখি/ঘুম এখনো ভাঙ্গিল নাকি।'

২. রুদ্রচন্ড(১৮৮১)

জ্যোতিন্দ্ররায়কে উৎসর্গকৃত 'রুদ্রচন্ড' নাটকটিতে উৎসর্গ পত্রে বিদেশ-যাত্রাজনিত কবির বিচ্ছেদ বেদনার আভাস পাওয়া যায়–

'যাহা দিতে আসিয়াছি কিছুই তা নহে ভাই!
কোথাও পাই নে খুঁজে যা তোমারে দিতে চাই!
আগ্রহে অধীর হয়ে ক্ষুদ্র উপহার লয়ে
যে উচ্ছ্বাসে আসিতেছি ছুটিয়া তোমারি পাশ,

দেখাতে পারিলে তাহা সকল আশ ।
ছেলেবেলা হ'তে, ভাই, ধরিয়া আমারি হাত
অনুক্ষণ তুমি মোরে রাখিয়াছ সাথে সাথ ।
তোমার স্নেহের ছায়ে কত না যতণ করে
কঠোর সংসার হ'তে আবরি রেখেছ মোরে ।
সে স্নেহ-আশ্রয় ত্যজি যেতে হবে পরবাসে
তাই বিদায়ের আগে এসেছি তোমার পাশে ।
যতখানি ভালবাসি, তার মত কিছু নাই–
তবু যাহা সাধ্য ছিল যতনে এনেছি তাই ।'১০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী'তে বলেন, "রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে বোলপুর আসিয়া 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে যে কাব্য রচনা করেন (মার্চ ১৮৭৩) এই 'রুদ্রচন্ড' তাহারই নাট্যরূপ ।"১১

'রুদ্রচন্ড' রচনার সমকালে কবি গীতিকাব্য 'ভগ্নহৃদয়', 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাতসংগীত' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং উপন্যাস 'করুণা', 'বৌঠাকুরানীর হাট' প্রভৃতি কথাসাহিত্য সৃষ্টি করেন । এসব রচনায় বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে বিষণ্ন সুরের বীণাঝংকার এবং রোমান্টিক কবির হৃদয়ানুভূতির অবারিত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় । এটি নাটিকারূপে উল্লেখিত হয়েছিল । 'রুদ্রচন্ড' চতুর্দশ দৃশ্যে বিভক্ত । এই নাটিকার সংলাপ কবিতায় রচিত । কয়েকটি গানও এতে সংযোজিত হয়েছে । 'ভগ্নহৃদয়ে' গানের প্রাধান্য, 'রুদ্রচন্ডে' কাহিনির প্রাধান্য । তাই নাট্যগুণ এরমধ্যে অধিক পরিমাণে বর্তমান । রচনা হিসেবে 'রুদ্রচন্ড'ও দুর্বল । তবে এর দু'একটি গান রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে দীর্ঘকাল জাগরূক ছিল ।

'রুদ্রচন্ড' রচনার সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলো আখ্যায়িকামূলক গাঁথাকাব্য রচনা করেন । এসব গাঁথা রচনার প্রভাব 'রুদ্রচন্ড'-এ লক্ষ্য করা যায় । এই নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার পর ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজে মন্তব্য করা হয়-

"This is the little of the melodrama from the pen of writer who belongs to a nest of singing birds and to whose credit it may be said that amid great temptations they have made literature and poetry the

vocation of life. As regard the performance under notice we need. Serially say it is not a drama properly so called nor an opera. it is sort of an interlocutory of poem, short but sweet.” ১২

এই নাটকের তৃতীয় দৃশ্যের দুটি গান :

গান	রাগ ও তাল	পর্যায়
১. বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল	মিশ্র গৌড় সারং - ঝাঁপতাল	নাট্যগীতি
২. তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল	গৌড় সারং - ঝাঁপতাল	নাট্যগীতি

গানদুটির পান্ডুলিপি *‘মালতীপুঁথি’*তে পাওয়া যায় এবং দুটি গানই নাট্যগীতি পর্যায়ের। প্রথম গানটি চাঁদকবি অমিয়াকে গাইতে অনুরোধ করে এবং দ্বিতীয় গানটি অমিয়াকে শেখাবার উদ্দ্যেশে চাঁদ কবি গায়। দুজন দুজনকে ভালোবাসে কিন্তু সবার সামনে প্রকাশের সাধ্য নেই। এই গান দুটি নাটকের প্রয়োজনে লেখা এবং এর শব্দবিন্যাস নাটকীয়তা সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে। দুটি গানের আলাদা সুর থাকলেও ইন্দিরা দেবী জানান গান দুটি একই সুরে গাওয়া হতো। গীতবিতানের গ্রন্থপরিচয়েও এটির উল্লেখ আছে। দুটি গান যেন একটি কবিতার দুটি স্তবক। বসন্তপ্রভাতে ফোটা মালতী ফুলের বৃত্ত থেকে ছিন্ন হওয়ার বেদনা যেন গায়িকা অমিয়ার ক্ষুব্ধ হৃদয়ের চিত্রকল্প। গান দুটি ‘রবিচ্ছায়া’তে আছে, এছাড়াও সংক্ষিপ্ত আকারে ‘ফুলের ইতিহাস’ নামক শিশু কাব্যেও কবি স্থান দিয়েছিলেন।

৩. বাল্মীকি-প্রতিভা (১৮৮১)

চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পরিচ্ছদ গীতিনাট্য অংশে ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’ আলোচনা করা হয়েছে।

৪. কালমৃগয়া (১৮৮২)

চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পরিচ্ছদ গীতিনাট্য অংশে ‘কালমৃগয়া’ আলোচনা করা হয়েছে।

৫. প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৩)

নাটক ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’র প্রকৃতি জানিয়ে ১৯৪০ সালের ২৮শে জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> “জীবনের প্রথম বয়স কেটেছে বদ্ধঘরে নিঃসঙ্গ নির্জনে। সন্ধ্যাসঙ্গীত এবং প্রভাত সঙ্গীতের অনেকটা সেই অবরুদ্ধ আলোকের কবিতা। নিজের মনের ভাবনা নিজের মনের প্রাচীরের মধ্যে প্রতিহত হয়ে আলোড়িত। তারপরের অবস্থায় মনের মধ্যে মানুষের স্পর্শ লাগল, বাইরের হাওয়ায় জানলা গেল খুলে, উৎসুক মনের কাছে পৃথিবীর দৃশ্য খন্ড খন্ড চলচ্ছবির মতো দেখা

দিতে লাগল। গুহাচরের মন তখন ঝুঁকল লোকালয়ের দিকে। তখনো বাইরের জগৎ সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি আবেগের বাষ্পপুঞ্জ থেকে। তবু দুঃস্বপ্নের মতো আপনার বাঁধনজাল ছাড়াবার জন্যে জেগে উঠল বালকের আগ্রহ। এই সময়কার রচনা ছবি ও গান। লেখনীর সেই বহির্মুখী প্রবৃত্তি তখন কেবল ভাবুকতার অস্পষ্টতার মধ্যে বন্ধন স্বীকার করলে না। বেদনার ভিতর দিয়ে ভাবপ্রকাশের প্রয়াসে সে শ্রান্ত, কল্পনার পথে সৃষ্টি করবার দিকে পড়েছে তার ঝোঁক। এই পথে তার দ্বার প্রথম খুলেছিল বাল্মীকিপ্রতিভায়। যদিও তার উপকরণ গান নিয়ে, কিন্তু তার প্রকৃতিই নাট্যীয়। তাকে গীতিকাব্য বলা চলে না। কিছুকাল পরে, তখন আমার বয়স বোধহয় তেইশ কিংবা চব্বিশ হবে। কারোয়ার থেকে আসতে আসতে হঠাৎ যে গান সমুদ্রের উপর প্রভাত সূর্যালোকে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল তাকে নাট্যীয় বলা যেতে পারে অর্থাৎ সে আত্মগত নয়, সে কল্পনায় রূপায়িত। 'হেদে গো নন্দরানী' গানটি একটি ছবি, যার রস নাট্যরস। রাখাল বালকেরা নন্দরানীর কাছে এসেছে আবদার করতে। তারা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাবে এই তাদের পণ। এই গানটি প্রকৃতির প্রতিশোধে ভুক্ত করেছি। এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে ও নাট্যে মিলত। সন্ন্যাসীর যা অন্তরের কথা তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা। এই আত্মকেন্দ্রিক বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানারূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই কলরবের বিশেষত্ব হচ্ছে অকিঞ্চিৎকরতা। এই বৈপরীত্যকে নাট্যিক বলা যাইতে পারে। এরই মাঝে মাঝে গানের রস এসে অনির্বচনীয়তার আভাস দিয়েছে। শেষ কথাটি এই দাড়াঁল শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, সেইখানেই যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায়।"১৩

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ এই তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে কবি নিজেই বলেছেন,

"কারোয়ারে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাট্যকাব্যটি লিখিয়াছিলাম। কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপর জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সবকিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল– ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়া অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনি পাই, তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যে সীমা নাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেই জন্যই এই সৌন্দর্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া

যাই।"[১৪]

অন্ধকার গুহার মধ্যে বসে তপস্যায় মগ্ন হয়ে থাকা এক সন্ন্যাসীর মনে হলো তার সাধনা সিদ্ধ হয়েছে। সেদিন প্রকৃতির মায়াজাল ছিন্ন করে আত্মকেন্দ্রিক সাধনায় সিদ্ধির আনন্দে সন্ন্যাসীর হৃদয় পরিপূর্ণ। সংসারের তুচ্ছ খেলাধুলা দেখার জন্য তিনি রাজপথে বের হলেন। দেখলেন, কৃষক-বালকেরা গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছে : 'হেদে গো নন্দরানী, /আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।/ আমরা রাখাল-বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে,/ আমাদের শ্যামকে দিয়ে দাও।'

নাটকটির ভূমিকায় এ গানটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> "হে দে গো নন্দরানী গানটি একটি ছবি, যার রস নাট্যরস। রাখাল বালকেরা নন্দরানীর কাছে এসেছে আবদার করতে, তারা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাবে এই তাদের পণ। এই গানটি প্রকৃতির প্রতিশোধে ভুক্ত করেছি। এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে ও নাট্যে মিলিত।"[১৫]

গানটি কোলাহল মুখর পরিবেশের মধ্যে অনির্বচনীয়তার আভাস এনেছে। কৃষকগণ রৌদ্র-করোজ্জ্বল সবুজ শস্যক্ষেত্রের উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রকৃতির নিবিড় সৌন্দর্যরাশি দর্শনে অভিভূত হয়েছে; তাই পৃথিবীর মানবমনের একাত্মবোধের কথা তাদের গানের মধ্যে ফুটে উঠেছে। সন্ন্যাসী তার গুহা থেকে বের হয়েই রাজপথ দিয়ে যাবার সময় সাধারণ মানুষের নিত্যকার্য দেখার সময় গানটি শুনলেন। জীবন বিমুখ সন্ন্যাসীর কাছে গানের মধ্য দিয়ে জীবনের স্বরূপ, প্রকৃতির সৌন্দর্য মোহবিষ্ট করে তোলে। একই সুরে বাঁধা মালিনীর কণ্ঠের গানটি। গানের পরেই স্ত্রী-বালকপুত্রের সাথে ব্রাহ্মণের রঙ্গালাপ, পথিকের গল্পালাপ, ব্রাহ্মণ-বটুর সাথে শাস্ত্রালোচনা। তাই দেখে সন্ন্যাসী বলে মূর্খের আলোচনা। এরমধ্যে গান গাইতে গাইতে মালিনীর প্রবেশ : 'বুঝি বেলা বহে যায়,/ কাননে আয়, তোরা আয়।'

মানব জীবনের যেই রহস্য– জন্ম, মৃত্যুর সত্য রূপটি মালিনীদের এই গানটিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে। এরপর নিরন্ন ভিক্ষুকের ভিক্ষা চাওয়া গানে গানে : 'ভিক্ষে দে গো ভিক্ষে দে।/ দ্বারে দ্বারে বেড়াই ঘুরে, মুখ তুলে কেউ চাইলি নে।'

চতুর্দোলায় মন্ত্রীপুত্রদের খেলা। এসব কোনকিছুই তাকে স্পর্শ করে না। তিনি নিজেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভেবে সবকিছু, জনকোলাহল থেকে নিজেকে একপাশে সরিয়ে রাখেন। সেই পথেই

সন্ন্যাসীর গানের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে প্রাত্যহিক কর্মভার জীবনের এক প্রতিচ্ছবি। সেই পথে এক অনার্য কন্যাকে দেখে পথিকগণ ঘৃণায় দূরে সরে যায়, মন্দির রক্ষক মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে দূর করে দেয়। সন্ন্যাসী সেই মেয়েটিকে কাছে ডেকে আনেন এবং অনাথ মেয়েটির ভাঙা কুটিরে যান। মেয়েটি সন্ন্যাসীকে বাবা বলে সম্বোধন করে। সন্ন্যাসী সেই ডাকে নিজের অন্তরে এক অভূতপূর্ব পুলক অনুভব করেন। আবার তিনি প্রকৃতির মায়াজালে জড়িয়ে পড়ছেন– এই আশঙ্কায় ভয় পেলেন। এরমধ্যে মঞ্চে একদল স্ত্রী পুরুষের প্রবেশ। স্ত্রীদের গান : 'কথা কোস নে রো রাই, শ্যামের বড়াই বড়ো বেড়েছে।/ কে জানে ও কেমন করে মন কেড়েছে।/ শুধু ধীরে বাজায় বাঁশি, শুধু হাসে মধুর হাসি,/ গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে।'

গানটি দিয়ে পরিবেশটিকে কিছুক্ষণের জন্য পরিবর্তন করা হয়। বালিকার স্পর্শে সন্ন্যাসীর মন ধ্যানের মতো সীমা থেকে নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে। ধীরে ধীরে সংসারের প্রতি সন্ন্যাসীর মোহ বাড়তে থাকে। জগতের মায়া, মোহ, স্নেহ থেকে পরিত্রাণের জন্যে সন্ন্যাসী আত্মসমালোচনায় নিজেকে প্রকাশ করেন গানে : 'বালিকা কি মনে করে স্নেহ করি ওরে?/ হায় হায় এ কী ভ্রম ! জানে না সরলা/ নিষ্কলঙ্ক এ হৃদয় স্নেহরেখাহীন।/ তাই মনে করে যদি সুখে থাকে থাক্।/ মোহ নিয়ে ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকে এরা।'
এমন সময় গুহার সামনে পর্বত পথে দুইজন স্ত্রীলোক গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে : 'বনে এমন ফুল ফুটেছে,/ মান করে থাকা আজ কি সাজে!/ চলো চলো কুঞ্জমাঝে।'

সপ্তম দৃশ্যের শুরুতেই বৈষ্ণবীয় এই গানটি একটি আনন্দের পরিবেশের সূচনা করে। জগৎ-সংসারকে মনোহর লাগছে, চারিদিকে শান্তি স্তব্ধতার মধ্যে সিন্ধুর গান তার কানে বাজছে। এরমধ্যে পথিকের গান: 'মরি লো মরি,/ আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!/ ভেবেছিলেম ঘরে রব কোথাও যাব না-/ ওই যে, বাহিরে বাজিল বাঁশি বলো কী করি?/ শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনাতীরে,/ সাঁঝের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে-/ ওগো তোরা জানিস যদি/ আমায় পথ বলে দে।/ আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!'

গানটি অর্থবহ। সন্ন্যাসীর জগত জীবন ও সন্ন্যাস জীবনের একটা রেখা টেনেছেন গানটিতে। তিনি তার গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন, কিন্তু বাঁশি তাকে ঘরে থাকতে দিচ্ছে না। তিনি মুক্তি চাচ্ছেন এই জীবন থেকে, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। গানটি সম্পর্কে অরুণকুমার বসু বলেন :

“এ গানের উৎসে রয়েছে গভীর বিশ্বপ্রীতি ও জীবনমমতা। মর্ত্যজীবনের প্রতি যে নিবিড় আসক্তিতে রবীন্দ্রসংগীত কম্পমান, লোকায়ত পৃথিবীর মর্মে মর্মে মধুকোষ সন্ধানের যে উৎকণ্ঠকাতর মূর্চ্ছনা রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীতগুলির সম্বল, মাত্র তেইশ বৎসরের গানেই তার এমন অনির্বচনীয় অভিপ্রকাশ সম্ভব হয়েছে। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে কবি বলেছিলেন যে, এর আইডিয়া হল ‘বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়’, তারই নামান্তর সীমার সহিত অসীমের মিলন সাধনের পালা। ‘মরি লো মরি’ গানটি সেই প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তনের, জীবন নিমন্ত্রণের মুগ্ধ রাগিণী। মাত্র তেইশ বৎসরের এই গানে প্রেমানুরাগ, আসক্তি ও লোকালয়ের মধুর আহ্বান কবিকে যে বাঁশিতে ডাক দিয়েছে, সেই বাঁশিটি আর কখনো ত্যাগ করেননি। জীবনের বাঁকে বাঁকে সেই একটি বাঁশি চলচপলার চকিত ইশারা হয়ে কবিকে হাতছানি দিয়েছে, হিরন্ময় শস্যগীত জীবনের আহ্বান হয়ে বেজেছে। রক্তকরবীর নন্দিনীর কানেও সেই বাহিরের বাঁশির ডাক বেজেছিল একদিন - ‘ভালোবাসি, ভালোবাসি/এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি’। এই বাঁশিই ‘ওগো সুদূর বিপুল সুদূর তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী’ হয়ে কবিকে চিরকাল উন্মনা করেছে। প্রকৃতির প্রতিশোধের এই গান যেন সেই বংশীখন্ডের গৌরচন্দ্রিকা।”[১৬]

এরপর পথিকের কণ্ঠে আরেকটি বৈষ্ণবীয় গান শিব স্তোত্র : ‘যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে।/ বিভূতিভূষিত শুভ্র দেহ,/ নাচিছ দিকবসনে।’ এই গানগুলোতে সন্ন্যাসীকে বাইরের জগতে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

অষ্টম দৃশ্যে সন্ন্যাসী আর বালিকা গুহার দ্বারে বসে আছে। তিনি গুহার ভেতর যেতে চাচ্ছেন না। নিজেকে স্বাধীন মনে করছেন। বালিকা গান ধরে : ‘মেঘেরা চলে চলে যায়,/ চাঁদেরে ডাকে ‘আয় আয়’।/ ঘুমঘোরে বলে চাঁদ, ‘কোথায় - কোথায়’!/ না জানি কোথা চলিয়াছে,/ কী জানি কী সে সেথা আছে,/ আকাশের মাঝে চাঁদ চারিদিকে চায়।’

বালিকার এই গানটির তাৎপর্য রয়েছে নাটকটিতে। এই একটি গান বালিকার কণ্ঠে যা সন্ন্যাসীর অনুরোধে গাওয়া। সন্ন্যাসী তার এতদিনের নিঃসঙ্গ সাধনার পথ থেকে যখন জগৎসংসারের দিকে ঝুঁকেছেন, বিশ্বপ্রকৃতির লীলামাধুর্য গানের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে তার সামনে। আকাশে চাঁদের লুকোচুরি হাসি, পার্থিব জগৎ তার কাছে মূর্তময়। তিনি যেন আঁধার থেকে আলোয় এসে পড়েছেন।

শেষে একদিন সন্ন্যাসী বালিকাকে ছেড়ে চলে যান। কিন্তু তাঁর অন্তরের স্নেহ-প্রবৃত্তি এতকাল রুদ্ধ ছিল, অনাথ বালিকার স্পর্শে তা মুক্ত হয়ে যায়, তিনি পথের চারপাশে স্নেহ-প্রেম দেখতে পান। বালিকা সন্ধান করতে করতে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়। সন্ন্যাসী পুনরায় বালিকাকে ত্যাগ করে নির্জন অরণ্যে পালিয়ে যায়। এ যেন অনেকটা প্রভাত সংগীতের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র মতো : 'না জানি কেমনে পশিল হেথায়/ পথহারা তার একটি তান/ আঁধার গুহায় ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া/ গভীর গুহায় নামিয়া নামিয়া/ আকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া/ ছুঁয়েছে আমার প্রাণ।'

সেখানে এক ঝড়ের রাতে মেয়েটির কান্না শুনতে পান সন্ন্যাসী। অরণ্যে থেকে ছুটে বাইরে আসে এবং জনকোলাহল রাস্তার উপর দিয়ে বালিকার সন্ধান করতে থাকে। খুঁজে না পেয়ে নিজের পরিত্যক্ত আশ্রয়ে ফিরে এসে দেখেন, বালিকার প্রাণহীন দেহ তার সম্মুখে ধুলায় লুটাচ্ছে। সন্ন্যাসী যে সংসার-প্রকৃতিকে মায়াজ্ঞানে বিবেচনা করেছিলেন তাই আজ তাঁর কাছে পরম সত্য বলে ধরা দেয়।

নাটকের গানগুলি প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন বিচিত্র চরিত্রকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। কৃষক, মালিনী, বৃদ্ধ ভিক্ষুক, সমবেত স্ত্রীলোক ও পুরুষ, পর্বত পথযাত্রী স্ত্রীলোক পথিক– বিচিত্র স্বভাবের মানুষ ও বাস্তব জগতের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র সংগীতের ব্যবহার করেছেন। এই চরিত্রগুলো সৃষ্টি সর্ম্পকে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "গ্রাম্যজীবনের খন্ড খন্ড ছবিগুলি ও পল্লীবাসীদের আলাপের কৌতুককর অসঙ্গতি রবীন্দ্রনাথের আত্মকেন্দ্রিকতামুক্ত জীবন পর্যবেক্ষণের পরিচয় দেয়, কিন্তু এগুলি ছাড়া ছাড়া, নাট্য ঘটনাবিন্যাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত নহে।"[১৭]

প্রথম সংস্করণে স্ত্রীলোকদের গান হিসেবে অক্ষয় চৌধুরীর 'আজ তোমায় ধরব চাঁদ' ব্যবহৃত হলেও এবং কাব্য গ্রন্থাবলী-তে (১৩০৩ বঙ্গাব্দ) থাকলেও ১৩১০-এ মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্য-গ্রন্থ থেকে এটি বাদ দেয়া হয়। গাটির পাঠরূপ ছিল : 'আজ তোমায় ধরব চাঁদ আঁচল পেতে,/ জাগব বাসর আজি তোমার সাথে।/ কুমুদিনী বলে রাখব ধরে এনে / বাঁধব মৃণাল দিয়ে দিব না যেতে।'[১৮]

নাটকটির অধিকাংশ গানই পদাবলী অনুষঙ্গ। যেমন 'হে দে নন্দরানী' গানটি পদাবলীর গোষ্ঠলীলা, বাৎসল্যে ও সখ্যে জড়িত। 'বুঝি বেলা বহে যায়', 'কথা কোসনে লো রাই শ্যামের বড়াই বড় বেড়েছে', 'বনে এমন ফুল ফুটেছে', ও 'মরি লো মরি আমায়' গানগুলো পদাবলীর

আধুনিক সংস্করণ। গানগুলির ৪টি গান নাট্যগীতি পর্যায়ের, ২টি বিচিত্র এবং ৩টি প্রেম পর্যায়ের।

এই নাটকটি রচনার আগে কবির কাব্য জগতে চলছে ছবি ও গানের যুগ। 'প্রভাতসঙ্গীত' (১৮৮৩) কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার রচনা। এর পূর্বে 'বউঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩) ও 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পর্বে রবীন্দ্রচেতনা ছিল অন্তর্মুখী। এসময় কবির সুন্দর পিপাসু দৃষ্টি বাইরের জগতের রূপ-রস-গন্ধ থেকে সৌন্দর্য আস্বাদনের জন্য উন্মুখ। আর তাই এই গল্পের সন্ন্যাসী বিশ্ব-সংসার ছেড়ে অনন্তকে লাভ করতে ও স্নেহ-মায়ার বন্ধনকে ছিন্ন করতে চাইলেও অসীমকে খুঁজে পান সীমার মাঝে। প্রকৃতির প্রতিশোধ রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক যেখানে তিনি গানের ব্যবহার করেছেন ঘটনাপ্রবাহ উপস্থাপনার সাথে ঘটনাপ্রবাহকে তাৎপর্যমন্ডিত করে তোলার জন্য।

৬. নলিনী (১৮৮৪)

নাটকটি যৌথ নাটক লেখার পরিকল্পনা হলেও রবীন্দ্রনাথই ছিলেন ১২৯১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'নলিনী' নাটকের প্রধান লেখক। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

> "যৌথ-রচনা বিবাহ উৎসবের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া তরুণ তরুণীরা স্থির করিলেন নাটকের রচয়িতা হইবেন অভিনেতারা স্বয়ং। সেইজন্য মোটামুটিভাবে একটা প্লট খাড়া করিয়া অভিনয়ের অংশ নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইলো। একজন নিজ অংশ লিখিয়া দিলে অপরজন তাঁহার অংশ লিখিবেন, এইরূপে অভিনেতা-লেখকদের হাতে হাতে ঘুরিয়া একটি জিনিস খাড়া হইল বটে, তবে তাহাকে সাহিত্য নাম দেওয়া যাইবে না।"[১৯]

পুরো নাটকটি বিশৃঙ্খলভাবে রচনা করা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ পুরোটুকু কেটে দিয়ে সেই খসড়ার উপর একাই নাট্যরূপ দেন। প্রশান্তকুমার পাল অনুমান করেন :

> "নীরদ ফুলি ও নলিনী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবী মনোনীত হয়েছিলেন। তাঁর এরূপ অনুমানের কারণ, জ্ঞানদানন্দী দেবী সঙ্গীত পরিবেশনায় তেমন দক্ষ ছিলেন না। সেজন্য নলিনীর মনের কথা গানের মাধ্যমে বলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ফুলি-রূপিনী বালিকা ইন্দিরাকে। প্রশান্তকুমার আরও অনুমান করেছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হয়তো নবীন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হন, নীরজা চরিত্রের সম্ভাব্য অভিনেত্রীর নাম হয়তো কাদম্বরী দেবী।"[২০]

নাটকটির শুরু নীরদের গানে : 'হা কে বলে দেবে/ সে ভালোবাসে কি মোরে!/ কভু-বা সে হেসে

চায়, কভু মুখ ফিরায়ে লয়' ।

নীরদ ভালোবাসে নলিনীকে, কিন্তু নলিনী বালিকা, হৃদয়ে প্রেমোন্মেষ হয়নি । এতদিন ধরে সে অপেক্ষো করছে কিন্তু কোন সাড়া নেই । অন্যদিকে নবীনও নলিনীকে ভালোবাসে । উত্তর প্রত্যুত্তরে ফুলিকে দিয়ে নলিনী গান গাওয়ায় : 'ও কেন ভালোবাসা জানাতে আসে/ ওলো সজনি!/ হাসি খেলি রে মনের সুখে,/ ও কেন সাথে ফেরে আঁধারমুখে/ দিনরজনী!'

গানটিতে নলিনীর মনোভাব ফুটে উঠেছে । সে হেসে খেলে ঘুরে বেড়ায়, কেন সে ভালোবাসা জানাতে আসে । নবীনের উত্তর : 'ভালোবাসিলে যদি সে ভালো না বাসে/ কেন সে দেখা দিল!/ মধু অধরের মধুর হাসি/ প্রাণে কেন বরষিল!'

অমন হাসি প্রাণে পরশ আনে, পথের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেম কিন্তু দেখা দিয়ে মনে ভালোবাসার তৃষ্ণা বাড়িয়ে দিলো । নলিনী নীরদকে ভালোবাসে কিন্তু তার প্রেমে চপলতা নেই, প্রকাশ নেই । কিন্তু মনে মনে এক আকর্ষণ অনুভব করে । নীরদও মুখ ফুটে কিছু বলে না, কেঁদে চলে যায় । নলিনী কিছু শুনবার আশায় ফুলিকে জিজ্ঞেস করে, নীরদ কিছু বলেছে নাকি? ফুলি জানায় কিছু বলেনি । নলিনীর গান : 'মনে রয়ে গেল মনের কথা-/ শুধু চোখের জল, প্রাণের ব্যথা!/ মনে করি দুটি কথা বলে যাই,/ কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই,' ।

গানে নলিনীর প্রকাশ সে নীরদকে ভালোবাসে । কিন্তু ভালোবাসা ব্যক্ত করতে পারে না, নীরদের চোখে জল দেখে তার কষ্ট হয় । কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না । নলিনীর থেকে কোন সাড়া না পেয়ে নীরদ দেশ ছেড়ে চলে যায় । নীরদ চলে গেলে নলিনীর মধ্যে পরিবর্তন আসতে শুরু করে । সে বুঝতে পারে নীরদকে সে ভালোবাসতো । সে ঘর থেকে বের হয় না । কারো ডাকে সাড়া দেয় না । সবসময় নীরদের কথা ভাবে । অন্যদিকে নীরদ বিদেশ গিয়ে নীরজা নাম্নী এক যুবতির প্রেমে পড়ে এবং তার মমতায় মুগ্ধ হয়ে যায় । নীরজার প্রেমে নলিনীকে ভুলতে চায় এবং বিয়ে করে দেশে ফিরে আসে । নলিনীদের বাড়িতে বসন্তোৎসবে নীরদ নীরজাকে নিয়ে বাগানে প্রবেশ করে । বাগানের গাছপালা দেখে নীরদের আগের কথা মনে হয় । এমন সময় নলিনী আসে, সে শীর্ণকায়, নীরদের সাথে একটু কথা বলতেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে । নীরজা তাকে সুস্থ করে তোলে । নীরদের প্রতি নলিনীর প্রেম বুঝতে পেরে নীরজা বলে, 'আর বেশিদিন তোকে দুঃখ পেতে হবে না, আমি তোদের মিলন করিয়ে দেব ।' পরিচয় জানতে চাইলে 'তোর দিদি হই'

জানায়। শেষ দৃশ্যে নীরজার মৃত্যু সজ্জায় নলিনীকে ডেকে সে নীরদের হাতে তুলে দেয় এবং 'আমি তবে চল্লাম বোন' বলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

পান্ডুলিপির নবম পৃষ্ঠায় নারীদের কণ্ঠে একটি গান ছিল 'দেখে যা দেখে যা' (ফুলমালা গাথার অন্তর্গত), কিন্তু মুদ্রিত কপিতে ছিল না। নাটকের এই গানগুলো বিবাহ উৎসব ১৮৮৪ গীতিনাট্যতে ছিল। নাটকটি অভিনয়ের জন্য রচিত হলেও কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যুতে নাটকটি মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রভারতী-সংগ্রহশালায় এই নাটকটির একটি মুদ্রিত কপি রাখা আছে। সেই কপিতে রবীন্দ্রনাথ-কৃত সংযোজন-পরিবর্ধন দেখে ধারণা করা হয় পরবর্তীকালে এই নাটকটি আবার মঞ্চস্থ করার কথা ভাবা হয়েছিল।[২১]

নাটকের প্রথম তিনটি গান টপ্পা প্রভাবিত। উনিশ শতকের প্রথম দিককার নিধুবাবুর টপ্পার ছায়া পাওয়া যায়। এই নাটকটি পরে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য কিছুদিন পরই এর সংশোধিত রূপ 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যটি রচনা করেন। 'কবি কাহিনি'র সাথে 'ভগ্নহৃদয়ের' গল্পাংশের সাথে মিল রয়েছে। 'নলিনী' নাটকও তাই। 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়' ও 'রুদ্রচন্ড' প্রভৃতি একই ছাঁচে ঢালা। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, "সবগুলি তপ্ত উচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত।"[২২]

নাটকের ৮টি গানের ৩টি নাট্যগীতি, ৩টি প্রেম ও ২টি গান গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য পর্যায়ের। কাব্যগ্রন্থ 'প্রভাত সংগীত' রচনাকালে নাটকটি রচিত। তিনি এসময় বিভোর ছিলেন আবেগপ্রবণতায়।

৭. মায়ার খেলা (১৮৮৮)

চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পরিচ্ছদে গীতিনাট্য অংশে 'মায়ার খেলা' আলোচনা করা হয়েছে।

৮. রাজা ও রানী (১৮৮৯)

'রাজা ও রানী' নাটকের ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন প্রকৃতির প্রতিশোধ ও মায়ার খেলার ধারাবাহিকতায় তিনি নাটকটি রচনা করেছেন। তিনি বলেন :

> "প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে রাজা ও রানীর এক জায়গায় মিল আছে। অসীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব হতে ভ্রষ্ট হয়ে সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে। এই তত্ত্বকেই যে সজ্ঞানে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে তা নয়। এরমধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্যে স্বত উদ্যত হয়েছে যে, সংসারের জমি থেমে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি

ঘটতে থাকে । -

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম/প্রেম মিলে না ।

শুধু সুখ চলে যায়/এমনি মায়ার ছলনা ।"২৩

জালন্ধরের রাজা বিক্রমদেব কাশ্মীরের রাজকন্যা সুমিত্রাকে বিয়ে করে তার প্রতি অন্ধ ভালোবাসায় রাজ-কার্যে অবহেলা করেন । রাজকার্যে রাজার অবহেলার সুযোগ নিয়ে কর্মচারীরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠে, প্রজাদের উপর নির্যাতন শুরু করে এবং একপর্যায়ে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় । রাজা রাজ্য বিষয়ে কোন কথাই শুনতে চায় না । রাজ-বয়স্ক দেবদত্ত কৌশলে রাজাকে কর্তব্য পালনে রাজি করাতে ব্যর্থ হয়ে রানীর কাছে রাজ্যের অবস্থা ব্যক্ত করেন । রানী রাজাকে স্বেচ্ছাচারী রাজকর্মচারীদের দমন করতে বললেও তারা সবাই কাশ্মীরাগত এবং রানীর আত্মীয় হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে পারেন না । রাজকার্যে তার উদাসীনতা এবং স্বেচ্ছাচারী রাজকর্মচারীদের শাসনের ব্যর্থতার মূলে রানী নিজেকে দায়ী করেন এবং পুরুষের ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে কাশ্মীর যাত্রা করেন । উদ্দেশ্য, তার ভাই কাশ্মীরের যুবরাজ কুমারের সহায়তায় এবং পিতৃরাজ্য থেকে সৈন্য নিয়ে এসে জালন্ধর রাজ্যের উদ্ধত রাজকর্মচারীদের সমুচিত দন্ড দিয়ে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা । রানীর প্রতি প্রেম রাজার মনে এবার হিংস্রতায় পরিবর্তিত হয় । তিনি সেই মুহূর্তেই সৈন্য নিয়ে রাজকর্মচারীদের দমনে প্রবৃত্ত হন । এবং তার রোষের সামনে পরাজিত হয়ে কেউ বশ্যতা স্বীকার করে, কেউবা পালিয়ে যায় । এমন সময় রানীও কাশ্মীর কুমার সেনকে নিয়ে পথের মধ্যে পারিয়ে যাওয়া বিদ্রোহীদের বন্দী করে বিক্রমের শিবিরে এসে উপস্থিত হন । ভিন্ন রাজ্যের রাজপুত্র তার রাজ্যে বিদ্রোহ দমন করতে এসেছে শুনে রাজা ক্ষুব্ধ হন । তার সাথে দেখা করতে আসা রানীকেও তিনি শিবিরের দরজা থেকে ফিরিয়ে দেন । অপমানিত হয়ে কুমারসেন রানীকে নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান । তাকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করার জন্য বিক্রমদেব কাশ্মীর পর্যন্ত তাড়া করেন । কুমারের পিতৃব্য চন্দ্রসেন কাশ্মীর রাজ্য শাসন করতেন, বিক্রমকে বাধা দেবার জন্য কুমার চন্দ্রসেনের কাছে সৈন্য চাইলে পত্নীর পরামর্শে তিনি সৈন্য দিতে অস্বীকৃতি জানান, বরং কুমারকে বিক্রমের হাতে সমর্পণ করে কাশ্মীরের সিংহাসন নিজের জন্য নিষ্কণ্টক করে নিতে চান ।

কুমার সুমিত্রাকে নিয়ে বনে পালিয়ে যায় । বিক্রম কাশ্মীরে এসে কুমার সেনকে জীবিত বা মৃত তার সামনে নিয়ে আসতে পারলে পুরস্কৃত করবেন বলে ঘোষণা দেন । কিন্তু কাশ্মীরের প্রজারা

কুমার সেনকে অত্যন্ত ভক্তি করতো, তাই তাকে বনের মধ্যে লুকিয়ে রাখে এবং কাউকে সন্ধান দেয় না। কুমারের এক প্রতিপালক বৃদ্ধ শঙ্করের কাছ থেকে বিক্রমের লোকেরা কুমারের সন্ধান পাবার জন্য অত্যাচার করতে থাকে, প্রজাদের উপরও অত্যাচার অব্যাহত থাকে, রাজ্যজুড়ে হাহাকার শুরু হয়। এ সংবাদে কুমার নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত হন এবং রাজ্যের উপর অত্যাচার বন্ধের নিমিত্তে সুমিত্রাকে রাজি করান তার ছিন্নমুন্ডু রাজাকে ভেট দিতে।

ত্রিচুড়ের রাজকন্যা ইলা কুমারকে ভালোবাসত। তাদের বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কুমারের এরকম বিপদ দেখে ইলার পিতা এ বিয়ে ভেঙে দেন এবং বিক্রমকে পানিগ্রহণ করার আমন্ত্রণে নিয়ে আসেন। ইলা বিক্রমকে জানায় সে কুমারকে মন দিয়েছে, তাই অন্য কারো হতে পারবে না, প্রয়োজনে জীবন দিয়ে দিবেন। প্রেমের এই রূপ দেখে বিক্রম অবাক হয়ে যান। বিক্রমের মধ্যে পরিবর্তন আসে, সে কুমারকে খুঁজে এনে ইলাকে তার হাতে সমর্পণ করে তাদেরকে কাশ্মীরের সিংহাসনে উপবিষ্ট করতে চান। এমন সময় শুনতে পান কুমার আত্মসমর্পণ করতে চাইছেন। তা শুনে শঙ্কর কুমারকে ধিক্কার জানায়। নির্ধারিত দিনে এক রুদ্ধদ্বার শিবিকায় এসে সুমিত্রা সোনার থালায় কুমারের ছিন্ন মাথা বিক্রমকে উপহার দেয় এবং সাথে সাথে সুমিত্রা জ্ঞান হারিয়ে প্রাণত্যাগ করে। ভৃত্য শঙ্কর কুমারকে সাধুবাদ দিতে দিতে প্রভুর অনুগমন করে। চন্দ্রসেন সিংহাসনকে পায়ে আঘাত করে মুকুট দূরে ছুড়ে ফেলে। ইলাও ছুটে এসে প্রিয়তমের ছিন্নমাথার কাছে লুটিয়ে পড়ে।

এই নাটকের প্রথম গানটি সৈনিকের (তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)। যুবরাজের বিয়ের কথা আলোচনা করার সময় গীত। প্রথম সৈনিক তার প্রেয়সীর বর্ণনায় গেয়ে ওঠে : 'ওই আঁখি রে! / ফিরে ফিরে চেয়ো না চেয়ো না, ফিরে যাও/ কী আর রেখেছ বাকি রে!'

দ্বিতীয় গানটিও এই দৃশ্যে। কুমার যখন ইলাকে ছেড়ে যেতে চায় তখন সখীদের গান : 'যদি আসে তবে কেন যেতে চায়?/ দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়?'

এই দৃশ্যে কথা প্রসঙ্গে ইলা কুমারকে সুমিত্রার কথা বলে এবং তাকে দেখার ইচ্ছা পোষণ করে। তার মনে হয় সুমিত্রা যেন কুমারের শৈশব স্মৃতি আটকিয়ে রেখেছে। পেয়েও যেন কুমার তার না। কুমার জানায় আজ সুমিত্রা থাকলে তাকে সাজিয়ে দিত, শৈশবের কত মধুর স্মৃতি, কিন্তু আজ সে পরগৃহে পর হয়েছে। ইলা গেয়ে ওঠে : 'এরা পরকে আপন করে, আপনারে পর-/ বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর।/ ভালোবাসে সুখে দুখে,/ ব্যথা সহে হাসিমুখে,/ মরণেরে

করে চির জীবননির্ভর ।'

গানটিতে একদিকে সুমিত্রার পর হয়ে যাওয়াও ইঙ্গিত করে, আবার কুমারকেও বোঝায় । একটি বিষাদ কাতর সুর ধ্বনিত হয়েছে । যেন ক্লান্ত অবসন্ন বাণী । কুমারের জিজ্ঞাসা– কেন এ করুণ সুর, কেন দুঃখের গান? ইলা জানায়, সুখ দুঃখ বিসর্জন দিয়েই রমণীর সুখ ।

তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে সখীদের গান : 'বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে-/হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে ।/ বচন রাশি রাশি, কোথা সে যাবি ভাসি,/অধরে লাজহাসি সাজিবে ।'

মূলত গানটি সংলাপেরই একটি অংশ । এরই সাথে সখীদেরই অরেকটি গান : 'ওই বুঝি বাঁশি বাজে ।/ বনমাঝে কি মনোমাঝে?/ বসন্তবায় বহিছে কোথায়, কোথায় ফুটেছে ফুল!/ বল গো সজনী, এ সুখরজনী কোন্‌খানে উদিয়াছে-/ বনমাঝে কি মনোমাঝে?'

গান দুটিতে কুমারসেন ও ইলার ললিতলাবণ্যময় প্রেমের পটভূমিকা সৃষ্টি করেছে, গানদুটিতে তাদের মিলন যে সামনে ব্যর্থতায় পরিণত হবে তারই একটা নাটকীয় শ্লেষ ফুটে উঠেছে ।

পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে জনসাধারণের 'যমের দুয়ার খোলা পেয়ে' গানটি নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক । তবে এই অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে ইলা কণ্ঠে গাওয়া গানটি একটি নিখাদ প্রেম সংগীত : 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি/ তুমি অবসরমতো বসিয়ো ।/ আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি/ তোমায় যখন মনে পড়ে আসিয়ো ।'

কুমার বিহনে ইলার মনোভাব, স্মৃতিকাতরতা, মিলনের বাসনা, বেদনা খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এই গানে । সংগীতের মাধ্যমে এই যে চরিত্রের হৃদয়ের ভাবের প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথ তা সফলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । এখানে সংগীত প্রয়োগের সার্থকতা । গানগুলিতে বাঁশির কথা বেশ কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে । বাঁশি সাধারণত বৈষ্ণব পদাবলীর অনুষঙ্গ । যেমন 'বাজিবে সখী বাঁশি বাজিবে', 'সখী, ওই বুঝি বাঁশি বাজে', 'এরা পরকে আপন করে' গানটিতে 'বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর' ।

পঞ্চম অঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্যে কাঠুরিয়াদের 'বঁধু তোমায় করবো রাজা' গানটি কুমারসেনের অভিষেক প্রসঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে । সকলেই কুমারকে ভালোবাসে । আর তাই তারা রাজা হিসেবে কুমারকেই চায় । এই নাটকে কাঠুরিয়াদের গান হিসেবে ব্যবহৃত 'বঁধু তোমায় করব রাজা' গানটির বাণী পরিবর্তিত রূপ পায় । গানটি ছিল : 'বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে ।/ বনফুলের বিনোদমালা দেব গলে ।/ সিংহাসনে বসাইতে/ হৃদয়খানি দেব পেতে,/ অভিষেক করব তোমায় আঁখিজলে ॥' নাটকে পাঠরূপ : 'বঁধু, তোমায় করব রাজা বসে তরুতলে ।/ চক্ষের জলে ধুয়ে পা মুছাব আঁচলে

॥ / বনফুলের মালা গেঁথে দেব তোর গলে ।/ সিংহাসনে বসাইতে/ দিব এই হৃদয় পেতে,/ পীরিতি পরম-মধু দিব তোরে খেতে ।/ বিচ্ছেদেরে বেঁধে এনে ফেলব পায়ের তলে ।/ মালঞ্চ আর পুষ্প এসে ফুটবে কেয়ার ডালে ।'

দ্বিতীয় সংস্করণে দৃশ্য সংখ্যা কমে যায় । প্রথম তিনটি গান ছাড়া অন্যগানগুলি বাদ দেয়া হয় আবার ১৩০৩ এ কাব্য গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হবার সময় অধিকাংশ দৃশ্য ও গান যুক্ত করা হয় ।[২৪]

নাটকটিতে গানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় । মূলত গানগুলো ইলা ও সখীদের গাওয়া । সুকুমার সেন বলেছেন :

"প্রকৃতপক্ষে ইলা ও তার সখীদের গানগুলি মূল যে দ্বন্দ্ব-বস্তু সুমিত্রা ও বিক্রমের বিরোধ, সেই ঘটনাকে অগ্রগতি দান করেনি । কিন্তু সুমিত্রা ও বিক্রমের প্রেমের বৈপরীত্য সাধন করেছে গানগুলি । তাই 'কুমারসেন-ইলার' আখ্যায়িকা প্রধান নাট্য-কাহিনীকে ব্যাহত তো করেই নি, বরং বৈপরীত্যের বৈচিত্র্য দিয়েছে ।"[২৫]

রবীন্দ্রনাথ নানা জায়গায় নিজেই স্বীকার করেছেন 'রাজা ও রানী' রচনা হিসেবে দুর্বল আর এই কারণে এটি সংশোধন ও সংমার্জন করেও তিনি সন্তুষ্ট হননি । শেষ পর্যন্ত এই রচনাকে তিনি গদ্যনাটক 'তপতী'তে পরিণত করেন । এ নিয়ে তিনি 'তপতী'র ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন । নাটকের ৯টি গানের ৬টি গানই প্রেম, ২টি নাট্যগীতি ও ১টি বিচিত্র পর্যায়ের গান ।

এই রচনা পর্বে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি '*মানসী*' (১৮৯০) । কাব্যগ্রন্থটির 'নিস্ফল কামনা' (১৮৮৭), 'সংশয়ের আবেগ' (১৮৮৭), 'বিচ্ছেদের শান্তি' (১৮৮৭), 'নিস্ফল প্রয়াস' ও 'হৃদয়ের ধন' (১৮৮৭) প্রভৃতি কবিতার অন্তর্নিহিত ভাববস্তু এ-পর্বের নাটকে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় । এ-সময়কার কবিতাগুলোতে মানব হৃদয়ের অতৃপ্তি ও অসন্তোষের যে বেদনা, তাই প্রকাশিত হয়েছে 'রাজা ও রানী'তে । রবীন্দ্রনাথের '*মানসী*' কাব্যগ্রন্থের কাব্য রচনার কবি মনোভাবের বিকাশ ও পরিণত হবার কালের রচনা এই নাটকটি । তিনি সেইসময় গাজীপুরে ছিলেন । '*মানসী*'র সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> "আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী । পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূলহস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এলো মনোরাজ্যে । এই আবহাওয়ায় আমার কাব্যরচনার একটা নতুন পর্ব আপনি প্রকাশ পেল । আমার কল্পনার উপর নূতন পরিবেষ্টনের প্রভাব বার বার দেখেছি । এইজন্যেই আলমোড়ায় যখন ছিলুম আমার লেখনী হঠাৎ নতুন পথ নিল 'শিশু' কবিতায়, অথচ সে-জাতীয় কবিতার কোনো প্রেরণা কোনো

উপলক্ষ্যই সেখানে ছিল না। পূর্বতন রচনাধারা থেকে স্বতন্ত্র এ একটা নূতন কাব্যরূপে প্রকাশ। 'মানসী'ও সেই রকম। নূতন আবেষ্টনে এই কবিতাগুলি সহসা যেন নবদেহ ধারণ করল। পূর্ববতী 'কড়ি ও কোমল' - এর সঙ্গে এর বিশেষ মিল পাওয়া যাবে না। আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। 'মানসী'তেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।"[২৬]

নাটক রচনা ও সংগীত রচনার ক্ষেত্রেও তাই– নতুন যুগের সূচনা হলো।

৯. বিসর্জন (১৮৯০)

মূলত 'রাজর্ষি' উপন্যাসের বিষয়বস্তুগত চেতনা 'বিসর্জন' নাটকটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রথম ১৮ পরিচ্ছদ থেকে 'বিসর্জন' নাটকের গল্প সৃষ্টি হয়েছে। তবে ৩২, ৩৩, ৩৬ ও ৩৭ পরিচ্ছদ থেকে নক্ষত্ররায়ের বিদ্রোহ নাটকের কাহিনিতে গৃহীত হয়েছে। চরিত্র সৃষ্টির দিক থেকে বিসর্জনের সঙ্গে রাজর্ষির গোবিন্দ্রমানিক্য, নক্ষত্ররায়, রঘুপতি, জয়সিংহ চরিত্রের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তবে গুণবতী, অপর্ণা, নয়নরায়, চাঁদপাল চরিত্র 'বিসর্জনে' কবির নতুন সৃষ্টি। রানী গুনবতীর আক্ষেপ তার কোন সন্তান নেই। যে ভিখারী পেটের দায়ে সন্তান বিক্রি করে, তাকে সন্তান দেন, যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগে মেরে ফেলে, তার গর্ভে সন্তান আসে অথচ তিনি রানী, সোনার পালংকে বসে আছে, হাজার হাজার তার সৈন্য সামন্ত, দাসী কিন্তু তিনি সন্তানহীনা। রানী রাজপুরোহিত রঘুপতিকে জিজ্ঞেস করেন, কি করলে সন্তান লাভ হবে? তিনি মানত করেন এ বৎসর তিনি নিজে বলি দেবেন এবং প্রতি বছর একশ মহিষ ও তিনশ ছাগল বলি দেবেন যদি সন্তান হয়।

মন্দিরে একটি ছাগশিশু বলির জন্য আনা হয় এবং ভিখারী অপর্ণা কাঁদতে থাকে শিশুটির জন্য। সে সেটি তার শিশু বলে দাবি করে। সেই ছাগশিশুর বলির রক্ত দেখে এবং অপর্ণার কথায় গোবিন্দ্যমানিক এবং জয়সিংহের মধ্যে পরিবর্তন আসে। জয়সিংহ বলে ওঠে : 'আজন্ম পূজিনু তোরে, তবু তোর মায়া/ বুজিতে পারিনে। করুণায় কাঁদে প্রাণ/ মানবের, দয়া নাই বিশ্বজননীর!'

রাজা পশুবলি নিষিদ্ধ করে দেন। তিনি বলেন, দেবী স্বপ্নে এসে বলে গেছেন, তিনি বলির রক্ত পান করেন না। আরো বলে গেছেন, এ পাপ, জীবরক্ত তার সহে না। এ কথায় রাজ পুরোহিতসহ সকলেই ক্ষুব্ধ হয়।

তৃতীয় দৃশ্যে জয়সিংহ একা মন্দিরে। মায়ের সামনে বসেও তার একাকিত্ব অনুভব হয়। এরমধ্যে

গান ভেসে আসে : 'আমি একেলা চলেছি এ ভবে/আমায় পথের সন্ধান কে কবে?/ ভয় নেই, ভয় নেই, যাও আপন মনেই/যেমন একেলা মধুপ ধেয়ে যায়/ কেবল ফুলের সৌরভে।'

রঘুপতি জয়সিংহকে জানায়, রাজা মায়ের পূজায় পশুবলি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং এই বলে তাকে রাজি করায় 'এ প্রাণ থাকিতে অসম্পূর্ণ নাহি রবে জননীর পূজা'। অন্যদিকে রানীর মানত করা বলির ছাগল ফিরিয়ে দেয়া হয় মন্দির থেকে। রানীর জিজ্ঞাসায় রাজা জানায়, জননী এসে না করে গেছে। রানী রাজাকে ফিরিয়ে দিতে উদ্দ্যত হলে রাজা জানায়, যখন রানী স্মরণ করবে তখনই ফিরে আসবে। তখন রানী রাজার কাছে মাফ চায় এবং ফিরিয়ে আনে। আবার ফিরিয়ে দেয়।

প্রথক অঙ্কের ৫ম দৃশ্যে মন্দিরে সকলের প্রবেশ। মন্দিরে পূজা শুরু হয়। জয়সিংহ পূরবাসীদের ডাক দেয়। নৃত্য শুরু হয় শ্যামা সংগীতের সাথে : 'উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে।/ আমরা নৃত্য করি সঙ্গে।/ দশ দিক আঁধার করে মাতিল দিক্বসনা,/ জ্বলে বহ্নিশিখা রাঙা-রসনা,/ দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে।/ কালো কেশ উড়িল আকাশে,/ রবি সোম লুকালো তরাসে।/ রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে,/ ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে।'

কালীর ভয়ঙ্কর রূপ অবলম্বনে অসামান্য একটি গান এটি, যা নাটকের আবহ রচনায় সাহায্য করেছে। গানের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় পটভূমি ও পরিস্থিতির আবহমন্ডল। 'বিসর্জন' নাটকে পুরবাসীগণের গান 'উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে' দর্শকদের মনে সঞ্চার করে রক্তপিপাসু ত্রিভুরেশ্বরীর পূজার মঞ্চ পরিবেশ। এরমধ্যে সৈন্য আসতে দেখা যায়। সকলে মনে করে রাজা লোক পাঠাচ্ছে, কিন্তু দেখা যায় রানী বলির ছাগশিশু পাঠিয়েছেন। বলি আরম্ভ করার আগেই রাজার প্রবেশ করে বলি দিতে বাধা দেন। সেনাপতি, রাজপুরোহিত সকলেই বলির পক্ষে। কিন্তু কোন অনুনয়ই রাজাকে রাজি করাতে পারে না।

মন্দিরে রঘুপতি ছক আঁকে। রাজার ছোট ভাই নক্ষত্ররায়কে ডেকে বলে, দেবীর স্বপনে সে দেখেছে নক্ষত্ররায় রাজা হয়েছে কিন্তু এর জন্য রাজরক্ত লাগবে, রাজা গোবিন্দ মানিক্যের রক্ত। বধ করে রাজাকে মন্দিরে নিয়ে আসতে বলে। জয়সিংহ এ কথা শুনে জানায়, ভাইয়ের হাতে ভাইকে সে খুন হতে দেবে না। কিন্তু রঘুপতি তাকে বিশ্বাস করাতে বাধ্য করে যে দেবী রাজরক্ত চায়। এ দেবতার আজ্ঞা, পাপ নয়। জয়সিংহ এই পুণ্যি অর্জন করতে চাইলে রঘুপতি তাকে হারাতে পারবেন না বলে জানায়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে অপর্ণার প্রবেশ গান গাইতে গাইতে : 'ওগো পুরবাসী/আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।' সে এসে জয়সিংহকে খোঁজে। কিন্তু রঘুনাথ তাকে ফিরিয়ে দেয়। তৃতীয় দৃশ্যে মন্দিরের সম্মুখ পথে জয়সিংহ। পাপপুণ্যের হিসাব নিকাশে সে হতবিহ্বল। গান ধরে : 'আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে।/আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে সঙ্গে তোদের নিয়ে যারে।'

অপর্ণার সংস্পর্শে তার মনে পরিবর্তন এসেছে। রঘুপতি অপর্ণাকে তাড়িয়ে দিতে বলে। প্রজারা মাতা দর্শনে এলে রঘুপতি দেবীর মুখ ঘুরিয়ে রাখে, জানায় দেবী রাগ করেছেন। অপর্ণা পুনরায় এসে দেবীর মুখ ঘুরিয়ে দেয়। সকলে হর্ষধ্বনি করে ওঠে। এবং গেয়ে ওঠে : 'থাকতে তো পারলি নে মা, পারলি কই?/ কোলের সন্তানেরে ছাড়িলি কই?/ দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি বসে ক্ষণিক রোষে,/ মুখ ফিরালি শেষে, অভয় চরণ কাড়লি কই?'

নক্ষত্ররায় সিংহাসনের লোভে রানী ও রঘুপতির কথায় রাজি হয়ে রাজাকে বলি দিয়ে চায়, মন্দিরে অপেক্ষা করে। কিন্তু রাজা বুঝতে পেরে অতর্কিতে এসে তাদের ধরে ফেলে। নক্ষত্ররায়কে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেন এবং রঘুপতিকে দন্ড দেন। নক্ষত্ররায় ফিরে এসে রাজ্যে হামলা করে, অন্যদিকে রঘুপতি রাজরক্তের জন্য অস্থির হয়ে যায়। জয়সিংহ জানায় সে রাজবংশের পুত্র, তার রক্ত রাজরক্ত। অপর্ণা এসে জয়সিংহকে খুঁজতে থাকে। রঘুপতি ফিরিয়ে দেয় এবং জয়সিংহ ফিরে এসে বুকে ছুরি চালিয়ে রক্তে মন্দির ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু জয়সিংহের এই বিসর্জন রঘুপতি মেনে নিতে পারে না এবং প্রতিমাকে গোমতীর জলে নিক্ষেপ করে। রানী গুনবতী এসে দেখেন দেবী নেই। রাজাও এসে জিজ্ঞেস করেন, দেবী কোথায়, এতো রক্ত কেন? রঘুপতি উত্তর দেন : 'এই শেষ পুণ্যরক্ত এ পাপ-মন্দিরে।/ জয়সিংহ নিবায়েছে নিজ রক্ত দিয়ে/হিংসারক্তশিখা।'

জয়সিংহের এই বিসর্জনে রানীর মনেও পরিবর্তন আসে। সংস্কারের মোহ দূর করে প্রেমময় নারীতে রূপান্তরিত হন। নাটকের পরিশেষে রঘুনাথের উপলব্ধি– 'পাষাণ ভাঙিয়া গেল- জননী আমার, এবারে দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা! জননী অমৃতময়ী!'

নাটকটি সম্পর্কে *রবীন্দ্র রচনাবলী* পর্ব ১৬-এর গ্রন্থপরিচয়ে সাহানা দেবীকে উদ্ধৃত করে বলা হয়:

> "সেবার কলকাতায় যতদূর মনে পড়ে ১৯২৩ সালের আগস্ট মাসে হবে বোধ হয়, এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটক হয় চারদিন ধরে। জয়সিংহের ভূমিকায় নেমেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আর বিশিষ্ট ভূমিকাগুলিতে নেমেছিলেন রঘুপতি-দিনুদা (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর),

অপর্ণা-কুমারী রানু অধিকারী (পরে লেডি রানু মুখার্জি) ও কুমারী মঞ্জু ঠাকুর (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠাকন্যা, ইনি একদিনই অভিনয় করেছিলেন), গোবিন্দমাণিক্য-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নক্ষত্র রায়-তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র)। গোটা দশেক গান দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাকেও এরমধ্যে ঢুকিয়ে দেন। এ দশটি গানের মধ্যে 'বিসর্জন'-এর জন্যে আগেকার রচিত গান ছিল তিনটি। এই তিনটি গান হচ্ছে 'ওগো পুরবাসী', 'আমি একেলা চলেছি এ ভবে' আর 'থাকতে আর তো পারলিনে মা পারলিনে মা পারলি কৈ'। এই তিনটি গান ছাড়াও কবি পুরানো গান থেকে বেছে দেন 'তিমির দুয়ার খোল', 'দিন ফুরালো হে সংসারী' এই গান দুটি। নতুন রচনা করে দেন আরও পাঁচটি গান। সেগুলি হচ্ছে 'ও আমার আঁধার ভালো', 'কোন ভীরুকে কে ভয় দেখাবি', 'আঁধার রাতে একলা পাগল', আমার যাবার বেলা পিছু ডাকে' ও 'জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি হে নমি নমি'। শেষের এই পাঁচটি গান কবি আমায় শেখান তাঁদের জোড়াসাঁকোর পুরানো বড় বাড়িতে (৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন) দোতলায় সামনের দিকের বসবার ঘরে বসে। প্রতিটি গান তিনি নিজের হাতে লিখে দেন।"[২৭]

সাহানা দেবী জানান, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কয়েকটি গানের সঙ্গে 'জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি হে নমি নমি' গানটিও শেখান জোড়াসাঁকোর পুরানো বড় বাড়িতে দোতলায় সামনের দিকে বসবার ঘরে এবং প্রতিটি গান তিনি নিজের হাতে লিখে দেন কারণ কবি সোৎসাহে তাঁকে 'বিসর্জন' নাটকের অনুষ্ঠানের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। নাটকটির দুটি সংস্করণে গানের পর্যায় বিভাগে দুই ধরনের গান দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম সংস্করণে নাট্যগীতি ৩টি, বিচিত্র ২টি ও ১টি পূজা পর্যায়ের গান রয়েছে। অন্যদিকে ২য় সংস্করণে পূজা, বিচিত্র, প্রেম, নাট্যগীতি ও গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্য পর্যায়ের গান রয়েছে।[২৮]

একবার রঘুপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অভিনয় মুগ্ধ করেছিল নাট্যবিদ্বেষী কৃষ্ণকুমার মিত্রকে। তিনি ছিলেন কট্টর ব্রাহ্ম এবং সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক। অনেক ব্রাহ্মর মতন তিনিও মঞ্চে উঠে অভিনয় করাকে নীতিসংগত মনে করতেন না। কিন্তু জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী বলেন, একবার বিসর্জন নাটকে তিনি দর্শক ছিলেন। সেবার সংবাদ এলো ত্রিপুরার মহারাজ কলকাতায় আসবেন, তার অভ্যর্থনায় 'সঙ্গীত সমাজ' এ অভিনয়ের আয়োজন করে। ত্রিপুরার মহারাজার সাথে রবীন্দ্রনাথের গভীর সৌহার্দ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নেমেছিলেন রঘুপতির ভূমিকায়। অভিনয়ের দিন মহারাজাকে অভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ রচিত গানটি

Dhaka University Institutional Repository

গাওয়া হয় : 'রাজ অধিরাজ তব ভালে জয়মালা ।/ ত্রিপুর পুরলক্ষ্মী বহে তব বরণডালা ।'

'বিসর্জন'র বর্তমান সংস্করণে মোট ৫টি গান রয়েছে। নাটকের প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের শ্যামা সংগীত 'উলঙ্গিনী নাচে রণ রঙ্গে'- এর মাধ্যমে দেবীর ঐশ্বর্যরূপের প্রকাশ পেয়েছে। তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে প্রজাদের কণ্ঠে 'থাকিতে পারিলাম না মা' গানটির মধ্যে প্রজাদের উল্লাসের মধ্যে দেবীর প্রসন্নময়ী রূপের আভাস পাওয়া যায়। অপর তিনটি গানের একটি জয়সিংহের এবং বাকি দুইটি অপর্ণার কণ্ঠে। ড. আলো সরকার বলেন :

> "নাট্য সংস্করণের পরিবর্তন এবং অভিনয়ের দাবীতে নাটকে সংযোজিত গানগুলির যথেচ্ছ বর্জন ও সংযোজন পদ্ধতি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, এ পর্বের নাট্যসঙ্গীতগুলি শুধুমাত্র নাটকের বহিরঙ্গের শোভা বিস্তারকারী, নাটকের সামগ্রিক ভাবরূপটি সঙ্গীতের আঁধারে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়নি। নাটকের দৃষ্টিকোণ থেকে যথাযথ বিচার করলে দেখা যায়, নাটকে যুক্ত গান নাট্যকারের আপন ইচ্ছায় গ্রহণ বা বর্জন সম্ভব নয়। কারণ নাট্যসঙ্গীতের উদ্দেশ্যই হলো নাটকে সুপ্রযুক্ত হয়ে নাট্যগীতি ও দ্বন্দ্বকে তীক্ষ্ণ ও দ্রুতগামী করে তোলা। 'বিসর্জন' নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সংস্করণের সংযোজিত এই পাঁচটি সঙ্গীত নাটকীয় তাৎপর্যমন্ডিত।"[২৯]

নাটকে অপর্ণার কণ্ঠের গানগুলো প্রেমধর্মী। সুরগুলোতে করুণ ব্যাকুলতার আভাস। অপর্ণা প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় একটি মন্তব্য করেছেন : "অপর্ণা একটি গানের সুর, তাহার সমস্ত চরিত্রের মধ্যে যে জিনিসটি ফুটিয়াছে তাহা একান্তই গীতধর্মী। 'বিসর্জনে'র মত নাটকেও এই গীতধর্ম সমস্তকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে,...সমস্ত নাটকটির প্রত্যয় প্রকাশের ভঙ্গিমার মধ্যেও।"[৩০]

বিসর্জন রচিত হয়েছিল *মানসী* কাব্যগ্রন্থ রচনার শেষ পর্যায়ে। এ সময় কবির মনে অনন্ত প্রেমের এক অনুভব কবি চিত্তকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছিল, '*মানসী*'র ঋতু অবসিত হয়েছে। *মানসী*র প্রকাশ আগেই হয়ে গেছে। তাঁর মনের অবচেতনায় গোপনে *সোনার তরী*'র ঋতু আসছিল। তিনি এ সময় দেহী প্রেমের থেকে দেহহীন প্রেমের সম্পূর্ণতায় বিশ্বাসী ছিলেন। এই সময়কালে তার রচনা *মানসী* কাব্যের কয়েকটি কবিতা - 'ধ্যান', 'পূর্বকালে', 'অনন্তপ্রেম', 'ক্ষণিক মিলন', 'আত্মসমর্পণ' ইত্যাদি।

এ সময়কালীন নাটকের গানে প্রেম, নাট্যগীতি, গীতিকাব্য, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য এবং বিচিত্র পর্যায়ের গান রয়েছে। বিসর্জন নাটকে প্রথম পূজা পর্যায়ের গান পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

১৮৯১–১৯০০ সাল পর্যন্ত রচিত নাটক

১৮৯১ সাল থেকে ১৯০০ সাল সময়কালে রবীন্দ্রনাথ 'প্রহসন' নাটক রচনা করেন এবং 'সাংকেতিক' নাটক রচনা শুরু করেন যা বাংলা নাটকের ইতিহাসে বিষয়বস্তুর আঙ্গিকে এক নতুন অধ্যায়। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' কিছুটা সাংকেতিক নাটকের আভাস দিলেও এই পর্যায়ে তিনি পুরোপুরি সাংকেতিক নাটক রচনা করেন। এসময়কার রচনা *সোনার তরী* (১৮৯৪), *চিত্রা* (১৮৯৬), *চৈতালি* (১৮৯৬) *কল্পনা* (১৯০০) ও *ক্ষণিকা* (১৯০০) কাব্যগ্রন্থ। কবির পরিণত যৌবনের যথার্থ গীতিকবিতা এসময় রচিত হয়। অনেকেই এই সময়কালকে রবীন্দ্র-সাধনার সমৃদ্ধতম যুগ বলে আখ্যায়িত করেন। '*সোনার তরী*' ও '*চিত্রা*'রও বেশ কয়েকটি কবিতা তিনি গানে রূপান্তরিত করেন। ড. আলো সরকার বলেছেন, "'সোনার তরী'তে (১৮৯৪) সুগভীর মর্ত্ত্য মমতার অভ্যুদয় ও সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকর্ষণ, 'চিত্রা' (১৮৯৬) কাব্যে সৌন্দর্য উপলব্ধির পূর্ণতা ও মর্ত প্রীতির সম্পূর্ণতার মাঝে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা তত্ত্ব অভিব্যক্ত হয়েছিল। কবিমনের চঞ্চলতা এক নিবিড় ভাবসঙ্গতিতে কেন্দ্রীভূত হল আধ্যাত্মিক পর্বে, ভগবৎ স্বরূপ উপলব্ধির আভাসে।"[৩১] 'সোনার তরী' প্রসঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাহিরের দরজা বন্ধ করে। সেগুলো হয়তো অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষার আবেগ, কিংবা রূপরচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এক জাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সাথে মিলিয়ে নিয়ে।... যেমন সোনার তরী কবিতাটি।"[৩২]

১. চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২)

'চিত্রাঙ্গদা' নাটকটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিবৃত। 'মানসী' (১৮৯০) কাব্যে যে অনন্ত প্রেম ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য চেতনা ব্যক্ত হয়েছে তারই নাট্যপ্রয়াস 'চিত্রাঙ্গদা'। নাট্যকাব্য হিসেবে 'চিত্রাঙ্গদা'র আত্মপ্রকাশ ঘটে ১২৯৯ বঙ্গাব্দে, এতে কোন গান নেই এবং নৃত্যনাট্য হিসেবে রূপান্তরিত হয় তার ৪৪ বছর পরে। নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'র বিজ্ঞপ্তিতে এইরূপ উল্লেখ আছে : "এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। এ কথা মনে রাখা কর্তব্য যে এইজাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূরে অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য ও ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে পাখীর

প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপর চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয় ।"৩৩ নাটকটি সম্পর্কে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

২. গোড়ায়গলদ (১৮৯২)

'গোড়ায় গলদ' প্রহসনটিতে গান ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও রবীন্দ্রনাথ তা করেননি । মুদ্রিত গ্রন্থে বিচিত্র পর্যায়ের বাউলের সুরে একটি মাত্র গান রয়েছে– 'ওগো, তোমরা সবাই ভালো' । এই গানটি সংযোজনের ইতিহাস কৌতুকপ্রদ । রবীন্দ্রনাথ রচিত এই নাটকটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ভারত সংগীত-সমাজে যখন অভিনীত হয় তখন পরিচালক রবীন্দ্রনাথ অভিনেতাদের গভীর রাত পর্যন্ত যথাযথ তামিল দিতেন । সংগীত, নৃত্য ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কড়া দৃষ্টি থাকতো । পূর্ণ সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত বারবার করাতেন । এই নাটকে চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন শ্রীশচন্দ্র বসু । শেষ দৃশ্যে গায়ক চন্দ্রবাবুর ভূমিকাভিনেতা শ্রীশচন্দ্রের তরফে কিভাবে নির্দেশক রবীন্দ্রনাথ থেকে বাধ্য হয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল তার বিবরণ দিয়ে খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন :

> "চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় শেষ গানটি শ্রীশবাবুর গেয় ছিল কিন্তু তিনি গাইতে অক্ষম থাকায় 'রবিবাবু' নিজ নামেই স্টেজে বাহির হইয়া উহা গাহিয়া দেন । তাঁহার অবতরণের জন্য নাটকীয় কথোপকথন কিছু যোগ করিয়া দেওয়া হয় । 'চন্দ্রবাবু' তাঁহার বন্ধুদের রবিবাবুর গান শোনার জন্য একটু বসিতে বলেন, কারণ সেইদিনই তাঁহার দেখা করিতে আসিবার কথা আছে । পরে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশের পর সকলের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় করাইয়া দেয়া হয় ও তাঁহাকে গাহিতে অনুরোধ করায় তিনি এই গানটি পরিবেশন করেন ।"৩৪

এই নাটকে গান ব্যবহারের সুযোগ রবীন্দ্রনাথ তেমন গ্রহণ করেননি । নাটকের শেষ দৃশ্যে একটি মাত্র গান আছে সমবেত কণ্ঠে । বাউল সুরের গানটি চন্দ্র শুরু করলেও পরে সকলে মিলে গায় : 'যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক তোমরা সবাই ভালো !/ আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো ।/ কেউ বা অতি জ্বলজ্বল, কেউ বা ম্লান ছলছল,/ কেউ বা কিছু দহন করে, কেউ বা স্নিগ্ধ আলো ।' (পর্যায়-বিচিত্র)

"গোড়ায় গলদ-এর প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের শেষে চন্দ্রকান্তের উক্তি '...একটি ছিঁচ কাঁদুনে দুধের মেয়ে বিয়ে করে এনে মানুষ করতে বসবে, সে কিছুতেই মনে করতে পারিনে'-র পর পাণ্ডুলিপিতে ছিল : 'আমার সেই বদন অধিকারীর গানটা মনে পড়ছে- এখনো তারে চোখে

Dhaka University Institutional Repository

দেখিনি - শুধু বাঁশি শুনেছি'- এরপর গীতবিতানের পাঠ থেকে সামান্য পার্থক্য-সহ গানটি সম্পূর্ণ লেখা হয়েছে। গানটি গ্রন্থে বর্জিত হলেও এই সুযোগে রচনার উপলক্ষ্যটি জানা যাচ্ছে।"[৩৫]

১৩০০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত 'গানের বহি' ও 'বাল্মীকিপ্রতিভা' গ্রন্থে গানটি প্রথম মুদ্রিত হয়। 'মানসী' কাব্যের প্রায় দুই বছর পর এই নাটকটি রচিত।

৩. বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৬)

১৮৯৭ সালে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসনটি প্রথম অভিনীত হয়। অভিনয়ে ছিলেন কেদার- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবিনাশ- নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ, তিনকড়ি- অবনীন্দ্রনাথ। এতে একটি গানও নেই শুধুমাত্র বৈকুণ্ঠ চরিত্রের মধ্য দিয়ে তার সংগীত-প্রীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

নাটকটির তৃতীয় দৃশ্যে বিপিনের চরিত্রে একছত্রের গান আছে 'ভাবতে পারিনে পরের ভাবনা'।

কাব্যনাট্য রচনার পর রবীন্দ্রনাথ এই প্রহসন নাটকগুলো রচনায় মনোনিবেশ করেন। বৈকুণ্ঠের খাতা নাটকে রবীন্দ্রনাথ কেদারার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছদ

১৯০১–১৯১০ সাল পর্যন্ত রচিত নাটক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এসময়কার রচিত কাব্যগ্রন্থ *নৈবদ্য* (১৯০১), *খেয়া* (১৯০৬) এবং *গীতাঞ্জলি* (১৯১০)। এসময় রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। নাটকের বা নাটকের গানের বিষয়বস্তু ও কবিতার ধারায় তফাত দেখা যায়। দুটি ভিন্ন ধারায় তা প্রবাহিত হয়। তবে গীতাঞ্জলির যুগ থেকে আবার কবিতার ও গানের ধারা পাশাপাশি বাহিত হয়।

১. হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭)

'হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক' সংলাপময় রম্যরচনা। এটি কয়েকটি নাটকের সমন্বয়। এরমধ্যে রয়েছে :

খ্যাতির বিড়ম্বনা

হাস্যকৌতুক (১৯০৭) প্রহসন সংগ্রহে সংকলিত ছোট প্রহসন 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' নাটকটি মাঘ ১২৯২ সালে 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি 'হেঁয়ালি-নাট্য' হিসেবে মুদ্রিত।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দুকড়ি দত্ত-র একটি স্তুতি গান আছে। 'ইমন কল্যাণ' রাগে গানটি হলো : 'জয় জয় দুকড়ি দত্ত/ ভুবনে অনুপম মহত্ব।' গান-হিসেবে উল্লিখিত হলেও গীতবিতান - এ স্থান পায়নি। কোষগ্রন্থে একটি সুরহীন গীতিকবিতা হিসেবে গানটি সংকলিত হয়েছে।

বিনি পয়সার ভোজ

ব্যঙ্গকৌতুক এর অন্তর্গত প্রহসন 'বিনি পয়সার ভোজ'-এর একটি চমৎকার কৌতুক সংগীত হচ্ছে : 'যদি জোটে রোজ/ এমন বেশি পয়সার ভোজ/ ডিশের পর ডিশ/ শুধু মাটন কারি ফিশ/ সঙ্গে তারি হুইস্কি সোডা দু-চার রয়াল ডোজ।' (পর্যায় - নাট্যগীতি)

বশীকরণ

ব্যঙ্গকৌতুকের অন্তর্গত 'বশীকরণ' নাটিকায় গান আছে দুটি : 'আমি কী বলে করিব নিবেদন' (পূজা পর্যায়) ও 'এবার সখী সোনার মৃগ দেয় বুঝি দেয় ধরা' (প্রেম পর্যায়)। হাস্যকৌতুকের মধ্যে 'আর্য ও অনার্য', 'সূক্ষ্মবিচার', 'গুরুবিচার' প্রভৃতি নাটকে এই নব্যহিন্দু আন্দোলনের প্রতি কবির নিরাসক্ত মনোভাবটি প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রহসনগুলো রচনা করার সময় 'কবি

Dhaka University Institutional Repository

কাহিনী'র গুরগম্ভীর নাট্যকবিতাগুলো রচনা করেন।

২. শারদোৎসব (১৯০৮)

'শারদোৎসব' ঋতুনাট্যে বিশ্বজগৎ আনন্দের ঋণ পরিশোধ করছে, এই ভাবনির্যাসটি সংগীতের মাধ্যমে আভাসিত হয়েছে। এটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাংকেতিক নাটকও বলা যায়। নাটকটির শুরুতেই ছিল একটি নান্দী : 'শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায়/ অনন্ত সৌন্দর্যধারে যাঁহার আনন্দ বহি যায়/ সেই অপরূপ, সেই অরূপ, রূপের নিকেতন/ নব নব ঋতুরসে ভরে দিন সবাকার মন।/ প্রফুল্ল শেফালি কুঞ্জ যাঁর পায়ে ঢালিছে অঞ্জলি/ কাশের মঞ্জরীরাশি যাঁর পানে উঠিছে চঞ্চলি/ স্বর্ণদীপ্তি আশ্বিনের স্নিগ্ধ হাস্যে রসময়/ নির্মল শারদরূপে কেড়ে নিল সবার হৃদয়।'

শারদোৎসবের জন্য নান্দী পদ্যটি গ্রন্থে না থাকলেও একটি নান্দী গান শারদোৎসবের প্রতিপাদ্যটিকে জানিয়ে দেয়। গানটি কে বা কারা গাইছে তার কোন উল্লেখ নেই। গানটি সম্মিলিত না একক কণ্ঠে গাওয়া হবে কিংবা পর্দা উঠার আগে না পরে গাওয়া হবে, সেই সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু নেই। ভূমিকা সংগীতটি হচ্ছে : 'আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে/ দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি, / আকাশেতে সোনার আলোয়/ ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।'

প্রথম দৃশ্যে শরতের ছুটিতে বালকদের গান : 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে/বাদল গেছে টুটি -/ আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,/আজ আমাদের ছুটি।'

গানটিতে রয়েছে পুরোপুরি ছুটির আমেজ। তারা কি করবে বুঝতে পারছে না, কখনো চাইছে মাঠে ছুটে বেড়াতে, কখনো বা কেয়া পাতার নৌকা তাল দিঘীতে ভাসাতে চাইছে, কখনো বা বাঁশি বাজিয়ে রাখাল ছেলের সাথে মাঠে গরু চরাতে চাইছে, আবার কখনো বা চাঁপার বনে লুটোপুটি করে ফুলের রেণু গায়ে মাখতে চাইছে। তারা বেরিয়েছে ছুটির আনন্দের সন্ধানে। সে আনন্দ আছে ঋণশোধের সৌন্দর্যে। কবি লিখেছেন : "নব ঋতুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীয় পরিয়া চারিদিক হইতে সাড়া দিতে থাকে, তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে– সেই হৃদয়ে যদি কোন রং না লাগে, কোন গান জাগিয়া না উঠে, তাহা হইলে মানুষ সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।"[৩৬]

কিন্তু তাদের এই হইচইয়ে লক্ষেশ্বরের ঘর থেকে ছুটে আসে এবং ঠাকুরদার জিজ্ঞেসে জানায় হিসাব নিকাশে ভুল হয়ে যাচ্ছে তার। সেজন্য ঠাকুরদাদা তাদের এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চাননতলার মাঠে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে জানায়। বালকেরা তাকে ঘিরে নাচতে থাকে, গল্পের আবদার করে, আরেকজন বটতলায় ঠাকুর্দার পাঁচালি শুনতে চায়, কেউবা পারুলডাঙ্গায় যেতে চায়।

এরমধ্যে উপনন্দ প্রবেশ করে এবং জানায় তার প্রভু বীণাবাদক সুরসেনের মৃত্যু হয়েছে। যেহেতু লক্ষেশ্বরের কাছে তার প্রভুর ঋণ রয়েছে, সেই ঋণ শোধ করার জন্য সে এখানেই থাকতে চায় এবং পুঁথি নকল করে টাকা জমিয়ে ঋণশোধ করবে। এইদিকে সকলে বেতসিনীর তীরে আছেন শুনে লক্ষেশ্বরের চিন্তা শুরু হয়, কারণ সেখানে তার গজমোতির কৌটা লুকানো। উপনন্দকে কাজ দিয়ে পাঠিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় দৃশ্যে বেতসিনীর তীরে বসে ঠাকুরদাদা এবং বালকগণ গান গাইছে : 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়/ লুকোচুরি খেলা।/ নীল আকাশে কে ভাসালে।/ সাদা মেঘের ভেলা!'

ঠাকুরদাকে দলে টানার জন্য সকলের মধ্যে টানাটানি শুরু হয়। এরমধ্যে সন্ন্যাসী অপূর্বানন্দ প্রবেশ করেন। বালকেরা তাকে জানায় তারা সবাই তার চেলা হবে এবং তিনি জানান সবাই শিশু সন্ন্যাসী সাজুক, তিনি হবেন বুড়ো চেলা। সন্ন্যাসী আরো বলেন তিনি ছাত্র, পুঁথিবিদ্যা সব পোড়ানোর জন্য বের হয়েছেন, তার পিছনে গুরুমশায় তাড়া করে বেড়িয়েছেন। উপনন্দকে গাছের নিচে পুঁথির মধ্যে ডুবে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, কে সে? সবাই তাকে খেলতে ডাকে কিন্তু কাজ এখনো বাকি তাই সে রাজি হয় না। ছুটির দিনে তাকে কাজ করতে দেখে সকলেই তার পুঁথিগুলো লিখে দেবে বলে সাহায্য করতে বসে যায়। সকলেই আবদার করে পুঁথিলেখা শেষ হলে উপনন্দকে নিয়ে নৌকা-বাইচ করতে যাবে। ঠাকুরদাদা গান ধরেন : 'আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান/ দাঁড় ধরে আজ বোস্ রে সবাই, টান্ রে সবাই টান্।'

সন্ন্যাসী ঠাকুরদাকে বলে দুঃখ নিয়ে টানাটানি না করে শরৎ-প্রভাতের মান রাখার জন্য একটি গান ধরবেন। সন্ন্যাসী গেয়ে ওঠে : 'তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ/ দুখের অশ্রুধার।/ জননী গো, গাঁথব তোমার/ গলার মুক্তার হার।/ চন্দ্র সূর্য পায়ের কাছে/ মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,/ তোমার বুকে শোভা পাবে আমার/ দুখের অলংকার।/ ধন ধান্য তোমারি ধন,/ কী করবে তা কও।/ দিতে চাও তো দিও আমায়,/ নিতে চাও তো লও।'

এই গানটির ভেতর ঋণশোধের তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছেন। তাই এটি শারদোৎসবের তত্ত্বসংগীত

হিসেবে দাঁড়িয়েছে। উপনন্দ থেকে তার প্রভু বীণাচার্য সুরসেনের নাম শুনে সন্ন্যাসী খুব আফসোস করেন এবং জানায় তার বীণা শোনার জন্য এ দেশে তিনি এসেছিলেন। ঠাকুরদাদা জানায় এখানকার রাজা কোনদিন সুরসেনকে ডাকেনি, চোখেও দেখেননি, তিনি কিভাবে চেনেন। সন্ন্যাসী জানায় সম্রাট বিজয়াদিত্যর সভায় সুরসেনের বাজনা শুনেছেন তিনি। রাজা তাকে রাজধানীতে রাখতে অনেক চেষ্টা করেও বিফল হন। ঠাকুরদা জানায় রাজাকে তারা চক্রবর্তী সম্রাট বলে। উপনন্দের সাথে সুরসেনের সম্পর্ক কি জিজ্ঞেস করলে জানতে পারে ছোট বয়সে তার বাবা মারা গেলে সে নিজ দেশ ছেড়ে এই নগরে আসে এবং শ্রাবণ মাসের বৃষ্টির দিনে মন্দিরের এক কোনে দাঁড়ালে পুরোহিত নীচ জাত বলে তাকে তাড়িয়ে দেন। সেখানে বসে তার প্রভু বীণা বাজাচ্ছিলেন এবং তখন তিনি বাজনা ছেড়ে এসে ঘরে নিয়ে যায়। উপার্জনের জন্য তাকে বীণা বাজানো না শিখিয়ে রং দিয়ে চিত্র করে পুঁথি লিখতে শিখিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী যেন সুরসেনের আরেক সুর শুনতে পেলেন। এরমধ্যে লক্ষেশ্বরের প্রবেশ। তিনি এসে দেখেন ঠিক যেখানে গজমোতি পোঁতা, তার উপর উপনন্দ বসে আছে। তার ধারণা হয় এই ছেলে তার টাকা-পয়সার খোঁজে এসেছে। তাকে খারাপভাবে তাড়িয়ে দিতে উদ্যত হলে সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করে, কিসের সন্দেহে তাকে তাড়াচ্ছে? তখন লক্ষেশ্বর সন্ন্যাসীকে ভন্ড বলে। এতে ঠাকুরদাদা ক্ষেপে যান। লক্ষেশ্বর তাড়াতাড়ি সন্ন্যাসীর পিছনে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং জানায় বিরূপাক্ষের মন্দিরের ভন্ড সন্ন্যাসী ভেবেছিলেন। তাকে একমুঠ চাল দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। উপনন্দ এই সব দেখে ঋণমুক্ত হয়ে চলে যাবার কথা বলে।

এরমধ্যে ঘোড়া সাওয়ার দেখে লক্ষেশ্বর সন্ন্যাসীকে গজমোতি পোঁতার জায়গার উপর বসিয়ে জানায় কোনভাবে যেন সে এই স্থান ত্যাগ না করে। যদি কথা শুনে তাহলে সে তাকে খুশি করিয়ে দেবে। রাজদূত সন্ন্যাসীকে জানায় মহারাজ সোমপাল তার সাথে দেখা করতে চান। অদূরেই রাজ্যোদানে অপেক্ষা করছেন। সন্ন্যাসী জানায় তিনি একজনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে এইখান থেকে নড়বেন না। রাজা যেন এসে তার সাথে দেখা করেন। রাজসমাগমের সম্ভাবনায় ঠাকুরদাদা বালকদের নিয়ে চলে যেতে চাইলে সন্ন্যাসী জানায় তুমি শিশু বন্ধুদের নিয়ে আসর জমাও। আমি বেশি দেরি করবো না। লক্ষেশ্বর প্রবেশ করে সন্ন্যাসীর পরিচয় পেয়ে তার কাছে মাফ চায়। সাথে বর চায় কোথায় গেলে কি করলে বাণিজ্যে সুবিধা করতে পারবে। সন্ন্যাসী জানায় সেও সেই খোঁজে আছে। লক্ষ্মী যেই পদ্মটির উপর দাঁড়িয়ে থাকে, সেই পদ্মের খোঁজে

আছেন তিনি। লক্ষেশ্বর জানায় এতে যে খরচপাতি হবে তার অংশিদার সে হতে চায়। কিন্তু সন্ন্যাসী জানায় বহুকাল সোনা ছুঁতে পারবে না। এই কথায় সে একবার অরাজি হয় কিন্তু আবার লোভও ছাড়তে পারে না। রাজা আসতে দেখে সরে দাঁড়ায় আড়ালে। বন্দীগণের গান : 'রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে!/ ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে!'

রাজা এসে জানায় সে রাজ্যের একচ্ছত্র আধিপত্য চায়, বিজয়াদিত্যের প্রভাব তার ভালো লাগে না। সন্ন্যাসী জানায় সেও তাকে বশ করার জন্য মন্ত্রসাধনা করছে। সিদ্ধি লাভ হলে বিজয়াদিত্যকে ধরে রাজদরবারে হাজির করবেন এবং এও জানায় বিজয়াদিত্য একজন সাধারণ মানুষ। ঠাকুরদা প্রবেশ করলে সন্ন্যাসী জানায় আজ তার মনে হচ্ছে জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। নিজের সমস্ত শক্তি সমস্ত ত্যাগ দিয়ে করছে। তিনি বলেন, 'লক্ষ্মী যখন মানবের মর্তলোকে আসেন তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই সাধনার তপস্বিনীবেশেই ভগবান মুগ্ধ হয়ে আছেন; শত দুঃখেরই দলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফুটে উঠেছে, সে খবরটি আজ ঐ উপনন্দের কাছ থেকে পেয়েছি।' সবাই মিলে সন্ন্যাসী খেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ছেলেরা সকলে সোনা রঙের কাপড় পরে সেজে নেয়। সন্ন্যাসী গান ধরেন : 'নবকুন্দধবলদল-সুশীতলা/ অতিসুনির্মলা সুখসমুজ্জলা/ শুভ-সুবর্ণ-আসনে-অচঞ্চলা।'

আলোর সাথে আকাশের মিলনের উৎসবে শুভ্রপুষ্পাচ্ছাদিত সন্ন্যাসী পুরোহিত সাজলেন, শরতাগমনের বেদমন্ত্র যেন উচ্চারিত হলো। শারদোৎসবের আবাহনগান গাইলো সকলে : 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা/গেঁথেছি শেফালিমালা।/ নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে/সাজিয়ে এনেছি ডালা।/ এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার/ শুভ্র মেঘের রথে/ এসো নির্মল নীল পথে,/ এসো ধৌত শ্যামল আলো ঝলোমলো/ বনগিরিপর্বতে।.../ সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা/ আঁধার হইবে আলো।'

এরপর কি শারদলক্ষ্মী দূরে থাকতে পারে? সন্ন্যাসী জানায় তাদের গান আকাশের পারে পৌঁছে গেছে এবং আগমনী সংগীত গাইতে থাকে : 'লেগেছে অমল ধবল পালে/ মন্দ মধুর হাওয়া।'

তিনি বালকদের দেখান সাদা মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে, আলোতে, আনন্দে। বাতাসে শিশিরের পরশ। ধানের ক্ষেত চঞ্চল হয়ে গেছে, বেতসিনী নদীর ভাব পরিবর্তন হয়ে গেছে। ঠাকুরদা বরণের গান শুরু করে : 'আমার নয়ন ভুলানো এলে!/ আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে।'

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষেশ্বর গেরুয়া রঙের কাপড় পরে প্রবেশ করে এবং তার কৌটা সন্ন্যাসী কে দিয়ে দেয়। হেতু হিসেবে জানায় রাজার সৈন্যরা আসছে। তারা আর যাই করুক সন্ন্যাসী থেকে কিছু কাড়বে না। রাজা এসে জানায় বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা যাচ্ছে। হয়তো রাজ্য দখলে আসছে। মন্ত্রীরা এসে সন্ন্যাসীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে এবং জানায় মহারাজ সময় অনেক হয়েছে, এখন রাজধানীতে ফিরে চলুন। তিনি যে রাজা বিজয়াদিত্য তা প্রকাশ পেয়ে যায়। সবাই তার পরিচয় পেয়ে ক্ষমা চায়। তিনি জানান নিজেকে পরীক্ষা করার জন্য আজ তিনি পথে বের হয়েছেন। সন্ন্যাসী সেজে সকলকে দেয়া প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করবেন। তিনি বলেন, 'রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই'। লক্ষেশ্বরকে হাজার কার্যাপণ দিয়ে উপনন্দকে ঋণমুক্ত করেন এবং পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। লক্ষেশ্বরের গজমোতির মালার রক্ষক হিসেবে তিনি থাকবেন বলে পণ করেন। রাজা সোমপালের কাছ থেকে ঠাকুরদাদাকে নিয়ে যেতে চান। তার দরবারে রাজাকে এনে দেবার যে প্রতিশ্রুতি তিনি সোমপালকে করেছিলেন তা তিনি রক্ষা করবেন বলে জানান। সভা প্রস্তুত করতে বলে তিনি আসবেন বলেও জানান। বালকেরা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করে গেয়ে ওঠে : 'আমার নয়ন ভুলানো এলে!/ আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!/ শিউলিতলার পাশে পাশে/ ঝরা ফুলের রাশে রাশে / শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে/ অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে।/ নয়ন ভুলানো এলে!'

এটি বরণের গান। শারদলক্ষ্মীর বরণগান ও রাজার বরণগান এক হয়ে গেছে। 'শারদোৎসব' নাটকটি অভিনয়কালে রবীন্দ্রনাথ একটি নান্দী রচনা করেছিলেন– তার একটি কবিতা এবং কবিতাটি মূলত শরৎ বন্দনা (কবিতাটি মুদ্রিত 'শারদোৎসবে' নেই), অন্যটি গান 'তুমি নব নব রূপে'– এটি পরে '*গীতাঞ্জলি*' গ্রন্থে স্থান পায়। নাটকটির ভূমিকা গান 'আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে' মূলত *খেয়া* কাব্যের 'বিকাশ' কবিতারই বাণীরূপ। এই নাটকের পাঁচটি গান পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র সংগীত হিসেবে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 'আমার নয়ন ভুলানো এলে', 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ', 'ওগো শেফালী বনের মনের কামনা', 'আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি' এবং 'আমাদের শান্তিনিকেতন'। 'আনন্দেরি সাগর হতে' এবং 'কোন খেলা যে খেলব কখন' গান দুটিও খুব জনপ্রিয় ছিল। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসে রবীন্দ্রনাথ 'বর্ষামঙ্গল' গীতি-আলেখ্যটি রচনা করেন এবং 'ওগো শেফলি বনের মনের কামনা' গানটি অন্তর্ভুক্ত করেন।

গানই এই ঋতুনাট্যের প্রাণ। রচনা হিসেবেও গানগুলো অসামান্য। রবীন্দ্রনাথের ঋতুসংগীতগুলি

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে শারদোৎসব থেকেই সূচিত হয়েছে। এই নাটকের গানগুলো নাট্যবহতার সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত, চরিত্রের ভিতর থেকে উৎসারিত এবং সংলাপগুলো গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ। গানের ভিতর দিয়ে ভুবনকে নতুন করে আবিষ্কার করার এই নেশা রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যন্ত ছিল। শান্তিনিকেতনে তপোবন বিদ্যালয়ে বিদ্যার্জনের সঙ্গে যেমন গানের সংযোগ ছিল অপরিহার্য, তেমনি রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলোতে গান ব্যবহৃত হয়েছে অবিচ্ছেদ্যভাবে। অরুণকুমার বসু বলেন,

> "গীতাঞ্জলীর ৮-১৩ সংখ্যক গান শারদোৎসব নাটকের। শারদীয় প্রকৃতি যেন এই গানগুলির ভাষা ও সুরে অকৃপণ অমলিন ঐশ্বর্যে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। বিশ্বজগৎ আনন্দের ঋণশোধ করছে - এই তত্ত্বটি এই নাটকে রূপায়িত আর সেই তত্ত্ব যেন গানের সুরের মধ্য দিয়েই যথার্থ অনুভবগম্য হয়। সুরের ঋণই সেই আনন্দের ঋণ, এই নাটকের পাত্রপাত্রী গানের দ্বারাই যথার্থ শারদোৎসব করেছে। বেতসিনীর তীরবনে ঠাকুরদাদা ও বালকের 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়' গানে সেই উৎসবের আগমনী বাজে, 'আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুট করে' এই প্রতিজ্ঞায় উৎসবের মন্ত্রসূচনা হয়। ঠাকুরদাদার গান 'আনন্দেরই সাগর হতে' উৎসবের উপরিতলের আনন্দধ্বনির চন্দ্রতাপ আর তলদেশে রয়েছে উৎসবের গভীর দর্শন যা সন্ন্যাসী-রাজার গানে বেজেছে 'তোমার সোনার থালায় সাজাবো আজ দুখের অশ্রুধারে'। অবশেষে এই জগতের উপর থেকে প্রত্যহের সেই আবরণটি যায় ঘুচে, নির্মল শুভ্র রৌদ্রধৌত সোনার সকালটি লক্ষ্মীর চরণপদ্মের মতো।"[৩৭]

গীতাঞ্জলী থেকে নেয়া গানগুলো হলো :

১. আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়।
২. আনন্দেরই সাগর থেকে, এসেছে আজ বান।
৩. তোমায় সোনার থালায় সাজাব।
৪. আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ।
৫. লেগেছে অমল ধবল পালে।
৬. আমার নয়ন ভুলানো এলে।

গানগুলোর পর্যায় বিভাগে প্রকৃতির গান বিশেষ করে শরতের গান বেশি। পূজা ও বিচিত্র পর্যায়ের যথাক্রমে একটি করে গান আছে। রাগ বিভাসকে আশ্রয় করে তিনি বাউল সুরে ২টি এবং

ছায়ানট রাগে ১টি বাউল গান রচনা করেছেন।

নাটকটি *গীতাঞ্জলী* পর্বে রচিত আর তাই খেয়া-গীতাঞ্জলীর একাধিক গান শারদোৎসবে আছে। গীতাঞ্জলির যুগ রবীন্দ্রনাথের মন উপলব্ধি ও তন্ময়তার রসে পূর্ণ। তিনি যেই বিশ্ব-জীবন-সত্যের সন্ধানে ছিলেন এতকাল, তাই এই যুগে এসে ধরা দিয়েছে।

৩. প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯)

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "বউঠাকুরানীর হাট নামক উপন্যাস হইতে এই প্রায়শ্চিত্ত গ্রন্থখানি নাট্যীকৃত হইল। মূল উপন্যাসখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নূতন গ্রন্থের মতোই হইয়াছে।"[৩৮]

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় উদয়াদিত্য সুরমার কাছে তার আনন্দ ব্যক্ত করছে যে সে খাজনা আদায় করতে পারে না তাই রাজা মাধবপুরের পরগনার শাসন তার থেকে কেড়ে নিয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় রাজা প্রতাপাদিত্য তার পিতৃব্য বসন্ত রায়কে খুন করবার জন্য দুজন পাঠানকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ খবর পেয়ে উদয়াদিত্য ছুটে গেছেন বসন্ত রায়কে উদ্ধার করতে। এরমধ্যে এক পাঠান বসন্ত রায়কে খুন করতে আসলেও খুন করতে পারে না। পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করে। কথায় কথায় পাঠান খুব সুন্দর একটি উক্তি দেয়। সমস্ত নাটকের মূল বাণীও যেন এটি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও যেন তার সব নাটকে সংগীতের ব্যবহার এই জন্যই করেছেন। পাঠান বলে : 'তরোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায় কিন্তু সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়'। এসময় হঠাৎ উয়াদিত্যের আগমন ঘটলে বসন্ত রায় তার হাতের সেতারে ঝংকার তুলে গেয়ে ওঠে : 'বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ?/ সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।/ তুমি গগনেরই তারা/মর্ত্যে এলে পথহারা,/ এলে ভুলে অশ্রুজলে আনন্দেরই হাস।'

বসন্ত রায় যশোরের রাজদরবারে আসেন। তার মৃত্যু হয়নি দেখে রাজা প্রতাপাদিত্য ভঙ্ককর খেপে যান। ১ম অঙ্ক ৫ম দৃশ্যে বিভা ও সুরমা। চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের স্ত্রী বিভা, উদয়াদিত্যের ভগ্নি। এদিকে রামচন্দ্রের সাথে বিভার অভিমান। বিভাকে রাজা ডাকেন না। তাই মনের দুঃখে বিভা গান গায়: 'ওর মানের এ বাঁধ টুটবে না কি টুটবে না?/ ওর মনের বেদন থাকবে মনে/ প্রাণের কথা ফুটবে না?/ কঠিন পাষাণ বুকে লয়ে/ নাই রহিল অটল হয়ে।/ প্রেমেতে ঐ পাথর ক্ষয়ে/ চোখের জল কি ছুটবে না?'

Dhaka University Institutional Repository

বিভার মনের ব্যথা এ গানের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাজার এতো গর্ব কি কখনো ভাঙবার নয়? এরই মধ্যে দাদামশায় বসন্ত রায়ের প্রবেশ গান গাইতে গাইতে : 'আজ তোমারে দেখতে এলেম/ অনেক দিনের পরে ।/ ভয় করো না সুখে থাকো,/ বেশিক্ষণ থাকব নাকো,/ এসেছি দন্ড দুয়ের তরে ।/ দেখব শুধু মুখখানি,/ শোনাও যদি শুনব বাণী,/ না হয় যাব আড়াল থেকে/ হাসি দেখে দেশান্তরে ।'

প্রেমের এই মিষ্টি গানটি দাদামশাই বিভার মন হালকা করে দেবার জন্য গাইলেন। যেন বিভার হাসি মুখের কথা শুনেই দেশান্তরী হয়ে যাওয়া যায়। প্রতাপাদিত্যকে বিভার কথা জিজ্ঞাসে আবার তিনি গান গেয়ে জানায় : 'মলিন মুখে ফুটুক হাসি, জুড়াক দু-নয়ন ।/ মলিন বসন ছাড়ো সখী, পরো আভরণ ।/ অশ্রুধোওয়া কাজলরেখা/ আবার চোখে দিক না দেখা,/ শিথিল বেণী তুলুক বেঁধে কুসুমবন্ধন ।'

সত্যিই তিনি কিছু বলেছেন নাকি জিজ্ঞাসে আবার গানে উত্তর দেন : 'মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে/ এগিয়ে নিয়ে আয়-/ তারে এগিয়ে নিয়ে আয় ।'

প্রথম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে প্রজাদলের সাথে ধনঞ্জয়ের প্রবেশ। এর আগের ঘটনা হলো প্রতাপাদিত্যকে মন্ত্রীরা জানায় ধনঞ্জয় মাধবপুরের প্রজাদের ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা জোট বেঁধে ছোট দল থেকে বড় দল হয়ে যাচ্ছে। রাজা জানায় 'সেই বেটাই যত নষ্টের গোড়া। ধর্মের ভেক ধরে সেইতো যত প্রজাকে নাচিয়ে তোলে। সে তো প্রজাদের পরামর্শ দিয়ে খাজনা বন্ধ করিয়েছে। উদয়কে বলেছিলুম যেমন করে হোক তাকে আচ্ছা শাসন করে দিতে। কিন্তু উদয়কে জানো তো! এদিকে তার না আছে তেজ, না আছে পৌরুষ, কিন্তু একগুয়েমির অন্ত নেই। ধনঞ্জয়কে শাসন দূরে থাক, তাকে আস্পর্ধা দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছে। এবার তার কণ্ঠীসুদ্ধ চেপে কণ্ঠ চেপে ধরতে হচ্ছে, তারপর দেখা যাবে তোমার মাধবপুরের প্রজাদের কতবড়ো বুকের পাটা।' এমনাবস্থায় যশোর যাবার পথে প্রজাদের সাথে দেখা। রাজার লোকরা তাদের পিটিয়েছে। তারা ভয় পাচ্ছে ধনঞ্জয়কেও যদি মারে। ধনঞ্জয় জানায় মার খেতে সে প্রস্তুত, সে ভয় পায় না। তাদের সাথে নেচে গাইত থাকে : 'আরো আরো প্রভু আরো ।/ এমনি করে আমায় মারো ।/ লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই/ ধরা পড়ে গেছি আর কি এড়াই?/ যা কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো ।/ এবার যা করবার তা সারো সারো/ আমি হারি কিম্বা তুমি হারো!/ হাটে ঘাটে

Dhaka University Institutional Repository

বাটে করি মেলা/ কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা/ দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো ।’

ধনঞ্জয়ের প্রতিবাদ যেন এই গানের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। রাজা কত মারতে পারে তাদের দেখে নেবে। শুধু কাঁদবেনই না, রাজার কতটুকু শক্তি কাঁদাবার তাও দেখে নেবে। সবাই তার সাথে যেতে চায়। তাকে যদি মারে আর তারা যুবরাজকে নিয়ে আসবে। তাদের হাতিয়ার নিতে দেয় না এবং ধনঞ্জয় জানায় অর্ধেক রাজ্যও তারা নিয়ে আসবে কারণ রাজত্ব শুধু রাজার একার নয়। কথাটিতে একটি গভীর ভাবার্থ আছে। প্রজা আছে, তাই রাজা আছে আর তাই রাজ্য প্রজারও। দরবারে শুধু রাজাই নয়, আরো লোক আছে কথা শোনবার। রাজ্যে যাবার আগে শেষ গান ধরে : ‘আমরা বসব তোমার সনে/ তোমার শরিক হব রাজার রাজা/ তোমার আধেক সিংহাসনে ।/ তোমার দ্বারী মোদের করেছে শির নত/ তারা জানে না যে মোদের গরব কত/ তাই বাহির হতে তোমায় ডাকি/ তুমি ডেকে লও গো আপন জনে ।’

গানটিতে ধনঞ্জয়ের মানসিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। তারা অত্যাচার সহ্য করেছে কিন্তু অর্ধেক রাজ্য তো প্রজার। অহিংসাতেও সমাধান সম্ভব।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য। পথের পাশে বৈরাগীর সাথে দেখা। তারা শঙ্কিত রাজা যদি না ছাড়ে। উত্তরে ধনঞ্জয় গানে জানায় : ‘আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে তার সাধন/ সে কি অমনি হবে!/ আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন/ সে কি অমনি হবে!/ আমাকে যে দুঃখ দিয়ে আনবে আপন বশে/ সে কি অমনি হবে!/ তার আগে তার পাষাণ হিয়া গলবে করুণ রসে/ সে কি অমনি হবে!/ আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন/ সে কি অমনি হবে!’

তাকে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। সে এতো সহজে কারো কাছে ধরা দেবে না। তারা জানায় যদি তার গায়ে হাত তোলে, তাহলে তারা সইতে পারবে না। তিনি প্রত্যুত্তরে জানান তিনি সইতে পারলে, তারাও সইতে পারবে। তার শরীর দুঃখ পেলেও, মার খেলেও সইতে পারবে। সেই সঙ্গে গান ধরেন : ‘কে বলেছে তোমায় বঁধু এতো দুঃখ সইতে?/ আপনি কেন এলে বঁধু, আমার বোঝা বইতে?/ প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু/ সুখের বন্ধু, দুখের বন্ধু/ তোমায় দেব না দুখ, পাব না দুখ/হেরব তোমার প্রসন্ন মুখ। / আমি সুখে দুঃখে পারব বন্ধু চিরানন্দে রইতে/ তোমার সাথে বিনে কথায় মনের কথা কইতে ।’

বৈষ্ণবীয় ভাবের গানটিতে নিজেই নিজের উত্তর দিচ্ছেন তিনি। প্রজাদের জিজ্ঞাসা, রাজা খাজনা

Dhaka University Institutional Repository

চাইলে কি বলবে? ধনঞ্জয় জানায়, উত্তর দেবে যে তারা খাজনা দিবে না। যে ঠাকুর তাদের অন্ন দিয়েছে তাকে তারা ভোগ দেবে। ঘরের ছেলে-পেলেকে ক্ষুধার্ত রেখে তারা খাজনা দিতে পারবে না। রাজা না মানতে চাইলেও বলতে হবে। সে বলে, 'তোদের এই বাবা যার ভরসায় চলেছে তার নাম কর। বেটারা কেবল তোরা বাঁচতেই চাস– পণ করে বসেছিস যে মরবি নে। কেন মরতে দোষ কি হয়েছে? যিনি মারেন তাঁর গুনগান করবি নে বুঝি!' আর তার নামে গান ধরতে বলেন : 'বলো ভাই ধন্য হরি/বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি।/ ধন্য হরি সুখের নাটে/ধন্য হরি রাজ্যপাটে।/ ধন্য হরি শ্মশান ঘাটে/ধন্য হরি, ধন্য হরি।'

সর্বাবস্থায় হরিকে ধন্যবাদ। তিনি মারুন, বাঁচান, মাতাক, কাঁদাক, মুখে হাসি দেক কি ঘরে ছাই দেক সবসময়ই তার প্রশংসা।

দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে বিভা, রামমোহন ও মহিষী। রামমোহন এসেছে রাজা রামচন্দ্রের সাথে। মহিষীর অনুরোধে রামমোহন গান ধরে : 'সারা বরষ দেখি নে মা,/ মা তুই আমার কেমন ধারা?/ নয়নতারা হারিয়ে আমার/ অন্ধ হলো নয়নতারা।/ এলি কি পাষাণী ওরে?/ দেখব তোরে আঁখি ভরে;/ কিছুতেই থামে না যে মা/ পোড়া এ নয়নের ধারা।'

এ যেন বিভার উদ্দেশে গাওয়া। এরপরে দাদাঠাকুর আর সুরমা প্রবেশ করেন। বিভাকে দেখে দাদাঠাকুর গেয়ে ওঠে : 'হাসিরে কি লুকাবি লাজে/ চপলা সে বাঁধা পড়ে না যে।/ রুধিয়া অধর-দ্বারে/ ঝাঁপিতে চাহিলি তারে,/ অমনি সে ছুটে এল নয়নমাঝে।'

দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে নটীর কণ্ঠে চমৎকার কতগুলো রবীন্দ্র সংগীত রয়েছে– 'না বলে যেও না চলে মিনতি করি!', 'ও যে মানে না মানা'। এরমধ্যে রামমোহন এসে রামচন্দ্রকে ডেকে নিয়ে যায়। রামাইয়ের কৌতুক স্পর্ধাতে রাজা উদয়াদিত্য রেগে গিয়ে রামচন্দ্রের মুন্ডুপাত করতে প্রস্তুত হয়েছেন। আসরে কেউ না থাকায় নটীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকে এবং আশঙ্কা করছে কিছু একটা হবে। নিজেরাই পরিস্থিতি স্বভাবিক করতে গান ধরে : 'নয়ন মেলে দেখি আমায় বাঁধন বেঁধেছে।/ গোপনে কে এমন করে এ ফাঁদ ফেঁদেছে।'

এর পরের দৃশ্যে দেখা যায় বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের সাথে মিলে রামচন্দ্রকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। প্রতাপাদিত্য ক্ষেপে যান এবং বসন্ত রায়কে জানান আবার যদি তিনি যশোর এসে উদয়াদিত্যের সাথে দেখা করে, তবে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে উদয়াদিত্যের ঘরে মাধবপুরের একদল প্রজা। প্রজারা এসেছে

Dhaka University Institutional Repository

উদয়াদিত্যকে নিয়ে যেতে কারণ তাকে সেখান থেকে প্রত্যাহার করেছে। প্রতাপাদিত্য এ সময় প্রবেশ করে। তিনি খাজনা না দেয়ায় প্রজাদের উপর খ্যাপা। তার থেকেও বেশি ক্ষ্যাপা তাদের সর্দার বৈরাগী ধনঞ্জয়ের উপর। কারণ তার ধারণা সে সমস্ত প্রজাদের ক্ষেপিয়েছে। ধনঞ্জয় স্বীকার করে গান গায় : 'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়/কোন খেপা সে।/ ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে/ কী বাজে কোন বাতাসে।'

এতটুকু গেয়ে রাজাকে পাওয়ার আনন্দে সকলকে নিয়ে নেচে গেয়ে ওঠে : 'গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা-/ ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা।/ তারে কানন-গিরি খুঁজে ফিরি,/ কেঁদে মরি কোন হুতাশে!'

ধনঞ্জয় জানায়, তাকে যে খেপায় সে তো আকাশ জুড়ে মোহন বাঁশি বাজাচ্ছে। সে তো পাগল, ডাকলেও ধরা দেয় না। খাজনা দিতে রাজি না হওয়ায় রাজা বৈরাগী বাদে সকলকে চলে যেতে বলেন এবং তারা যেতে রাজি না হলে ধনঞ্জয় গেয়ে ওঠে : 'রইল বলে রাখলে কারে?/ হুকুম তোমার ফলবে কবে?/ তোমার টানাটানি টিকবে না ভাই,/ রবার যেটা সেটাই রবে।/ যা খুশি তাই করতে পারো-/ গায়ের জোরে রাখ মার;/ যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে/ তিনি যা সন সেটাই সবে।/ অনেক তোমার টাকাকড়ি,/ অনেক দড়া অনেক দড়ি,/ অনেক তোমার আছে ভবে।/ ভাবছ হবে তুমিই যা চাও,/ জগৎটাকে তুমিই নাচাও,/ দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে/ হয় না যেটা সেটাও হবে।'

ধনঞ্জয় রাজাকে জানাচ্ছে, তাঁর হুকুমই চূড়ান্ত নয়। যেটা ঘটার, যেটা রবার সেটাই রবে তিনি যতই মারুক কাটুক। তিনি চাইলেই জগৎকে নাচাতে পারবেন তা নয়। তার উপরও আরেক জন আছে। সেই জন চাইলে হঠাৎ নয়ন খুলে দেখবে যেটা না, সেটাও হচ্ছে। মন্ত্রীকে হুকুম দেন রাজা ধনঞ্জয়কে কারাগারে পাঠানোর। সেখানে উদয়াদিত্যকেও পাঠানো হয়। এরমধ্যে বিভাকে নিতে শ্বশুর বাড়ি থেকে রামমোহন আসেন কিন্তু তার দাদা কারাগারে থাকায় সে যায় না।

পঞ্চম দৃশ্যে বসন্ত রায়ের বুদ্ধিতে উদায়দিত্যকে মুক্ত করার জন্য কারাগারে আগুন লাগানো হয়। নৌকায় করে বসন্ত রায় উদয়াদিত্যকে নিয়ে পালিয়ে যায়। ধনঞ্জয় নেচে গেয়ে প্রবেশ করে : 'ওরে আগুন আমার ভাই/ আমি তোমারি জয় গাই।/ তোমার শিকল-ভাঙ্গা এমন রাঙ্গা মূর্তি দেখি নাই।/ তুমি দু হাত তুলে আকাশ-পানে/ মেতেছ আজ কিসের গানে।/ এ কী আনন্দময় নৃত্য অভয়, বলিহারি যাই।/ যে দিন ভবের মেয়াদ ফুরোবে ভাই,/ আগল যাবে সরে,/ সে দিন হাতের

দড়ি পায়ের বেড়ি/ দিবি রে ছাই করে।’

আগুন আজ খুশির বার্তা নিয়ে এসেছে। সে এসেছে মুক্তি নিয়ে। তার শিকল ভাঙ্গা রাঙ্গা মূর্তি দেখে সে জয়গান গাইছে। আজ আগুনের লেলিহান শিখা দেখে আনন্দময় নৃত্য মনে হচ্ছে। এই আগুনেই সব পুড়ে ছাই হবে, মিটবে সকল দাহে, সব বালাই ঘুচে যাবে।

চতুর্থ অঙ্ক সপ্তম দৃশ্যে রাজা ধনঞ্জয়কে ডেকে পাঠায়। পালিয়ে যাবার সুযোগ পেলেও সে রাজাকে না বলে যেতে চায় না। গারদে দিনকাল কেমন কাটছে, তার উত্তরে জানায় : ‘ওরে শিকল, তোমায় কোলে করে/ দিয়েছি ঝংকার।/ তুমি আনন্দে ভাই রেখেছিলে/ ভেঙে অহংকার।/ তোমায় নিয়ে করে খেলা।/ সুখে দুঃখে কাটল বেলা,/ অঙ্গ বেড়ি দিলে বেড়ি/ বিনা দামের অলংকার।/ তোমার পরে করি নে রোষ, /দোষ থাকে তো আমারি দোষ,/ ভয় যদি রয় আপন মনে/ তোমায় দেখি ভয়ংকর।/ অন্ধকারে সারা রাতি/ ছিলে আমার সাথের সাথি,/ করি নমস্কার।’

গারদে সে আনন্দতেই ছিল এবং সে রাস্তায় ফিরে যাবেন বলে জানায়। পথেই সে পথিক। রবীন্দ্রনাথের নাটকে ঘুরে ফিরে পথই যেন অবলম্বন হয়ে ওঠে। এবার তিনি মুক্তির পথে বের হচ্ছেন। গন্তব্য নিশ্চিত নয়। পঞ্চম অঙ্কে রাজা প্রতাপাদিত্য মুক্তিয়ারকে পাঠিয়েছেন রাজা বসন্ত রায়কে মেরে ফেলতে। দ্বিতীয় অঙ্কে বসন্ত রায় কতিপয় বালককে নিয়ে গান গাচ্ছেন : ‘ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না,/ ওকে দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে!/ মন নাই যদি দিল, নাই দিল,/ মন নেয় যদি নিক কেড়ে।’

এরমধ্যে মুক্তিয়ার খাঁ প্রবেশ করে এবং রাজা প্রতাপাদিত্যের আদেশ পালন করে।

পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে উদয়াদিত্য মা কালির চরণ স্পর্শ করে শপথ করে সে রাজ্য ত্যাগ করবে এবং রাজ্যের দিক ফিরে তাকাবে না। পঞ্চম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে উদয়াদিত্যর সাথে ধনঞ্জয়ের দেখা। দুজন ভাই ডেকে কোলাকুলি করে। আজ আর ভেদাভেদ নেই – বলেই গান ধরে : ‘সকল ভয়ের ভয় যে তরে/ কোন বিপদে কাড়বে?/ প্রাণের সঙ্গে যে প্রাণ গাঁথা/ কোন কালে সে ছাড়বে।’

আজ তাদের বড়ো আনন্দ। পথ চলাতেও কোন ভয় নেই। বিভাও এসেছে সাথে কিন্তু তাকে তার শ্বশুড়বাড়ি দিয়ে আসবে। ধনঞ্জয় তাদের সাথে যাবে নাকি জিজ্ঞেস করলে জানায় কোথায়

যাবে সে তা জানে না। ঐ রাস্তাই তাকে মজিয়েছে আবার ঐ মাটি দেখলে তাকে মাটি করে দেয় বলেই গান ধরে : 'গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ/আমার মন ভুলায় রে! / ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে/ লুটিয়ে যায় ধুলায় রে!'

গানটির একটি অসামান্য তাৎপর্য রয়েছে নাটকটিতে। জগৎ সংসার ছেড়ে বৈরাগী আত্মঅন্বেষণে বের হয়েছে। এই পথই ঘর থেকে বের করেছে কিন্তু এর গন্তব্য জানা নেই। কোথায় নিয়ে ঠেকাবে, কোথায় কি দেখাবে, তার কোন শেষ নেই।

শেষ দৃশ্যে বিভা জানতে পারে রাজা রামচন্দ্র বিয়ে করছেন, শুনে একলা যেতে চাইলেও পরবর্তীতে মন পরিবর্তন করেন এবং উদয়াদিত্য ও বৈরাগী ধনঞ্জয়ের সাথে কাশী চলে যেতে মনস্থির করে। নাটকটি শেষ হয় ধনঞ্জয়ের গান দিয়ে :

'আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর ফিরব না রে-
এমন হাওয়ার মুখে ভাসল তরী,/কুলে ভিড়ব না আর ভিড়ব নারে!
ছড়িয়ে গেছে সুঁতো ছিড়ে,/তাই খুঁটে আজ মরব কি রে!'

গানটি দিয়ে বিভার সংসার ছেড়ে আসা, উদয়াদিত্যের রাজ্য ছেড়ে আসা আর ধনঞ্জয়ের জগৎ ছেড়ে আসা সবই যেন প্রকাশিত হচ্ছে 'আমি ফিরব নারে ফিরব না আর ফিরব নারে'। জগৎ সংসারের প্রতি তাদের মায়া ত্যাগ করে চলে এসেছেন। জীবনপথের মুক্ত আহ্বান এই নাটকটিতে আগাগোড়া প্রকাশ পেয়েছে গানগুলোর মধ্য দিয়ে। ধনঞ্জয় ও উদয়াদিত্য দুই জগতের মানুষ কিন্তু মনের দিক থেকে, চিন্তাধারার দিক থেকে তারা এক। নাট্যপরিস্থিতিতে কাব্য সংগীত কতটা ব্যঞ্জনাময় হতে পারে, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে নাটকে ধনঞ্জয়ের গানগুলো। উপন্যাসটির সপ্তম (বর্তমানে ষষ্ঠ) পরিচ্ছেদে বসন্ত রায়ের মুখে একটি সম্পূর্ণ গান ব্যবহার করা হয়েছে। উপন্যাসটিতে এই গানটির যে পাঠ রয়েছে সেই 'আজ তোমারে দেখতে এলেম' গানটির একই পাঠ রয়েছে *রবিচ্ছায়া* ও *গানের বহি*তে। কিন্তু 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে গানটির ব্যাপক পাঠান্তর লক্ষিত হয়। নাটকের শেষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত স্বরলিপিতেও এই পরিবর্তিত পাঠ পাওয়া যায়। 'গীতবিতানে'ও এই পাঠই পাওয়া যায়। সুরেদ্রনাথের স্বরলিপিটির সঙ্গে ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপিটি 'স্বরবিতান ৯'-এ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে ইন্দিরা দেবী পূর্বতন পাঠই অনুসরণ করেছেন। 'বউঠাকুরানীর হাট'- এর নবম (বর্তমানে অষ্টম) পরিচ্ছেদে

Dhaka University Institutional Repository

বসন্ত রায়ের মুখে একটি দ্বিপদী কবিতা আছে : 'হাসিরে পায়ে ধরে রাখিবি কেমন করে/হাসির সে প্রাণের সাধ ঐ অধরে খেলা করে।' এই কবিতাটির গীতিরূপ লাভ করেছে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে। ভৈরবী একতালা সুরে নিবদ্ধ এই গানটি হলো, 'হাসিরে কি লুকাবি লাজে।'

দশম (বর্তমান নবম) পরিচ্ছেদে রামমোহন মালের কণ্ঠে একটি আগমনী গান ব্যবহার করা হয়েছে - 'সারা বরষ দেখিনে মা, মা তুই আমার কেমন ধারা'। 'স্বরবিতান ৯' এ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গানটির স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে এবং একই সঙ্গে ইন্দিরাদেবী-কৃত সুরভেদও সংকলিত।

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি 'বউঠাকুরানীর হাট' অবলম্বনে প্রায় ২৬ বছর পরে শান্তিনিকেতনে মঞ্চস্থ হয়। পরের বছরে অর্থাৎ ১৯১০ সালে আরও দু'বার অভিনীত হয়েছিল। এই তিনবারের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দু'বার অভিনয় করেন এবং দু'বারই ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায়। চরিত্রটির মুখে গান থাকায় রবীন্দ্রনাথ নাচও যোগ করেছিলেন। এ-সম্পর্কে শান্তিনিকেতনের পুরোনো ছাত্র নৃপেন্দ্রকুমার বসুর স্মৃতিচারণার সূত্রে জানা যায়, 'গেরুয়া আলখাল্লা-পরা মাথায় পাগড়ি-জড়ানো শালশিশুর মতো তার সুদীর্ঘ দেহ এখনও স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে ওঠে। 'ওরে আগুন আমার ভাই', 'বল ভাই ধণ্য হরি' এবং 'আমাদের পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়' গানগুলিতে কবি মনোহরণ ভাবচঞ্চল তা-ব দেখিয়ে দর্শকপ্রাণে পুলক-শিহরণ জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর অপ্সরা-লাঞ্ছিত কণ্ঠে 'গ্রামছাড়া ওই রাঙ্গামাটির পথ' গানটি হৃদকন্দরে প্রতিধ্বনি তোলে। এমনকি, এই প্রাচীন ছাত্রটিকে সেই গীতাভিনয় আজীবন এমন আবিষ্ট করে রেখেছিল যে, কোথাও রাঙ্গামাটির পথ দেখলে তার দূরতম প্রান্তসীমায় ধনঞ্জয়ীরূপী কবিগুরুর ছায়ামূর্তি তিনি যেন দেখতে পেতেন। রূপসজ্জার সঙ্গে সেই কণ্ঠ এখানে চিরকারের স্মৃতিতে বিবৃত হয়েছে।[৩৯]

এই নাটকে বসন্ত রায়ের 'আমিই শুধু রইনু বাকী' গানটির জন্য রামপ্রসাদী সুর ব্যবহার করা হয়েছে।

'বৌঠাকুরানীর হাট'র নাট্যরূপ 'প্রায়শ্চিত্ত' ১৩১৬ সালে প্রকাশিত হয় এবং পুনর্লিখিত হয়ে ১৩৩৬ সালে 'পরিত্রাণ' নামে প্রকাশিত হয়। ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র সন্নিবেশের মাধ্যমে একটি নতুন সাংগীতিক মাত্রাও যুক্ত হয় এ নাটকে। 'আরো প্রভু আরো আরো', 'আমারে যে বাঁধবে ধরে', 'বাঁচান বাঁচি মারেন মারি', 'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়', 'ওরে আসুন আমার ভাই', 'রইল বলে রাখলে কারে', 'মলিন মুখে ফুটুক হাসি', 'আজ তোমারে দেখতে এলেম' প্রভৃতি

Dhaka University Institutional Repository

গানের ভিতর দিয়ে ধনঞ্জয়ের হৃদয়াবেগ স্পর্শ করে যায় । এ নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ গান 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' । নাটকের মূল ভাবটি এই গানে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে । ধনঞ্জয়ের চরিত্রের রাজনৈতিক আদর্শই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, এর আধ্যাত্মিক অংশও সমভাবে লক্ষ্যণীয় । এই আধ্যাত্মিক অংশই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাকে প্রেরণা দিয়েছিল ।

শুধু ধনঞ্জয়ের গান নয়, বসন্ত রায়ের গান, নটীর গান, সুরমার গানও নাটকটিকে আরো অর্থবহ ও গতিশীল করেছে । নাটকটিতে সংগীতের উপযোগিতা সম্পর্কে নাটকের শুরুতেই পাঠানের বক্তব্যে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, 'তলোয়ারে শত্রুকে জয় কার যায় কিন্তু সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায় ।' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন :

> "প্রায়শ্চিত্ত নাটকে তেইশটি গান আছে; অধিকাংশ গানই পূর্বের রচনা, নাটকের মধ্যে যোজিত হয়; তবে কয়েকটি নাটক যে লিখিবার সময়েই রচিত তাহা গানের ভাব ও ভাষা হইতেই বুঝা যায় । গীতাঞ্জলি গানের অব্যবহিত পূর্বে শান্তিনিকেতনের উপদেশমালা প্রদানের পর্বে এই নাটকটি লিখিত; সেজন্য কয়েকটি গানের মধ্যে ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণের যে একটি গভীর আকুতি শোনা যায়, তাহার পটভূমি পাই উপদেশমালায় ।"[৪০]

'আমাকে যে বাঁধবে ধরে' গানটি 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে বিচিত্র পর্যায়ের গান; কিন্তু 'মুক্তধারা' নাটকে কথার ঈশৎ পরিবর্তনে প্রেম পর্যায়ের গান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত । ২০টি গানের মধ্যে ৫টি গান বিচিত্র, পূজা ৬টি, স্বদেশ ১টি, নাট্যগীতি ২টি এবং প্রেম পর্যায়ের ৫টি গান রয়েছে । সুরের দিক থেকে ১০টি গানই বাউল সুরে এবং ১টি কীর্তন সুরে রচিত ।

নাটকটি রচনার সময় *গীতাঞ্জলি*র গানগুলো রচিত হতে থাকে এবং পরের বছরই *গীতাঞ্জলি* রচনা শেষ হয় । 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের রূপ *গীতাঞ্জলি*র সুর ও ভাবের আবহের মধ্যে পরিকল্পিত হয়েছিল ।

৪. রাজা (১৯১০)

'রাজা' রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রথম সাংকেতিক নাটক । এই নাটকে ছাব্বিশটি গান রয়েছে । সাংকেতিক রহস্য উন্মোচনের জন্য এ নাটকে গানের ব্যবহার ঘটে, যা আগেরকার নাটকসমূহে গানের ব্যবহার অপেক্ষা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পৃথক । আগেরকার নাটকে গান ব্যবহৃত হয়েছে কিছুটা চিরাচরিত ধারায়– দর্শকদের খুশি করার জন্য, কিছুটা নাট্যপরিস্থিতির প্রয়োজনে । কিন্তু সাংকেতিক নাটকে গান ব্যবহৃত হয়েছে সংকেতময় ভাবকে প্রকাশ করার জন্য । সাংকেতিক

Dhaka University Institutional Repository

নাটকে যে অসীম জীবনের বোধ রবীন্দ্রনাথ উপস্থাপিত করেছেন গান তাতে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

রাজা ও রানী সুদর্শনার বিয়ে হয় বাল্যকালে। সেই বিয়ের কথা কারো মনে নেই; এমনকি স্বামী রাজা দেখতে কেমন তাও রানীর মনে নেই। অন্ধকার ঘরে রাজার সাথে রানীর মিলন হয়, তাই রানীর ইচ্ছা রাজাকে আলোতে দেখবে। রাজা সুরঙ্গমা নামে এক দাসীকে অন্ধকার ঘরের জন্য নিযুক্ত করেন। রাজার উপর দাসীর অপার ভক্তি। রানী তার কাছে রাজার স্বরূপ জানতে চাইলে সে জানায় রাজাকে সুন্দর বললে ছোট করে বলা হবে, তিনি যেন সুন্দরের থেকে আরো অদ্ভুত, এমন আশ্চর্য। হঠাৎ সুরঙ্গমা বুঝতে পারে রাজা আসছেন। সে টের পায় বড় দরজা খুলে রাজা এই দিকে আসছেন, রানীকে জানায়। কিন্তু রানী তা অনুভব করতে পারে না। বাইরে থেকে গান ভেসে আসছে : 'খোলো খোলো দ্বার, রাখিয়ো না আর/ বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।/ দাও সাড়া দাও, এই দিকে চাও,/ এসো দুই বাহু বাড়ায়ে।/ কাজ হয়ে গেছে সারা,/ উঠেছে সন্ধাতারা,/ আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া/ অস্তসাগর পারায়ে।/ এসেছি দুয়ারে এসেছি, আমারে/ বাহিরে রেখো না দাঁড়ায়ে।/ ভরি লয়ে ঝারি এনেছ কি বারি,/ সেজেছ কি শুচি দুকুলে।/ বেঁধেছ কি চুল, তুলেছ কি ফুল,/ গেঁথেছ কি মালা মুকুলে।/ ধেনু এলো গোঠে ফিরে,/ পাখিরা এসেছে নীড়ে,/ পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত/ আঁধারে গিয়েছে হারায়ে।/ তোমারি দুয়ারে এসেছি, আমারে/ বাহিরে রেখো না দাঁড়ায়ে।'

রাজা সুদর্শনাকে বলছেন সজ্জিত হতে এবং দ্বার খুলতে। সবকিছু আঁধারে ঢেকে যাবার ক্ষণে তিনি এসেছেন। বাইরের আলোকিত অবস্থা লুপ্ত হলে রাজা এসেছেন, যেন অন্তরের আলোর উজ্জ্বলতায় রানী রাজাকে দেখতে পান। জগতের সব পথ অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, সেই ক্ষণে রাজা এসেছে রানীর দ্বারে। সুরঙ্গমা জানায় দরজা খোলা। একটু স্পর্শ করলেই খুলে যাবে। তবুও রাজা নিজে দরজা খোলেন না। সুরঙ্গমা গেয়ে উঠে : 'এ যে মোর আবরণ/ ঘুচাতে কতক্ষণ।/ নিশ্বাসবায়ে উড়ে চলে যায়/ তুমি যদি কর মন।/ যদি পড়ে থাকি ভূমে/ ধূলার ধরণী চুমে/ তুমি তারই লাগি দ্বারে রবে জাগি/ এ কেমন তব পণ।/ রথের চাকার রবে/ জাগাও জাগাও সবে,/ আপনার ঘরে এসো বলভরে/ এসো এসো গৌরবে।/ ঘুম টুটে যাক চলে,/ চিনি যেন প্রভু বলে-/ ছুটে এসে দ্বারে করি আপনারে/ চরণে সমর্পণ।'

Dhaka University Institutional Repository

গানে সুরঙ্গমা বলছে রাজা মনে করলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কেউ যদি দরজা না খোলে তাহলে কি তিনি বাহিরে দাঁড়িয়ে থাকবেন? কেউ ঘুমে মজে থাকলে রাজা কি তার রথের চাকার ঘর্ষণ শব্দে সবাইকে জাগাবেন না? যেন প্রভুকে চিনতে পেরে দরজা খুলে তাঁকে আবহন করতে পারে? গান দুটির অর্থ গভীর। রানী রাজার রূপ দেখার জন্য অধীর। রাজার ভালোবাসা সে অনুভব করে না, সে শুধু রাজার দর্শন চায়। অন্তরের চোখে দেখতে চায় না। 'খোল খোল দ্বার' গানটি দিয়ে রাজা যেন বলছেন ভেতরে ডেকে নিতে, শুধু ঘরে নয়, তার অন্তরেও। কিন্তু রানী দরজা খোলে না। সুরঙ্গমার গানে আরেকটি রূপকার্থ দেয় রাজাকে, রানী সুদর্শনা এখনো ঘুমে আছে, তার ঘুম ভাঙিয়ে দিলেই তিনি প্রভুকে চিনতে পারবেন এবং চরণে আত্মসমর্পণ করবেন। আবরণের কথা বলা হয়েছে গানের প্রথম চরণে। এ মোহের আবরণ। এ মোহ সত্যকে চিনতে দেয় না। রাজা জোর করে কারো হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না। নিজের হৃদয়কে তৈরি করে তবেই রাজাকে ডেকে নিতে হবে। রানী রাজাকে দেখার জন্য উদগ্রীব, শুধু অন্ধকারে অনুভবে নয়, সামনা সামনি আলোতে দেখতে চায়। তখন রাজা তাকে আশ্বাস দেয়, 'আজ বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপর দাঁড়িয়ো, চেয়ে দেখো, আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা করো। বার বার সকল দিক থেকেই দেখা দেব।'

রাজা সুরঙ্গমাকে জানায় রানী তাকে দেখতে চেয়েছে, বসন্তপূর্ণিমাতে তাকে নিয়ে যোগ দিতে। সুরঙ্গমা চমকে ওঠে কারণ সে রাজাকে দেখেছে, রাজার ভিতর বাহির দুই রূপ। সে তো সাধনায় সিদ্ধ, সে জানে রাজা কি। সুরঙ্গমা উত্তর দেয়, 'কৌতূহলের জিনিস হাজার হাজার আছে। তুমি কি তাদের সঙ্গে মিলে কৌতূহল মেটাবে। তুমি আমার তেমন রাজা নও। রানী তোমার কৌতূহলকে শেষ কালে কেঁদে ফিরে আসতে হবে।' এই বলে সে গান ধরে : 'কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়,/ তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।/ আজি হৃদয়মাঝে যদি গো বাজে প্রেমের বাঁশি/ তবে আপনি সেধে আপনা বেঁধে পরে সে ফাঁসি,/ তবে ঘুচে গো ত্বরা ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়-/ আহা আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।/ চেয়ে দেখিস না রে হৃদয়দ্বারে কে আসে যায়।/ তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিন বায়।/ আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে/ চির বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে।/ তারে বাহিরে খুঁজি ঘুরিয়া বুঝি পাগলপ্রায়-/ তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়॥'

এই গানে সুরঙ্গমা রাজাকে দেখার বা বোঝার স্বরূপটি নিজের মতন করে ব্যাখ্যা করেছে। সে

Dhaka University Institutional Repository

জানে কোন পথে রাজাকে পাওয়া যায়, সেই সিদ্ধ হবার পথটি। আর গানের আগে সে যে বলেছিল রানীর কৌতূহলই কান্না হয়ে ফিরে আসবে, তারও একটা ব্যাখ্যা গানটিতে পাওয়া যায়। সুরঙ্গমাই যেন এই গানটির মাধ্যমে সমগ্র নাটকের তত্ত্বটি ফুটিয়ে তুলেছে। রাজা কেবল হৃদয়ে পাওয়া যায়। বাইরের বহুর ভিড়ে সে নেই, তাকে পাওয়া যায় প্রেমে। প্রেমের বাঁশিটি বাজলে আপনিই সে ধরা দেবে। সে ধরাও সহজ নয়। ফাঁসি লাগানোর মতন তিনি প্রেমে ধরা পড়েন। বাইরে থেকে রাজাকে দেখার যে কৌতুহল তা বনের পাখির মতন, যে বনে পালিয়ে বেড়ায়। অনর্থক কৌতূহল সফল হয় না। তিনি হৃদয়দ্বারে আসেন। এর আগে তিনি যে দরজা খুলতে বলেছিলেন তা সুদর্শনার মনের দ্বার। শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য নয় রাজাকে দেখতে হলে মনের আলোয় দেখতে হবে। রাজ্যের লোকও রাজাকে কখনো দেখেনি, তাদের ধারণা রাজা বলে কেউ নেই। এইদিকে বসন্ত উৎসব উপলক্ষ্যে নানা দেশের রাজা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। রাজাকে না দেখতে পেয়ে তারাও সংশয়ে আছেন যে আদৌ রাজা আছেন নাকি। কাঞ্চীর রাজা ধরেই নিয়েছেন রাজা নেই।

দ্বিতীয় দৃশ্যে পথ। রাজার রাজ্যে অনেক প্রবেশদ্বার, সবাই বসন্ত উৎসবে যোগ দেবার জন্য আসছে। যেই রাস্তা ধরে যাক না কেন, বসন্ত উৎসবে পৌঁছে যাবে। অন্য রাজ্যের প্রজারা অবাক, এ কেমন রাজার রাজ্য যেখানে কোন বাধা নেই, যার খুশি যখন তখন আসা যাওয়া করতে পারে, কেউ বাধা দেয়ার নেই। এখানে পথ অনেক কিন্তু গন্তব্য একটাই। এমন সময় বসন্তের আগমনী গান গাইতে গাইতে ঠাকুরদার প্রবেশ বালকদের নিয়ে : 'আজি দখিন দুয়ার খোলা - / এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার/ বসন্ত এসো।'

শারদোৎসব রচিত হয় শরৎ ঋতু নিয়ে, রাজা নাটকে বসন্ত। অরূপ রাজা এই উৎসবের নায়ক। রানী আজ রাজাকে দেখতে পাবে, উৎসবে মিলিত হবার পূর্বে বসন্তের এই আগমনী গান এক অসামান্য পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। ড. করুণাময় গোস্বামী বলেন :

"এ গানও রাজার বন্দনা। এই গানে যে ব্যক্তিরূপের বন্দনা করা হচ্ছে তিনি রাজা, যিনি বসন্তেরও রাজা। 'মৃদু মধুর মদীর হেসে/এসো পাগল হাওয়ার দেশে/তোমার উতলা উত্তরীয়। তুমি আকাশে উড়ায়ে দিও'– চরণগুলোতে যার কথা বলা হচ্ছে, বা যাকে আবাহন করা হচ্ছে তিনি বসন্তেতর অধিদেবতা, রাজা নাটকের রাজা। বসন্তোৎসব যে হতে যাচ্ছে, তার কেন্দ্রে রয়েছেন রাজা, রূপের অশেষ সমারোহের মধ্যে অরূপ, তিনি রয়েছেন।" [৪১]

Dhaka University Institutional Repository

প্রজাদের মনে দুঃখ রাজাকে দেখতে পায় না। এরমধ্যে সুসজ্জিত মালা পরিহিত ঠাকুরদাকে একদল লোক টেনে নিয়ে আসে। একজন গেয়ে ওঠে কবিকেশরীর রচনা করা গান : 'যেখানে রূপের প্রভা নয়নলোভা/সেখানে তোমার মতন ভোলা কে- ঠাকুরদাদা!/ যেখানে রসিক-সভা পরম শোভা/সেখানে এমন রসের ঝোলা কে - ঠাকুরদাদা!'

এখানে ঠাকুরদাদার স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকে ঠাকুরদাদা চরিত্রটি পাওয়া যায়। একটি সহজ সরল চরিত্র। কোন বাদাবাদিতে নেই, তিনি রূপের ব্যাকুল, রসিক, গলাগলি কোলাকুলিতে তৎপর। তবে তিনি ধ্যানী। দেশ বিদেশের লোক এসেছে বসন্তোৎসবে। সবাই রাজাকে খোঁজে। এক প্রজা বলে রাজা নেই বলে দেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। কিন্তু ঠাকুরদা উত্তর দেন রাজা এক জায়গায় দেখা দেন না বলে সমস্ত দেশ জুড়ে রাজার অস্তিত্ব। তিনি নিজে দেখা না দিয়ে সকলকে রাজা বানিয়ে দিয়েছেন। এ বলেই গান ধরেন : 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে/ নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।/ আমরা সবাই রাজা।/ আমরা যা খুশি তাই করি/ তবু তাঁর খুশিতেই চরি/ আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে/ নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে/ আমরা সবাই রাজা।/ রাজা সবারে দেন মান/সে মান আপনি ফিরে পান/ মোদের খাটো করে রাখে নি কেউ কোনো অসত্যে/ নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।/ আমরা সবাই রাজা।'

এই গানটিতে রাজার স্বার্থক রূপটি ফুটে উঠেছে। আদর্শ শাসন ব্যাবস্থার এক প্রধান যেন তিনি। এই রাজত্বে সবাই সমান। রাজা সবাইকে অধিকার দিয়েছেন তার সঙ্গে মেশার। প্রজারা নিজের স্বাধীনতায়, নিজের খুশিতে চলতে পারে, কাজ করতে পারে। সবাই রাজার পথেই মিলবে কারণ রাজা সত্য। সেখানে কোন বিফলতা নেই। যেখানে সব সত্য সেখানেই সাফল্য থাকে। বিদেশিরা পুনঃপ্রবেশ করে এবং ধারণা করে রাজা সত্যিই নেই। সকলে মিলে গুজব রটিয়ে রেখেছে যে রাজা আছেন, নয়তো সবচেয়ে বেশি তিনিই চোখে পড়তেন, প্রজারা এমন নির্ভয়ে থাকতো না আর এদেশের কেউ রাজাকে কেউ দেখেছেন বলে জানেন না। এমন বলাবলি করে বিদেশির দল প্রস্থান করলে গান গাইতে গাইতে বাউলের প্রবেশ : 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে/ তাই হেরি তায় সকল খানে।/ আছে সে নয়ন-তারায় আলোক ধারায়- তাই না হারায়/ ওগো তাই দেখি তার যেথায় সেথায়/ তাকাই আমি যেদিক পানে।'

Dhaka University Institutional Repository

রাজা আছেন কি নেই সেই তর্কের উত্তর স্বরূপ বাউলদের এই গান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের রচনায় বাউলের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বাউলের এই গানটি অনেকটা যাত্রাপালার বিবেকের মতন। সহজ পদে, সহজ সুরে আধ্যাত্মিক রূপটি ব্যাখ্যা করেন। রাজার অস্তিত্বের তত্ত্বটি প্রকাশ পেয়েছে সহজ রূপে। বিদেশিদের সংশয়ের জবাবে বাউলরা বলছেন, রাজাকে একটি নির্দিষ্ট আসনে কেন বসাতে হবে? তিনি প্রাণের মানুষ, তাকে তো সবখানেই পাওয়া যায়। নিজেদের গানেই রাজার বাণী আছে কারণ এই রাজ্যে সবাই রাজা। তিনি সকলের নয়ন তারায় রয়েছেন, তাই কখনো হারান না। তারা তাদের নিজের গানেই রাজার বাণী শুনতে পাবে। রাজা আছেন হৃদয়ে, নয়নে। তবে এইভাবে রাজার অস্তিত্বকে নিজের প্রাণে উপলব্ধি করার, তারই গান গেয়ে বেড়াবার শক্তি অর্জন করতে চাইলে প্রেম চাই এবং তাকে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি সর্বত্র বর্তমান। এখানে রাজাকে পরমেশ্বর অর্থেও ভাবা যায়। আমরা তাকে দেখতে পাই না কিন্তু তিনি সর্বত্র রয়েছেন, আমাদের অনুভবে, ভালো কাজে, আমাদের অন্তরে। চোখ বন্ধ করলে তাকে অনুভব করা যায়, উপলব্ধি করা যায়। অনেকটা সুদর্শনা যেমনভাবে রাজাকে দেখতে চাইছেন, তেমনভাবে নয়, সুরঙ্গমা যেভাবে বাতাসে টের পায় রাজা আসছেন, ঠিক সেইভাবে।

বাউলের দল চলে গেলে লোকজন জানায় রাজা রথে চড়ে নিশান উড়িয়ে পথে বের হয়েছেন। লোকজন তাকে দেখতেও পাচ্ছেন এবং অনুযোগ জানাচ্ছেন কিন্তু ঠাকুরদা বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন রাজা যদি সত্যিই বের হতেন তবে তাকে চেনা যেত না। তিনি আলাদা কেউ নন, সকলের মাঝে মিশে থাকেন। এরমধ্যে পাগলকে দেখে তাদের ডেকে গান ধরতে বলেন ঠাকুরদা কারণ তার ধারণা লোকে পাগল হয়ে গেছে; বাদ্য নেই, পাইক নেই, আলোক নেই, কিসের রাজা। পাগলেরা প্রবেশ করে গান ধরে : 'তোরা যে যা বলিস ভাই/ আমার সোনার হরিণ চাই।/ সেই মনোহরণ চপল চরণ/ সোনার হরিণ চাই।/ সে যে চমকে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়,/ যায় না তারে বাঁধা।/ তার নাগাল পেলে পালায় ঠেলে,/ লাগায় চোখে ধাঁধা।/ তবু ছুটব পিছে মিছে মিছে/ পাই বা নাহি পাই-/ আমি আপন-মনে মাঠে বনে/ উধাও হয়ে ধাই।'

রাজার অনুপস্থিতিরি সুযোগ নিয়ে সুবর্ণ নামে এক সুদর্শন জুয়াড়ি রাজা সেজে প্রচার করছে, সবার ভিতর সংশয়– তিনি রাজা নাকি না। ঠাকুরদা আর সবার মাঝে বিরোধ এই নিয়ে। এখানে যেন সোনার হরিন বলতে বোঝাচ্ছে রাজবেশী ভন্ড সুবর্ণকে, সোনার হরিণ রামচন্দ্রের বনবাস

Dhaka University Institutional Repository

জীবনে বিপর্যয় এনেছিল। সীতা রামের অনুপস্থিতিতে লক্ষণকে সোনার হরিণ বা মায়ামৃগ ধরতে পাঠালে রাবণ সুযোগ বুঝে তাঁকে হরণ করে। কেননা সোনার হরিণ যেমন সত্য নয়, সুবর্ণও সত্যিকার রাজা নয়। সুদর্শনা রূপের ভক্ত। তিনি কল্পনায় রাজাকে সুপুরুষ ভেবে রেখেছে। একারণে ভুল করে ছদ্মবেশীকে রাজা মনে করায় নাটকে বিপর্যয় আসে। নাটকের অবিসম্ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে গানে।

তৃতীয় দৃশ্যে কুঞ্জবনের দ্বার দেখা যাচ্ছে। ঠাকুরদা ও উৎসব বালকেরা মিলে শুরু করলো গান : 'আজি কমলমুকুলদল খুলিল!/ দুলিল রে দুলিল!/ মানসসরসে রসপুলকে/ পলকে পলকে ঢেউ তুলিল। / গগন মগন হল গন্ধে,/ সমীরণ মূর্ছে আনন্দে,/ গুন্ গুন্ গুঞ্জনছন্দে/ মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে-/ নিখিলভুবনমন ভুলিল,/ মন ভুলিল রে/ মন ভুলিল।'

এখানে বসন্তোৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায়। কমলমুকুলদল খুলছে, ফুল ফুটছে, বসন্তের আবহে সংগীতের মাধ্যমে। এই গানের সুরে গানের কথায় বসন্তঅবাহন। গানের শেষে তিনবার 'মন ভুলিল রে' বলা হয়েছে হয়তো ভুল রাজাকে নিজেদের রাজা হিসেবে গ্রহণ না করার ইঙ্গিত। গানের শেষে সকল রাজা প্রবেশ করে। এরমধ্যে কাঞ্চীরাজ বুঝতে পারে এ ছদ্মবেশী, প্রকৃত রাজা নয়। তিনি সুদর্শনাকে পছন্দ করেন। এই ছদ্মবেশীর মাধ্যমে সুদর্মনাকে পাবার সুযোগ আসতে পারে ভেবে তাকে হাতে রাখলেন। কুঞ্জবনের ভেতর উৎসব শুরু হয়েছে। ঠাকুরদা আছেন দ্বারে। গান ধরলেন অকিঞ্চনের দলের সঙ্গে মিলে : 'মোদের কিছু নাই রে নাই/ আমরা ঘরে বাইরে গাই-/ তাইরে নাইরে নাইরে না।/ যত দিবস যায় রে যায়/ গাই রে সুখে হায় রে হায়-/ তাইরে নাইরে নাইরে না।/ যারা সোনার চোরাবালির পরে/ পাকা ঘরের ভিত্তি গড়ে/ তাদের সামনে মোরা গান গেয়ে যাই-/ তাইরে নাইরে নাইরে না।/ যখন থেকে থেকে গাঁঠের পানে,/ গাঁঠ-কাটারা দৃষ্টি হানে/ তখন শূন্য ঝুলি দেখায়ে গাই-/ তাইরে নাইরে নাইরে না।/ যখন দ্বারে আসে মরণ-বুড়ি/ মুখে তাহার বাজাই তুড়ি,/ তখন তান দিয়ে গান জুড়ি রে ভাই-/ তাইরে নাইরে নাইরে না।'

গানটি পুরোপুরি রূপক। অকিঞ্চনের দল বলছে তারা কোনকিছুকে গ্রাহ্য করে না, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়। সোনার চোরাবালি আর পাকা ঘরের ভিত্তি গড়ার উপমাটি সাংকেতিক। এখানেও নাটকের ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে, তার একটা অবশ্যম্ভাবী ধারণা দেয়া হয়েছে। আজ রানী

Dhaka University Institutional Repository

আসবেন রাজাকে দেখতে। উৎসবটি তার কাছে সোনার চোরাবালি হবে। উৎসবটিতে চারদিকে আলোকসজ্জায় সোনার বর্ণ আলোয় পরিণত হয়েছে। আর চোরাবালি এই জন্য যে আজ রাজাবেশে ছদ্মবেশী রাজা আসবে। রানী তাকে দর্শন করবে আর সেখানেই মূল বিপত্তি। রানীর মনে যেই পাকা ঘরের ভিত আজ তৈরি হবে তা তো বালুচরের উপর গড়া, কারণ ছলনাটি গড়া ছদ্মবেশী সুবর্ণকে নিয়ে, সেই সোনার চোরাবালি, সেই সোনার হরিণ। এরপর স্ত্রীলোকের দল প্রবেশ করে, প্রবেশ করে নাচের দল। সবাই উৎসবে যোগ দিতে এসেছে। তবে তার আগে সকলে ঠাকুরদার কথায় কুঞ্জবনের দ্বারেই গান গেয়ে নাচে : 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে/ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।/ তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে/ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।/ হাসি কন্না হীরাপান্না দোলে ভালে,/ কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দে তালে তালে।/ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।/ কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ-/ দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ,/ সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে/ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।'

এটি দুঃখ-সুখের, ভালো-মন্দের, দিবা-রাত্রির, জন্ম-মৃত্যুর নৃত্য। বারবার তাতা থৈথৈ বলে অবিরাম চলাকে বোঝাচ্ছে। এরপর নেচে গেয়ে তারা বের হয়ে গেলে নাগরিক দলের প্রবেশ। তাদের কথা রাজা নেই আর ঠাকুরদাদার কথা রাজা সম্পর্কে তারা যা বলে বলুক, আজ বসন্তউৎসব। নানা সুরের উৎসব আজ। তবে সব সুর মিলে আজ এক সুরে এক তালে গাইবে– বলেই গান ধরলেন : 'বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে।/ দেখিস নে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে।'

বসন্তরাজ আসে নতুন পাতা নিয়ে, ফোটা ফুলের মেলা নিয়ে। প্রভুর পায়ের তলে শুধু মানিক জ্বলে না, তাঁর চরণে লক্ষ মাটির ঢেলা লুটিয়ে কাঁদে। এখানে প্রভু বলতে রাজা। বসন্ত উৎসবের দিন ছদ্মবেশী সুবর্ণকে দেখে সুদর্শনা তাকে রাজা মনে করলেন। রাজা সম্পর্কে সুরঙ্গমার ধারণা ছিল। সে তখন রানীর কাছে ছিল না। রানী দাসী রোহিণীর কাছে পদ্মপাতার ফুলে অর্ঘ্য রচনা করে সুবর্ণর কাছে পাঠায়। রাজাকে দেখে সুদর্শনা আত্মহারা। আম্রবনের বীথিকায় থাকা বালকদের গান শুনতে ডাকলেন। বালকেরা গাইলো : 'বিরহ মধুর হলো আজি/মধুরাতে।/ গভীর রাগিণী উঠে বাজি/ বেদনাতে।'

এই গানটিও রূপকার্থে ব্যবহৃত। এখানে বিরহ মধুর হয়েছে বলা হচ্ছে, কিন্তু আজ তো মিলনের

Dhaka University Institutional Repository

রাত। গভীর রাতে বেদনায় বেজে উঠছে : 'ভরি দিয়া পূর্ণিমানিশা/ অধীর অদর্শনতৃষা/ কী করুণ মরীচিকা আনে/ আঁখিপাতে!' বালকেরা যেন বলে দিচ্ছে, রানী অধীর হয়ে আছেন দর্শনের জন্য কিন্তু রাজা তো মরিচিকা, মিথ্যা। বালকদের এই গান শুনে রানীর চোখে পানি এসে যায়। তার মনে হচ্ছে যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার জো নেই; দরকারও নেই। এমনি করে খোঁজার মধ্যে সমস্ত পাওয়া যেন সুধাময় হয়ে আছে। রানীর জিজ্ঞাসা, কোন মাধুর্যের সন্ন্যাসী তোমাদেরকে এই গান শিখিয়েছে? ইচ্ছে করছে চোখে-দেখা, কানে-শোনা ঘুচিয়ে দেই। হৃদয়ের ভিতরটাতে যে গহনপথের কুঞ্জবন আছে, সেইখানকার ছায়ার মধ্যে উদাস হয়ে চলে যাই। সুদর্শনার পাঠানো উপহারে সুবর্ণ ইঙ্গিতটি বুঝতে পারে না। কিন্তু কাঞ্চীর রাজা বুঝতে পেরে সুবর্ণের গলার মুক্তার হার খুলে নিয়ে রোহিণীর মাধ্যমে সুদর্শনার কাছে পাঠিয়ে দেন। কাঞ্চীরাজে এই ভূমিকা পালনের কথা শুনে রানী বিব্রত হলেও মালাটি গ্রহণ করেন। তার তীব্র অভিমানও হলো যে রাজা তাকে অপমান করেছে। তার দর্প চূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু রূপের মোহে ফিরতে পারছে না, অভিমান থাকছে না। বিমুখ হয়ে থাকার শক্তিও পাচ্ছেন না।

পঞ্চম দৃশ্যে কুঞ্জদ্বারে ঠাকুরদা আছেন দ্বারে। ভেতরের উৎসবের লোকজন আবির রাঙা হয়ে বের হয়ে আসছে। তারা জানালো রাজারা প্রতাপের গন্ডিতে বিচ্ছিন্ন দর্শক হয়ে ছিলেন, উৎসবে যোগ দেয়নি। শুধুমাত্র প্রজারা লাল রঙে রেঙেছেন। এরমধ্যে বাউলের দল গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে : 'যা ছিল কালো ধলো/ তোমার রঙে রাঙা হলো।/ যেমন রাঙাবরণ তোমার চরণ/ তার সনে আর ভেদ না রইল।/ রাঙা হলো বসন ভূষণ, রাঙা হলো শয়ন স্বপন -/ মন হলো কেমন দেখ্ রে, যেমন/ রাঙা কমল টলমল॥'

এটি উৎসবে রঙিন হবার গান। সব লালে লাল, শুধু আকাশের চাঁদটাই রয়ে গেছে শুভ্র। ঠাকুরদা গান ধরেন : 'আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা/ প্রিয় আমার ওগো প্রিয়।/ বড়ো উতলা আজ পরান আমার/ খেলাতে হার মানবে কি ও।'

কার সাথে এই প্রাণের খেলা? এখানে সুদর্শনার আকাঙ্ক্ষাও যেন ফুটে উঠেছে। 'কেবল তুমি কি গো এমনি ভাবে/ রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে।/ তুমি সাধ করে নাথ, ধরা দিয়ে/ আমারও রঙ বক্ষে নিয়ো-' রাজা কি তার থেকে শুধু পালিয়ে থাকবে? রাজা কি রঙে রঙিন হবে না? স্ত্রীলোকের প্রবেশ। তারা ঠাকুরদাকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়। বসন্ত পূর্ণিমার

Dhaka University Institutional Repository

অচঞ্চল চাঁদের মতন তিনি কিসের আশায় দাঁড়িয়ে আছেন জানতে চাইলে ঠাকুরদা গান ধরেন : 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি/ সর্বনাশের আশায়/ আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি/ পথে যে জন ভাসায় ।/ যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে,/ ভালোবাসে আড়াল থেকে,/ আমার মন মজেছে সেই গভীরের/ গোপন ভালোবাসায় ।'

ঠাকুরদা গভীরের গোপন ভালোবাসায় মজেছেন। কিন্তু এ ভালোবাসা সর্বনাশা। ঠিক যেন সুদর্শনা আর রাজার মতন। দেখা দেয় না, আড়াল থেকে ভালোবাসে। এবার কুঞ্জবন থেকে বেরিয়ে আসে নাচের দল। তারা শেষ নাচ নেচে যায় : 'আমার ঘুর লেগেছে তাধিন তাধিন/ তোমার পিছন নেচে নেচে/ ঘুর লেগেছে তাধিন তাধিন ।'

উৎসব শেষ হয়ে গেলে শুধু ঠাকুরদা আর সুরঙ্গমা। সুরঙ্গমার কেন যেন মনে হচ্ছে রাজা তাকে অনেক দূরে পাঠিয়ে দেবে। সে গান ধরলো : 'পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে/ কোন নিভৃতে রে, কোন গহনে ।/ মাতিল আকুল দক্ষিণবায়ু/ সৌরভচঞ্চল সঞ্চরণে/ কোন্ নিভৃতে রে, কোন গহনে ।/ কাটিল ক্লান্ত বসন্তনিশা/ বাহির-অঙ্গন-সঙ্গী-সনে ।/ উৎসবরাজ কোথায় বিরাজে-/ কে লয়ে যাবে সে ভবনে,/ কোন নিভৃতে রে কোন গহনে ।'

গানটিতে গভীর দুঃখবোধ ফুটে উঠেছে। উৎসব রাজের সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু কে তাকে নিয়ে যাবে সেই ভবনে। কথাগুলো যেন সুদর্শনারও। কাঞ্চীরাজ সুদর্শনাকে পাবার আশায় প্রাসাদে আগুন লগিয়ে দেয়। সে আগুন ভয়ংকর হয়ে ওঠে। কাঞ্চীরাজও বিমূঢ় হয়ে ওঠে। সুবর্ণ ভয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। প্রাসাদের চারদিক আগুন ধরে যায়। সুদর্শনা বাঁচবার জন্য রাজবেশী সুবর্ণের কাছে সাহায্য চাইলে জানতে পারে সে রাজা নয়, সে ভন্ড, পাখন্ড। সে মুকুট ফেলে পালিয়ে যায়। চারদিকে আগুন লেগে গেলে রানী ভয় পেয়ে যায় এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাঁকে অভয় দিয়ে রাজা বলে, 'ভয় নেই, তোমার ভয় নেই। আগুন এ ঘরে এসে পৌঁছবে না'। ছদ্মবেশী রাজার দেয়া মালা পরে রানী তখন মর্মাহত এবং কলুষিত বোধ করছেন। তবে তখনও তার রূপের নেশা আছে। তিনি ভাবছিলেন রাজা যেন পরমসুন্দর হন। কিন্তু সেই ভয়ানক আগুনের মধ্যে রানী যখন রাজাকে দেখলেন, রানী লজ্জায় ও আতঙ্কে চমকে উঠে আর্তনাদ করে বলে, 'ভয়ানক, সে ভয়ানক। কালো, কালো, তুমি কালো। তখনই চোখ বুজে ফেললুম, আর চাইতে পারলুম না। ঝড়ের মেঘের মতন কালো, কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো, তারই তুফানের

Dhaka University Institutional Repository

উপরে সন্ধ্যার রক্তিমা।' রাজা বললেন, 'যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে আমার ভালোবাসা কিসের?' এর পরেই একটি অসামান্য গান ধরেন : 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না,/ ভালোবাসায় ভোলাব।/ আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো,/ গান দিয়ে দ্বার খোলাব।/ ভরাব না ভূষণভারে,/ সাজাব না ফুলের হারে,/ সোহাগ আমার মালা করে/ গলায় তোমার পরাব।/ জানবে না কেউ কোন তুফানে/ তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে।/ চাঁদের মতো অলখ টানে/ জোয়ারে ঢেউ তোলাব।'

রাজা কাউকে রূপে ভোলান না। সেজন্য সুদর্শনাকেও তিনি রূপে ভোলাবেন না। তিনি প্রেমে ভোলাবেন। তিনি হাত দিয়ে দ্বার খুলবেন না, এ দ্বার মনের দ্বার যা খুলতে কোন জোরাজুরি করবেন না। তিনি দ্বার খুলবেন গান দিয়ে, প্রেম দিয়ে। ভক্তকে তিনি ভোলান না, তাকে তিনি নীরব নিভৃতে নিজের প্রেমের টানে কাছে ডেকে নেন। ভক্তও তেমনি প্রেম দিয়ে তাকে কাছে পান। রবীন্দ্রনাথের এই বোধের মধ্যে ব্রাহ্মবোধ, বৈষ্ণবীয় বোধ ও মরমি লৌকিক বোধ মিলে-মিশে একটি মধুর রবীন্দ্রবোধ নির্মাণ করেছেন। যে তাকে চাইবে তিনি তার প্রাণে তুফান তুলে দেবেন, চাঁদ যেমন অদৃশ্য টানে সাগরে জোয়ার তোলে, ঠিক সেইভাবে। রানী এই আশ্বাসে খুশি নন। তিনি বলছেন, 'শুধু তোমার ভালোবাসায় কী হবে। আমার ভালোবাসা যে মুখ ফিরিয়েছে। রূপের নেশা আমাকে লেগেছে, সে নেশা আমাকে ছাড়বে না। সে যেন আমার দুই চক্ষে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আমার স্বপন শুদ্ধ ঝলমল করছে। কেন আমাকে লোকে বলেছিল তুমি সুন্দর। তুমি যে কালো, তোমাকে আমার কখনো ভালো লাগবে না। সে যেন আমার দুই চক্ষে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আমার স্বপন শুদ্ধ ঝলমল করছে। কেন আমাকে লোকে বলেছিল তুমি সুন্দর। তুমি যে কালো, তোমাকে আমার কখনো ভালো লাগবে না। আমাকে এখান থেকে যেতেই হবে। তোমার সঙ্গে মিলন সে আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আমার ইচ্ছে করছে দূরে চলে যাই, এত দূরে যাই যেখানে তোমাকে আর মনে আনতে হবে না।' যাবার আগে রাজাকে বলছেন, তোমার প্রহরীদের হুকুম দাও আমাকে ঠেকাক। কিন্তু রাজার একটাই কথা– কেউ ঠেকাবে না। ঝড়ের মুখে ছিন্ন মেঘ যেমন অবাধে চলে তেমনি রানী অবাধে চলে যেতে পারবে। সুদর্শনা বললেন, এবার নোঙর ছিড়ল। হয়তো ডুবব, কিন্তু আর ফিরব না। এমন সময় গান গেয়ে সুরঙ্গমা প্রবেশ করে : 'ভয়েরে মোর আঘাত করো ভীষণ, হে ভীষণ/ কঠিন করে চরণ পরে প্রণত করো মন।'

Dhaka University Institutional Repository

সুদর্শনা নতুন জীবনে পা রাখতে যাচ্ছে। সুরঙ্গমা ভীষণকে বলছেন তিনি যেন তার চরণে কঠিন করে মনকে প্রণত করে। এই ভীষণ হচ্ছে রাজা। বলতে গেলে সুরঙ্গমা যেন সুদর্শনার হয়ে গাইছে। রানী ক্রোধে আর লজ্জায় পিতৃগৃহে চলে যান। দাসী সুরঙ্গমাও সাথে যায়। রানী নিতে না চাইলেও সে যাবেই। এই বলে সে গেয়ে উঠলো : 'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী/ আমি সকল দাগে হব দাগি।/ তোমার পথের কাঁটা করব চয়ন-/ যেথা তোমার ধুলার শয়ন/ সেথা আঁচল পাতব আমার/ তোমার রাগে অনুরাগী !'

সুরঙ্গমা কোনভাবেই সুদর্শনাকে একা যেতে দেবে না। সকল কলঙ্ক মাথায় নিয়ে সে রানীর সাথে যাবে, যদি ধুলায় শুতে চান, সেখানে কাঁটা দূর করে তার আঁচল পেতে দেবে। তার কলঙ্কভাগী হবে রাজার প্রতি ভালোবাসার জন্য। সে রাজার প্রেমে সিদ্ধ। মেয়ে স্বামীগৃহ ত্যাগ করে আসায় পিতা কান্যকুব্জরাজ মর্মাহত হন এবং তাকে বলেন রাজঅন্তঃপুরে দাসী হয়ে থাকতে হবে। আত্মসম্মানবোধ এবং রূপের আকাঙ্ক্ষায় সুদর্শনা জর্জরিত। তিনি সুবর্ণের রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজাকে ত্যাগ করলেন; সে তাকে উদ্ধারে আসছে না, আবার রাজাও তাকে ফিরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করছে না। রানী কিছুতেই মানতে চাইছে না– রাজা তাকে চলে যেতে দিয়েছেন কিংবা এসে ফিরিয়ে নিচ্ছে না। সে কিছুতেই নিচু হবে না। রাজাকেই আসতে হবে। এরমধ্যে ধুলি উড়িয়ে কাকে যেন আসতে দেখে রানী মনে করেন রাজা তাকে নিতে আসছেন। কিন্তু সুরঙ্গমা জানায় সে তাদের রাজা নয়, সে সুবর্ণ। আর সুরঙ্গমার মুখে সে জুয়াড়ি ছিল শুনে আর সয্য করতে পারে না। শুধু জিজ্ঞেস করে, রাজাকে কেন এত ভালোবাসে সুরঙ্গমা? সুরঙ্গমা জানায় : 'আমি কেবল তোমার দাসী/ কেমন করে আনব মুখে তোমায় ভালোবাসি।/ গুণ যদি মোর থাকত তবে/ অনেক আদর মিলত ভবে,/ বিনামূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণপ্রয়াসী ॥'

সে গানে জানাচ্ছে সে কেবল দাসী। ভালোবাসি বলার মতন স্পর্ধা তার নেই। সে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পিত। অহংবোধের শতভাগ বিসর্জন দিয়ে সে আজ সাধনার উচ্চশিখরে পৌছেছে। সে যেন সুদর্শনাকে বলছে সব অভিমান ত্যাগ করে সে যেন রাজার অভিপ্রায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

এদিকে কাঞ্চীরাজ ছল হিসেবে সুবর্ণকে নিয়ে কান্যকুব্জরাজ্যে হাজির হলেন সুদর্শনাকে পাবার আশায়। তিনি রাজদূতের কাছে সুবর্ণকে সুদর্শনার স্বামী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। দূত

Dhaka University Institutional Repository

সংশয় প্রকাশ করলে কাঞ্চীরাজ জানান প্রয়োজনে তিনি জোর করে সুদর্শনাকে ছিনিয়ে নেবেন। এদিকে সুদর্শনার স্বামীরগৃহ ত্যাগ এবং পিতার গৃহে আশ্রয়ের কথা শুনে অবন্তীরাজ, কলিঙ্গরাজ, বিরাটরাজ, পাঞ্চালরাজ, বিদর্ভরাজ প্রভৃতি সাতরাজ্যের রাজা সুদর্শনার পাণিগ্রহণের জন্য কান্যকুব্জরাজ্যে এসে হাজির হয়। সুদর্শনার পিতার সাথে যুদ্ধ হয় এবং তিনি পরাজিত হন। সাত রাজাই সুদর্শনাকে চায়। এই অবস্থায় স্বয়ংবর সভার আয়োজন করা হয়। সুদর্শনা যাকে মালা পরাবেন, তাকেই গ্রহণ করবেন। স্বয়ংবর সভা প্রস্তুত। কাঞ্চীরাজ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সুবর্ণকে তার ছত্রধর সাজায়। এ দৃশ্য দেখে সুদর্শনা অনুতপ্ত হন এবং ঠিক করেন স্বয়ংবর সভায় বুকে ছুরিকাঘাত করে তিনি আত্মবির্সজন করবেন। সাথে গান ধরেন : 'এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে/ ওহে অন্ধকারের স্বামী!/ এসো নিবিড়, এসো গভীর, এসো জীবনপারে/ আমার চিত্তে এসো নামি।/ এ দেহমন মিলায়ে যাক, হইয়া যাক হারা,/ ওহে অন্ধকারের স্বামী !/ বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধারা/ ওই চরণে যাক থামি।/ নির্বাসনে বাঁধা আছি দুর্বাসনার ডোরে,/ ওহে অন্ধকারের স্বামী!/ সব বাঁধনে তোমার সাথে বন্দী করো মোরে,/ ওহে আমি বাঁধনকামী।/ আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম,/ ওহে অন্ধকারের স্বামী!/ সকল ঝরে সকল ভরে আসুক সে চরম,/ ওগো মরুক না এই আমি ॥'

সুদশর্নার বধোদয় হয়েছে। এতো পরীক্ষার ভিতর দিয়ে তার আত্মশুদ্ধি ঘটেছে। সুবর্ণকে তার আর ভালো লাগে না। তার মনে পড়ে রাজার সেই বীণাবাদন। অন্ধকার ঘরের সেই মিলন। সুন্দর তার কাছে অসুন্দর ঠেকছে। রাজাকে তিনি নিবিড়ভাবে, নিজের চিত্তে গভীরভাবে কামনা করছেন। তিনি স্বীকার করছেন তার বাসনা ছিল, বিকৃতি ছিল, রূপের মোহ ছিল। কিন্তু এখন আর ওসব নেই। তিনি রাজার চরণে সমর্পণ করতে চাইছেন। আত্মশুদ্ধির ভিতর দিয়ে তিনি আত্মনিবেদনের গানের মাধ্যমে রাজার পায়ে নিজেকে সমর্পণ করতে চাইছেন। এসময় ঠাকুরদা যোদ্ধা হিসেবে সভায় প্রবেশ করেন এবং ঘোষণা করেন রাজা এসেছেন, তিনি তার সেনাপতি। তিনি বলেন 'রণক্ষেত্রেই আমার প্রভুর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় হবে।' যুদ্ধ বেঁধে গেল। সব রাজাই পরাজিত হলেন। কাঞ্চিরাজ ছাড়া সকলকেই শাস্তি দেয়া হলো। তাকে রাজা তার সিংহাসনের ডান পাশে বসিয়ে স্বহস্তে তাঁর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন। যুদ্ধ শেষ করে রাজা সুদর্শনার সাথে দেখা না করেই চলে যান। এতে সুদর্শনা অভিমান করে এবং অসহ্য বোধ হয় তার। কাঞ্চীরাজ এই রায় মানতে পারে না, রাতে পথে বের হয়েছেন রাজার সাথে মিলিত হতে।

Dhaka University Institutional Repository

পথে ঠাকুরদার সাথে দেখা। ঠাকুরদা তার বালকদের নিয়ে গান ধরলো : 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে/ তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে/ কোরো না বিড়ম্বিত তারে ।/ আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,/ আজি ভুলিয়ো আপন-পর ভুলিয়ো,/ এই সংগীতমুখরিত গগনে/ তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো ।/ এই বাহির-ভুবনে দিশা হারায়ে/ দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে ।/ অতি নিবিড় বেদনা বনমাঝে রে/ আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে ।'

গানটিতে কাউকে লক্ষ্য করে যেন বলা। এখানে রাজা যেন বসন্তরূপে এসেছে তাকে বরণ করে নিতে, রানী যেন দেরি না করে। রূপ-তৃষ্ণা, মান-অভিমান ক্রোধে রানী অনেক সময় নষ্ট করেছেন। ঠাকুরদা দরজায় ঘা দেবার গান বলতে মনের দরজা খুলবার কথাই বলেছেন। ঠাকুরদা নিজের গান দিয়ে রাজার বার্তা বলছেন। তাঁর এই শেষ গানে তিনি জানাচ্ছেন, 'সুদর্শনার হৃদয়দ্বার খুলবে এবং রাজাও তাকে ডেকে নেবেন ।'। তার মনে হয় রাজা লুকিয়ে আসেন তার কাছে। সুরঙ্গমা গান ধরে : 'অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে/ কখন তুমি এলে, হে নাথ, মৃদুচরণপাতে ।/ ভেবেছিলেম, জীবনস্বামী/ তোমায় বুঝি হারাই আমি -/ আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে ।/যে নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলেম আলো/ তারই মাঝে তুমি তোমার ধ্রুবতারা জ্বালো/ তোমার পথে চলা যখন/ ঘুচে গেল, দেখি তখন–/ আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চল সাথে ।'

এই গানটি যেন রানীর মর্মগাঁথা। রানী এতোদিন রাজার ভালোবাসা বুঝতে পারেনি। রাজা যখন তার সকল দর্প চূর্ণ করে সকলের কাছ থেকে মুক্ত করে তার সাথে দেখা না করে চলে যায়, তিনি অভিমান করেন রাজার উপর কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন রাজা তাকে সময় দিয়ে গেছেন। জোর করে ভালোবাসা আদায় করবেন না,বরং ভালোবাসা দিয়েই ভালোবাসা আদায় করবেন : 'রূপে তোমায় ভোলাব না/ ভালোবাসায় ভোলাব'। সেই ভালোবাসা এখন রানী উপলব্ধি করতে পারছেন। তবে খুব দ্রুতই সুদর্শনার অভিমান গলতে থাকে। তার বোধোদয় হতে শুরু করে যে রাজা তার কাছে আসবে না, তিনি তো যাবার দ্বার খুলেই রেখেছেন। তিনি জোর করবেন না, যখন রানী তার ভালোবাসা অনুধাবন করবেন, রূপের মোহ কাটিয়ে মনের আলোয় তাকে অনুভব করবেন তখন যেন ফিরে আসে। রাত্রি বেলা কোথা থেকে ভেসে আসা রাজার বীণাবাদন শুনতে পান তিনি। সুরঙ্গমা রাজার সাথে মিলিত হবার জন্য দীর্ঘ পথ হেঁটে চলবেন বলে সংকল্প করে।

Dhaka University Institutional Repository

রাস্তায় কাঞ্চীরাজের সাথে দেখা, সে ভুল বুঝতে পেরেছে এবং রানীকে মা সম্বোধন করেন। এদিকে সুদর্শনা দাসীর বেশে ভোরবেলা এসে রাজার রাজত্বে পৌঁছায়। রাজার প্রাসাদের সোনার শিখর দেখা দিচ্ছে। সেই মুহূর্তে সুরঙ্গমা গাইলেন : 'ভোর হল বিভাবরী, পথ হলো অবসান/শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরই গান।/ ধন্য হলি ওরে পান্থ/ রজনী জাগরক্লান্ত,/ ধন্য হল মরি মরি ধুলায় ধূসর প্রাণ।'

সব অভিমান লজ্জা ভুলে রানী ভোরবেলা এসেছেন রাজার রাজ্যে মিলনের জন্য। সেই বাণীই ধ্বনিত হচ্ছে এই গানে। এখন শুধু মিলন আর প্রাপ্তি। ঠাকুরদা রানীর বেশে সাজাতে চাইলে সুদর্শনা আপত্তি জানিয়ে বলে রাজা তাকে দাসীর বেশে সাজিয়েছেন, সে সাজেই তিনি রাজার কাছে যাবেন।

আবারো অন্ধকার ঘরে রাজার সাথে রানীর দেখা। রানী রাজার চরণের দাসী হিসেবে সেবা করার অধিকার চান। রাজা জানতে চায় তাকে সহ্য করতে পারবে নাকি। সুদর্শনা বলেন, 'পারব রাজা পারব। আমার প্রমোদবনে, আমার রানীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই এমন বিরূপ দেখেছিলুম। সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে। তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।' রাজা অন্ধকার ঘরের দ্বার খুলে দিয়ে বলেন, এখানকার লীলা শেষ হলো। এসো এবার আমরা বাইরে আলোয় যাই। সুদর্শনা নাটকের শেষ সংলাপটি বলেন, 'যাবার আগে আমার অন্ধকার প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।' অন্ধকারের রাজা আলোয় গিয়ে দাঁড়ালেন, সুদর্শনা আলোয় গিয়ে রাজার সাথে মিলিত হলো।

এই নাটকের 'আমি যখন ছিলেম অন্ধ' গানটি ১৩১৭ বঙ্গাব্দে রচিত হলেও, কেদারা রাগে রচিত গানটিতে কীর্তনাঙ্গ বেদনার সুর ব্যবহার করেন। সীতা দেবীর বর্ণনাতে জানতে পারা যায়, কোন এক প্রদর্শনীতে দর্শকদের গান তেমন জমছে না দেখে রবীন্দ্রনাথ পিছন হতে 'ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি' গানটিতে যোগ দেন। দর্শকরা নতুন প্রাপ্তিতে তৃপ্ত হলেন। তখন হঠাৎ যেন স্বর্ণবীণার ঝংকারে অভিনয়ক্ষেত্র পূর্ণ হয়ে যায়।[৪২]

'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' গানটি 'আজি কমলমুকুলদল খুলিল রে' গানটির সুরে। 'রাজা' নাটকে 'আজি দখিন দুয়ার খোলা', 'আজি কমলমুকুলদল খুলিল রে', 'পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে', 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' প্রভৃতি গান বসন্ত ঋতুর পরিবেশ এবং বাহারের সুরে অবয়বত্ব লাভ করে এক

Dhaka University Institutional Repository

অনুকূল মদির বাসন্তিক পরিবেশ রচনা করেছে। গানের ব্যবহার, ব্যবহারের যৌক্তিকতা, এবং এর ব্যঞ্জনাঘনিষ্ঠতাই এই নাটকের ধারাবাহিকতাকে ধরে রাখে। নাটকের যে তত্ত্ব বা সাংকেতিকতা, তার অসামান্য প্রকাশ ঘটেছে গানে। নাটকটিতে গানের আধিক্য ছিল। তবে গানগুলো নাটকের চলমান পরিস্থিতির বর্ণনা বা অবশ্যম্ভাবী ঘটনার বণর্নায় সহায়ক ছিল। ঠাকুরদা এবং সুরঙ্গমার গানগুলো নাটকের কাহিনি বর্ণনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এরমধ্যে অনেকগুলো গানই রবীন্দ্রনাথের রচিত শ্রেষ্ঠ প্রেমসংগীত। নাটকের বাইরেও এগুলো তাদের স্বকীয়তায় মহীয়ান। নাটকটির ২৫টি গানের মধ্যে ৯টি প্রেম, প্রকৃতি বসন্ততে ৫টি গান, ৬টি পূজা পর্যায়ের গান ছাড়াও বিচিত্র পর্যায়ের ৩টি গান, নাট্যগীতি ও স্বদেশ পর্যায়ের গান রয়েছে। প্রকৃতি বসন্ত পর্যায়ের গানগুলো বসন্তের রাগ বাহার এবং পিলুতে সুরারোপিত। এছাড়াও সুরের দিক থেকে ৫টি বাউল সুরের গান এবং ২টি কীর্তন গান রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের *মানসী* কাব্যে প্রকাশিত নারী হৃদয়ের বেদনা ‘তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে/ রূপ না দিলে যদি বিধি হে’ কবিতায় (১৮৮৮) প্রকাশ পেয়েছে। তাই যেন ধ্বনিত হচ্ছে ‘চিত্রাঙ্গদা’ কিংবা ‘রাজা’ নাটকে। গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ‘আমি রূপে তোমায় ভুলাবো না/ ভালবাসায় ভোলাব’। এ নাটকটি *খেয়া* কাব্যগ্রন্থ রচনার সময়কার। *খেয়ার* ‘শুভক্ষণ’, ‘ত্যাগ’, ‘কৃপণ’, ‘আগমন’ কাব্যে ‘রাজা’র কথা বলা হয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থে ‘রাজা’ কথাটিকে তিনি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। এই রাজা কখনো প্রভু, কখনো রাজেশ্বর। রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকেই রাজা এসেছেন নানারূপে। *খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির* পর্বে রাজা নাটকটি রচিত হয়। এ পর্বে কবি অসীমের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিচিত্র রূপ ও সমস্যা নানাভাবে উন্মোচিত করেছেন। *খেয়ার* শুভক্ষণ কবিতায় আঁধার ঘরের রাজার কথা অভিব্যক্ত হয়েছে - ‘ওরে দুয়ার খুলে দেরে, বাজা শঙ্খ বাজা/ গভীর রাতে এসেছে আজ আঁধার ঘরের রাজা।/ ডাকে শূন্যতলে বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,/ ছিন্ন শয়ন টেনে এনে আঙিনা তোর সাজা/ ঝড়ের সাথে হঠাৎ এলো দুঃখ দিনের রাজা।’

মূলত *খেয়া* কাব্যের শুভক্ষণ কবিতার আঁধার ঘরের এই রাজা এবং দুঃখ দিনের রাজা ‘রাজা’ নাটকের মূল প্রেরণা। অন্যদিকে *গীতাঞ্জলির* নানা কবিতায় ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার মধ্যে যে তৃপ্তি ও আনন্দ অভিব্যক্ত হয়েছে তারই রূপ লক্ষ্য করা যায় রাজা নাটকের সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদা চরিত্রদ্বয়ে। ‘আমার ধর্ম’ প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘খেয়া’র কোনো কোনো

Dhaka University Institutional Repository

কবিতার ব্যাখ্যা করে বলেছেন :

> "খেয়ার 'আগমন' বলে যে কবিতা আছে, সে কবিতায় যে মহারাজ এলেন তিনি কে? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ করে শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মনে করে নি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল, তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে তিনি আসছেন, পাছে তাদের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল– এলেন রাজা।"[৪৩]

এই সময়ের নাটকে প্রকৃতি পর্যায়ের গান বেশি। গানের দিক থেকে বাউল সুরের গান বেশি। নাটকগুলোতে স্বদেশি গানও দেখতে পাওয়া যায়।

১৯০৮ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ রূপত-সাংকেতিক তত্ত্বধর্মী নাট্যরচনা শুরু করেন। ইতিপূর্বে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪) নাটকে তিনি কিছুটা রূপক-সাংকেতিক আঙ্গিক ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ১৯০৮ সালের পর থেকে একের পর এক নাটক তিনি এই আঙ্গিকে লিখতে শুরু করেন। যেমন : 'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'রাজা' (১৯১০)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১৯১১–১৯২০ সাল পর্যন্ত রচিত নাটক

১৯১১ সাল থেকে ১৯২০ সাল, এই ১০ বছরে রবীন্দ্রনাথ মাত্র ৪টি নাটক রচনা করেন। এসময়কালীন রচনা 'অচলায়তন' নাটকটি রূপক নাটক। এই নাটকের মূল বক্তব্য 'বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে বাহিরের স্বাদ আস্বাদন'। বাকি নাটক ৩টি হলো 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী' ও 'গুরু'। ডাকঘর নাটকটি রচনার সময় কোন গান না থাকলেও মঞ্চস্থ করার সময় এতে গানের যোজনা হয়। অন্যদিকে 'ফাল্গুনী' নাটক হচ্ছে গানে ভরপুর। আর 'গুরু' নাটকটি 'অচলায়তন' নাটকের সহজ সংস্করণ। *গীতাঞ্জলি* (১৯০০), *গীতিমাল্য* (১৯১৪) ও *গীতালি* (১৯১৪) কাব্যগ্রন্থ এই সময়কার রচনা। কবি সংগীতের সহায়তায় গীতিকবিতার এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। জীবনদেবতার চরণে তার হৃদয়ার্ঘ্য সপে দিয়েছেন গীতসুধারসে। কোনটি গান কোনটি কবিতা আলাদা করে বোঝা যেত না। এরপর রচনা করেন *বলাকা* (১৯১৬) কাব্য। 'ফাল্গুনী' নাটকের ভিতর দিয়ে তিনি 'বলাকা'র ভাবটি প্রকাশ করলেন, আধ্যাত্মিক চিন্তার জায়গায় মর্ত্যজীবন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কবিতাগুলো সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন :

> "এই কবিতাগুলি প্রথমে সবুজপত্রের তাগিদে লিখতে আরম্ভ করি। পরে চার-পাঁচটি কবিতা রামগড়ে থাকতে লিখেছিলাম। তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময়ে পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল। এন্ডরুজ সাহেব এই সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমার তখনকার মানসিক অবস্থার কথা জানেন। এই কবিতাগুলি ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা আসছিল। হয়তো এদের পরস্পরের মধ্যে একটা অপ্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। এইজন্যই একে 'বলাকা' বলা হয়েছে। হংসশ্রেণীর মতনই তারা মানসলোক থেকে যাত্রা করে একটি অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা নিয়ে কোথায় উড়ে যাচ্ছে।"[৪৪]

১. অচলায়তন (১৯১১)

রবীন্দ্রনাথ "আমার ধর্ম" প্রবন্ধে 'অচলায়তন' সম্পর্কে লিখেছেন, "যে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে বোধে আমাদের মুক্তি 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'–

Dhaka University Institutional Repository

দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে– আতঙ্কে সে দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে। তাকে শত্রু বলেই মনে করি; তার সাথে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়। কেননা, 'নয়ামাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। অচলায়তনে এই কথাটাই আছে।"[৪৫] এছাড়াও অচলায়তনের গ্রন্থপরিচয় অংশে তিনি বলেন :

> " ধর্মকে প্রকাশ করিবার জন্য, গতি দিবার জন্যই, আচারের সৃষ্টি; কিন্তু কালে কালে ধর্ম যখন সেই-সমস্ত আচারকে নিয়মসংযমকে অতিক্রম করিয়া বড়ো হইয়া উঠে অথবা ধর্ম যখন সচল নদীর মতো আপনার ধারাকে অন্য পথে লইয়া যায়, তখন পূর্বতন নিয়মগুলি অচল হইয়া শুষ্ক নদীপথের মতো পড়িয়া থাকে– বস্তুত তখন তাহা তপ্ত মরুভূমি, তৃষাহারা তাপনাশিনী স্রোতস্বিনীর সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই শুষ্ক পথটাকেই সনাতন বলিয়া সম্মান করিয়া নদীর ধারার সন্ধান যদি একেবারে পরিত্যাগ করা যায় তবে মানবাত্মাকে করিয়া রাখা হয়। সেই পিপাসিত মানবাত্মার ক্রন্দন কি সাহিত্যে প্রকাশ করা হইবে না, পাছে পুরাতন নদীপথের প্রতি অনাদর দেখানো হয়?"[৪৬]

নাটকটি মূল্যায়নে শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য জানান :

> "রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও এ যাবৎকাল কোনদিনই ব্রাহ্মধর্মের সাক্ষাত সম্পর্কে আসেন নাই। তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়াও এ পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মের মূল আদর্শের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার গোঁড়ামি কিংবা নিষ্ঠার পরিচয়ও প্রকাশ পায় নাই। 'গীতাঞ্জলি'র যুগে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টির বিকাশ হয়, তাহার সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের ব্রহ্মবাদের আদর্শগত ঐক্য ছিল। এই সময় হইতেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি নানাভাবে সক্রিয় সহানুভূতি দেখাইতে থাকেন। এই সময়েই তিনি মাঘোৎসবে কলিকাতায় সর্বপ্রথম আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম-বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং ক্রমান্বয়ে কিছুকাল পর্যন্ত বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে ব্রাহ্মধর্মের মূল আদর্শ ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। এই সময় বক্তৃতা ও প্রবন্ধের ভিতর দিয়া ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁহার প্রবল সহানুভূতি প্রকাশ পায়। স্বধর্ম ও সমাজের প্রতি তাঁহার এই প্রবল সহানুভূতির যুগে হিন্দু সমাজের আচার-জীবনকে প্রচ্ছন্নভাবে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি রূপক নাট্য রচনা করেন, তাহার নাম 'অচলায়তন'। ইহা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়।"[৪৭]

অচলায়তন ছয়টি দৃশ্যে বিভক্ত। এ নাটকটিতেও গানের এক অসামান্য ভূমিকা রয়েছে। এই নাটকে ২৩টি গান ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম দৃশ্যের সূচনাতেই 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে' গানটি গেয়ে পঞ্চক নাটকের মূল বক্তব্যের আভাস দেয়। আনন্দ, উল্লাস ও বিষাদের গান রয়েছে এই নাটকে। দাদাঠাকুর বা বৈরাগী শ্রেণির চরিত্রসমূহ রবীন্দ্রনাথের উপর যাত্রার প্রভাবের কথা

Dhaka University Institutional Repository

স্মরণ করিয়ে দেয়। একটি কৃষি বিষয়ক ও একটি শ্রম বিষয়ক গান আছে এই নাটকে। গান দু'টি যথাক্রমে 'আমরা চাষ করি আনন্দে' ও 'যিনি সকল কাজের কাজি মোরা তাঁরই কাজের সঙ্গী'। নাটকের 'উতল ধারা বাদল ঝরে' গানটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত বর্ষাগীতি।
প্রথম দৃশ্যে অচলায়তনের গৃহে পঞ্চকের গান : 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে/ কেউ তা জানে না।/ আমার মন যে কাঁদে আপন মনে/ কেউ তা মানে না।/ ফিরি আমি উদাস প্রাণে/ তাকাই সবার মুখের পানে/ তোমার মতন এমন টানে/ কেউ তো টানে না।'

পঞ্চকের এই প্রস্তরগৃহ ভালো লাগে না। সে যেন কার ডাক শুনতে পায়, বাহিরের ডাক। কেমন টান অনুভব করে। এই টান সে এখানে পায় না। আসলে গানটিতে মুক্তির আহ্বানের কথা বলা হয়েছে। এই শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনে পঞ্চকের মন নেই। জগতের সমস্ত চলমান প্রেরণা থেকে এই অচলায়তন বিচ্ছিন্ন। এটি একটি আশ্রম। এখানে শিক্ষার্থী, আচার্য, উপাচার্য, উপাধ্যায়, অধ্যাপক, মহাপঞ্চক প্রমুখ বাস করে। বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। উচ্চপ্রাচীরে ঘেরা আশ্রমটি ভেতরে লোহার দরজা দিয়ে বন্ধ। এখানে ছাত্ররা বিভিন্ন তন্ত্রমন্ত্র মুখস্ত করে, সেই অনুযায়ী নানা কাজকর্ম করে এবং তাদের শাস্ত্রবিধি মতো চলাফেরা করে। এই নিয়মের লঙ্ঘন হলে মহাপাতক ঘটবে, তাই কেউ এই নিয়মের বাইরে যায় না এবং সবাই এই সুপ্রাচীন নিয়মে কঠিনভাবে বাধা। পঞ্চক এখানকার ছাত্র হলেও সে মনপ্রাণ দিয়ে এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। তার মন্ত্র মুখস্ত হয় না, তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। বাক্যে, আচারে সে শুধু অনিয়ম আর বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আর তাই মহাপঞ্চক তার কণ্ঠে গান শুনে রেগে ওঠে। যে কিনা বজ্রবিদারণ মন্ত্র মুখস্ত করতে পারে না এতো দিন হয়ে গেল, বজ্রকে বিদীর্ণ করে দেবার মন্ত্র আর সে কিনা মিহি সুরে গান গাইছে। পঞ্চক মহাপঞ্চকের ছোট ভাই। অর্ধেক গানের পর বড় ভাইয়ের চাপে বজ্রবিদারণ মন্ত্র শেখায় আবার মন দেয়, কিন্তু বেশি দূর শিখতে পারে না। শঙ্খ বাজায়ে মহাপঞ্চক সপ্তকুমারীগাথা পাঠ করতে চলে যায়। এই সময় পঞ্চক গানের বাকি অংশ গেয়ে শেষ করে : 'বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর,/ কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,/ বাহির হতে দুয়ারে কর/ কেউ তো হানে না।/ আকাশে কার ব্যাকুলতা,/ বাতাস বহে কার বারতা,/ এ পথে সেই গোপন কথা/ কেউ তো আনে না।'

বজ্রবিদারণ মন্ত্র প্রতিদিন সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তে ঊনসত্তরবার জপ করলে নব্বই বছর পরমায়ু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ খবরও তাকে উৎসাহিত করে না। বরং মন্ত্র শেখার সময় একেক মুহূর্তকে ঊনসত্তর বছর মনে হয়। তার মনে হয় নিত্য নিয়ত ভোরবেলা কে যেন পঞ্চম স্বরে ডাক পাঠাচ্ছে, এতে অচলায়তনের বন্ধ ঘর কেঁপে উঠছে। কিন্তু দরজা খুলছে না কেউ। আকাশে মুক্তির আহ্বানের ব্যাকুলতা, বাতাসে কার বারতা, কিন্তু সেই গোপন কথা এ ঘরে পৌঁছায় না। মুক্তি আর বন্ধন, অর্থহীণ আচার এবং সত্যের বৈপরীত্য তীব্র হয়ে উঠেছে পঞ্চকের গানে। অচলায়তন নাটকের মর্মার্থটি এই গানেই ফুটে উঠেছে। ছাত্রদল প্রবেশ করে তারা নানা প্রশ্নে পঞ্চককে যাচাই করতে চায় যে সে কোন কোন মন্ত্র জানে, কিন্তু সে কোনটাই আত্মস্থ করতে পারেনি। তারা তাকে অমনোযোগিতার জন্যে তিরস্কার করে এবং জানায় গুরু আসবেন। সত্যই কি আসবে, নাকি আসবে না– তা নিয়েও তর্ক চলে। শেষে মন দিয়ে মন্ত্র শেখার জন্য পরামর্শ দিয়ে বালকেরা চলে যায়। পঞ্চক গান ধরে : 'দূরে কোথায় দূরে দূরে/ মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে/ যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে/ সেই বাঁশিটির সুরে সুরে।/ যে পথ সকল দেশ পারায়ে/ উদাস হয়ে যায় হারায়ে,/ সে পথ বেয়ে কাঙাল পরান/ যেতে চায় কোন অচিন পুরে।'

অচলায়তনে পঞ্চক পোষ মানতে চায় না। তার মন দূরে যেতে চায় কিন্তু কোথায় জানে না। বাতাসে বাঁশির সুরে কান্না শোনা যায়, সেই সুরে তার মন দূরে দূরে ঘুরে বেড়ায়। পঞ্চকের কাঙাল পরান অচিনপুর যেতে চায়। সে মুক্তি খুঁজে বেড়ায়। প্রথম গানের পরিপূরক এই গান। টপ্পার এই সুর পঞ্চকের হৃদয় বেদনাকে আরো তীব্র করে তোলে। পঞ্চকের স্বভাব হচ্ছে সমস্ত নিয়ম ভাঙ্গা, কি ক্ষতি হতে পারে দেখার জন্য। এরমধ্যে সুভদ্র এসে জানায় সে মহাপাপ করে ফেলেছে। উত্তরের যেই জানালা তিনশ পঁয়তাল্লিশ বছর কেউ খোলেনি, সেটা সে খুলে ফেলেছে। পঞ্চক বলে সেও দেখতে চায় কি আছে বাইরে। সবাই জানতে চায় সে কি দেখেছে, ওখানে জটাদেবীর মন্দির। সবাই ভয় পেতে থাকে প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে হবে সেই নিয়ে। পঞ্চকের ধারণা সুভদ্রের প্রায়শ্চিত্তের দরকার নেই, বরং দরজা খুলে একটা সাহসের কাজ করেছে।

আচার্য ও উপাচার্য প্রবেশ করে তাদের গুরু এতোদিন পরে আসছেন সেই সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করছেন আবার সংশয়েও রয়েছেন– এতোদিন পর কেন আসছেন। অপরাধ কি বেশি হয়ে গেছে, কিন্তু তারা তো কঠিন তপস্যায় সবাইকে ব্যস্ত রেখেছে। দুজনের মনেই প্রশ্ন আসে, কি পেলেন তারা এই সাধনা করে? সাধনা কেবল 'আপনাকেই আপনি প্রদক্ষিণ করেছে'। দূরে পঞ্চককে দেখে তারা বলে, এই ছেলের ভিতর প্রবল অনিয়ম আছে। উপাচার্য আচার্যকে জানায় একটু

Dhaka University Institutional Repository

শাসন করে দিতে তাকে। পঞ্চক আসলে আচার্য তার গায়ে হাত দেয়। এতে পঞ্চক জানায় তাকে ধরতে গেল কেন, সে তো আচার মেনে চলে না। আচার্য তখন জানায়, 'তোমাকে যখন দেখি আমি মুক্তিকে যেন দেখতে পাই। এত চাপেও যখন দেখলুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতেই মরতে চায় না তখন আমি প্রথম বুঝতে পারলুম মানুষের মন মন্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতিপ্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য। যাও বৎস, তোমার পথে তুমি যাও। আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না।' এমনকি শোণপাংশুদের সঙ্গে যদি পঞ্চক মেশে তাতেও তার আপত্তি নেই। উপাধ্যায়, উপাচার্য, মহাপঞ্চক প্রবেশ করলেন। আচার্যের কাছে তাদের নিবেদন জানায় যে, সুভদ্রের জন্য যেন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা হয়। আচার্য জানায়, সুভদ্রের কোনো প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নেই। মহাপঞ্চকের ধারণা আচার্য সুভদ্রকে বাঁচাতে সনাতন ধর্মকে বিনাশ করলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য পাহাড় ও মাঠে। পঞ্চক গান গাইছে : 'এ পথ গেছে গো কোনখানে-/ তা কে জানে তা কে জানে।/ কোন পাহাড়ের পারে, কোন সাগরের ধারে,/ কোন দূরাশার দিক-পানে-/ তা কে জানে তা কে জানে।/ এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোনখানে/ তা কে জানে তা কে জানে।/ কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি,/ তা কে জানে তা কে জানে।'

মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় পঞ্চক দূরে পাহাড়ে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে এমন এক পথের কথা বলছে যে পথ কোথায় গেছে কেউ জানে না। কোন পাহাড়ে বা সাগরে, কেইবা আসে যায়, কেমন তার বাণী, কেমনইবা হাসিখানি, সে বলতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের নাটকের গানে পথ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তার গানে ঘুরেফিরেই পথের কথা আসে। পথ হচ্ছে মুক্তির বারতা। মুক্তিদাতার খোঁজ কেউ জানে না। গান শেষ করে পঞ্চক পিছন ফিরে দেখে শোণপাংশুরা নাচছে। কখন এসেছে জানতে চাইলে তারা জানায় নাচার সুযোগ পেলেই নাচে, পা দুটি ঠিক রাখতে পারে না। পঞ্চক জানায় অচলায়তনের গুরু আসবে শুনে তারা খুব অবাক হয়, তারা জানায় তাদের গুরু নেই, আছেন দাদা ঠাকুর। তাদের কানে কেউ মন্ত্র দেয় না। তাদের কাজ আছে, তাদের পথ কর্মের পথ। তারা চাষ করে, জানায় 'চাষ করি বৈ কি, খুব করি। পৃথিবীতে জন্মেছি, পৃথিবীকে সেটা খুব কষে বুঝিয়ে তবে ছাড়ি।' শোণপাংশুরা গান ধরে : 'আমরা চাষ করি আনন্দে / মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।'

শোণপাংশুরা কাজের মানুষ। তারা চাষ করে তবে সেটা কাজের কাজ সে হিসেবেই কেবল নয়।

Dhaka University Institutional Repository

ফসল না উঠলে অনাহারে থাকতে হবে, চাষের সাথে রয়েছে অন্ন। সকাল সন্ধ্যা মাঠে কেমন করে যে সময় কেটে যায় বোঝাই যায় না। কারণ তারা তা করে আনন্দের সাথে। মাঠের এই কাজের ভিতর দিয়ে শোণপাংশুদের চিত্তে দোলা দেয় প্রকৃতির লীলা।

'রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রানেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারই চন্দ্রে।'

এ যেন 'অচলায়তন'র বিপরীত চিত্র। এখানকার কাজ নিত্য নতুন, নব নব আলোকে উজ্জ্বল, নব নব বায়ুতে আন্দোলিত। সোনার রোদে, পূর্ণিমার চাদের আলোয়, চষা মাটির গন্ধে বিহ্বল। এ গানের শেষে পঞ্চক কাঁকুড় আর খেসারি ডালের চাষের আচারের নিরর্থকতা নিয়ে কথা বলার পর শোণপাংশুদের জিজ্ঞেস করে তারা লোহার কাজ করে কিনা। জবাবে তারা জানায় লোহার কাজ করে– বলেই গান ধরে : 'কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন,/ ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে!/ লক্ষযুগের অন্ধকারে ছিল সংগোপন,/ ওগো, তায় জাগাইনুরে।'

অচল হয়ে লোহা মাটির নিচে ছিল। মানুষের হাত লেগে তা সচল হয়ে গেছে। জীবনের নানা কাজে লেগে গেল। কতো রূপে কতো আকারে তাকে গড়ে তোলা যায়। শোণপাংশুরা অচলায়তনের নানা মন্ত্রের কথা জানে না, সেখানকার কল্পকাহিনিও শোনেনি। কিন্তু তারা প্রকৃতিকে জানে। গড়ে পিটে লোহাকে নানা আকার দিতে জানে, নদী পার হতে হলে অচলায়তনের লোকের কাছে যা কঠিন, তা তাদের জন্য সহজ, এরা নৌকায় উঠে যায় অনায়াসে। এদের দাদাঠাকুর কোনো কাজ করতে মানা করে নাকি এমন প্রশ্নে তারা গানে জানায় : 'সব কাজেই হাত লাগাই মোরা সব কাজেই/ বাধা বাঁধন নেই গো নেই।/ দেখি খুঁজি, বুঝি,/ কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,/ মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।/ পারি নাইবা পারি,/ নাহয় জিতি কিংবা হারি,/ যদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।/ আপন হাতের জোরে/ আমরা তুলি সৃজন করে,/ আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।'

Dhaka University Institutional Repository

গানে গানে তারা জানাচ্ছে, তারা শুধু চাষ করা বা লোহা পেটানো না, সব কাজেই হাত লাগান। কোনটা পারবে, কোনটা পারবে না– এমন হিসেব নেই তাদের। তারা দেখে, খোঁজে, ভাঙে, গড়ে, পারুক না পারুক সব কাজে হাত লাগায়। কর্মজীবি মানুষের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে এই গানে। গানের তালে পঞ্চকের পাও ভুলে নেচে ওঠে। গানটি গেয়ে তারা শিকারে বের হয়ে যায়। পঞ্চক নিজেকেই বলতে থাকে, এই শোণপাংশুরা বাইরে থাকে বটে, কিন্তু দিন রাত্রি এমনি পাক খেয়ে বেড়ায় যে বাহিরটা দেখতে পায় না। তারা পুঁথিতে হরেক রকম কথা পড়েছে কিন্তু এদের এসব বিদ্যা নেই। এরা যেখানে থাকে সেখানে একেবারে অস্থিরতার চোটে চতুর্দিক খুলে যায়। এরা একটু থামলে সমস্ত আকাশটা যেন গান গেয়ে ওঠে। এরা চুপ করলেই আর কিছু শুনতে পায় না। ওরা নিজেদের গোলমালটাই শুনে, সেইজন্য এত গোল করে। কিন্তু সেই আলোতে ভরা নীল আকাশটা তার রক্তের ভিতর গিয়ে কথা বলছে। তার সমস্ত শরীরটা গুনগুন করে বেড়াচ্ছে। এই বলে গান ধরে : 'ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে/ আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।/ আলোতে কোন গগনে/ মাধবী জাগল বনে/ এলো সেই ফুল জাগানোর খবর নিয়ে।'

অচলায়তন ও শোণপাংশুদের জীবনে যেই বৈপরীত্য সেই ব্যাপারটি পঞ্চক অনুভব করতে পারছে। শোণপাংশুদের কর্মপ্রবাহ পঞ্চকের প্রাণে যে অনুভূতি জাগাচ্ছে তাই যেন ভ্রমর। ঘর হচ্ছে তার মন। সে যথার্থ স্বরূপটি ধরতে পারছে না কিন্তু কিছু একটা পরিবর্তন এসেছে তার মনে। সে যে ক্রমেই শোণপাংশুদলের কর্মযোগের সঙ্গী হয়ে উঠছেন সে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে। দাদাঠাকুরের কাছে যাবার সময় তাকে ডাকলে তার যেতে ইচ্ছে করছে। এমন সময় ঠাকুরদা প্রবেশ করেন এবং তারা গান গাইতে শুরু করলো : 'এই একলা মোদের হাজার মানুষ/ দাদাঠাকুর।/ এই আমাদের মজার মানুষ/ দাদাঠাকুর।/ এই তো নানা কাজে।'

দাদাঠাকুর একলাই হাজার। তিনি মজার মানুষ। নানা কাজে, নানা সাজে, নানা খেলায় তিনি রয়েছেন শোণপাংশুদের সাথে। সুখে-দুখে, আনন্দ-বেদনায় তিনি রয়েছেন। তিনি ওদের মনের মানুষ। তিনিই মুক্তি। পঞ্চক দাদাঠাকুরের সাথে কথা বলতে চাইলে তারা বলে ওঠে দাদাঠাকুর অচলায়তনে গেলে সেখানকার পাথরগুলো নাচতে আরম্ভ করবে, পুঁথিগুলির মধ্যে বাঁশি বাজতে থাকবে।

দাদাঠাকুরের সাথে কথায় পঞ্চক জানায় তার মন উতলা হয়েছে। অচলায়তনে কোন প্রশ্নের

Dhaka University Institutional Repository

জবাব চাইলে মহাপঞ্চকদা হয়তো কোনভাবে উত্তর দিয়ে দেয়, কিন্তু দাদাঠাকুরের হাত ধরে সে যেই জগতে এসেছে সেখানে কোনকিছু বাঁধা-ধরা নেই। জবাব কার কাছে পাবে? অমনি দাদাঠাকুর গান ধরেন : 'যা হবার তা হবে/ যে আমাকে কাঁদায় সে কি অমনি রবে। / পথ হতে যে ভুলিয়ে আনে, পথ যে কোথায় সেই তা জানে,/ ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায় সেই তো ঘরে লবে।'

অচলায়তন থেকে পথ ভুলিয়ে একবার যখন তিনি পঞ্চককে বাইরে এনেছেন তখন তিনিই হাত ধরে তাকে ঘরে পৌঁছে দেবেন। এটি হচ্ছে আশ্বাসের গান। দাদাঠাকুরের বক্তব্য পঞ্চকের কোন ভয় নেই, শঙ্কার কারণ নেই। গন্তব্যে সে আপনিই পৌঁছে যাবে। গান শুনে পঞ্চক জিজ্ঞেস করে, দাদাঠাকুর এতো বড়ো ভরসা তুমি আমাকে কেমন করে দিচ্ছ? দাদাঠাকুর জানাচ্ছে আমার এক বন্ধু এমন মন্ত্র আমাকে পড়িয়েছেন যে তাতে চিরদিনের জন্য ভয়ের বিষদাঁত ভেঙে যায়। পঞ্চকের কৌতূহল কোথায় গেলে তার দেখা পাবে, কেমন করে তাকে পাওয়া যায়। যাকে পেলে অচলায়তন থেকে মুক্তি মেলে। সাথে এটাও জানায় তার মন শুধু দাদাঠাকুরের কাছে ঘুরে ফিরে আসে কারণ সে ভাবছে তিনিই তাকে মুক্তি ও মুক্তিদাতার সন্ধান দিতে পারবে। তিনি যেন তাকে জোর দেয়। সাথে গান ধরে : 'আমি কারে ডাকি গো/ আমার বাঁধন দাও গো টুটে/ আমি হাত বাড়িয়ে আছি/ আমায় লও কেড়ে লও লুটে।'

সে যে কাকে ডাকছে, পঞ্চক এখনো তাকে চেনে না। দাদাঠাকুর বলছেন, যে পঞ্চককে কাঁদিয়েছে সে কি অমনি রবে। এ গানে পঞ্চকের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বা নাটকের যে মূল উপজীব্য অচলায়তন থেকে মুক্তি, সে আকাঙ্ক্ষার কথা তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। গানের শেষে পঞ্চক জানতে চায় শোণপাংশুরা মুক্তিদাতার জন্যে কাঁদে নাকি। দাদাঠাকুর জানায় তাদের সে সময় নেই। ওরা শুধু কাজ করে, কাজ বাদ রেখে কিছু করতে তারা নারাজ। পঞ্চক দূর থেকে মেঘের গর্জন শুনতে পাচ্ছে, শুকনো মাঠ এবার ভিজে সবুজের আভা জাগাবে। সে মুক্তির আভাস পাচ্ছে। দাদাঠাকুর গান ধরলেন : 'বুঝি এলো, বুঝি এলো ওরে প্রাণ।/ এবার ধর দেখি তোর গান।/ ঘাসে ঘাসে খবর ছোটে/ ধরা বুঝি শিউরে ওঠে/ দিগন্ত ওই স্তব্ধ আকাশ পেতে আছে কান।'

পঞ্চকের বুকের মধ্যে আনন্দ হচ্ছে। এই মাটিকে তার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা হচ্ছে। দাদাঠাকুরকে বলছে, ডাকো ডাকো, তোমার একটা ডাক দিয়ে এই আকাশ ছেয়ে ফেলো। এই বলে গান

Dhaka University Institutional Repository

ধরে : 'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ/ তেমনি করে গাও গো ।/ যেমন করে চাইছে আকাশ/ তেমনি করে চাও গো ।'

দাদাঠাকুরের গানে জানিয়েছেন মুক্তিদাতা এলেন বলে। তার মনে হলো আকাশ গান গাইছে, আকাশ যেমন করে তাঁকে চাইছে তেমন করে তাঁর পক্ষেও চাওয়া দরকার। সে যেন কাঁদে কেননা সে তো শুনলো যে কাঁদায় সে কাঁদিয়ে দূরে থাকতে পারেন না। তার মনে গভীর আশা জাগছে। গানটি গেয়ে পঞ্চক অচলায়তনে ফিরে যেতে চাইছে। দীপকেতন পূজো চলছে সেখানে, অনেক কৃত্য এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। শোণপাংশুরা তাকে তাদের বনভোজনে অংশ নিতে বলছে। তার আর থাকার উপায় নেই জানিয়ে সে বাইরে গিয়ে আবার ফিরে এসে গান ধরে : 'হা রে রে রে রে রে/ আমায় ছেড়ে দে রে দে রে ।/ যেমন ছাড়া বনের পাখি/ মনের আনন্দে রে ।'

সে হয়ে উঠতে চায় বাঁধনহারা শ্রাবণধারার মতো, প্রচন্ড বাদলবাতাসের মতো, যেন কেউ তাকে আটকে না রাখতে পারে। সে চলতে চায় দাবানলের নাচনের মতো, ঝড়ের মেঘে বজ্রের মতন। প্রচন্ড এই গানের বাণী, সাথে সুর যেন পঞ্চকের মুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বনিত করছে। অচলায়তন বদ্ধ জায়গা, কিন্তু শোণপাংশুদের মধ্যেও কোথায় যেন বাঁধা। সব বাঁধা চিন্ন করে মুক্তির পথে চলার প্রত্যয়ই ব্যক্ত হয়েছে এই গানে। গানের শেষে পঞ্চক বনভোজন যেতে রাজি হয় কিন্তু এরমধ্যে খবর আসে স্থবিরক হয়ে ওঠার জন্য চন্ডক পোড়ো মন্দিরে তপস্যা করছিল, সেখানকার রাজা মন্থরগুপ্ত তাকে হত্যা করেছে। শোনা গেল সে দেশের রাজা রাজ্যের পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু প্রাচীরকে আশি হাত উচু করে তুলেছেন, সেখানে প্রবেশের বাধাকে আরো প্রবল করে তুলবেন বলে। আবার দশজন শোণপাংশুদের নিয়ে চলে গেলেন দেয়াল ভেঙে দেবার জন্য। আর পঞ্চককে পাটিয়ে দিলেন অচলায়তনে গুরুর জন্য অপেক্ষা করতে।

তৃতীয় দৃশ্যে আচার্য সব শুষ্ক আচার পালনের অবসান চাইছেন। গুরুর উদ্দেশ্যে তিনি বলছেন গুরু যেন প্রাণ দিয়ে প্রাণকে জাগিয়ে দেয়। এমন সময় পঞ্চক ছুটে এসে অচলায়তনবাসীদের তার গানের সঙ্গে নাচতে বলে। 'আজ নৃত্য কর রে নৃত্য কর' বলেই সে গান ধরে : 'ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে/ তারে আজ থামায় কে রে/ সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে/ তারে আজ নামায় কে রে ।'

পঞ্চকের মন মেতেছে মুক্তির আনন্দে। সুভদ্রকে মহাতামস ব্রত পালনে বাঁধা দিয়ে আচর্য ও

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চক সাথে করে নিয়ে যায়। জানালা খোলার শাস্তি হিসেবে তাকে এই ব্রত দেয়া হয়েছিল। এরমধ্যে রাজা মন্থরগুপ্ত এসে জানায় শোণপাংশুদের নিয়ে দাদাঠাকুর এ রাজ্যে আশি হাত উঁচু প্রাচীর ভেঙ্গে দিতে আসছেন। এ কান্ড সুভদ্রর পাপের জন্য হয়েছে। আর প্রায়শ্চিত্ত ব্রত পালনে বাধা দেয়ায় আচার্য অদীনপুণ্যকে নির্বাসিত করা হলো। পঞ্চকও স্বেচ্ছায় তার সাথে নির্বাসন গ্রহণ করে।

পঞ্চম দৃশ্যে দর্ভক পল্লীতে নির্বাসন পেয়েও পঞ্চকের কেন যেন স্বাধীন লাগছে না। সে গাইছে : 'এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে।/ তোরা আমায় বলে দে ভাই বলে দে রে।/ ফুলের গোপন পরানমাঝে/ নীরব সুরে বাঁশি বাজে-/ ওদের সেই বাঁশিতে কেমন মন হরেছে রে।/ যে মধুটি লুকিয়ে আছে/ দেয় না ধরা কারো কাছে/ ওদের সেই মধুতে কেমনে মন ভরেছে রে।'

দর্ভকরা যেন ঘরছাড়া মৌমাছি। মৌমাছিদের ঘর ছাড়া করে ফুলের পরানে বাজে যে নীরব বাঁশি, সে হচ্ছে মধু। এই মধু সরল ভক্তি। পঞ্চকের মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব। সে শোণপাংশুদের কর্ম-উদ্দীপনা দেখে এসেছে। প্রথমে ভালো লাগলেও পরে কাজ পাগলামিও এক ধরনের বন্ধন। দর্ভকের মধ্যে যে ভক্তি মধু রয়েছে তা তারা সংগ্রহ করেছে মৌমাছির মতো ফুলে ফুলে ঘুরে ঘুরে মৌচাকে অর্থাৎ প্রাণে। পঞ্চক তাতে অভিভূত। তারা শাস্ত্র জানে না কিন্তু নাম গান করে। গানটি : 'ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,/ ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি!/ ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,/ ও রতনের হার, ও পরানের বঁধূ!'

তারা আচার জানে না, বিচার বোঝে না, শাস্ত্র জানে না, মানতেও পারে না। তারা শুধু নাম দেয়, নাম নেয়, প্রেমভক্তিতে হৃদয় বিগলিত করে। অচলায়তনের কঠিন জ্ঞান সাধনার সাথে তাদের সহজ ভক্তি সাধনার বৈপরীত্যটি তীব্র। নাম গান শুনে পঞ্চক আরো একটি গান শুনতে চায়। তারা গাইছে : 'আমরা তারেই জানি তারেই জানি সাথের সাথি।/ তারেই করি টানাটানি দিবারাতি।/ সঙ্গে তারি চরাই ধেণু,/ বাজাই বেণু,/ তারি লাগি বটের ছায়ায় আসন পাতি।'

তাদের এই সহজ সরল স্বীকারোক্তি আচার্য ও পঞ্চককে আশ্চর্য করে দেয়। একদিন আগে সন্ধ্যায় এরা যখন কাজ থেকে ফেরে তখন গান ধরেছিল : 'পারের কান্ডারী গো, এবার ঘাট কি দেখা যায়?/ নামবে কি সব বোঝ এবার, ঘুচবে কি সব দায়?'

তখন আচার্যের মনে হয়েছে গা থেকে পাথর খসে গেল। দিনের পর দিন যার বোঝা বয়েছেন

Dhaka University Institutional Repository

অথচ কি সহজভাবেই না সেই কান্ডারীর খেয়ায় বসা যায়! আচার্য যেন সুভদ্রের কান্না শুনতে পাচ্ছে। এমন করে অচলায়তনবাসীরা দেবতাকে কাঁদাচ্ছে! পঞ্চক এই কথায় সায় দিয়ে গান ধরলো : 'সকল জনম ধরে ও মোর দরদিয়া / কাঁদাই কাঁদাই তোরে ও মোর দরদিয়া।'

এখানে দরদিয়া পরমেশ্বর। তাঁর জন্য পঞ্চকরা কাঁদে, তাঁকেও কাঁদায়। এর আগে ঠাকুরদা বলেছে তাঁর জন্যে যারা কাঁদে তিনিও তাদের জন্য কাঁদেন। দর্ভকদের মধ্যে যে অতি সহজ-সরল ভক্তি, আত্মনিবেদনের যেই সহজ শক্তি তা দেখে পঞ্চকের মন অন্যরকম হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ যেন ব্রাহ্মশাস্ত্রের কঠিন তত্ত্বপথ থেকে একেবারে লৌকিক সহজ পরমেশ্বর তত্ত্বে বেরিয়ে আসলেন। এখানে অচলায়তন হচ্ছে প্রাচীন প্রাণবিরোধী আচার জাল, নিয়মের নিগূঢ়ে অন্তসারশূন্য, সেই সাধনায় আসলেও পরমেশ্বরকে পাওয়া যায় নাকি তা নিয়ে সন্দীহান। অন্যদিকে শোণপাংশুদের আরেক ধরন। তারা কাজ পাগল। আর দর্ভকের ভক্তি সহজ সরল। আলোচনার মধ্যেই বজ্রের গর্জন শোনা গেল, সাথে বৃষ্টির ঘ্রাণ। উপাচার্যও অচলায়তন ছেড়ে চলে আসে। এরমধ্যে বৃষ্টি নেমে আসে। মাদল বাজিয়ে নৃত্যগীতে গাওয়া শুরু করে : 'উতল ধারা বাদল ঝড়ে সকল বেলা একলা ঘরে।/ সজল হাওয়া বহে বেগে পাগল নদী উঠে জেগে/ আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে তমালবনে আঁধার করে।'

গানটির একটি মর্মার্থ রয়েছে। দর্ভকদল বৃষ্টিকে দেখছে একভাবে, যেমন বৃষ্টি হবে, মাটি ভিজবে সরস হবে, মাঠে ফসল ফলবে, জলাশয়ে মাছেরা বেড়ে উঠবে, বনে বনে গাছের পাতা গভীর থেকে গভীরতর সবুজ হবে। আর এই তত্ত্ব নাটকে আচার্যের জন্য এবং পঞ্চকের জন্য আরেক ইঙ্গিত নিয়ে আসে এই বৃষ্টি। ড. করুণাময় গোস্বামী বলেছেন :

> " এই নাটকের সূচনা গ্রীষ্মে অর্থাৎ খরশুষ্ক সময়ে। সূচনা যেহেতু অচলায়তনকে কেন্দ্র করে, শুকনো প্রতিষ্ঠান, শুকনো সব আচার বিধান, গলা শুকিয়ে যাবার মতন মন্ত্রপাঠ, তাই গ্রীষ্মে নাট্যঘটনাপ্রবাহের সূচনা তত্ত্বসংগতই হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহে পরিবর্তন আসছে, অচলায়তনের বিধানকাঠামোটি ভেঙ্গে পড়ছে, মুক্তিদাতা গুরুর আগমন অনিবার্য হয়ে উঠেছে, শুকনো যুগ শেষ হয়ে সজল সরস যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে, দর্ভকদলের বর্ষাবন্দনা সংগীত তারই আভাষ দিচ্ছে।"[৪৮]

আচার্য পঞ্চককে বলছেন, 'আমাদেরও এমনিভাবে ডাকতে হবে, বজ্ররবে যিনি দরজায় ঘা দিয়েছেন তাঁকে ঘরে ডেকে নাও, আর দেরি করো না। বলেই গানে গলা মেলালেন : 'ভুলে গিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

জীবন মরণ লব তোমায় করে বরণ/ করিব জয় শরমত্রাসে দাঁড়াব আজ তোমার পাশে ।'

আচার্য আর পঞ্চকের মনে হচ্ছে পরমের সাথে মিলনের আর বেশি দেরি নেই । ঝরের রাতে তার সাথে অভয় পথে বাহির হবে । রবীন্দ্রনাথের নানা গানে ঝড়ের রাতে পরমেশ্বরের সাথে মিলনের কথা বার বার এসেছে। যেমন 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, পরাণ সখা বন্ধু হে আমার', কিংবা 'যে রাতে মোর দুয়ার গুলি ভাঙ্গলো ঝড়ে, জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে' ।

পঞ্চম দৃশ্যের শুরুতে সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত, চারদিক ভেঙে যাচ্ছে । গুরু আসছেন । বালকেরা প্রাচীর ভাঙ্গায় অচলায়তনে যে আলো ঢুকেছে তা দেখে খুশিতে পঞ্চকদা গান ধরেছে : 'আলো আমার আলো ওগো আলোয় ভুবন ভরা/ আলো নয়ন ধোওয়া আমার আলো হৃদয়হরা ।'

দেয়াল ধসে চারদিক থেকে আলো আসছে। এ আলো ভুবন ভরা, হৃদয়হরা। বিশ্বভুবনকে হাসিয়ে তোলা আলো। সবাই এই আলোকস্পর্শে মুক্ত হবে। গান শেষেই যোদ্ধার বেশে দাদাঠাকুর প্রবেশ করেন । তার সাথে অস্ত্রধারী শোণপাংশুর দল । মহাপঞ্চক মোটেই খুশি নয় তা দেখে । তখন দাদাঠাকুর শোণপাংশুদের মন্ত্র শুনিয়ে দিতে বলে । তারা গাইলো : 'যিনি সকল কাজের কাজি মোর তারি কাজের সঙ্গী ।/ যার নানা রঙের রঙ্গ, মোরা তার রসের সঙ্গী ।'

শোণপাংশুরা তাদের সকল কাজের কাজি অর্থাৎ পরমেশ্বর, তার সাথেই আছে। তারা তার কাজের সঙ্গী। কাজের ভিতর দিয়ে তিনি যে রঙ্গ করে বেড়াচ্ছেন, শোণপাংশুরা সেই রসে নিজেদের রাঙিয়ে তোলে । তারা চলে যায় আনন্দে, তিনি যখন ভেরী বাজান, সেই মতে তারা নাচে । মহাপঞ্চক খুব বিরক্ত কিন্তু দাদাঠাকুর তাকে উপেক্ষা করে বালকদের সাথে কথা বলে । তাদের খোলা মাঠে নিয়ে গিয়ে সাথে খেলার প্রস্তাব দেন । খেলায় কোন পাপ নেই ।

ষষ্ঠ দৃশ্য আরম্ভ হয় দর্ভকপল্লিতে পঞ্চকের গান দিয়ে : 'আমি যে সব নিতে চাই সব নিতে ধাই রে/ আমি আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে ।'

পঞ্চক এক সত্যের সন্ধান পেয়েছে যেখানে সে সব নিতে চায়, বুকের মধ্যে পথে বেরিয়ে পড়ার ডাকের বাঁশি বাজছে । মুক্তির পথ সে পেয়ে গেছে, দিকে দিকে তারি সাড়া পাচ্ছে । দভর্কদল এসে খবর দেয় অচলায়তনে যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং অচলায়তনের দেয়াল ভেঙে দিয়েছেন যোদ্ধারূপী গুরু দাদাঠাকুর । পঞ্চক আনন্দে অধীর হয়ে আচার্যকে জানায় তার বাসনা ছিল

Dhaka University Institutional Repository

কখনো যদি গুরুর সাথে দাদাঠাকুরের দেখা করিয়ে দিতে পারতো। দর্ভকদের নিয়ে সেও রাজি হয়ে যায় অচলায়তনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। নাটকের শেষ গান গেয়ে ওঠে : 'আর নহে আর নয়।/ আমি করি নে আর ভয়।/ আমার ঘুচল বাঁধন ফলল সাধন/ হলো বাঁধন ক্ষয়।'

অচলায়তনের পতন হয়েছে। তাকে আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। সকল দুয়ার খুলে গেছে, সে সকলের কাছে যাবে। যুদ্ধযাত্রার জন্য সে তৈরি হয়ে আছে। পবনবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে সে ভুবন জয় করবে। দর্ভকদের গোঁসাইঠাকুরও এই দাদাঠাকুর। তিন স্থানে তার তিন রূপ। তিনিই শোণপাংশুদের দাদাঠাকুর, অচলায়তনের গুরু এবং দর্ভকদের গোঁসাইঠাকুর। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন নতুন করে অচলায়তন গড়া হবে। তিনি পঞ্চক এবং মহাপঞ্চককে ডেকে এনে এদের হাতেই এই কঠিন ভবনকে নতুন করে গড়ে তোলার কাজ দিলেন।

নাটকটিতে গান কখনো কখনো পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বা গানের গূঢ় তত্ত্ব তুলে ধরেছে। যেমন অচলায়তনে বাসকালে পঞ্চকের গান : 'দূরে কোথাও দূরে দূরে/ মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে/ যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে/ সেই বাঁশিটির সুরে সুরে।/ যে পথ সকল দেশ পারায়ে/ উদাস হয়ে যায় হারায়ে/ সে পথ বেয়ে কাঙাল পরান/ যেতে চায় কোন অচিনপুরে।'

গানটিতে বন্দী জীবনে থেকে বাহিরের মুক্ত জীবনের স্বাদ আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষার রূপ ফুটে উঠেছে। নাটকটিতে গানগুলোর মাধ্যমে নাট্যসংকেত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। পঞ্চক, দাদাঠাকুর, শোণপাংশুদল, দর্ভকদল সবারই অন্তর্কথাটি প্রকাশ পেয়েছে গানে। শুধু কথা দিয়ে ভাবের এই তীব্রতা প্রকাশ পেত না। পঞ্চক, দাদাঠাকুর, শোণপাংশুদল, দর্ভকদল সকলের অন্তরতম কথাটি গানের মাধ্যমেই পরিস্ফুটিত হয়েছে। শুধু সংলাপের মাধ্যমে নাটকের নাটকীয়তা এতটা ভাবার্থ হতো না। চার দেওয়ালের বাইরে যে প্রাণবন্ত জীবন আছে, যে জীবন প্রকৃতির সংসর্গে প্রাণবান ও রসময় সেই জীবনের আবহম-ল রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন শোনপাংশুদের কণ্ঠে গীত 'আমরা চাষ করি আনন্দে', 'কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন', 'সব কাজে হাত লাগাই মোরা' ইত্যাদি গানের মাধ্যমে। ২৩টি গানের মধ্যে ৯টি পূজা, প্রেম ৩টি, বিচিত্র পর্যায়ের ৭টি গান রয়েছে। প্রেম ও প্রকৃতি পর্যায় ছাড়া বসন্ত ও বর্ষা ঋতুর গান রয়েছে। সুরের দিক থেকে ৬টি বাউল সুর ও ২টি কীর্তন সুরের গান রয়েছে নাটকটিতে। নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথ জড় ধর্মের প্রতি কঠিন আঘাত হেনেছেন। তিনি নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেন :

> "আমার লেখা পড়িয়া অনেকে বিচলিত হইবেন এ কথা আমি নিশ্চিত জানিতাম; আমি শীতলভোগের বরাদ্দ আশাও করি নাই। অচলায়তন লেখায় যদি কোন চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা বৃথা লেখা হইয়াছে বলিয়া জানিব। সংস্কারের জড়তাকে আঘাত করিব, অথচ তাহা আহত হইবে না, ইহাকেই বলে নিস্ফলতা।"[৪৯]

'*গীতাঞ্জলি*' (১৯১০) ও '*গীতিমাল্য*' (১৯১৪) পর্বে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন অচলায়তন। এ-পর্বে কবি দুঃখ-আঘাত-বিপদের মধ্যে পথ কেটে কেটে সাধনায় দেবতার সান্নিধ্যে উপনীত হবার প্রত্যাশা করেছেন।

২. ডাকঘর (১৯১২)

ডাকঘর রচনাকালে কবি আবেগে আপ্লুত ছিলেন। মনের ভিতরকার অব্যক্ত চঞ্চলতাকে রূপদানে কবি অস্থির হয়ে ওঠেন। কবি নিজেই বলেছেন :

> "ডাকঘর যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল।...প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল চল বাইরে, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হবে– সেখানকার মানুষের সুখ-দুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে। সেসময় বিদ্যালয়ের কাজে বেশ ছিলুম। কিন্তু হঠাৎ কি হলো। রাত দুটো-তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে পাখা বিস্তার করল। যাই যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল...আমার মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে। হয়তো মৃত্যু, স্টেশনে যেন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠতে হবে সেই রকমের একটা আনন্দ আমার মনে জাগছিল। যেন এখান হতে যাচ্ছি। বেঁচে গেলুম। এমন করে যখন ডাকছেন তখন আসার দায় নেই। কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে খুব একটা আবেগে সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে ডাকঘরে কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম। মনের আবেগকে একটা বাণীতে বলার দ্বারা প্রকাশ করতে হলো। মনের মধ্যে যা অব্যক্ত অথচ চঞ্চল তাকে কোন রূপ দিতে পারলে শান্তি আসে। ভিতরের প্রেরণায় (ডাকঘর) লিখলুম। এরমধ্যে গল্প নেই। এ গদ্য-লিরিক।...আমার মনের মধ্যে যে বিচ্ছেদর বেদন্ ততটা ছিল না। চলে যাওয়ার মধ্যে যে বিচিত্র আনন্দ তা আমাকে ডাক দিয়েছিল।"[৫০]

মাধব দত্ত ঠাকুরদাকে জানায় সে অমল নাম্নী এক ছেলেকে পালক পুত্র হিসেবে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু ছেলেটি শারীরিকভাবে অসুস্থ, তাই কবিরাজ তাকে ঘর থেকে বের হতে মানা করে গেছে। কিন্তু অমল বন্দি থাকতে চায় না। সে পুঁথিগত বিদ্যায় বিশ্বাসী না। সে চায় নিজের চোখে জগৎ দেখতে। রাস্তার ধারে ঘরে বসে সে দইওয়ালার মতো নানান জনকে আসতে দেখে। দইওয়ালার

সাথে গল্প করতে গিয়ে অমলের দইওয়ালা হতে মন চায়। এরমধ্যে আসে প্রহরী। সে জানতে পারে রাজার ডাকঘর হয়েছে। ডাক হরকরা চিঠি নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায় শুনে সেও ডাক হরকরা হতে চায়। তার খুব ইচ্ছে তাকে রাজা প্রতিদিন চিঠি পাঠাবে, কিন্তু সেই চিঠি কে পড়ে শোনাবে? তাই সে মোড়লকে ডাকে। আসে সুধা, আসে বালকের দল। এরমধ্যে ঠাকুরদাদা আসেন ফকিরের বেশে যে তাকে গল্প শোনায়, বাইরের বর্ণনা দেয়। কবিরাজ তাকে বাহিরের ঘরেও বসে থাকতে দেয় না। মোড়ল আর ফকির এসে জানায় রাজা চিঠি পাঠিয়েছেন, তার জন্য রাজ কবিরাজকে পাঠিয়েছেন। রাজ কবিরাজ এসে সমস্ত বন্ধ দুয়ার জানালা খুলে দেয়। রাজদূত এসে জানায় স্বয়ং রাজা আসছেন তার সাথে দেখা করতে। শেষ দৃশ্যে সমস্ত ঘর অন্ধকার করে দেয়া হয়। একটি তারার আলো ঘরে আসছে এবং অমল ঘুমিয়ে পড়ে। সুধা ফুল নিয়ে আসে তার জন্য। কিন্তু দেখা করতে পারে না তাই রাজ কবিরাজকে জানাতে বলে যায় যে অমলকে বলতে 'সুধা ভোলেনি তোমায়'। এখানে যেন বন্দী অবস্থায় অমলের মানবাত্মা বিশ্বের অসীমতার সাথে মিলনের পিপাসায় রয়েছে। তার অন্তরের আবেগ তরঙ্গ জেগে উঠেছিল সুদূরের সাথে মিলনের জন্য। এটি রূপক পর্যায়ের সাংকেতিক নাটক। এখানে রূপকের মধ্যে রয়েছে বাস্তবের স্তর এবং বাস্তবে রয়েছে রূপকের লীলা।

নাটক রচনার সময় সংগীত সংযোজিত না হলেও অভিনয়ের সময়ে নাটকটিতে বিভিন্ন সময় নানা গান যুক্ত ও বর্জিত হয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায় নাটকে সংগীতের অপরিহার্যতা। যেমন নাটকটি অভিনীত হবার সময় একবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মধাব দত্তের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় একটি গান গাইতে গাইতে নৃত্য করতে করতে চলে গিয়েছিলেন। গানটি নাটকে ছিল না।

১৯১৭ সালে বিচিত্রা হলে নাটকটি অভিনয়ের সময় সর্বপ্রথম 'হে দে গো নন্দরানী' (নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' থেকে নেয়া) গানটি গাওয়া হয়েছিল। শুরুর দিকে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে গানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯১৭ সালে নাটকটি অভিনয়ের সময় রবীন্দ্রনাথ নাটকের প্রাণকেন্দ্রে দর্শকের মনে পৌঁছাবার জন্য নিজের কবিতায় সুর বসিয়ে গাওয়ালেন, 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'। ভৈরবীর উদাস করা সুরের পর ঠাকুরদা গান ধরলেন, 'গ্রামছাড়া ওই রাঙ্গামাটির পথ' ('প্রায়শ্চিত্ত' নাটক থেকে গৃহীত)। নাটকের শেষ মুহূর্তে বালক অমলের কণ্ঠ নীরব হবার একটু আগে নেপথ্য সংগীতে বেহালায় করুণ সুরে বাজানো হয়– 'জীবনে যত পূজা হল না সারা'। এভাবে নানা ধরনের সংযোজন ও বর্জনের মধ্যে নাটকের

Dhaka University Institutional Repository

গানগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১৯১৭ সালের ১০ অক্টোবর বিচিত্রায় অভিনয়কালে

	গান	রাগ ও তাল	পর্যায়
১.	আমি চঞ্চল হে	ভৈরবী - দাদরা	বিচিত্র
২.	গ্রামছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ	বাউল - কাহারবা	বিচিত্র
৩.	বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে	মিশ্র পুরবী - একতাল	পূজা
৪.	হে দে গো নন্দরানী	ভৈরবী - দাদরা	বিচিত্র
৫.	ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি	বাউল - দাদরা	পূজা

১৯৩৯ সাল (আয়োজন হলেও মঞ্চস্থ হয়নি)

১.	আমরা দূর আকাশের নেশায় মাতাল	রামকেলী-ভৈরবী - দাদরা	নাট্যগীতি
২.	বাহির হলেম আমি আপন হতে	খাম্বাজ - ষষ্ঠী	নাট্যগীতি
৩.	এই তো ভরা হল ফুলে ফুলে	সুর অজ্ঞাত	নাট্যগীতি
৪.	শুনি ওই রুনুঝুনু	মল্লার - কাহারবা	নাট্যগীতি
৫.	সুরের জালে কে জড়ালে	সুর অজ্ঞাত	নাট্যগীতি
৬.	সমুখে শান্তি পারাবার।	মিশ্র পুরবী-কাহারবা	আনুষ্ঠানিক সংগীত
৭.	কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা	কীর্তন - দাদরা	নাট্যগীতি

দ্বিতীয় তালিকার গানগুলি নুতন লেখা হলেও দুটিতে ইচ্ছা অনুসারে কবি সুরারোপ করে উঠতে পারেননি। 'সমুখে শান্তির পারাবার' গানটি স্বতন্ত্র করে রাখা হয় তাঁর মৃত্যুর পরে গাইবার জন্যে। ২২ শ্রাবণ ১৩৪১ শান্তিনিকেতন মন্দিরে উপাসনায় গানটি সর্বপ্রথম পরিবেশিত হয় শান্তিদেব ঘোষের কণ্ঠে। গানটি পুনরায় কবির শ্রদ্ধাবাসরে গাওয়া হয় সমবেত কণ্ঠে। তবে গীতিযোজনায় রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত হতে পারেননি দেখে ডাকঘরের পরবর্তী সংস্করণে গানগুলি বাদ দেয়া হয়েছিল। গানছাড়া এই নাটকটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এন্ডরুজ সাহেবকে লিখেছিলেন :

> "Amal represent the man whose soul has received the call of the open road, he seeks freedom from the comfortable enclosure of habits sanctioned by the prudent and from walls of rigid opinion built for him by the respectable....there is the post office in front of the window, and Amal

Dhaka University Institutional Repository

> waits for the kings letter to come to him direct from the king, brining to him the message of emancipation. At last the closed gate is opened by the king's own physician and that which is death to the world of hoareled wealth and certified creeds, brings him awakening in the world of spiritual freedom."[৫১]

পর্যায়ের দিক থেকে বিভিন্ন সময়ে অভিনীত নাটকে গীত গানগুলোর বেশিরভাগই নাট্যগীতি পর্যায়ের, ৬টি গান রয়েছে এ পর্যায়ের। পূজা পর্যায়ের রয়েছে ২টি গান, বিচিত্র ৩টি এবং আনুষ্ঠানিক সংগীত পর্যায়ের ১টি গান।

গীতাঞ্জলি (১৩১৩-১৩১৭), *গীতিমাল্য* (১৩১৫-১৬), *গীতালি* (১৩২২) পর্বে রবীন্দ্রনাথ 'ডাকঘর' নাটকটি রচনা করেন। 'গীতাঞ্জলি'র যুগে রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যরচনা 'ডাকঘর'। এ সময়কালীন রচনায় প্রেম-সৌন্দর্য, মাধুর্যকে পাবার জন্য তার যে ব্যাকুলতা ছিল, তাই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এ নাটকে।

৩. ফাল্গুনী (১৯১৬)

রবীন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই রচনাটি উৎসর্গ করেছেন। উৎসর্গবাক্যে ফাল্গুনীকে তিনি নাট্যকাব্য হিসেবে অভিহিত করেন। গীতিভূমিকার গানগুলি ও সর্বশেষের উৎসবের গানটি একত্রে 'বসন্তের পালা' নামে নাটকের প্রবেশকরূপে এবং নাটক অংশটি 'ফাল্গুনী' নামে ১৯১৫ সালে সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়। ড. অরুনকুমার বসু বলেন :

> "তারুণ্যের প্রতি যৌবনের প্রতি কবির জয়তিলক বলাকা কাব্যেই ঘোষিত হয়েছিল, ফাল্গুনীতে তাকেই নাট্যের সুরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে মাত্র। বলাকার একটি কবিতায় কবি লিখেছিলেন যে, তাঁর বহুদিনকার ভুলে যাওয়া যৌবন পৌষের জীর্ণপত্র ঝরাবার অবকাশে কবির কাছে আমন্ত্রণ পাঠাল, 'উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে, অকস্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে।' সেই আমন্ত্রণের উত্তরেই কবি যেন তাঁর গানের লিপি প্রেরণ করলেন সেই ভুলে-যাওয়া যৌবনের কাছে; সেই লিপির নামই যেন ফল্গুনী।"[৫২]

সূচনাতে রাজোদ্যান। ইক্ষ্বাকু বংশের এক রাজা মন খারাপের জন্য রাজসভার কাজে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করছেন। কারণ হিসেবে মন্ত্রীকে বললেন, রানী গতরাতে গলায় মল্লিকার মালা পরাতে গিয়ে কানের কাছে দুটো পাকাচুল দেখেছে। রাজার কাছে এই চুল দুটো যমরাজের নিমন্ত্রণপত্র। রাজকাজ ভুলে তিনি শ্রুতিভূষণের বৈরাগ্যবারিধির চৌপদী শুনে আনন্দ পেতে চান।

প্রজাদের দুর্ভিক্ষের প্রতি তার কোন খেয়াল নেই। শ্রুতিভূষণের বৈরাগ্যসাধনের ফর্দে নিজের স্বার্থ পূরণ করছিলেন। এমন সময় কবিশেখর প্রবেশ করেন। কবি শেখর রাজার বৈরাগ্যসাধনের প্রকৃত সহচর হতে চেয়েছেন। তিনি রাজাকে বোঝান, জ্বরা নয় পরিপক্ক চুলের মধ্যে রাজা যৌবনকেই আবিষ্কার করছে। যে যৌবন প্রাণের ভিতর চিরন্তনরূপে বিরাজ করে। রাজা কবিকে প্রাণটা জাগিয়ে রাখার জন্য 'একটা নাটক, কিংবা প্রকরণ, কিংবা রূপক, কিংবা ভান, কিংবা-' কিছু একটা রচনা করার কথা বললেন। কবি জানান সে একটি নাটক রচনা করবেন কিন্তু তার প্রকরণ জানে না। দর্শক হিসেবে ডাক দিবেন তাদের যাদের চুলে পাক ধরেছে। কোন চিত্রপট নেই, আছে চিত্তপট। গানের চাবি দিয়ে একেকটি অঙ্ক খোলা হবে। এই কথাটিতেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ নাটকটিতে গানের অসামান্য ব্যবহার করবেন। এছাড়াও কবি জানায় নাটকটিতে থাকবে শীতের বস্ত্রহরণ। শীত বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্তরূপ দেখানো হয়েছে। গানের ভাব আর নাটকের ভাব পৃথক নাকি জিজ্ঞেস করায় কবি জানায়, 'বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে, আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্বকবির সেই গীতিকাব্য থেকেই তিনি ভাব চুরি করেছেন। নাটকের চরিত্রতে আছে সর্দার যে সকলকে চালিয়ে নেয়, আছে চন্দ্রহাস যাকে সকলে ভালোবাসে, আছেন এক অন্ধ বাউল যে চোখ দিয়ে না দেখে মন প্রাণ দিয়ে দেখে। আরেক পাত্র দাদা এবং রাজা স্বয়ং আছেন সেই নাটকে। সেখানে শীতের প্রস্থান ও বসন্তের নবীন আহ্বান বিষয়রূপে স্থান পায়। কবির থেকে জীবনের বাণী শুনে রাজা রাজকার্য ও মন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যের দায়িত্ব সম্পাদনে নিযুক্ত হন। এই হলো সূচনা অংশ। সূচনা অংশে কবির একটি গান আছে : 'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে / ডাক দিয়ে সে যায়।/ আমার ঘরে থাকাই দায়।'

নাটকের শুরুতে প্রথমদৃশ্যে গীতি ভূমিকা। নাটকটি রচিত হয়েছে রাজাকে বোঝাবার জন্য যে যৌবনের শেষ বলে কিছু নেই। এরই মধ্যে নবীনের আবির্ভাব এবং বেণুবন গান গাইছে : 'ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া/ দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।/ নূতন পাতার পুলক ছাওয়া/ পরশখানি দাও বুলিয়ে।'

বেণুবন দখিন হাওয়াকে স্বাগত জানাচ্ছে। নতুন পাতার পুলক ছাওয়া পরশ বুলিয়ে দিতে বলছে। বেণুবন বলছে সে পথের ধারের ব্যাকুল বেণু হঠাৎ ছোঁয়া পেয়ে কাঁপন জেগে উঠছে। শীতের শেষে বসন্তের মৃদু বাতাসের দান এই বেণুবনে। পাখির নীড় গেয়ে ওঠে : 'আকাশ

আমায় ভরলো আলোয়,/ আকাশ আমি ভরব গানে ।/ সুরের আবীর হানব হাওয়ায়/ নাচের আবীর হাওয়ায় হানে ।'

নীড়ের পাখি বলছে আকাশ আলো দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে, সে তার কলকাকলীতে আকাশকে ভরিয়ে দেবে । পলাশ ফুলকে ডেকে বলছে সে দিকে দিকে লাল রঙের শিখায় চারদিকে যেন আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, পাখির মনের রাগরাগিণী সেই রঙে রঙিন হয়ে যাচ্ছে । ফুলন্ত গাছ গেয়ে ওঠে : 'ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা,/ আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু/ গন্ধভরে তন্দ্রহারা ।/ আমি সদা অচল থাকি,/ গভীর চলা গোপন রাখি,/ আমার চলা নবীন পাতায়,/ আমার চলা ফুলের ধারা ।'

নদী তার আপন বেগে চলে যায় । চাঁপার তরু বসন্তে স্তব্ধ হয়ে তন্দ্রাহারা হয়ে গেছে । নদী শুধু চলে না, সেও চলমান, তার চলা দেখা যায় না । তার প্রাণ চলা নতুন পাতা জন্ম দেয়ায়, ফুল ফোটায় । প্রকৃতির মধ্যে তার চলার গতি । সাগরের বহমানতা সবার চোখে পড়ে কিন্তু গাছের নীরব বেড়ে ওটা বোঝা যায় না । এই নাটকটি কবির বলাকা যুগের রচনা । বলাকা রচনায় গতির কথা এসেছে বারবার । আর তাই বোধহয় বয়ে চলা গতি এখানেও বলেছেন ।

প্রথম দৃশ্যের ভূমিকা শেষ হয় এই তিনটি গান দিয়ে । প্রথম দৃশ্যের শুরুতে পথ । রবীন্দ্রনাথের সব নাটকেই পথের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে । যুবক দলের বসন্তের গান : 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে-/ ডালে ডালে ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় রে,/ আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে ।'

গানেই বোঝা যাচ্ছে ফাগুনের আগমনী । শীতের জড়তা দিনের পরে ফাগুন আসছে নতুন পাতা ফুল নিয়ে । বসন্তে নতুন পাতা আর ফুলের সমাহার । ডালে ডালে, পাতায় পাতায় এমনকি আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে । গানের শেষে দেখা যায় দাদা বের হয়ে এসেছেন বাইরে । সবাই বলছে ফাগুনের গুন কিন্তু চন্দ্রহাস বলছে 'দাদার তুলট কাগজের হলদে পাতাগুলো পিয়াল বনের সবুজ পাতার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি; দাদা খুঁজতে বের হয়েছে ।' দাদার সাদা চাদর কেড়ে নিয়ে রঙিন চাদর পরাতে হবে । কিন্তু তার বয়স হয়ে যাচ্ছে বলে জানালে চন্দ্রহাস জানায় তাকেও রঙ্গিন চাদর পরতে হবে । সবাই ব্যস্ত । দাদার জিজ্ঞেসে তারা জানায় বসন্তের খেলা খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা । সকলে গান ধরে : 'মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ/ জানিস নে কি ভাই ।/ তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই ।/ খেলা মোদের লড়াই করা,/ খেলা মোদের বাঁচা

Dhaka University Institutional Repository

মরা,/ খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই ।'

গানের গোলে সর্দার ঘর থেকে বের হয়ে আসে। সবাই গান গাচ্ছে কেন জিজ্ঞেস করলে চন্দ্রহাস জানায়: 'মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ/জানিস নে কি ভাই।' সর্দারও গেয়ে ওঠে : 'খেলতে খেলতে ফুটেছে ফুল,/ খেলতে খেলতে ফল যে ফলে,/ খেলারই ঢেউ জলে স্থলে ।/ ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে ।/ খেলার আগুন যখন লাগে/ ভাঙাচোরা জ্বলে যে হয় ছাই ।'

জগৎ জুড়েই খেলার আয়োজন। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত। ফুল সে খেলতে খেলতে ফোঁটে, ফলও ফলে খেলতে খেলতে। জলের ঢেউও খেলতে খেলতে বহে। কিন্তু দাদার এই খেলায় তাড়িয়ে বেড়ানো পছন্দ নয়। এসব তার কাছে ছেলেমানুষি। চন্দ্রহাস জানায়, 'আমরা যে কেবলই ছেলেমানুষ! সব জিনিসের সীমা আছে কেবল ছেলেমানুষির সীমা নেই।' তাদের কখনো বয়স হবে না। বয়স হলে চুল কামিয়ে ঘোল ঢেলে নদী পার করিয়ে দেবে। তারা গেয়ে ওঠে : 'আমাদের পাকবে না চুল গো মোদের/ পাকবে না চুল ।/ আমাদের ঝরবে না ফুল গো মোদের/ ঝরবে না ফুল ।'

নবযৌবনের দল চিরযৌবনের রহস্য গানে প্রকাশ করেছে। সর্দার গানে গলা মিলিয়ে বলে তারা নয়ন মুদে ধ্যান করবে না বা ঘরের কোণে বসে জ্ঞান খুঁজবে না। তারা স্রোতে স্রোতে ভেসে চলবে কোন কূলে ভিড়বে না। দাদাকে নিয়ে তারা শঙ্কিত। তিনি যেন মান্ধাতার আমলের বুড়োর মতন হয়ে গেছে। সর্দার জানায় নিজেদেরকে অফুরন্ত শক্তির দূত হিসেবে দেখছে নিজেদের। সমস্ত বুড়োমি দূর করতে হবে। সে বুড়োমিকে দূর করতে চায়। সে চন্দ্রহাসদের বলে সেই বুড়োকে ধরে নিয়ে আসতে, বসন্ত উৎসবে নিয়ে যাবে। এটাই হবে তাদের নতুন খেলা। নববসন্তের যৌবনের খোঁজে সবাই বের হয়েছে। তাদের আর ভয় নেই। সর্দার নির্ভয়ের গান ধরলো : 'আমাদের ভয় কাহারে ।/ বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে কি আমাদের করতে পারে ।'

দ্বিতীয় দৃশ্যের গীতি-ভূমিকায় প্রবীণের দ্বিধা ও দুরন্ত প্রাণের গান : 'আমরা খুঁজি খেলার সাথি ।/ ভোর না হতে জাগাই তাদের / ঘুমায় যারা সারা রাতি ।/ আমরা ডাকি পাখির গলায়, / আমরা নাচি বকুলতলায়,/ মন ভোলাবার মন্ত্র জানি,/ হাওয়াতে ফাঁদ আমরা পাতি ।'

তারা বলছে, তারা মন ভোলাবার মন্ত্র জানে, হাওয়াতে ফাঁদ পাততে পারে। মরণকে তারা মানে না। কালের ফাঁসি ফাঁসিয়ে দিয়ে তারা লুট করা ধন কেড়ে নেয়। কেউ আঁধারে যেতে চাইলেও

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে বাতি জ্বালিয়ে দেয়। এরপর শীত বিদায়ের গান : 'ছাড় গো তোরা ছাড় গো,/ আমি চলব সাগর-পার গো ।/ বিদায় বেলায় এ কি হাসি,/ ধরলি আগমনীর বাঁশি ।/ যাবার সুরে আসার সুরে/ করলি একাকার গো ।/ সবাই আপনপানে/ আমায় আবার কেন টানে ।/ পুরানো শীত পাতা-ঝরা,/ তারে এমন নূতন করা?/ মাঘ মরিল ফাগুন হয়ে/ খেয়ে ফুলের মার গো ।'

শীত চলে যাচ্ছে। বিদায় বাঁশির সাথে বসন্তের আগমনী বাঁশি বাজা শুরু হয়ে গেছে। একদিকে পুরোনো পাতা ঝরছে, অন্যদিকে নতুনের আগমন ঘটছে। মাঘ ফুলের উপস্থিতিতে ফাগুন হয়ে যাচ্ছে। এরপর শুরু নবীন বসন্তের গান : 'আমরা নূতন প্রাণের চর ।/ আমরা থাকি পথে ঘাটে/ নাই আমাদের ঘর ।/ নিয়ে পক্ক পাতার পুঁজি/ পালাবে শীত ভাবছ বুঝি ।/ ও সব কেড়ে নেব, উড়িয়ে দেব/ দখিন হাওয়ার পর ।/ তোমায় বাঁধব নুতন ফুলের মালায়/ বসন্তের এই বন্দীশালায় ।/ জীর্ণ জরার ছদ্মরূপে/ এড়িয়ে যাবে চুপে চুপে?/ তোমার সকল ভূষণ ঢাকা আছে/ নাই যে অগোচর গো ।'

নবীন বসন্ত বলছে তারা নূতন প্রাণের চর। তাদের ঘর নেই। শীত ভাবছে পুরোনো পাতার পুঁজি নিয়ে শীত পালাই পালাই করছে। তারা ওসব কেড়ে নেবে, উড়িয়ে দেবে দখিন হাওয়ায়। নতুন ফুলের মালায় শীতকে বন্দী করে বসন্তের বন্দীশালায় বাঁধবে। জীর্ণ জরার ছদ্মরূপে তাকে পালাতে দেবে না। উদ্ভ্রান্ত শীত গাইছে : 'ছাড় গো আমায় ছাড় গো-/আমি চলব সাগর-পার গো ।/ রঙের খেলার, ভাই রে,/আমার সময় হাতে নাই রে ।/ তোমাদের ওই সবুজ ফাগে/চক্ষে আমার ধাঁদা লাগে,/ আমায় তোদের প্রাণের দাগে/দাগিস নে ভাই, আর গো ।'

শীত পালিয়ে বাঁচতে চাইছে। তার হাতে বসন্তে রঙ্গীন হবার সময় নেই।

দ্বিতীয় দৃশ্যে ঘাটে। চন্দ্রহাসেরা এসেছে আদ্যিকালের বুড়োর সন্ধানে। মাঝির জিজ্ঞাসায় জানায় তারা তাকে বসন্তউৎসবে নিয়ে যাবে। শুনে মাঝিরা তাদের পাগল বলে অভিহিত করে। সেই পাগলামি স্বীকার করে চন্দ্রহাস গেয়ে ওঠে : 'আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে/কোথায় লুকিয়ে থাকে রে ।/ ছুটল বেগে ফাগুন হাওয়া/কোন খেপামির নেশায় পাওয়া ।/ ঘূর্ণা হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিল সূর্যতারাকে ।'

মাঝি বুড়োর খোঁজ দিতে পারে না। কিন্তু সে যেহেতু অনেক ঘাটে আসে-যায়, তাই তাকে জোর করতে থাকে। তবুও তাকে নিয়েই পথে বের হয়। গেয়ে ওঠে : 'কোন খেপামির তালে নাচে/

Dhaka University Institutional Repository

পাগল সাগরনীর ।/ সেই তালে যে পা ফেলে যাই,/ রইতে নারি স্থির ।/ চল্ রে সোজা, ফেল রে বোঝা,/ রেখে দে তোর রাস্তা খোঁজে,/ চলার বেগে পায়ের তলায়/ রাস্তা জেগেছে ।'

পথে কোটালের সাথে দেখা । কোটালকে বুড়োর কথায় জানায়, সেও চন্দ্রহাসদের খুঁজতে বের হয়েছে । কারণ জিজ্ঞেসে জানায়, 'সে নিজের হিমরক্তটা গরম করে নিতে চায়, তপ্ত যৌবনের পরে তার বড় লোভ ।' তার ধারণা সেটাও পাগলামি । চন্দ্রহাস যেতে চায়, কোথায় তা জানে না, চলতে চলতে ঠিক হয়ে যাবে– অর্থের উত্তরে গান গেয়ে বলে : 'চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে ।/ পথের প্রদীপ জ্বলে গো/ গগন-তলে ।/ বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি,/ ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,/ রঙিন বসন উড়িয়ে চলি/ জলে স্থলে ।'

গান ছাড়া তাদের উত্তর বের হয় না । সাদা কথায় অস্পষ্ট শোনায় কথা । গানেই তারা কথার স্পষ্টতা সুরে জানিয়ে দেয় : 'পথিক ভুবন ভালোবাসে/ পথিক জনে রে ।/ এমন সুরে তাই সে ডাকে/ ক্ষণে ক্ষণে রে ।/ চলার পথের আগে আগে/ ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,/ চরণঘায়ে মরণ মরে/ পলে পলে ।'

এরমধ্যে দাদা এসে হাজির হন । দাদা মাঝিকে চৌপদী শোনাতে চাইলে চন্দ্রহাসেরা তাড়া দেয় । এরপর দুটি গান– 'ভালোমানুষ নইরে মোরা' ও 'জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে ।' বালকেরা এসে জানায় বুড়োকে পাওয়া যাবে না, সে রথে চড়ে ধূলি উড়িয়ে কোন দিকে যেন চলে গেছে ।

তৃতীয় দৃশ্যের গীতভূমিকায় প্রবীণের পরাভব । বসন্তের হাসির গান : 'ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি । হায় হায় রে ।/ মরণ-আয়োজনের মাঝে/ বসে আছেন কিসের কাজে/ প্রবীণ প্রাচীন প্রবাসী । হায় হায় রে ।/ এবার দেশে যাবার দিনে/ আপনাকে ও নিক না চিনে/ সবাই মিলে সাজাও ওকে/ নবীন রূপের সন্ন্যাসী । হায় হায় রে ।'

বসন্ত হেসে প্রবীণ প্রাচীনদেরকে নবীন রূপের সন্ন্যাসী সাজতে আহ্বান জানাচ্ছে । গোপন প্রাণের পাগলকে প্রকাশ করতে বলছে । আছে আসন্ন মিলনের গান : 'আর নাই যে দেরি, নাই যে দেরি ।/ সামনে সবার পড়ল ধরা/ তুমি যে ভাই আমাদেরি ।'

এই গানে বলা হচ্ছে হিমের বাঁধন টুটে উত্তরের হাওয়া উজান কুঞ্জ ঘেরি ছুটেছে । জাদুকরের ভেরি বাজা শুরু হয়ে গেছে জলে স্থলে । সাদা রঙ রঙ্গিন হয়ে যাবে । বসন্ত এসে গেলো । তৃতীয় দৃশ্যের পটভূমি মাঠ, শিরোনাম সন্দেহ । চন্দ্রহাস ও তার সঙ্গীরা বুড়োর খোঁজে, গান গাইছে :

Dhaka University Institutional Repository

'মোর চলব না/ মুকুল ঝরে ঝরুক, মোরা ফলব না ।/ সূর্য তারা আগুন ভুগে/ জ্বলে মরুক যুগে যুগে,/ আমরা যতই পাই না জ্বালা/ জ্বলব না ।'

এরমধ্যে চন্দ্রহাস হাসিমুখে এসে জানায় বুড়োর খোঁজ পাওয়া গেছে । খোঁজ দিয়েছে অন্ধ বাউল । সে অন্ধ তাই তার রাস্তা খুঁজতে হয় না । ভেতর থেকে দেখতে পায় । কিন্তু সে গান না গাইলে রাস্তা খুঁজে পায় না, তাই পিছন পিছন ডাকে, আর গেয়ে যায় : 'ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে/ চলো তোমার বিজন মন্দিরে ।/ জানি নে পথ, নাই যে আলো,/ ভিতর বাহির কালোয় কালো,/ তোমার চরণশব্দ বারণ করেছি/ আজ এই অরণ্যগভীরে ।'

এ চলা কোন দিকে চলে বোঝা যায় না । বসন্তসমীরে তার বসনগন্ধ অনুসরণ করে হাওয়ার ইশারাতে চলছে সে বুড়োর খোঁজে ।

চতুর্থ দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা শুরু নবীনের জয়গানে : 'বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম/ বারে বারে ।/ ভেবেছিলেম ফিরব না রে ।/ এই তো আবার নবীন বেশে/ এলেম তোমার হৃদয়-দ্বারে ।'

যৌবন চলে গিয়েছিল কিন্তু আবার ফিরে এসেছে । বকুল, পারুল, আমের মুকুল ঝরে গিয়েছিল কিন্তু আবার ফিরে এসেছে । তারা বলছে এবার যখন তারা ঝরে যাবে তখন আর দুঃখ থাকবে না, কারণ তারা জেনে গেছে আবার ফিরে আসবে । নতুন আশায় গান গাইছে : 'এই কথাটি ছিলেম ভুলে-/ মিলব আবার সবার সাথে/ ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে ।'

পুরোনো আবার ফিরে আসে নতুন পাতায় । সে জেগে ওঠা নতুন করে যৌবনের জেগে ওঠা । এরপর বোঝাপড়ার গান : 'এবার তো যৌবনের কাছে/ মেনেছ, হার মেনেছ?/ মেনেছি ।/ আপন মাঝে নূতনকে আজ জেনেছ?/ জেনেছি ।'

এ বোঝা-পড়া যৌবনের কাছে, আপন প্রাণের কছে হারের বোঝা-পড়া । এবার নবীন রূপের গান : 'এতোদিন যে বসেছিলেম/ পথ চেয়ে আর কাল গুনে,/ দেখা পেলেম ফাল্গুনে ।'

শীতে প্রকৃতির আসল স্বরূপ হারিয়ে গেছে । ফাল্গুনে তাকে ফিরে পাওয়া যাচ্ছে । তরুণ হাসির আড়ালে আগুন রেখে যৌবন এসেছে নবীনরূপে, বীরের বেশে, এ হচ্ছে বিস্ময় ।

চতুর্থ দৃশ্য গুহাদ্বার, প্রকাশ । চন্দ্রহাস বাউলকে নিয়ে নদীর ওই পার গেছে । সকলেই বলছে এখানকার হাওয়া যেন কেমন । তারা শুধু বয়ে চলেছে, আশেপাশে দেখার সময় পায়নি । আজ দেখছে । এখানে এসে মনে হচ্ছে জগৎটা শুধু পাবার নয়, ছাড়ারও । গান গাইবার জন্য বুক

Dhaka University Institutional Repository

ফেটে আসে। গান ধরে : 'তুই ফেলে এসেছিস কারে। (মন, মন রে আমার)/ তাই জনম গেল শান্তি পেলি না রে। (মন, মন রে আমার)।'

কার সাথে যেন বিচ্ছেদ, পাওয়া না পাওয়ার বেদনা। গেয়ে নিজেরাই বলে ওঠে সুরটা যেন কেমনতর। ঝরা পাতার সুর। পৃথিবী কিছু পায় কিছু পায় না। এর ভিতরই কান্না পেতে পেতেই সব হারিয়ে যায়– 'আমি যাব না গো অমনি চলে।/ মালা তোমার দেব গলে।'

গান আসে তো সুর আসে না, এমনি গানের ভিতর বাউলের প্রবেশ। সবাই এসে তাকে ধরে, তারা খেলতে বের হয়েছিল। খেলা যে কি তাই ভুলে যাচ্ছে। বাউলকে গান গাইতে বললে, গেয়ে ওঠে : 'সবাই যারে সব দিতেছে/ তার কাছে সব দিয়ে ফেলি।/ কবার আগে চাবার আগে/ আপনি আমায় দেব মেলি।/ নেবার বেলা হলেম ঋণী,/ ভিড় করেছি, ভয় করি নি,/ এখনো ভয় করবো না রে,/ দেবার খেলা এবার খেলি।'

বাউলের ভাষ্য ফোঁটা ফুলের ঝরার আনন্দ হচ্ছে সে ঝরার পর ফল ধরায়। আসলে পৃথিবীতে কিছুই ফুরায় না। আমরা সবাই প্রকৃতির নিয়মে এগিয়ে চলছি। একটা পরিণামের দিক বয়ে চলাই জীবন। দাদা বা চন্দ্রহাসকে দেখা যাচ্ছে না। বাউল বললে, চন্দ্রহাস বেরিয়েছে পৃথিবী জয় করতে। খবর এসেছে মানুষের লড়াই শেষ হয়নি। যারা মরে তারাই অমর। বসন্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। যুগে যুগে মানুষ লড়াই করছে। আজ বসন্তের হাওয়ায় তারই ঢেউ। বাউল গাইল : 'বসন্তে ফুল গাঁথল আমার/ জয়ের মালা।/ বইল প্রাণে দখিন হাওয়া/ আগুন জ্বালা।'

আর কোনো পিছুটান নয়। বসন্তের ফুল জয়ের মালা গেঁথে দিয়েছে। আকাশ পাতালে যৌবনের ঝড় উঠেছে, সাথে নাচের তাল ঝংকারে মাতিয়ে দিয়েছে। বাতাসে সব পুরাতন উড়িয়ে নিয়ে যাবে। চন্দ্রহাসকে পাওয়া যাচ্ছে না। গুহাতে যাবার পর ফিরে আসেনি। বাউল তাদেরকেও রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাবে জানাচ্ছে, কিন্তু চন্দ্রহাসকে না পেয়ে তার প্রতি ভালোবাসাটা যেন তারা খুব বেশি অনুভব করছে, যা তারা সাথে থাকার সময় বোঝেনি– 'সে যে কী সুন্দর ছিল যখন তাকে চোখে দেখলুম তখন সেটা চোখে পড়েনি।' এমন বলাবলি করে গান ধরলো : 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম/ চোখের বাহিরে।/ অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহিরে।/ ধরায় যখন দাও না ধরা/ হৃদয় তখন তোমায় ভরা,/ এখন তোমার আপন আলোয়/ তোমায় চাহি রে।'

চন্দ্রহাসকে তারা দেখতে পাচ্ছে না। যদি আর না পায়– এই শঙ্কায় তাদের গান আর ভালো

Dhaka University Institutional Repository

লাগছে না। তাই বাউল গেয়ে ওঠে : 'হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে/ ওরে বীর, হে নির্ভয় ।/ জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ,/ জয়ী রে আনন্দ গান,/ জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম,/ জয়ী জ্যোতির্ময় রে ।'

বীরের জয় হবে, নির্ভয়ের জয় হবে, প্রাণ জয়ী হবে। নিরাশার মাঝে আশার গান। গান শেষ হতে না হতেই চন্দ্রহাসকে দূর থেকে দেখা যায়। কাছে এসে জানায় সে বুড়োকে ধরতে পেরেছে। কিন্তু সে জানে না বুড়ো কেমন। গুহা থেকে বের হয়ে আসে সর্দার। সে জানায় সেই বুড়ো। কিন্তু সর্দার শুধু বুড়ো নয়, সে নানারূপে দেখা দেয়। কখনো বালক রূপেও। তাকে নতুন নতুন রূপে পাওয়া যায়। বাউল বলে : 'তোমায় নতুন করে পাব বলে/ হারাই ক্ষণে ক্ষণ, / ও মোর ভালোবাসার ধন।/ দেখা দেবে বলে তুমি হও যে অদর্শন,/ ও মোর ভালোবাসার ধন।'

কোন কিছুই হারিয়ে যায় না। শুধু কিছুক্ষণের অদর্শন। সে আবারো জীবনের স্রোতে ফিরে আসে। এরপর প্রবেশ করেন দাদা। তিনি চৌপদী শোনাতে চাইলে সবাই না করে ওঠে। জানায় এবার হবে উৎসব। সকলে মিলে গান ধরে : 'আয়রে তবে মাতরে সবে আনন্দে/ আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।/ পিছনপানের বাঁধন হতে/চল ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,/ আপনাকে আজ দক্ষিণ হাওয়ায়/ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে,/ আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।'

এ উৎসব নবীন প্রাণের, বাঁধন ছিন্নের– সবকিছু নিয়ে অনন্তে ঝাঁপিয়ে পড়ার উৎসব।

'ফাল্গুনী' প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর একটি নাট্যোপহার। এতে সংগীতের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক দৃশ্যের সঙ্গেই একটি করে পৃথক গীতভূমিকা আছে। এ নাটকে সব চরিত্রের মুখে গান নেই। শুধু নবযৌবনের প্রতীক যারা তাদের কণ্ঠেই গান। তাই যুবকদল ও বাউল এতো সংগীতময় এই নাটকে যৌবনের দল। কবির মতে, তাদের চলার বেগে পথের বন্ধন খসে যায়, তাদের অমিত উৎসাহে জরার শাসন লোপ পায়। তারা দুরন্ত, দুর্বিনীত, প্রমত্ত, তারা অশান্ত, কাঁচা। নাটকটির 'আমাদের ভয় কাহারে', 'আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে', 'চলি গো চলি গো যাই গো চলে', 'ভালোমানুষ নই রে মোরা', 'আয় রে সবে মাত রে সবে আনন্দে'। গানগুলি হচ্ছে ফাল্গুনীর কবির যৌবনবন্দনা গীতি। এই গানগুলির সাথে সবুজের অভিযান কবিতার যৌবন-দর্শনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। গানগুলো তারুণ্যের গান। বিভিন্ন চরিত্রের কণ্ঠে গীত হলেও গানগুলো রবীন্দ্রনাথের কবি বিশ্বাস থেকে রচিত। তাই এগুলো নাটকীয়ভাবে থেকে আত্মভাবমূলক বেশি। গীতভূমিকার গানগুলো ঋতুসংগীত। নানাভাবে এখানে বসন্তের স্তুতি করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। তার কাছে বসন্ত ঋতু যৌবনের আরেক নাম। এই গানগুলির সবগুলোতে শিরোনাম আছে। রয়েছে বেণুবনের গান, পাখির নীড়ের গান, ফুলন্ত গাছের গান, শীতের গান, আসন্ন মিলনের গান, প্রত্যাগত যৌবনের গান, নতুন অশার গান, বোঝাপড়ার গান, আরও আছে নবীন রূপের গান। সবই ঋতুসংগীত। শুধু বাউলের গানগুলো বৈচিত্র্যময়। তবে কোনটিই বাউল সুরে রচিত নয়। বাউলের গানে নাটকটির অন্তর্নিহিত ভাবটি ফুটে উঠেছে : 'তোমায় নূতন করে পাব বলে / হারাই ক্ষণে ক্ষণে/ ও মোর ভালোবাসার ধন।'

২৬শে ফাল্গুন ১৯২১ জোড়াসাঁকোয় বৈঠক করে নাটকটি পড়ে শোনান হয়। একবার ফাল্গুন মাসে রবীন্দ্রনাথ ট্রেনে করে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ট্রেনের সেই দ্রুতগতি তার মনে এক আবেগের সৃষ্টি করে এবং সেই আবেগই এই নাটকের 'চলি গো চলি গো যাই গো চলে' এবং 'ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা' গান দুটির উৎস স্বরূপ।

এই নাটকে গানের ভিতর দিয়ে নিবিড়ভাবে বলা হয়েছে যে সবকিছুই চলমানতার মধ্যে আছে, সবই ফিরে ফিরে আসছে, অনন্তের মধ্যেই আছে, শীত সাময়িক আবৃত করে রাখে যৌবনকে, বসন্ত আসার সাথে সাথেই সে পূর্ণ উজ্জ্বলতায় প্রতিভাত হয়েছে। চলমানতাই জীবন, এই চলমানতার তত্ত্বকে, নতুন করে হারানো মাধুরীকে ফিরে পাবার তত্ত্বকে ফাল্গুনী নাটকের গানেই তীব্র হয়ে উঠেছে। জীবন-যৌবনের ঋতু বসন্তের গানের তাই অসামান্য সমারোহ এই নাটকে। ফাল্গুনী ঠিক নাটক নয়, গীতিনাট্যও নয়, একে কথার গ্রন্থনায় গানের সমারোহ বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সাথে নাটকের বা গানের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তা 'বলাকা'র সাথে 'ফাল্গুনী'র তুলনা করলেই বোঝা যাবে। দুটির মূলভাব এক। বলাকায় রয়েছে বিশ্বনিখিলে বয়ে চলা এবং যৌবনের চিরঞ্জীবতা। *গীতাঞ্জলি* পর্বে 'রাজা' নাটকটি যেমন গীতাঞ্জলির নাট্যভাষ্য, 'ফাল্গুনী' তেমনি *বলাকার* নাট্যপ্রেক্ষিত। '*বলাকা*'র মধ্যবর্তী পর্বেই ফাল্গুনী রচিত। 'বলাকা'য় যা ছন্দ, 'ফাল্গুনী'তে এসে তাই সংগীত, 'ফাল্গুনী'র ভিতর 'বলাকা'র সুর ধ্বনিত। 'বলাকা'য় যা রূপ, 'ফাল্গুনী'তে তা রূপক। 'বলাকা'র শুরুতেই আছে : 'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,/ ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,/ আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।'

কিংবা

'পৌষের পাতা-ঝরা তপোবনে/ আজি কী কারণে/ টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস।.../ শুধু আমি যৌবন তোমার/ চিরদিনকার,/ ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে

Dhaka University Institutional Repository

বারম্বার/ জীবনের এপার ওপার ।'

যৌবন নিয়ে একই সুর। কবিতাটি যেন 'ফাল্গুনী'র অলিখিত ভূমিকা। *বলাকা* কাব্য রচনায় যৌবনের স্তুতিই বেশি। যৌবনের প্রেমকেও নতুনভাবে আবিষ্কার করেছেন, যার প্রকাশ ঘটিয়েছেন গানের মাধ্যমে। নাটকটিতে ৩১টি গানের মধ্যে ৯টি রয়েছে প্রকৃতি বসন্ত, ৭টি পূজা, ৩টি প্রেম ও বিচিত্র পর্যায়ের গান। বাউল সুরে ১৩টি গান রয়েছে।

৪. গুরু (১৯১৮)

'গুরু' নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন "সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে 'অচলায়তন' নাটকটি 'গুরু' নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হইল।"[৫৩] নাটকটি সম্পর্কে ড. আলো সরকার বলেন :

> "'অচলায়তন' থেকে 'গুরু' নাটকে রূপান্তরিত সাধিত হয়েছে বর্জন-ক্রিয়ার মাধ্যমে এবং তা প্রধানত সঙ্গীত ও তত্ত্বালোচনার উপর পড়েছে। নাটকের ছয়টি দৃশ্য চারটিতে পরিণত এবং মূল নাটকের শোণপাংশু নামান্তরে যূণক হয়েছে। সমস্ত মানবসমাজকে ব্রাহ্মমুখী করার তীব্র প্রচেষ্টা 'অচলায়তন'-এ এবং এ নাটকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'গুরু'-তে পরিহাস প্রবণতার স্থলে প্রাধান্য লাভ করেছে দাদাঠাকুরের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক আনন্দবাদ ও ঐশ্বরিক ব্যঞ্জনা। কিন্তু এখানে গীতি-উচ্ছ্বাস বহু পরিমাণে সংযত ছিল– এর প্রধাণ কারণ রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন 'অচলায়তন'-এর গানগুলি গভীর অর্থবহ ও ভাবব্যঞ্জক হলেও নাট্যরস সৃষ্টির পক্ষে খুব প্রাসঙ্গিক ছিল না।"[৫৪]

গীতালি থেকে নেয়া 'ভেঙ্গেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়' গানটি চতুর্থ দৃশ্যে সমবেত কণ্ঠে নতুনভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। নাটকের ৭টি গান পূজা এবং বিচিত্র পর্যায়ের। ৩টি গানের সুর বাউল।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ প্রধানত শান্তিনিকেতনে মঞ্চ তৈরী করে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অভিনয়ের দল গড়ে মঞ্চস্থ করতেন। কখনও কখনও কলকাতায় গিয়েও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করতেন তিনি। এই সব নাটকেও একাধিক চরিত্রে অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ। তার মধ্যে ১৯১১ সালে শারদোৎসব নাটকে সন্নাসী এবং রাজা নাটকে রাজা ও ঠাকুরদাদার যুগ্ম ভূমিকায় অভিনয় ; ১৯৪১ সালে অচলায়তনে অদীনপূণ্যের ভূমিকায় অভিনয়; ১৯১৫ সালে ফাল্গুনী নাটকে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অভিনয় ; ১৯১৭ সালে ডাকঘর নাটকে ঠাকুরদা, প্রহরী ও বাউলের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১৯২১–১৯৩০ সাল পর্যন্ত রচিত নাটক

১৯২১–১৯৩০ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ১৪টি নাটক রচনা করেছেন। এসময় রচিত *পূরবী* (১৯২৫), *মহুয়া* (১৯২৯) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে কবি প্রেমকে আবার উপজীব্য করেন।

১. মুক্তধারা (১৯২২)

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ঐতিহাসিক কাহিনিই এই নাটকের বিষয়বস্তু। পূর্ব পরিকল্পিত নাম ছিল 'পথ'। পরে নাম পরিবর্তন করে 'মুক্তধারা' নামকরণ করেন। শ্রীমতী রানু অধিকারীকে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "শেষ হয়ে গেছে, তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা প্রায়শ্চিত্ত নয়, এর নাম 'পথ'। এতে কেবল প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে। আর কেউ নেই। সেই গল্পের কিছু এতে নেই। সুরমাকে এতে পাবে না।"[৫৫] ১৯২১ সালে কালিদাস নাগকে লিখিত একটি চিঠিতে (২১ বৈশাখ ১৩২৯) রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধারা' সম্বন্ধে লিখেছেন :

> "আমি 'মুক্তধারা' বলে একটি ছোটো নাটক লিখেছি, এতদিনে প্রবাসীতে সেটা পড়ে থাকবে। তার ইংরেজী অনুবাদ মর্ডান রিভিউতে বেরিয়েছে। তোমার চিঠিতে তুমি machine সম্বন্ধে যে আলোচনার কথা লিখেছ সেই machine এই নাটকের একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করেছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিত ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষমশোচনীয়তা আছে - কেননা যে-মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে - তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। আমার নাটকে অভিজিত হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ। নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্য সে প্রাণ দিয়েছে। আর ধনঞ্জয় হচ্ছে যন্ত্রের হাতে মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। সে বলছে 'আমি মারের উপরে; মার আমাতে এসে পৌঁছয় না– আমি মারকে না-লাগা দিয়ে জিতব, আমি মারকে না-মার দিয়ে ঠেকাব।' যাকে আঘাত করা হচ্ছে সে সেই আঘাতের দ্বারাই আঘাতের অতীত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু যে-মানুষ আঘাত করছে আত্মার ট্রাজেডি তারই– মুক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণ দিয়ে ভাঙবার ভার তারই হাতে। পৃথিবীতে যন্ত্রী বলছে, 'হে মন, মারকে ছাড়িয়ে উঠে জয়ী হও।' আর নিজের যন্ত্রে নিজে বন্দী মানুষটি বলছে, 'প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে- মুক্তি দিতে হবে।' যন্ত্রী হচ্ছে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্ছেন ধনঞ্জয়, আর মানুষ হচ্ছে

অভিজিত ।”৫৬

উত্তরকূট রাজ্যটি পার্বত্য অঞ্চলে, সেখানকার উত্তরে ভৈরব মন্দিরে যাবার রাস্তা । ভৈরব মন্দিরের ঠিক উল্টাপার্শ্বে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথা দেখা যাচ্ছে । কাছেই রাজা রণজিত অপেক্ষা করছেন মন্দিরে আরতী দিতে যাবার জন্য । তার সভার যন্ত্ররাজ বিভূতি বহু বছরের সাধনায় লৌহযন্ত্রের বাঁধ তুলে মুক্তধারা ঝরনাকে বেঁধেছেন । এই অসামান্য কীর্তিকে পুরস্কৃত করার জন্য উত্তরকূটের সমস্ত লোক ভৈরব-মন্দির প্রাঙ্গণে উৎসব করতে যাচ্ছে । সন্ন্যাসীরা গানের মাঝে মাঝে তালে তালে ঘণ্টা বাজাচ্ছে : ‘জয় ভৈরব, জয় শংকর,/ জয় জয় জয় প্রলয়ংকর,/ শংকর শংকর ।/ জয় সংশয়ভেদন,/ জয় বন্ধনছেদন,/ জয় সংকটহর/ শংকর শংকর ।’

গানটির মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে ভৈরব কারো নিজস্ব দেবতা নয় । উত্তরকূটের রাজা প্রজা সকলে মিলে তাকে যেই পূজা দিতে যাচ্ছেন এই ভেবে যে মুক্তধারায় বাঁধ দেয়াটা ভৈরবের আশীর্বাদপুষ্ট । মুক্তধারা সকলের, তা ভৈরবের দান, বিভূতি একে বাঁধ দিয়ে আটকে দেবার কেউ নয় । সন্ন্যাসীদের এই গানে ভৈরব প্রলয়ংকর, সংশয়ভেদন এবং সকল সংকট হরণকারী । শিবতারাইয়ের জনগণের জন্য যে সংকট উপস্থিত হচ্ছে, তা নিশ্চয়ই তিনি মুক্ত করবেন । যন্ত্রটি গড়নের দিক দিয়ে যেন মন্দিরকে ঢেকে দিয়েছে । অনেকটা স্পর্ধার মতন । এখানেই যেন নাটকটির একটা রূপরেখা পাওয়া যায় যে মুক্তধারা সকলের জন্য ছিল তা ঈশ্বরের দান, কিন্তু মানুষ তাকে বাঁধ দিয়ে বেঁধেছে । এতে বাঁধের আকৃতি মন্দিরকে ঢেকে কেমন উদ্ধত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে । যেন ভৈরবের সাথে যন্ত্রদানবের প্রতিযোগিতা । সকলে যন্ত্রের সাথে বিভূতির জয়গান গাইছে – ‘নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র ।/ তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত,/ তুমি বজ্রবাহ্নিবন্দিত,/ তব বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ/ ধ্বংসবিকট দন্ত ।’

গানটি যন্ত্রবন্দনা সংগীত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটিতে যন্ত্রের ভয়ঙ্কর রূপ বর্ণনা করা হয়েছে । উত্তরকূটের রাজশক্তি ও যন্ত্রশক্তি মিলিত হয়েছে কায়েমি স্বার্থের পটভূমিতে । গানের জটিল জটিল শব্দগুলো যেন যন্ত্রের কূটরূপ প্রকাশ করছে ।

শিবতরাইয়ের প্রজারা ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে দুই বছর খাজনা দেয়নি । কারণ দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তাদের দেবার মতন কিছু ছিল না । মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা যুবরাজ অভিজিতকে শিবতরাইয়ের বিদ্রোহ দমনে শাসনভার দিলেও তিনি ততটা নিষ্ঠুর হতে পারেননি । বরং তিনি সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের উপার্জন সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করতে থাকেন । সেখানে প্রচুর পশম

উৎপাদিত হতো, বাইরে যাবার পথটি রুদ্ধ থাকায় তা করা যাচ্ছিল না। আর তাই তারা উত্তরকূটের জনগণের উপর নির্ভরশীল ছিল। অভিজিত সেই নন্দী সংকটের পথ কেটে মুক্ত করায় সহজেই শিবতরাইর প্রজারা পশম বাইরের বাজারে বিক্রি করতে পারলো এবং অভিজিতের বনন্দা করতে থাকলো অন্যদিকে উত্তরকূটের প্রজারা ক্ষেপে গেল। রাজা ও মন্ত্রীর আলাপের মধ্যে ভৈরবপন্থিদলের আগমন ঘটলো গান গাইতে গাইতে : 'তিমিরহৃদবিদারণ/জ্বলদগ্নিনিদারুণ/ মরুশ্মশানসঞ্চর।/ শংকর শংকর।/ বজ্রঘোষবাণী/ রুদ্র, শূলপাণি/মৃত্যুসিন্ধুসন্তর/শংকর শংকর।'

যন্ত্রের বন্দনা সংগীতের পর পর গাওয়া এই গানটি ভৈরব বন্দনার গান। এই গানটি সম্পর্কে ড. করুণাময় গোস্বামী বলেছেন :

> "যন্ত্র নিয়ে গাওয়া গানের পরপরই ভৈরবকে নিয়ে গান উপস্থাপনার বিষয়টি বৈপরীত্য প্রকাশের জন্য করা হয়েছে বলে মনে হয়। বৈপরীত্য প্রকাশ পেয়েছে ভৈরবমন্দিরের চূড়ো ও বাঁধের লৌহ দন্ডের পাশাপাশি ও আড়াআড়ি অবস্থানে। ভৈরবকে এখানে রুদ্ররূপে বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রশ্ন জাগে এমন যে, মানুষের সর্বজনীন অধিকার যেখানে অস্বীকৃত, দেবতার অপার দানকে যেখানে হীন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থে অধিকার কষে নেয়া হয়েছে, রুদ্র কি সেখানে মানুষের সেই অনুচিত স্পর্ধাকে লজ্জিত করবেন, বাঁধ কি ভাঙবে, ঝরনা কি শিবতরাইর মানুষের জন্যে মুক্ত হবে, সাম্রাজ্যবাদের নির্বোধ ঔদ্ধত্য কি শাস্তি পাবে? ভৈরবস্তরের দুটি গানই মহাসংগীত। বিশ্বদেবতাকে, বিশ্বকল্যাণদাতাকে এখানে প্রশংসা করা হচ্ছে। আর যন্ত্র নিয়ে রচিত প্রথম গানটিতেই তার দুর্ব্যবহারে মানুষের অমঙ্গল ঘটবার জন্যে তাকে উপহাস করা হচ্ছে।"[৫৭]

গানের পর রণজিতের খুড়া মোহনগড়ের রাজা বিশ্বজিৎ এসে জানান তাদের এই পূজা ভৈরব গ্রহণ করবেন না। শিবতরাইর লোকদের জলকষ্ট দিয়ে তারা যেই আনন্দ করছে তাতে ভৈরব সন্তুষ্ট হবে না, কারণ ভৈরব সকলের। তাঁর দান মুক্তধারার উপর সবার অধিকার। তিনি আরও বলেন নন্দিসংকটের পথ খুলে দিয়ে অভিজিত ঠিক করেছেন। যেহেতু সেই পথ সকলের, যেমন উত্তরকূটের তেমন শিবতরাইয়ের। এরপর অম্বা প্রবেশ করে জানায় তার পুত্র সুমন বাঁধ তৈরির কাজে গিয়ে এখনো ফিরেনি। গাছের তলায় গুরুমশাই রাজার জয়ধ্বনি দিতে শেখাচ্ছেন– 'জয় রাজরাজেশ্বর, শ্রী উত্তরকূটাধিপতির জয়'। দ্বিতীয়দল নাগরিক প্রবেশ করে এবং বিভূতির সমালোচনা করে বলে যে ঝগড়ু এই বাঁধের দুর্বল জায়গাটি বের করে ফেলেছে যেখানে আঘাত করলে বাঁধ ভেঙে যাবে। বটকু আসে, সেও জানায় তার দুই জোয়ান নাতিকে নিয়ে যাওয়া

হয়েছিল আর ফেরেনি তৃষ্ণা দানবীর কাছ থেকে। যুবরাজ অভিজিতকে দেখা যায় রাজকুমার সঞ্জয়ের সাথে। রাজপ্রহরীর প্রশ্নোত্তরে অভিজিত জানায় শিবতরাইয়ের লোকদের নিত্যদুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচানোর জন্য সে নন্দিসংকটের পথ খুলে দিয়েছে। আবারো অম্বার প্রবেশ ছেলের সন্ধানে। ভৈরবপন্থিরা আবারো গাইতে গাইতে আসে : 'জয় ভৈরব, জয় শংকর,/ জয় জয় জয় প্রলয়ংকর,/ শংকর শংকর।/ জয় সংশয়ভেদন,/ জয় বন্ধনছেদন,/ জয় সংকটহর/ শংকর শংকর।'

ভৈরব হচ্ছে মুক্তিদাতা, মঙ্গলদাতা। নাটকের এমন নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে গানটির একটি তাৎপর্য রয়েছে। ভৈরব এ মুহূর্তে কাকে সমর্থন করবে। এরমধ্যে বিজয়পাল এসে জানায় মহারাজ তাকে ডেকেছে এবং তাকে নিয়ে যায়। বাউল গাইতে গাইতে প্রবেশ করে : 'ও তো ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না রে।/ ঝড়ের মুখে ভাসল তরী,/কুলে আর ভিড়বে না রে।/ কোন পাগলে নিল ডেকে,/ কাঁদন গেল পিছে রেখে,/ ওকে তোর বাহুর বাঁধন ঘিরবে না রে।'

নাটকের এই পর্যায়ে এই গানটি যেন নাটকের ভবিষ্যৎ বলে দিচ্ছে। রাজা অভিজিতকে নিয়ে গেলেন। বাউল তিনবার 'ফিরবে না রে' বলার মাধ্যমে যেন বার বার প্রাতষ্ঠিত করতে চাইছেন এই যাওয়াই শেষ যাওয়া। নাটকের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির এক প্রতিফলন রয়েছে এই গানে। অনেকটা যাত্রা নাটকে বিবেকের গানের মতো। কি ঘটতে যাচ্ছে তা আগেই বর্ণনা করা হচ্ছে। বিজয়পাল সঞ্জয়কে জানায় যুবরাজ বন্দী। এরমধ্যে শিবতরাইয়ের বৈরাগী ধনঞ্জয় গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে : 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব এই বিষম ঝড়ের বায়ে/ আমার ভয়-ভাঙ্গা এই নায়ে।/ মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে/ ছেঁড়াপালের বুক ফুলিয়ে/ তোমার ওই পারেতেই যাবে তরী / ছায়াবটের ছায়ে।/ পথ আমারে সেই দেখাবে/ যে আমারে চায়-/ আমি অভয়মনে ছাড়ব তরী/ এই শুধু মোর দায়।'

ধনঞ্জয় বিদ্রোহী। বাউলেরা গেয়ে গেল– 'ঝড়ের মুখে ভাসল তরী', কিন্তু ধনঞ্জয় গাইছে ঝড়ের মধ্যে সে মারের সাগর পাড়ি দেবে। তার ভয় নেই এই নৌকাতে করে এই যাত্রায়। ঝড়কে সে ভয় পায় না, ছেঁড়াপাল তবুও নয়। সে অভয়মনে ছাড়বে নৌকা এবং তা ঠিকই ঘাটে পৌঁছে যাবে। তার কাছে মনে হচ্ছে এই যে অন্যায় চলছে শিবতরাইয়ের লোকদের উপর, তিনি এর

ন্যায় বিচার নিয়ে আসবে। শিবতরাইয়ের একদল প্রজা প্রবেশ করে জানায়, রাজাশ্যালক চ-পাল তাদের দেউড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরেছে। তাদের আর সহ্য হয় না। খবর আসে যুবরাজকেও আটকে রেখেছে। সকলে ধনঞ্জয়কে মান্য করে কারণ তার কাছেই চরণাশ্রয় পেয়েছে। ধনঞ্জয় বোঝায় মার খেতে হলে খাবে। গেয়ে ওঠে : 'আরো, আরো, প্রভু, আরো, আরো / এমনি করেই মারো মারো।'

ধনঞ্জয় নিজেই এর ব্যাখ্যা দেন, মার এড়াবার জন্যই তারা মরতে নয় পালাতে থাকে, দুটোই এক কথা। দুটোতেই পশুর দলে ভেড়ায়, পশুপতির দেখা মেলে না–'লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,/ ভয়ে ভয়ে কেবল তোমায় এড়াই-/ যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।'

সে মৃত্যুঞ্জয়ের সাথে বোঝাপড়ায় যাচ্ছে। সে বলতে চায়, 'মার আমায় বাজে কি না তুমি নিজে বাজিয়ে নাও।' যে ডরে কিংবা ডর দেখায় তার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এগোতে পারবে না : 'এবার যা করবার তা সারো, সারো-/ আমিই হারি কিংবা তুমি হারো।/ হাটে ঘাটে বাটে করি খেলা/ কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা-/ দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো।'

এবার সরাসারি প্রতিবাদ হবে, ফলাফলে কেউ জিতবে কেউ হারবে। দেখবে কিভাবে কাঁদাতে পারে। সবাই রাজি এই প্রতিবাদে কিন্তু তারা ধনঞ্জয়কে একা যেতে দিতে রাজি নয়, তারাও যাবে। রাজত্ব রাজার একার নয়, রাজা প্রজা মিলেই তবে রাজত্ব। রাজার খাতিরেই সকলকে রাজত্ব দাবি করতে হবে। এরপর গানঃ 'ভুলে যাই থেকে থেকে/তোমার আসন পরে বসাতে চাও/ নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে।'

সাথে ব্যাখ্যা করেন 'সত্য কথা বলব বাবা? যতক্ষণ তাঁরই আসন বলে না চিনবি ততক্ষণ সিংহাসনে দাবি খাটবে না, রাজারও নয়, প্রজারও নয়। ও তো বুক-ফুলিয়ে বসবার জায়গা নয়, হাত জোড় করে বসা চাই'। গানের পরবর্তী অংশ : 'দ্বারী মোদের চেনে না যে,/বাধা দেয় পথের মাঝে,/ বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি,/ লও ভিতরে ডেকে ডেকে।'

রাজা রাজাসনে বসেন, কিন্তু রাজাসনে বসলেই রাজা হওয়া যায় না। রাজা প্রজাদের না চিনলে সে ভালো রাজাই না। রাজার কাজ সবাইকে ডেকে নেয়া। রবীন্দ্রনাথ নিজেও যখন জমিদারী কাজে বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়েছেন, প্রজাদের সাথে মেলামেশায় কোন ভেদাভেদ করেননি। ধনঞ্জয়ের গানে যেন তারই মনোভাব। এরপর গাইছে : 'মোদের প্রাণ দিয়েছ আপন হাতে/ মান দিয়েছ

তারি সাথে ।/ থেকেও সে মান থাকে না যে/ লোভে আর ভয়ে লাজে,/ ম্লান হয় দিনে দিনে,/ যায় ধুলোতে ঢেকে ঢেকে ।'

এ-সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ড. করুণাময় গোস্বামী বলেন :

> "ঈশ্বর মানুষকে প্রাণ দিয়েছেন, মানও দিয়েছেন । মানুষ লোভ বা ভয়ে মান হারায় । এখানে লোভের শিকার হচ্ছে উত্তরকূটের মানুষেরা, তারা শিবতরাইয়ের লোকদের যাবতীয় অধিকার কেড়ে নিয়ে বশীভূত করবে, ভয়ে মান হারাচ্ছে শিবতরাইয়ের লোকেরা– রাজা না জানি কী অত্যাচার করেন তাদের ওপর । ধনঞ্জয় চাইছে শিবতরাইর লোকেরা যেন ভয়ে মান না হারায়, রাজাও যেন উত্তরকূটের লোকদের প্রশ্রয় না দেন । রাজা তো সবার, তার দায়িত্ব একটি পবিত্র বিষয়, তিনি বুক ফুলিয়ে সিংহাসনে বসবেন না, জোড় হাতে বসবেন সেখানে অর্থাৎ বিনম্র চিত্তে ।"[৫৮]

'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকেও দেখা গেছে যিনি আসনে অধীন, তিনি যেন প্রজা থেকে অনেক দূরে । কিন্তু প্রজাই তো রাজ্যের আসল । প্রজার জন্যই রাজা । ধনঞ্জয় দাবী দাওয়া নিয়ে রাজার কাছে যাবেনই । কিন্তু শিবতরাইবাসী তাকে যেতে দিতে চায় না, রাজা যদি তাকে আটকে দেয় । ধনঞ্জয় উত্তর দেয় গানে : 'আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন/সে কি অমনি হবে?/ আমার কাছে পড়লে বাঁধা সেই হবে মোর বাঁধন/ সে কি অমনি হবে?/ কে আমারে ভরসা করে আনতে আপন বশে?/ সে কি অমনি হবে?/ আপনাকে সে করুক না বশ, মজুক প্রেমের রসে,/ সে কি অমনি হবে!/ আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন/ সে কি অমনি হবে?'

এই গানটি সম্পর্কে ড. অরুণকুমার বসুর বিশ্লেষণ হলো, করেছেন : ধনঞ্জয় বৈরাগী সহিষ্ণু প্রতিরোধের মূর্ত প্রতীক । সে কেবল আদর্শ নয়, কল্পনা বা স্বপ্ন নয়, ঐতিহাসিক বাস্তবতার পটভূমি । তাঁর মতে,

> "প্রায়শ্চিত্ত নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী ছিল সহিষ্ণু প্রতিরোধের মূর্ত প্রতীক, তার কণ্ঠে গান অপমান-লঞ্ছনার বিরুদ্ধে আত্মার ধিক্কৃত প্রতিবাদ হয়ে বেজে উঠেছিল । মুক্তধারা নাটকেও ধনঞ্জয় শিবতরাইয়ের লাঞ্ছিত নির্যাতিত মনুষত্বের নীরব প্রতিবাদের অনুরূপ আদর্শ । ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের তেজোদীপ্ত আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ প্রশংসা অর্জন করেছিল । প্রায়শ্চিত্তে যে চরিত্র ছিল কবির আপন চিত্তের গভীরতা থেকে বিশ্বস্তভাবে উৎসারিত, পরবর্তী ভারত-ইতিহাস সেই বিশ্বাসকে সত্য করে তুলল । সুতরাং মুক্তধারায় ধনঞ্জয় কেবল আদর্শ নয়, কল্পনা বা স্বপ্ন নয়, ঐতিহাসিক বাস্তবতার পটভূমি হয়ে উঠেছে । তাই ধনঞ্জয়ের সংলাপ ও

সংগীত, আবির্ভাব ও আন্দোলনের ভঙ্গিটি নাটকে আশ্চর্য গতি ও ছন্দ সঞ্চার করেছে। ধনঞ্জয়ের কণ্ঠে কবি যে নতুন গানগুলি যোজনা করেছেন, তার সবগুলিই এই নতুন অহিংস প্রতিরোধের প্রত্যক্ষতা থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছে। ধনঞ্জয়ের প্রথম গান 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব'। নির্ভীক হৃদয়ের দুঃসাহস এবং সহিষ্ণুতার অনমনীয় বীর্য সম্বল করে মারের সাগর পাড়ি দেওয়ার এই গর্জমান আহ্বান কেবল কবির স্বপ্নকল্পনা থেকে জাগাতে পারে না, একটি বিদ্যুৎগর্ভ ব্যক্তিত্বের অরণিসংঘর্ষেই যেন এই গানখানি এমন বজ্রস্তনিত হয়ে উঠেছে। মহাত্মা গান্ধীকে বারবার কারারুদ্ধ কারার জন্য কবি ব্যথিত হয়েছিলেন। যেন সেই অপরাভূত আত্মার সপক্ষে অসম্ভাবিত বন্ধন তুচ্ছ করার জন্যই ধনঞ্জয়ের কণ্ঠে এই গান-আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন/সে কি অমনি হবে?/আমার কাছে পড়লে বাঁধা সেই হবে মোর বাঁধন/সে কি অমনি হবে?' প্রায়শ্চিত্তে ধনঞ্জয় কেবল কবি জীবনের এক প্রকার আদর্শেরই রূপক চরিত্র ছিল, কিন্তু মুক্তধারা নাটকে চরিত্রটি ক্রমশ রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।"[৫৯]

শিবতরাইবাসী মানতে রাজি নয় যে ধনঞ্জয় একা যাবে, তখন ধনঞ্জয় পথের খোঁজ-খবর আনতে যান। এরমধ্যে উত্তরকূটবাসী এসে জানায় বিভূতি মুক্তধারায় বাঁধ দিয়েছে, শিবতরাইবাসী আর খাবার জল পাবে না। গনেশ বলে ওঠে, ভৈরব স্বহস্তে যা দান করেছে, কামারের ছেলে তা কিভাবে বন্ধ করে? ধনঞ্জয়ের প্রবেশ এর মধ্যে। সকলে জানায় যে বিভূতি বাঁধ দিয়েছে। শুনে ধনঞ্জয় উত্তর দেয়, 'সে হল আর-এক কথা। ওটা ভৈরব সইবেন না। তোরা বস্‌, আমি সন্ধান নিয়ে আসি গে। জগৎটা বাণীময় রে, তার যে দিকটাতে শোনা বন্ধ করবি সেইদিক থেকেই মৃত্যুবাণ আসবে।'

অভিজিতকে রাজা বন্দী করেছে শুনে সবাই ক্ষেপে যায়। তারা রাজাকে মানতে নারাজ হয়। এমন সময় রাজা ও মন্ত্রী প্রবেশ করেন। শিবতরাইবাসী যুবরাজকে ফেরত চাওয়ার উদ্দেশ্যে দরবারে এসেছে বলে জানায়। রাজা ধনঞ্জয়ের খোঁজ করে, যে তাদের ক্ষেপিয়েছে খাজনা না দেবার জন্য। ধনঞ্জয় প্রবেশ করে এবং খেপিয়েছে নাকির উত্তরে গান গায় : 'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন খ্যাপা সে/ ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে/ কী যে বাজায় কোন বাতাসে?/ গেল রে গেল বেলা,/ পাগলের কেমন খেলা?/ ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা-/ তারে কানন গিরি খুঁজে ফিরি,/ কেঁদে মরি কোন হুতাশে।'

যিনি তাকে খেপান, সে তো আকাশে মোহন সুরে কি যেন বাজায়। পাগলের খেলায় বেলা চলে যায়। সে ডেকে আকুল করে দিচ্ছে কিন্তু তাকে ধরা যায় না, তিনি দেখাও দেন না। রাজা

খাজনা চাইলে ধনঞ্জয় জানায় যা রাজার নয়, তা তারা দিতে পারবে না। যদি উদ্বৃত্ত থাকে তবে তা রাজার, কিন্তু যে অন্ন এখন উৎপাদিত হয় তা কেবল ক্ষুধা নিবারণের কাজে চলে। রাজা বৈরাগী ধনঞ্জয়কে থাকতে বলে সকলকে চলে যেতে বলে, কিন্তু প্রাণ থাকতে তাকে ফেলে তারা যেতে রাজি নয়। বৈরাগী গান ধরে : 'রইল বলে রাখলে কারে?/ হুকুম তোমার ফলবে কবে?/ টানাটানি টিকবে না ভাই,/ রবার যেটা সেটাই রবে।'

বৈরাগী নিজেই এর ব্যাখ্যাতে বলেন, 'যিনি সব দেন তিনিই সব রাখেন। লোভ করে যা চাইবে সে হল চোরাই মাল, সে টিকবে না।' এই বলেই বাকি অংশ গেয়ে ওঠে : 'যা খুশি তাই করতে পার/ গায়ের জোর রাখ মার/ যাঁর গায়ে তার ব্যথ্যা বাজে/ তিনিই যা সন সেটাই সবে।'

রাজা যা খুশি করতে পারেন, গায়ের জোরে মারতেও পারেন। কিন্তু যার ব্যথ্যা সেই টের পায়, যদি সয় ভালো। তবে তিনি ভুল করছেন কারণ ছেড়ে রাখলে যাকে পাওয়া যায়, মুঠোর মধ্যে তা চাপতে গেলেই দেখবে সে ফসকে গেছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি গান আছে যেটি এই গানের সাথে ভাবার্থে মিলে যায়– 'আমায় মুক্তি যদি দাও, বাঁধন খুলে। আমি তোমর বাঁধন নেব তুলে।' চাপিয়ে দিলে কিছু পাওয়া যায় না, যা আসবার সে এমনিতেই আসবে। জোর করে কিছু হয় না। শেষ স্তবকে বলেন : 'ভাবছ তুমি যা চাও/ জগৎটাকে তুমিই নাচাও/ দেখবে হঠাৎ নয়ন মেলে/ হয় না যেটা সেটাও হবে।'

সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেলে যা ছিল তাও হারাবে। রাজা যদি ভেবে থাকেন মুক্তধারায় বাঁধ দিয়ে প্রজাদের কষ্ট দেবেন, অভিজিতকে বন্দী করে রাখবেন, ধনঞ্জয়কেও বন্দী করবেন, কিন্তু তিনি যা ভাবেন তাই কি হবে? গানটিতে নাটকের ভবিষ্যৎ একটি সংঘাতের আভাস আসে যে, রাজার হুকুম বা মর্জিই সব না। মন্ত্রীকে রাজা ধনঞ্জয়কে আটকের আদেশ দিলে মন্ত্রী জানায়, 'শাসনের ভীষণ যন্ত্র তো তৈরি হয়েছে, তার উপর আরো ভয় চড়াতে গেলে সব যাবে ভেঙ্গে।' তবুও রাজার আদেশ পালন শীরধার্য, প্রজারা কেউ যেতে চায় না ধনঞ্জয়কে ছেড়ে। ধনঞ্জয় তাদের রাজি করায় চলে যাবার জন্য এবং বন্দীশালায় যাবার সময় গেয়ে ওঠে : 'তোর শিকল আমায় বিকল করবে না।/ তোর মারে মরম মরবে না।/ তাঁর আপন হাতের ছাড়-চিঠি সেই যে,/ আমার মনের ভিতর রয়েছে এই-যে,/ তোদের ধরা আমায় ধরবে না।/ যে পথ দিয়ে আমার চলাচল/ তোর প্রহরী তার খোঁজ পাবে কী বল?/ আমি তাঁর দুয়ারে পৌঁছে গেছি রে,/ মোরে তোর দুয়ারে

ঠেকাবি কী রে?/ তোর ডরে পরান ডরবে না ।’

ধনঞ্জয় রাজাকে জানিয়ে দিচ্ছেন তার এই শিকল তাকে বাঁধতে পারবে না । তার আত্মাকে রাজা বাঁধতে পারবে না । তিনি যেই পথে চলাচল করেন, প্রহরী তার খোঁজ পাবে না । তাকে শারীরিকভাবে আটকালেও তার আত্মাকে তো বাঁধতে পারবে না । সেই খোঁজ তো রাজা পাবে না । এমন সময় ভৈরবীদের প্রবেশ এবং তারা গাইছে : ‘তিমিরহৃদবিদারণ/ জ্বলদগ্নিনিদারুণ/ মরুশ্মশানসঞ্চর ।/ শংকর শংকর ।/ বজ্রঘোষবাণী/ রুদ্র, শূলপাণি/ মৃত্যুসিন্ধুসন্তর/ শংকর শংকর ।’

এই গানটির তাৎপর্য সম্পর্কে ড. করুণাময় গোস্বামী বলেন : “ভৈরবপন্থিরা এসে ভৈরবের স্তবগান করছেন । অভিজিত বন্দী, ধনঞ্জয় বন্দি, শিবতরাইর জনগণ হুমকির মুখে আছে, এ সময় ভৈরবের স্তবগান আমাদের বোঝাতে চাইছে যে, তিমির কেটে যাবে, মঙ্গলের জয় ঘোষিত হবে, ভৈরব তাঁর অপার শক্তি দিয়ে শ্রেয়কে রক্ষা করবেন । বিভূতি জয়ী হবে না, মানুষ মানুষকে ভৈরবের দান থেকে বঞ্চিত করতে পারে না, পারবে না ।”[৬০]

মহারাজ বিশ্বজিত বন্দিশালায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে অভিজিত ও ধনঞ্জয়কে মুক্ত করেন । তিনি অভিজিতকে মোহনগড় নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করলেও সে যেতে রাজি হয় না । মুক্তধারার স্রোতকে সে বন্ধনমুক্ত করবে । ধনঞ্জয় এসে গান ধরে : ‘ওরে আগুন আমার ভাই/ আমি তোমারি জয় গাই ।/ তোমার শিকল-ভাঙ্গা এমন রাঙ্গা/ মূর্তি দেখি নাই ।/ তুমি দু হাত তুলে আকাশ-পানে/ মেতেছ আজ কিসের গানে ।/ এ কী আনন্দময় নৃত্য অভয়,/ বলিহারি যাই ।/ যে দিন ভবের মেয়াদ ফুরোবে ভাই,/ আগল যাবে সরে,/ সে দিন হাতের দড়ি পায়ের বেড়ি/ দিবি রে ছাই করে ।/ সে দিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে/ ওই নাচনে নাচবে রঙ্গে,/ সকল দাহ মিটবে দাহে/ ঘুচবে সব বালাই ।’

আগুনেই মুক্তি হলো আজ । আগুনের লেলিহান শিখা যেন অভয় নৃত্যে মত্ত । জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সব বালাই ঘুচিয়ে দেবে । নাটকের এই পরিস্থিতিতে গানটি কিছু একটা ঘটার পূর্বাভাস দিচ্ছে ।
উত্তরকূটের নাগরিক দলের প্রবেশ । তারা অভিজিতকে না পেয়ে ধনঞ্জয়কে বেঁধে রাখে । এরমধ্যে ভৈরবীপন্থিরা গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে : ‘তিমিরহৃদবিদারণ/ জ্বলদগ্নিনিদারুণ/ মরুশ্মশানসঞ্চর ।...’

গানটি যেন নাটকের মূখ্যসংগীতের মত তত্ত্বভাব প্রকাশ করে চলছে যে ভৈরব সকল বন্ধন মোচন করবেন, তিমির হরন করবেন, বজ্রে ঘোষিত হবে সত্যবাণী এবং মানুষ মৃত্যু সমুদ্র সাঁতরে পার হবে। চতুর্থ নাগরিক যুবরাজের খোঁজ নিয়ে আসলে সকলে ধনঞ্জয়কে বেঁধে ফেলে। বন্ধন অবস্থায় গেয়ে ওঠে : 'শুধু কি তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরাবে/ গুণী মোর, ও গুণী?/ বাঁধা বীণা রইবে পড়ে এমনি ভাবে/ গুনী মোর, ও গুণী।/ তা হলে হার হল যে হার হল,/ শুধু বাঁধাবাঁধিই সার হল/ গুণী মোর, ও গুণী।/ বাঁধনে যদি তোমার হাত লাগে,/ তা হলেই সুর জাগে/ গুণী মোর, ও গুণী!/ না হলে ধুলায় পড়ে লাজ কুড়াবে।'

এখানে ধনঞ্জয়কে বেঁধে রাখাকে বাঁধা বীণার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সে কি বাজবে না? উত্তরকূটের লোকদের কাছে বাঁধা পড়ে থাকবে? বীণাতে হাত লাগলে বেজে উঠবে নয়তো ধুলায় গড়িয়ে শুধু লজ্জাই কুড়াবে। এরমধ্যে আবার নাগরিক দল প্রবেশ করেন এবং তাদের ধারণা মহারাজ অভিজিতকে ধরে নিয়ে গেছেন কঠিন শাস্তি দেবার জন্য। আবার তারা চলে যায়। ধনঞ্জয় গেয়ে ওঠে : 'ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে? (ও অবোধ)/ যে তার দাম জানে সে কুড়িয়ে লবে। (ও অবোধ)/ ওযে কোন রতন তা দেখ-না ভাবি,/ ওর পরে কি ধুলোর দাবি?/ ও হারিয়ে গেলে তাঁরি গলার/ হার গাঁথা যে ব্যর্থ হবে।/ ওর খোঁজ পড়েছে জানিস নে তো?/ তাই দূত বেরোল হেথা সেথা।/ যারে করলি হেলা সবাই মিলি,/ আদর যে তার বাড়িয়ে দিলি,/ যারে দরদ দিলি তার ব্যথা কি/ সেই দরদির প্রাণে সবে?'

গানের মাধ্যমে তিনি বলছেন, তাকে বেঁধে ফেলে রেখে দিলেই কি হয়ে গেল? তাকে বাঁধলেও সে তো বিদ্রোহী, সে সংগ্রামী। তাকে বেঁধে রেখে তার কদর বাড়িয়ে দিয়েছে। ড. করুণাময় গোস্বামী বলেন :

> "উত্তরকূটের লোকেরা অবোধ যে, তারা ভাবছে বৈরাগীকে বেঁধে রাখলেই হয়ে গেল। কিন্তু সে হবে না। বৈরাগী যে রতন, তার পরে ধুলোর কোনো দাবি নেই, দাবি আছে সত্যের, আছে ঈশ্বরের। তার যে অহিংস চৈতন্যরত্ন, সে পরমেশ্বরের গলার মালার শোভা বর্ধন করে। এবার তার খোঁজ পড়েছে, অর্থাৎ শিবতরাইয়ের মানুষ জেগে উঠেছে, অভিজিত বেরিয়ে পড়েছে মুক্তধারাকে মুক্ত করতে। ধনঞ্জয়কে এখন আর ব্যথা দিয়ে লাভ নেই। সে ব্যথা পরমেশ্বরের বুকে বাজবে। তিনি তাকে বুকে তুলে নিয়েছেন। যারা ব্যথা দিচ্ছে, অর্থাৎ রাজা ও উত্তরকূটের মানুষ, তাদের যে পরাজয় হতে যাচ্ছে, এখানে তারই ইংগিত দেয়।"[৬১]

কুন্দন এসে ধনঞ্জয়ের বাঁধন খুলে পালিয়ে যেতে বললে সে রাজি হয় না। সে যাচ্ছে উৎসবের শেষ পালাটায় যেখানে শুধু শিবতরাইয়ের আরতি বাকি। বিভূতিকে দেখে সকলে তার জয়জয়কার করলেও, উৎসবে তার শখ নেই জানালেন, কারণ তার কানে এসেছে মুক্তধারার বাঁধ ভাঙা হবে। কিন্তু সে আর প্রলাপবাক্য ভেবে প্রতিবাদ করেনি। কারণ বাঁধের বন্ধনে যে ছিদ্র আছে তা যম স্বয়ং পাহারা দিচ্ছে। আপাতত ননদীসংকটের পথটা আটকাতে পারলে আর চিন্তা নেই। পথের মধ্যে ধনঞ্জয়কে দেখে বিভূতি বলে ওঠে, 'তোমাদের মতন সাধুরা ভৈরবকে এ পর্যন্ত জাগাতে পারলে না, আর যাকে পাখন্ড বল সেই আমি ভৈরবকে জাগাতে চলেছি।' ধনঞ্জয় উত্তর দেয়, জাগাবার ভার তোমাদের, শিকল দিয়ে তাঁকে বেঁধেছ, এই শিকল ছেঁড়ার জন্য তিনি জাগবেন। সবচেয়ে দুঃসাধ্য যখন হয় তখনই তাঁর সময় আসে। এরমধ্যে ভৈরবপন্থিরা আবারো ভৈরবের জয়গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে। গানটি যেন বারবার ভৈরবের শক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। চরেরা প্রবেশ করে জানায় শিবতরাই থেকে হাজার হাজার লোক এসেছে যুবরাজকে মুক্ত করে তাদের রাজা করবার জন্য। আবারো ভৈরবপন্থিরা গাইতে গাইতে প্রবেশ করে : 'তিমিরহৃদবিদারণ/ জ্বলদগ্নিনিদারুণ/ মরুশ্মশানসঞ্চর।/ শংকর শংকর।'

নেপথ্যে সুমনের মায়ের আকুতি সুমন ফিরে আয়। এরমধ্যে যেন জলস্রোতের শব্দ শোনা যায়। ধনঞ্জয় জানায়, 'নাচ-আরম্ভের প্রথম ডমরুধ্বনি'। এবার তার বাঁধ ভাঙার উৎসবে ডাক পড়েছে। গেয়ে ওঠে : 'বাজে রে বাজে ডমরু।/ হৃদয় মাঝে হৃদয় মাঝে।.../ মরমে মরমে বেদনা ফুটে-/ বাঁধন টুটে, বাঁধন টুটে।'

ডমরু ভৈরবের বাদ্য। ধনঞ্জয়ের বুকে যেন মুক্তধারার স্রোতের শব্দ ডমরু হয়ে বাজছে। সব বাঁধন টুটে গেছে আজ। মুক্তধারার বাঁধ অভিজিত ভেঙ্গেছে এবং স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। সে মরে অমর হয়ে গেছে। ভৈরবপন্থিদের আবারো প্রবেশ এবং তাদের গানের মাধ্যমে নাটকের শেষ।

> 'জয় ভৈরব, জয় শংকর,/ জয় জয় জয় প্রলয়ংকর,
> শংকর শংকর জয় সংশয়ভেদন,/ জয় বন্ধনছেদন,
> জয় সংকটহর/ শংকর শংকর।'

এই নাটকের গানগুলোর মধ্যে ভৈরবপন্থিদের ভৈরববন্দনা, উত্তরকূটবাসীর একটি যন্ত্রবন্দনা ও

বাউলের একটি গান ব্যতীত সমস্ত গানই ধনঞ্জয় বৈরাগীর। এই নাটকে ভৈরবপন্থিদের গান ‘জয় জয় ভৈরব জয় শঙ্কর/জয় জয় প্রলয়ঙ্কর শঙ্কর শঙ্কর’ গানটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এ নাটকে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। ধনঞ্জয়ের গানে সেই চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে।

যন্ত্রের ভয়াবহ স্বরূপ বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ এই ‘রূপক’ নাটকটি রচনা করেন। এই নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বেশি গানগুলো রয়েছে বাউল বৈরাগী ধনঞ্জয়ের কণ্ঠে। তার গান দিয়েই নাটকের মর্মার্থ বলা হয়েছে। নাটকটির মূখ্য কথা, মুক্ত জীবনে মানুষের স্বাভাবিক অধিকার, সে কথাটি ধনঞ্জয়ের গানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। গানের ভাষায় বলার কারণে ধনঞ্জয়ের কথাগুলো এত চিত্তাকর্ষক হয়েছে এবং নাটকের সাংকেতিক ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে। ভৈরবের গানগুলো বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল সত্যের প্রতিষ্ঠা হবে, ভৈরব জাগবে, যখন জাগবে তার পরিণাম প্রলয়ংকরী হবে, তিনি মানুষের সৃষ্ট প্রলয়সম্ভাবনাকে ধ্বংস করেন, সংশয় ভেদন করেন, বন্ধন ছেদ করেন এবং সংকট হরণ করেন। ধনঞ্জয়ের গানগুলোই নাটকের মুক্তির তত্ত্বকে প্রাণবন্ত করে তোলে, কারণ যতবারই ধনঞ্জয় বাঁধন পরে, ততবারই গানের মাধ্যমে মুক্তির বার্তা দেন। তার কণ্ঠে গীত গানগুলো প্রায়শ্চিত্ত নাটকে থাকলেও এই নাটকে এর ব্যবহার একটু ভিন্ন। প্রায়শ্চিত্ত নাটকের গানগুলো একটানা গেয়, কিন্তু এই নাটকে ওই একই গান দুইছত্র গাইবার পর একটু সংলাপে ব্যাখা করা হয়েছে। তাতে গানগুলো আরও মর্মভেদী হয়েছে এবং গানের বক্তব্য সাথে সাথেই প্রসঙ্গনিষ্ঠ হয়েছে। নাটকটিতে অনেক গদ্যকথন রয়েছে, তবে গানই প্রাণ। ১৪টি গানের ৯টি গানই পূজা পর্যায়ের। এছাড়াও রয়েছে বিচিত্র, প্রেম ও প্রকৃতি, স্বদেশ ও নাট্যগীতি পর্যায়ের গান। ৮টি গানে বাউল সুর ব্যবহৃত হয়েছে।

২. বসন্ত (১৯২৩)

১৯২৩ সালে রচিত ‘বসন্ত’ নাটকটি প্রথম ঋতুনাট্য যেখানে কবি প্রথম নাচের সূত্রপাত করেন। নাটকটির বিষয়বস্তু হলো বসন্তের আগমন ও বিদায়। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন :

> “‘বসন্ত’ - ‘শেষবর্ষণ’ - এর মতোই একটি পালাগান। ইহার বিষয়বস্তু হইল বসন্তের আগমন ও বিদায়। নাটকের আঙ্গিকে ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পালাগান রচনা। ইহার বৎসরাধিক কাল পূর্বে কবি ‘বর্ষামঙ্গল’ নাম দিয়া একটি গানের জলসা করেন প্রথমে শান্তিনিকেতনে ও পরে কলিকাতায়। ইহাতে কেবল গান ও কবিতা আবৃত্তি ছিল। পালার অঙ্গ হিসাবে কাহারো বক্তব্য

ছিল না। বসন্তই প্রথম ঋতুনাট্য, যেখানে কবি রাজসভা-টেকনিক গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাতেই কবি প্রথম নাচের সূত্রপাত করেন ।"৬২

পালার স্থান রাজসভা। রাজকোষ শূন্য প্রায় তাই সচিবদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য পালিয়ে কবির কাছে এসেছেন বসন্তের পালা শুনবেন বলে। কবি জানায় তারাও জন্মপলাতক, বর্ণনায় গেয়ে ওঠে - 'আমরা বাস্তুছাড়ার দল,/ ভবের পদ্মপত্রে জল ।/ আমরা করছি টলমল ।/ মোদের আসা যাওয়া শূন্য হাওয়া/ নাইকো ফলাফল ।'

কবি জানায় এ দলে রাজসঙ্গী আছে আর সে হলো ঋতুরাজ বসন্ত। পৃথিবী তাকে সিংহাসনে বসালেও সে নিজেকে শূন্য করে রাজকোষ পূর্ণ করে দিয়ে পালিয়ে যান। ঋতুরাজ পূর্ণতা পায় দানের মাধ্যমে, প্রকৃতিও দানের মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। কবি তাড়া দেয় গান শুরু করতে। বসন্তের পরিচরগণ প্রকৃতিকে সব দানের আহ্বান জানিয়ে গেয়ে উঠে : 'সব দিবি কে, সব দিবি পায়,/ আয় আয় আয় ।/ ডাক পড়েছে ওই শোনা যায়,/ আয় আয় আয় ।/ আসবে-যে সে স্বর্ণরথে,/ জাগবি কারা রিক্ত পথে/ পৌষরজনী তাহার আশায় ।/ আয় আয় আয় ।/ ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা,/ হায় হায় হায় ।'

বসন্ত আসবে স্বর্ণরথে সব দিতে, তাই ডাক পড়েছে আসার। রিক্ত পৌষরজনী তার আশায় চেয়ে আছে। সে ক্ষণেকের জন্য আসে। চলে যাবার সময় সে এতো ধনরতন দিয়ে যাবে যে বহন করাই কঠিন হয়ে যাবে। রাজা জানায় দাবি তো কম না, কবি বলেন, 'দাবি বড়ো হলেই কৃপণতা জাগায় ।' প্রকৃতির সকলেই এই ডাকে সাড়া দেয়। বনভূমির মুখেই শোনা যাক বসন্তের আগমনী গান : 'বাকি আমি রাখব না কিছুই ।/ তোমার চলার পথে পথে/ ছেয়ে দেব ভুঁই ।/ ওগো মোহন, তোমার উত্তরীয়/ গন্ধে আমার ভরে নিয়ো,/ উজাড় করে দেব পায়ে/ বকুল বেলা জুঁই ।/ দখিনসাগর পার হয়ে-যে/ এলে পথিক তুমি ।/ আমার সকল দেব অতিথিরে/ আমি বনভূমি ।/ আমার কুলায়ভরা রয়েছে গান,/ সব তোমারেই করেছি দান,/ দেবার কাঙাল করে আমায়/চরণ যখন ছুঁই ।'

বসন্তবরণের জন্য বনভূমি প্রস্তুত। সে কোন কমতি রাখবে না। দখিন সাগর পার হয়ে আসা অতিথিকে তার উত্তরীয় সুগন্ধে ভরিয়ে দেবে, পায়ে দেবে বকুল, বেলী ও জুঁই ফুলের অর্ঘ্য। সব দান করার জন্য রয়েছে কুলায় ভরা গান, কাঙাল হয়ে চরণ ছোঁবে। শীতের সময় পাতা ঝরে

যায়, গাছগুলো হয়ে যায় শূন্য, সেই শূন্যতায় সব দান করে বসন্তকে আহ্বান জানানো হয় এবং বসন্ত সব শূন্যতা ভরিয়ে দেয়। বসন্তকে আহ্বানের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির বৈরাগ্য ফুটে উঠেছে। আম্রকুঞ্জ গেয়ে ওঠে : ‘ফল ফলাবার আশা আমি মনেই রাখি নি রে।/ আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণসমীরে।/ বসন্তগান পাখিরা গায়,/বাতাসে তার সুর ঝরে যায়,/ মুকুল ঝরার ব্যাকুল খেলা/ আমারই সেই রাগিণী রে।’

রাজা বললেন, ভাবখানা বুঝেছেন। ‘ফল ফলাব’ বলে কোমর বেঁধে বসলেই ফল ফলে না। মনের আনন্দে যদি ‘ফল চাই নে বলতে পারে তবেই ফল ফলে। যেমন আম গাছ তার মুকুল ঝরিয়ে ফেললেই ফল ফলে। করবী গায় : ‘যদি তারে নাই চিনি গো/ সে কি আমায় নেবে চিনে/ এই নব ফাল্গুনের দিনে।/ (জানি নে জানি নে)’

করবীর সংশয়, বসন্ত তাকে চিনবে নাকি! তার কুঁড়ির কানে কানে গানে গানে কথা বলবে নাকি কিংবা তার পরান কিনে নেবে নাকি নব ফাল্গুনের দিকে– সে সংশয়ে আছে। তার আরও ভয়, মর্মে এসে ঘুম ভাঙিয়ে আপন রঙে ফুল ফুটিয়ে যাবে কিনা? নতুন পাতার ঘোমটা খুলে দোল দেবে তো? তার জিজ্ঞাসা। এরই মধ্যে দক্ষিণ হাওয়ার আগমন। তার আগমনে বেণুবন উতলা আর ঘরের কোণের দীপশিখাটি নববধূর মতো শঙ্কিত। দুজনের বৈপরীত্য আলাপচারিতা গানে। বেণুবন গাইছে : ‘দক্ষিন হাওয়া জাগো জাগো/ জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রাণ।/ আমি বেণু আমার শাখায়/ নীরব-যে হায় কত-না গান।/ (জাগো জাগো)।’

দক্ষিন হাওয়া আসে সুপ্ত প্রাণ জাগিয়ে, নীরব গান জাগিয়ে তাই তাকে জাগাতে আহ্বান করছে। কিন্তু অন্যদিকে দীপশিখা গাইছে : ‘ধীরে ধীরে ধীরে বও/ ওগো উতল হাওয়া।/ নিশিথরাতের বাঁশি বাজে,/ শান্ত হও গো, শান্ত হও।’

বেণুবন বলছে উতল হাওয়ায় তাকে জাগিয়ে দিতে আর দীপশিখা বলছে ধীরে ধীরে বইতে, শান্ত হতে। বেণুবন জানায় : ‘পথের ধারে আমার কারা/ ওগো পথিক বাঁধনহারা,/ নৃত্য তোমার চিত্তে আমার/ মুক্তিদোলা করে যে দান।’

অন্যদিকে দীপশিখা বলে : ‘আমি প্রদীপশিখা তোমার লাগি/ ভয়ে ভয়ে একা জাগি,/ মনের কথা কানে-কানে,/ মৃদু মৃদু কও।’

দুজনের কথা বিপরীত। বেণুবন চায় দখিন হাওয়ার নৃত্যে চিত্ত দোলাতে আর প্রদীপশিখা মনের কথাও যেন কানে কানে কয়, সেই আশায় ভয়ে ভয়ে জাগে। তাদের নিজেদের কথপোকথনটি উত্তর প্রত্যুত্তরে প্রকাশ করছে। এর পর ঋতুরাজের পরিচয়বর্গ এসে গায় : 'সহসা ডালপালা তোর উতলা-যে!/ (ও চাঁপা, ও করবী)/ কারে তুই দেখতে পেলি/ আকাশ মাঝে/ জানি না যে। কোন সুরের মাতন হাওয়ায় এসে/ বেড়ায় ভেসে,/ (ও চাঁপা, করবী)।'

ঋতুরাজের দূতেরা ভাবছে বসন্ত আসার খবর কেউ পায়নি কিন্তু প্রকৃতিতে দেখা যাচ্ছে একটা আলোড়ন, সহসা ডালপালা উতল হয়েছে, চাঁপা ও করবী কাকে যেন দেখতে পেয়েছে আকাশ মাঝে। সুরের মাতন হয়ে সে ভেসে বেড়াচ্ছে, নাচনের নূপুর বাজছে, ক্ষণে ক্ষণে চমকাচ্ছে। ফুলে ফুলে রঙীন সাজে রঙের মাতন দোলাচ্ছে। কবি জানায় বসন্তের আসার 'পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু পায়ের শব্দ যে হৃদকম্পনের মধ্যে ধরা পড়ে '। এরই সাথে সুর মিলিয়ে মাধবী গেয়ে ওঠে : 'সে কি ভাবে গোপন রবে/ লুকিয়ে হৃদয় কাড়া।/ তাহার আসা হাওয়ায় ঢাকা,/ সে যে সৃষ্টিছাড়া।'

বসন্তর লুকিয়ে আসার পথ নেই। তার আসা হাওয়ায় ঢাকা সৃষ্টিছাড়া। হিয়ায় হিয়ায় তার বাণী জাগে, হয় পাতায় পাতায় কানাকানি হয়, ওই এলো বলে পরান সাড়া দেয়। ফুল ফোটানোর মাঝে সে নানা রঙে সাজে। পাখির গানে চরণধ্বনি বয়ে এনে বিশ্ববীণার তারে নাড়া দেয়। শালবীথিকা গায় : 'ভাঙল হাসির বাঁধ।/ অধীর হয়ে মাতল কেন/ পূর্ণিমার ওই চাঁদ। উতল হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে/ মুকুলছাওয়া বকুলবনে/ দোল দিয়ে যায়, পাতায় পাতায়/ ঘটায় পরমাদ।/ ঘুমের আঁচল আকুল হলো/ কী উল্লাসের ভরে।/ স্বপন যত ছড়িয়ে প'ল/ দিকে দিগন্তরে।'

সে গাইছে বসন্ত পূর্ণিমার গান। গানটির প্রথম তিনটি লাইন মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথেরই আরেকটি বিখ্যাত গান 'চাঁদরে হাসি বাঁধ ভেঙেছে/ উছলে পড়ে আলো/ ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধসুধা ঢালো।'

পূর্ণিমার চাঁদের আলো মাতাল হয়ে উল্লাসে রয়েছে। আজ রাতের পাগলামিকে বাঁধবে বলে শালবীথিকা ছায়া গেঁথে ফাঁদ পেতেছে। বকুলেরও গান চাঁদের আলো নিয়ে : 'ও আমার চাঁদের আলো,/ আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে/ ধরা দিয়েছ যে আমার/পাতায় পাতায় ডালে ডালে।'

রাজা জানায় আকাশ থেকে চাঁদ পৃথিবীর হৃদয়কে দোলা লাগিয়েছে, কিন্তু ওকে পৃথিবীতে নামিয়ে

এনে কষিয়ে দোলা না দিতে পারলে তো জবাব দেওয়া হয় না। তার কি করা যায়? কবি জানান ব্যবস্থা রয়েছে, নদীর ঢেউয়ে চাঁদের ছায়া টলোমলো করে। নদী গেয়ে ওঠে : 'কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা।/ আপন আলোর স্বপন-মাঝে বিভোল ভোলা।/ কেবল তোমার চোখের চাওয়ায়/ দোলা দিলে হাওয়ায় হাওয়ায়,/ বনে বনে দোল জাগালো/ ওই চাহনি তুফানতোলা।/ আজ মানসের সরোবরে/ কোন মাধুরীর কমলকানন/ দোলাও তুমি ঢেউয়ের পরে।'

নদী চাঁদের প্রতিবিম্বকে ঢেউয়ের দোলায় দোলাবে, চাঁদের হাসির আভাস লেগে আজ বিশ্বদোলনের দোলার বেগে নদীর গান কল্লোলিনী কলরোলার মতন জেগে উঠেছে। এরমধ্যে দখিন হাওয়ার প্রবেশ : 'শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে/ উদাস-করা কোন সুরে।/ ঘরছাড়া ওই কে বৈরাগী/ জানি না যে কাহার লাগি/ ক্ষণে ক্ষণে শূন্য বনে যায় ঘুরে।/ চিনি চিনি হেন ওরে হয় মনে,/ ফিরে ফিরে যেন দেখা ওর সনে।'

ঘরছাড়া বৈরাগী শুকনো পাতা ছড়িয়ে শূন্য বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে চেনা চেনা লাগছে। দখিন হাওয়া বলছে কেন এই ছদ্মবেশ। এই আবরণ খুলে ফেলে চিরনতুনকে প্রকাশ করতে আহ্বান জানাচ্ছে। রাজা জানায় বরযাত্রীর ভিড়ে বর কোথায় অর্থাৎ ঋতুরাজ কোথায়? কবির উত্তর আপনি তো ঠকেছেন। জীর্ণ বসন পরে শুকনো পাতা ছড়ানো সেই তো ঋতুরাজ। তার একদিকে নতুন অন্যদিকে পুরাতন। যখন উল্টে পরেন তখন দেখা যায় শুকনো পাতা, ঝরা ফুল। আবার যখন পাল্টে নেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী, ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরী কিংবা চৈত্রের কনকচাঁপা। একই মানুষ নতুন পুরাতনের মাঝে খেলা করে। তিনি বাস্তুছাড়ার দলপতি বলে পরিচয় করিয়ে গান ধরেন : 'গানগুলি মোর শৈবালেরি দল-/ ওরা বন্যাধারায় পথ যে হারায়/ উদ্দাম চঞ্চল।/ ওরা কেন আসে যায় বা চলে,/ অকারণের হাওয়ায় দোলে,/ চিহ্ন কিছুই যায় না রেখে,/ পায় না কোন ফল।/ ওদের সাধন তো নাই-/ কিছু সাধন তো নাই,/ ওদের বাঁধন তো নাই।'

কবি জানাচ্ছেন কোন কিছুই স্থায়ী নয়। সবই প্রচন্ডভাবে চলমান শৈবালদলের মতন, তারা এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারে না। বন্যাধারার মতন উদ্দ্যাম চঞ্চল। কেনই যে আসে কেনই বা যায় তার কোন চিহ্ন ও রেখে যায় না। তাদের সাধন নেই, বাঁধন নেই, উদাস গৃহহারা পথের স্বরে ভুলে যাওয়া স্রোতের পরে টলমল করে। রাজা জানায় তাড়াতাড়ি ঋতুরাজের আসর

জমাতে, কারণ মন্ত্রসভা থেকে অর্থসচিব তার খোঁজে চলে এসেছে। এ সময় মাধবী, মালতী ফুলেরা গান ধরে- 'তোমার বাস কোথা যে পথিক ওগো/ দেশে কি বিদেশে।/ তুমি হৃদয় পূর্ণ করা ওগো/ তুমিই সর্বনেশে।'

ঋতুরাজ, মাধবী, মালতী ইতাদি এবং বনপথের গানালাপ জমে ওঠে। পালাতে প্রাণের সঞ্চার হয়। ঋতুরাজের উত্তর : 'আমার বাস কোথা- যে জান নাকি,/ শুধাতে হয় সে কথা কি / ও মাধবী ও মালতী।' মাধবী মালতীদের জবাব : 'হয়তো জানি, হয়তো জানি, হয়তো জানি নে,/ মোদের বলে দেবে কে সে।/ মনে করি আমার তুমি,/ বুঝি নও আমার।/ বলো বলো বলো পথিক,/ বলো তুমি কার।' তখন ঋতুরাজ জানায় : 'আমি তারই যে আমারে/ যেমনি দেখে চিনতে পারে/ ও মাধবী ও মালতী।' মালতী মাধবীদের উত্তর : 'হয়তো চিনি, হয়তো চিনি, হয়তো চিনি নে/ মোদের বলে দেবে কে সে।' তখন বনপথ বলে : 'আজি দখিন বাতাসে / নাম-না-জানা কোন বনফুল/ ফুটল বনের ঘাসে।'

এভাবেই তাদের কথার মালায় গান চলতে থাকে। জানা-অজানার মাঝে পরিচয় পর্ব চলতে থাকে। রাজার মনে হয় এবার পালা জমেছে। অর্থসচিবও দুলছে গানের তালে। কিন্তু কবি জানায় এবার ঋতুরাজের যাবার সময়। পূর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পূর্ণ, এরই মাঝে তার আনাগোনা। রাজার পছন্দ পূর্ণতা কিন্তু কবির ভাষায় 'যথার্থ পূর্ণ হয়ে উঠলে রিক্ত হওয়ার খেলায় ভয় থাকে না'। ঋতুরাজও বিদায় বার্তা ঘোষণা দিল গানে : 'এখন আমার যাবার সময় হলো/ যাবার দুয়ার খোলো খোলো।/ হল দেখা, হল মেলা,/ আলোছায়ায় হল খেলা,/ স্বপন-যে সে ভোলো ভোলো।'

মাধবী জানায় বিদায় চাইলে তাকে ফিরে ডাকবে না : 'বিদায় যখন চাইবে তুমি দক্ষিণসমীরে,/ তোমায় ডাকব না তো ফিরে।/ করব তোমায় কী সম্ভাষণ।'

বসন্ত পাতাঝরিয়ে এসে যাবার সময় কুসুম ফুটিয়ে সাজিয়ে যায়। যখন চলে যায় তখন সব আয়োজন উধাও হয়ে যায়, গান ঘুচে যায়, রঙ মুছে যায় অশ্রুনীরে। উত্তরে ঋতুরাজ বলেন : 'এ বেলা ডাক পড়েছে কোনখানে / ফাগুনের ক্লান্ত ক্ষণের শেষ গানে।/ সেখানে স্তব্ধ বীণার তারে তারে,/ সুরের খেলা ডুবসাঁতারে,/ সেখানে চোখ মেলে যার পাই নে দেখা/ তাহারে মন জানে গো, মন জানে।'

কার কাছে যে তিনি যাচ্ছেন তাকে চোখে দেখতে না পেলেও মন জানে। সেখানে মিলন দিনে ভোলা হাসির ভিতর লুকিয়ে করুণ বাঁশি বাজছে। মিলনেও যেন বিরহের সুর। ঝুমকোলতা যেতে মানা করে গেয়ে ওঠে : 'না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো।/মিলনপিয়াসী মোরা,/ কথা রাখো, কথা রাখো।/ আজও বকুল আপনহারা, হায় রে,/ ফুল ফোটানো হয়নি সারা,/ সাজি ভরে নি,/ পথিক ওগো থাকো থাকো।'

ঝুমকোলতা বসন্তকে আরও কিছু সময় থেকে যেতে অনুরোধ করে– এখনো ফুল ফোটানো সারা হয়নি, সে বসন্তের মিলন পিয়াসী। কিন্তু আকন্দ ফুল বসন্তের বিদায় মেনে গাইছে : 'এবার বিদায় বেলার সুর ধরো ধরো,/(ও চাঁপা, ও করবী)/ তোমার শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো।'

ধুতরা ফুলও বসন্তের বিদায় মেনে নিচ্ছে চমৎকার একটি গানের মাধ্যমে : 'আজ খেলা ভাঙার খেলা খেলবি আয়।/সুখের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়।/ মিলনমালার আজ বাঁধন তো টুটবে,/ ফাগুনদিনের আজ স্বপন তো ছুটবে,/ উধাও মনের পাখা মেলবি আয়।'

জবা ও সকলে মিলে এদের সাথে গলা মিলিয়ে বিদায়ের গান গাইছে : 'ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,/ বিচ্ছেদে তোর খন্ডমিলন পূর্ণ হবে।/ আয় রে সবে/ প্রলয়গানের মহোৎসবে।'

রাজসভার সবাই সেখানে এসে উপস্থিত। কবি জানায় ঋতুরাজ আজ রাজবেশ খসিয়ে বৈরাগীর বেশে প্রস্থান করেছেন এবং মুক্তি পাগল এই বৈরাগীদের চিত্ততলে প্রেমসাধনার হোমহুতাশন জ্বলবে। নাটকের শেষ গানটি কবি গেয়ে ওঠেন :

'ভাঙনধরার ছিন্ন-করার রুদ্র নাটে/যখন সকল ছন্দ বিকল, বন্ধ কাটে,
মুক্তি পাগল বৈরাগীদের চিত্ততলে/প্রেমসাধনার হোমহুতাশন জ্বলবে তবে।'

দেখা যাচ্ছে, নাটকটিতে আছে বসন্তের রাজকীয়তা, যে রিক্ততাকে ভরিয়ে দিয়ে পূর্ণ করে নিজে রিক্ত হয়ে চলে যায়। তাকে ঋতুরাজ বলা হয়। রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি বসন্ত ঋতু নিয়ে রচিত বিখ্যাত গান এই নাটকে রয়েছে। মূলত পালার মধ্যে গানের ভাষায় বিবৃত হয়েছে পূর্ণতা বা রিক্ততা, ঐশ্বর্য বা সন্ন্যাস, বিরহ বা মিলন। কবি রাজার সংলাপে যা প্রকাশ করেছেন, তাই গানের মাধ্যমে ধ্বনিত হয়েছে। আজ যে নতুন কাল সে পুরাতন, এ আর্বতেই চলছে প্রকৃতি। শুধু প্রকৃতিই নয়, মানবজীবন ও তাই।

গীতরাজির মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঋতুভাবনা ও তত্ত্বকে উপস্থাপিত করেছেন। এ নাটকে

গান আছে ২৪টি। 'গানগুলি মোর শৈবালেরি দল' বলাকার একটি কবিতার গীতিরূপান্তর। 'বসন্ত' নাটকটি সম্পর্কে শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন :

> "১৯২৩ সালে তিনি বর্ষামঙ্গলের আদর্শে বসন্ত ঋতুর নতুন এক ঝাঁক গান নিয়ে 'বসন্ত' নামে একটি সংগীত আসর বসালেন কলকাতায়। এ নাটকের বৈশিষ্ট্য ছিল। এই সময় রঙ্গমঞ্চে একটি রাজসভা সাজিয়ে রাজা যেন তাঁর রাজকার্যের নীরস জীবনে অবসরে ও নিভৃতে রাজকবিকে ডেকে তাঁর দলবলের দ্বারা অনুষ্ঠিত বসন্তের গান শুনতে বসেছেন। এর গানই সব, কথা গৌণ। কেবল গানগুলিকে সংগীতময় করে তোলাই ছিল লক্ষ্য। এখানে বলে রাখা ভালো, এ ধরনের নাটকের গানগুলি তিনি আগে একটানা রচনা করেছিলেন, জলসায় সুবিধার জন্য কথাগুলি পরে লেখেন। গানে কখনো একজন, কখনো দুজন ও কখনো অনেকে একসঙ্গে মিলে রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে গানের সঙ্গে অভিনয় করত। দু-একটি গানে নাচ নেই। শেষ গানটিতে গুরুদেব স্বয়ং গানের দলের সঙ্গে নেচে রঙ্গমঞ্চকে মাতিয়ে তুলেছিলেন।"[৬৩]

এই নাটকটিকে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম গীতিনাট্য বলা হয়। নৃত্যও আছে এই নাটকটিতে। এসময় তিনি 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এই কাব্য সৃষ্টির রবীন্দ্রনাথের মনে এক বিবর্তন সূচিত হয় এবং যার আভাস পরবর্তী নাটকগুলোতে দেখা যায়। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের ১৫ সংখ্যক কবিতা 'মোর গান এরা সব শৈবালের দল' কবিতাটি ঈশৎ পরিবর্তন করে রচনা করেন 'গানগুলি মোর শৈবালেরই দল' গানটি। তিনি নাটকের ক্ষেত্রে গীতসংবলিত ঋতুনাট্যগুলো রচনা করা শুরু করেন যাতে নৃত্যের আভাস পাওয়া যায়। নাটকটির ২৩টি গানের মধ্যে ১৮টি গানই প্রকৃতি বসন্ত পর্যায়ের। এছাড়াও ২টি পূজা, ২টি প্রেম পর্যায়ের গান আছে। সুরের দিক থেকে ৫টি বাউল সুরে ও ৩টি কীর্তন সুরে রচিত হয়েছে।

৩. অরূপরতন (১৯২৪)

'অরূপরতন' নাটকটির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এই নাট্য-রূপকটি 'রাজা' নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ- নূতন করিয়া পুনর্লিখিত। নাটকটি সম্পর্কে শান্তিদেব ঘোষ বলেন :

> "১৯২৪ সালে 'অরূপরতন' অভিনীত হল। এটি 'রাজা' নাটকেরই রূপান্তর, বহু নতুন গান এতে সংযোজিত হয়। গীতবহুল যাত্রার আদর্শে এটি গীতনাটকে রূপ নেয়। গানগুলি নাটকের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলে গান ছাড়া নাটকটি অসম্পূর্ণ থেকে যেত। গানগুলিকে মুকাভিনয়ের রূপ দেয়া হয়। দেহভঙ্গিতে কোথাও কোথাও যে একটু নাচের আমেজ দেখা না গিয়েছিল তা নয়।

গুরুদেব নাটকে কথার অংশ পাঠ করেছিলেন। গানের দল ছিল পিছনে। এই সময় থেকেই মেয়েদের মধ্যে সামান্য একটু নাচের চর্চা শুরু হয়েছিল কাথিয়াবাড় ও গুজরাতের লোকনৃত্যের আদর্শে। তার সঙ্গে ছিল একটুখানি 'ভাও-বাৎলানো' নৃত্যপদ্ধতি।"৬৪

নাটকটির শুরুতেই রয়েছে প্রস্তাবনা সংগীত। গানটির সাথে ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, তার সাথে নাটকের ভাষ্যের কোন পার্থক্য নেই : 'চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো/ধানের বাটে মানের বাটে রূপের হাটে / দলে দলে গো।/দেখবে বলে করেছ পণ/ দেখবে কারে জানে না মন/প্রেমের দেখা দেখে যখন/ চোখ ভেসে যায় চোখের জলে গো ॥'

ঠিক এই কথাটিই ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন :

> "সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভা-রে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না; - নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ- কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল, সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমার ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়,– এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।"৬৫

প্রাসাদকুঞ্জে সুরঙ্গমা জানাচ্ছে রাজকুমারী সুদর্শনা রাজাকে বরণ করতে চাচ্ছে। কিন্তু রাজা জানায় সে তাকে গ্রহণ করবে অন্ধকারে। সেখানে বাঁশি বাজবে না, আলো জ্বলবে না, সমারোহ হবে না। এরই মধ্যে সুদর্শনার প্রবেশ। সুরঙ্গমার কাছে সে রাজার কথা শুনতে চায়। দেখতে কেমন জানতে চাইলে সুরঙ্গমা উত্তর দেয়, 'একদিন তাকে ভয়ংকর বলে ভয় পেয়েছি, আজ তাকে ভয়ংকর বলে আনন্দ করি।' সে ঝড়, দুঃখ, মরণ, আনন্দ। সাথে সাথে কথার বর্ণনাতে

গানে জানায় : 'আমি যখন ছিলেম অন্ধ/সুখের খেলায় বেলা গেছে পাইনি তো আনন্দ ॥/ খেলাঘরের দেয়াল গেঁথে/ খেলায় নিয়ে ছিলেম মেতে,/ ভিত ভেঙে যেই আসলে ঘরে/ ঘুচল আমার বন্ধ,/ সুখের খেলা আর রোচে না/ পেয়েছি আনন্দ ॥'

সুদর্শনার ধারণা রাজা তাকে সুন্দর হয়ে দেখা দেবে। কিন্তু সুরঙ্গমা তাকে বার বার বলছে যে রাজা অন্ধকারে দেখা দেবে। বসন্ত উৎসবে সুদর্শনা নিজ হাতে মালা গেঁথে অর্ঘ্য পাঠাবে। কিন্তু সুরঙ্গমা জানায় এখানেই দেখা হবে রাজার সাথে। তার জন্য সাজের প্রয়োজন নেই রাজা নিজেই সাজিয়ে দেবেন। মিলনে ব্যাকুল হয়ে গান ধরে : 'প্রভু বলো বলো কবে/তোমার পথের ধুলার রঙে রঙে/ আঁচল রঙিন হবে ।/ তোমার বনের রাঙা ধূলি/ ফুটায় পূজার কুসুমগুলি,/ সেই ধূলি হায় কখন আমায়/ আপন করি লবে ॥'

আর দেরি করতে মন চাইছে না। সুরঙ্গমা বলে তুমিই ডাকো তাকে। গানে গানে সুদর্শনা রাজাকে ডাকছে : 'খোলো খোলো দ্বার, রাখিয়ো না আর/বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে ।/ দাও সাড়া দাও, এই দিকে চাও,/এসো দুই বাহু বাড়ায়ে ।/ কাজ হয়ে গেছে সারা,/উঠেছে সন্ধাতারা,/ আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া/অস্তসাগর পারায়ে ।'

ধীরে ধীরে আলো নিভে আসছে। সুদর্শনা জিজ্ঞেস করে, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না, সে কি আছে? রাজা বলেন, এই তো আমি। আবারো জিজ্ঞেস করে, সে না দেখেই বরণ করে নেবে? রাজা জানায় মনের চোখ দিয়ে দেখতে হয়। অন্তরের দেখা মন শুদ্ধ করে। কিন্তু সুদর্শনা এখানে মিলনে রাজি হয় না। রাজা জানায় তাহলে বসন্ত পূর্ণিমার দিন উৎসবে তাকে খুঁজে নিতে। যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, পুষ্পকেশরের ফাগ উড়বে, আলোয় ছায়ায় হবে গলাগলি সেই দক্ষিণের কুঞ্জবনে দেখা দেবেন। সুরঙ্গমা গান গেয়ে ওঠে : 'কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে, হায় রে হায়,/তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়॥/ ওগো হৃদয়ে যবে মোহন রবে বাজবে বাঁশি,/তখন আপনি সেদে ফিরবে কেঁদে পরবে ফাঁসি,/ তখন ঘুচবে ত্বরা ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়-/আহা আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়॥'

এই গানে সুরঙ্গমা রাজাকে দেখার বা বোঝার স্বরূপটি নিজের মতন করে ব্যাখ্যা করেছে। সে জানে কোন পথে রাজাকে পাওয়া যায়, সেই সিদ্ধ হবার পথটি। আর গানের আগে সে যে বলেছিল রানীর কৌতূহলই কান্না হয়ে ফিরে আসবে, তারও একটা ব্যাখ্যা গানটিতে পাওয়া যায়।

সুরঙ্গমাই যেন এই গানটির মাধ্যমে সমগ্র নাটকের তত্ত্বটি ফুটিয়ে তুলেছে। রাজা কেবল হৃদয়ে পাওয়া যায়। বাইরের বহুর ভিড়ে সে নেই, তাকে পাওয়া যায় প্রেমে। প্রেমের বাঁশিটি বাজলে আপনিই সে ধরা দিবে। সে ধরাও সহজ নয়। ফাঁসি লাগানোর মতন তিনি প্রেমে ধরা পড়েন। বাইরে থেকে রাজাকে দেখার যে কৌতূহল তা বনের পাখির মতন, যে বনে পালিয়ে বেড়ায়। অনর্থক কৌতূহল সফল হয় না। তিনি হৃদয়দ্বারে আসেন। এর আগে তিনি যে দরজা খুলতে বলেছিলে তা সুদর্শনার মনের দ্বার। শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য নয় রাজাকে দেখতে হলে মনের আলোয় দেখতে হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে উৎসব ক্ষেত্রে বিদেশি পথিক দল ও প্রহরীর প্রবেশ। রাজার রাজ্যে অনেক প্রবেশদ্বার, সবাই বসন্ত উৎসবে যোগ দেবার জন্য আসছে। অন্য রাজ্যের প্রজারা অবাক, এ কেমন রাজার রাজ্য যেখানে কোন বাঁধা নেই, যার খুশি যখন তখন আসা যাওয়া করতে পারে, কেউ বাধা দেয়ার নেই! এরই মধ্যে ঠাকুরদা প্রবেশ করেন। মেয়েদের দল এসে জিজ্ঞেস করে, উৎসব কোথায় হচ্ছে? তিনি উত্তর দেন, যেই রাস্তাধরে যাক না কেন, বসন্তউৎসবে পৌঁছে যাবে। ঠাকুরদা গেয়ে ওঠে : 'আজি দখিন দুয়ার খোলা-/ এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার/ বসন্ত এসো।/ দিব হৃদয়দোলায় দোলা,/ এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার/ বসন্ত এসো।/ নব শ্যামল শোভন রথে/ এসো বকুলবিছানো পথে,/ এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু/ মেখে পিয়াল ফুলের রেণু-/ এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার/ বসন্ত এসো।'

অরূপ রাজা এই উৎসবের নায়ক। রানী আজ রাজাকে দেখতে পাবে, উৎসবে মিলিত হবার পূর্বে বসন্তের এই আগমনী গান হিসেবে এক অসামান্য পরিবেশের সৃষ্টি করেছে ঠাকুরদার এই গানটি। পুব ও পশ্চিমের দুয়ার খোলা হয়। ঠাকুরদা নবীনদের ডাকতে বের হয়েছে। কারণ প্রবীণ এসেই নবীনকে জাগায়, যেমন পাকা পাতা ঝরার সময় নুতন পাতাকে ডাক দিয়ে যায়। আর তাই আবার গেয়ে ওঠেন : 'আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে/ ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে।/ তাই তো আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে/ ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন বায়ে,/ নতুন সুরে গান উড়ে যায় আকাশ পারে/ নতুন রঙে ফুল ফোটে তাই ভারে ভারে ॥'

কৌণ্ডিল্যর উত্তরে জানায়, নিজে নতুন না হলে নতুনকে পাওয়া যায় না : 'ওগো আমার নিত্য নূতন দাঁড়াও হেসে/ চলব তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।/ দিনের শেষে নিবল যখন পথের আলো,/ সাগরতীরে যাত্রা আমার যেই ফুরালো,/ তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে/ শূন্যে

আমার উঠল তারা সারে সারে ॥'

কৌন্ডিল্য জানায়, দেশ-বিদেশ থেকে লোক এসেছে। সবার জিজ্ঞাসা রাজাকে দেখতে পাই না কেন? কাউকে উত্তর দিতে পারে না। সেই জায়গাটা ফাঁকা রয়েছে। ঠাকুরদা জানান ফাঁকা নয়, আমাদের এই দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে- তাকে বল ফাঁকা! সে তো আমাদের সবাইকে রাজা করে দিয়েছে। এই বলেই গান ধরেন : 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে/ নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে ।/ আমরা সবাই রাজা ।/ আমরা যা খুশি তাই করি/ তবু তাঁর খুশিতেই চরি/ আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে/ নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে/ আমরা সবাই রাজা ।'

কুম্ভ, জনার্দন, বিরাজদত্ত, মধাব সকলেরই একই প্রশ্ন– রাজা কোথায়, তিনি দেখা দেন না কেন? রাজ্য একটা নিয়মে চলছে, কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই, রাজা না থাকলে সম্ভব হতো না। এমনকি রাজা না থাকলে এই অনুষ্ঠানই হতো না। কিন্তু রাজাকে দেখা যায় না কেন, তিনি কোথায়? এমন সময় বাউল গান গেয়ে প্রবেশ করে । গানটিতেই যেন উত্তরটি নিহিত : 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে/ তাই হেরি তায় সকল খানে ।/ আছে সে নয়ন-তারায় আলোক ধারায়- তাই না হারায়/ ওগো তাই দেখি তার যেথায় সেথায়/ তাকাই আমি যেদিক পানে ।/ আমি তার মুখের কথা/ শুনব বলে গেলাম কোথা/ শোনা হলো না হলো না ।/ আজ ফিরে এসে নিজের দেশে / এই যে শুনি/ শুনি তাহার বাণী আপন গানে ।/ কে তোরা খুঁজিস তারে/ কাঙাল বেশে দ্বারে দ্বারে/ দেখা মেলে না, মেলে না ।/ ও তোর আয়রে ধেয়ে, দেখরে চেয়ে/ আমার বুকে/ ওরে দেখরে আমার দুই নয়নে ।'

রাজা আছেন কি নেই সেই তর্কের উত্তরস্বরূপ বাউলদের এই গান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের রচনায় বাউলের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বাউলের এই গানটি অনেকটা যাত্রাপালার বিবেকের মতন। সহজ পদে, সহজ সুরে আধ্যাত্মিক রূপটি ব্যাখ্যা করেন। রাজার অস্তিত্বের তত্ত্বটি প্রকাশ পেয়েছে সহজ রূপে। বিদেশিদের সংশয়ের জবাবে বাউলরা বলছেন, রাজাকে একটি নির্দিষ্ট আসনে কেন বসাতে হবে? তিনি প্রাণের মানুষ, তাকে তো সবখানেই পাওয়া যায়। নিজেদের গানেই রাজার বাণী আছে, কারণ এই রাজ্যে সবাই রাজা।

তিনি সকলের নয়ন তারায় রয়েছেন, তাই কখনো হারান না। তারা তাদের নিজের গানেই রাজার বাণী শুনতে পাবে। রাজা আছেন হৃদয়ে, নয়নে। তবে এইভাবে রাজার অস্তিত্বকে নিজের প্রাণে উপলব্ধি করার, তারই গান গেয়ে বেড়াবার শক্তি অর্জন করতে চাইলে প্রেম চাই, তাকে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করা চাই। তিনি সর্বত্র বর্তমান। এখানে রাজা পরমেশ্বর অর্থেও ভাবা যায়। আমরা তাকে দেখতে পাই না কিন্তু তিনি সর্বত্র রয়েছেন– আমাদের অনুভবে, ভালো কাজে, আমাদের অন্তরে। চোখ বন্ধ করলে তাকে অনুভব করা যায়, উপলব্ধি করা যায়। এরই মধ্যে রাজবেশী ভন্ড সুবর্ণর প্রবেশ। সে নিজেকে রাজা বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু তার ভন্ডামী ধরে ফেলে রাজা বিক্রম। সে প্রকাশ করবে না এক শর্তে– রাজকুমারী সুদর্শনার সাথে দেখা করিয়ে দিতে হবে। তার প্রাসাদ যেই করভোদ্যানে, সেখানে আগুন লাগাতে হবে। সেই অগ্নিদাহের মধ্যে বিক্রম কাজ সেরে নেবে, তাকে উদ্ধারের ছলনায় পাণিপ্রার্থী হবে। সদলে ঠাকুরদা প্রবেশ করে। বিজয় জিজ্ঞেস করে, তিনি কোন দিক দিয়ে ঘুরে চলে আসে বোঝা যায় না কেন? উত্তরে জানায়, তিনি নটরাজের চেলা, তাই ঘুরছেন আর ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছেন। এরমধ্যে শিঙ্গা বেজে ওঠে এবং ঠাকুরদা গান ও নৃত্য শুরু করেন : 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে/ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।/ তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে/ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।/ হাসি কন্না হীরাপান্না দোলে ভালে,/ কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দে তালে তালে।/ নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে/তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।'

এরপর কুঞ্জ বাতায়নে সুরঙ্গমা গাইছে : 'বাহিরে ভুল হানবে যখন/ অন্তরে ভুল ভাঙবে কি?/ বিষাদ-বিষে জ্বলে শেষে/ তোমার প্রসাদ মাঙবে কি?/ রৌদ্রদাহ হলে সারা/ নামবে কি ওর বর্ষাধারা ?/ লাজের রাঙা মিটলে, হৃদয়/প্রেমের রঙে রাঙবে কি?/ যতই যাবে দূরের পানে/ বাঁধন ততই কঠিন হয়ে/ টানবে না কি ব্যথার টানে ?/ অভিমানের কালো মেঘে/ বাদল হাওয়া লাগবে বেগে,/ নয়নজলের আবেগ তখন/ কোনোই বাধা মানবে কি ?'

এই গানটি নাটকের এই পর্যায়ে অনেকটা আবহ সংগীত হিসেবে কাজ করছে । কারণ সুরঙ্গমা ভন্ড রাজাকে নিজের রাজা হিসেবে মেনে নিচ্ছে। তার সুদর্শন চেহারায় সে বিমোহিত। কিন্তু সুরঙ্গমা জানে এ আসল রাজা নয় এবং আসল রাজা দেখতে সুন্দর না হলেও মনটা অসম্ভব ভালো। কিন্তু সুদর্শনার একই জেদ– এই সেই রাজা এবং তাকে সে মালাও পাঠিয়ে দেয়। এরই

মধ্যে আম্রবীথিকায় উৎসববালকদের গাইতে দেখে সুদর্শনা ডেকে পাঠন। তার দেহ মন আজ গান গাইছে। কিন্তু কণ্ঠে আসছে না, আর তাই তিনি অনুরোধ করেন তাদের গাইতে। বালকেরা গান শুরু করে : 'কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে/ আজ ফাগুনদিনের সকালে ।/ তার বর্ণে তোমার নামের রেখা,/ গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা,/ সেই মালাটি বেঁধেছি মোর কপালে/ আজ ফাগুন দিনের সকালে ॥'

গান শুনে সুদর্শনা বলে, 'হয়েছে, হয়েছে, আর না। তোমাদের এই গান শুনে চোখে জল ভরে আসছে - আমার মনে হচ্ছে যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার জো নেই - তাকে হাতে পাবার দরকার নেই।' গানটি তার আগের ঘটনা বর্ণনা করছে। সুদর্শনা তার নাম লিখে রাজার কাছে মালাটি পাঠিয়েছে। এরমধ্যে ঠাকুরদা ও দেশি পথিকদের প্রবেশ। সকলকে লাল রঙে রাঙা করে দিয়েছে। রাজারা ছাড়া সকলেই রাঙা হয়ে আছে। বাউলের প্রবেশ ও গান : 'যা ছিল কালো ধলো/তোমার রঙে রঙে রাঙা হলো ।/ যেমন রাঙাবরণ তোমার চরণ/তার সনে আর ভেদ না রল ।/ রাঙা হলো বসন ভূষণ,/রাঙা হলো শয়ন স্বপন,/ মন হলো কেমন দেখ রে, যেমন/রাঙা কমল টলোমলো ।'

সব লালে লাল হয়ে আছে, শুধু চাঁদটাই ফাঁকি দিয়েছে, সাদাই রয়ে গেল। ঠাকুরদা জানায়, বাইরে থেকেই কেবল ভালো মানুষ সেজে আছে চাঁদ। ওর সাদা চাঁদর খুললে দেখা যেত যে আজ কত রঙ ছড়িয়েছে এখানে দাঁড়িয়ে সে সব দেখছে। সে নিজে অমন সাদা রয়ে যাবে। এরই মাঝে গান : 'আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা/প্রিয় আমার ওগো প্রিয় ।/ বড়ো উতলা আজ পরান আমার/ খেলাতে হার মানবে কি ও ?/ কেবল তুমি কি গো এমনি ভাবে/ রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে ?/ তুমি সাধ করে নাথ, ধরা দিয়ে/ আমারও রঙ বক্ষে নিয়ো-/ এই হৃদকমলের রাঙা রেণু/ রাঙাবে ওই উত্তরীয় ।'

গানটি যেন সুদর্শনার। এই প্রাণের খেলা রাজার সাথে, অর্থাৎ এখানে সুদর্শনার আকাঙ্ক্ষাও যেন ফুটে উঠেছে। 'কেবল তুমি কি গো এমনি ভাবে/রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে ।/তুমি সাধ করে নাথ, ধরা দিয়ে/আমারও রঙ বক্ষে নিয়ো-' রাজা কি তার থেকে শুধু পালিয়ে থাকবে? রাজা কি রঙে রঙিন হবে না? এরই মধ্যে সুবর্ণ প্রসাদে আগুন লগিয়ে দেয়। সে আগুন ভয়ংকর হয়ে উঠে। বিক্রম ও সুবর্ণও বিমূঢ় হয়ে ওঠে। তারা পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। সুবর্ণ ভয়ে

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। প্রাসাদের চারদিক আগুন ধরে যায়। সুদর্শনা বাঁচবার জন্য রাজবেশী সুবর্ণর কাছে সাহায্য চাইলে সে জানায় সে রাজা নয়, সে ভন্ড, পাষন্ড। সে মুকুট ফেলে পালিয়ে যায়। চারদিকে আগুন লেগে গেলে রাজকুমারী ভয় পেয়ে যায় এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, সুবর্ণ ভন্ড জেনে সে বিমূঢ় হয়ে পরে। সুরঙ্গমা এসে তাকে আগুনের ভিতর দিয়ে বের করে নিয়ে যায়, কারণ সে রাস্তা চিনে এবং রাজা অপেক্ষা করছেন আগুনের ভিতর। আজ সোনা পুড়িয়ে খাঁটি করিয়ে নেবেন তিনি আগুনে। গানের দল গাইতে গাইতে প্রবেশ করে : 'আগুন হল আগুনময়।/ জয় আগুনের জয়।/ মিথ্যা যত হৃদয় জুড়ে/ এই বেলা সব যাক না পুড়ে,/ মরণ-মাঝে তোর জীবনের হোক রে পরিচয়॥'

এই আগুনের মাঝেই মিথ্যা পুড়ে সত্য বেরিয়ে এলো যে সুবর্ণ আসল রাজা নয়। আগুনে মরতে গিয়ে জীবনের পরিচয় পেলেন সুদর্শনা। এরই সাথে রাজাকে চিনতে না পারার লজ্জা তাকে গ্রাস করে। কবি বলছেন সেই লজ্জা মুছে যাক এই আগুনেই এবং ভয় সব চিরদিনের মতন ছাই হয়ে যাক। গান শেষ হলে সুদর্শনা জানায় আগুনের মধ্যে সে রাজার রূপ দেখেছে। সেই রূপ ভয়ংকর, কালো যা স্মরণ করতেও ভয় হয়। সুরঙ্গমা বলে, 'যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে ভালোবাসা কিসের?' এর পরেই একটি অসামান্য গান : 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না,/ ভালোবাসায় ভোলাব।/ আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো,/ গান দিয়ে দ্বার খোলাব।'

রাজা কাউকে রূপে ভোলান না। সেজন্য সুদর্শনাকেও তিনি রূপে ভোলাবেন না। তিনি প্রেমে ভালোবাসায় ভোলাবেন। তিনি হাত দিয়ে দ্বার খুলবেন না, এ দ্বার মনের দ্বার যা খুলতে কোন জোরাজুরি করবেন না। তিনি দ্বার খুলবেন গান দিয়ে, প্রেম দিয়ে। ভক্তকে তিনি ভোলান না, তাকে তিনি নীরবে নিভৃতে নিজের প্রেমের টানে কাছে ডেকে নেন, ভক্তও তেমনি প্রেম দিয়ে তাকে কাছে পান। রবীন্দ্রনাথের এই বোধের মধ্যে ব্রাহ্মবোধ, বৈষ্ণবীয় বোধ ও মরমি লৌকিক বোধ মিলে মিশে একটি মধুর রবীন্দ্রবোধ নির্মাণ করেছেন। যে তাকে চাইবে তিনি তার প্রাণে তুফান তুলে দিবেন, চাঁদ যেমন অদৃশ্য টানে সাগরে জোয়ার তোলে, ঠিক সেইভাবে। সুরঙ্গমার এই গান সুদর্শনা বুঝতে চায় না। সে চলে যায়। সুদর্শনার মনে কষ্ট– সে চলে আসলো অথচ রাজা তাকে আটকালেন না! পথে বের হলেন কিন্তু সঙ্গে এলো না! সুরঙ্গমা জানায় সমস্ত পথ

জুড়ে তিনি আছেন। তিনি নিষ্ঠুর, কেউ তাকে টলাতে পারেনি তবুও সেই কঠিনেরই জয় হোক : 'ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর/ তোমার প্রেম তোমারে এমন করে/ করেছে নিষ্ঠুর ।/ তুমি বসে থাকতে দেবে না যে,/ দিবানিশি তাই তো বাজে/ পরান মাঝে এমন কঠিন সুর॥'

এরমধ্যে বিক্রম জানায় সুবর্ণ পালিয়ে গেছে। তারা যখন আঁটঘাট বাঁধছিল রাজকন্যাকে উদ্ধারের জন্য তখন 'কোথা থেকে অগ্নিমূর্তি ধরে ঢুকে পড়ে। সৈন্যরা পালিয়ে যাওয়ার খবর এলো। তাদের মধ্যে অকারণে কেমন একটা আতঙ্ক ঢুকে গেছে। তারা প্রস্থান করে। সুরঙ্গমা প্রবেশ করে গান গাইতে গাইতে : 'বসন্ত তোর শেষ করে দে রঙ্গ,/ ফুল ফোটাবার খ্যাপামি, তার উদ্দাম তরঙ্গ ॥/ উড়িয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার/ মাতম তোমার থামুক এবার,/ নীড়ে ফিরে আসুক তোমার পথহারা বিহঙ্গ ॥'

সুদর্শনার মনে শান্তি নেই। পথ কেবল তাকে একই জায়গায় নিয়ে আসছে। সুরঙ্গমা বলেন, 'যে পথ তাঁর কাছে না নিয়ে যাবে সে পথের অন্ত পাবে না কোথাও'। সৈনিক এসে জানায় সুদর্শনার বাবাকে রাজা বিক্রম বন্দী করেছে। সুদর্শনা রাজা বিক্রমের শিবিরে আত্মসমর্পন করতে চায়। কিন্তু যুদ্ধ শুরুর আগেই বিক্রমের বুকে ঘাঁ লেগেছে, হেরে গেছে। সুরঙ্গমা গান গেয়ে প্রবেশ করে : 'এখনো গেল না আঁধার,/ এখনো রহিল বাধা ।/ এখনো মরণ-ব্রত/ জীবনে হল না সাধা ।/ কবে যে দুঃখজ্বালা/ হবে রে বিজয়মালা,/ ঝলিবে অরুণরাগে/ নিশীথরাতের কাঁদা ।'

দেখা যাচ্ছে, সুদর্শনার রাজা বিক্রমকে রাজমুকুট পরিয়ে রাজ্যের রাজা বানিয়েছেন। কিন্তু দেখা দেননি। তাই বিক্রম রাতে পথে বের হয়েছে রাজার খোঁজে। ঠাকুরদার সাথে দেখা। সে এখন ফেরত দিতে চায় মুকুট। ঠাকুরদাও পথে কেন জিজ্ঞাসে গেয়ে ওঠে : 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি/ সর্বনাশের আশায়/ আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি/ পথে যে জন ভাসায় ।'

ঠাকুরদা গভীরের গোপন ভালোবাসায় মজেছেন। কিন্তু এ ভালোবাসা সর্বনাশা। ঠিক যেন সুদর্শনা আর রাজার মতন। দেখা দেয় না, আড়াল থেকে ভালোবাসে। সুরঙ্গমার গান গেয়ে প্রবেশ : 'পথের সাথি, নমি বারংবার ।/ পথিক জনের লহো নমস্কার॥/ ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি/ ওগো দিনশেষের পতি,/ ভাঙা-বাসার লহো নমস্কার ॥'

সুদর্শনা প্রবেশ করে জানায় তার ভিতরের কঠিন গলেছে। সে রাজার কাছে ফিরে যাবে। কাল

রাতে তার বারে বারে মনে হচ্ছিল কোথায় যেন তার বীণা বাজছে। যে নিষ্ঠুর, তার হাতে অমন করে বীণা বাজবে না, তাতে কেবলই মিনতির সুর। সুরঙ্গমা জানায় 'অভিমানের গলানো সুর সে'। গানের দল গাইতে গাইতে প্রবেশ করে : 'আমার অভিমানের বদলে আজ/ নেব তোমার মালা।/ আজ নিশিশেষে শেষ করে দিই / চোখের জলের পালা ॥/ আমার কঠিন হৃদয়টারে/ ফেলে দিলেম পথের ধারে,/ তোমার চরণ দেবে তারে মধুর/ পরশ পাষাণ-গালা॥/ ছিল আমার আঁধারখানি,/ তারে তুমিই নিলে টানি,/ তোমার প্রেম এলো যে আগুন হয়ে/ করল তারে আলা।/ সেই যে আমার কাছে আমি/ ছিল সবার চেয়ে দামি/ তারে উজাড় করে সাজিয়ে দিলেম/ তোমার বরণডালা ॥'

গানটি অনেকটা নেপথ্য সংগীতের কাজ করে । সুদর্শনার হয়ে যেন গানের দল গাইছে। অভিমানের বদলে আজ মালা নেবে। এর আগে সে মালা দিয়েছিল ভুল মানুষকে। মধুর পরশে কঠিন হৃদয় গলে আজ রাজার চরণে দেবার জন্য প্রস্তুত। আজ উজাড় করে সে বরণমালা সাজিয়েছে। মূলত এ যেন সুদর্শনারই মনের কথা। সুদর্শনা রাজার খোঁজে বের হয়েছে। সে টের পাচ্ছে রাজা সাথেই আছেন। তাকে দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু অনুভব করছে। সুরঙ্গমা গেয়ে ওঠে : 'আমার আর হবে না দেরি,/ আমি শুনেছি ওই বাজে তোমার ভেরী॥ / তুমি কি নাথ দাঁড়িয়ে আছ/ আমার যাবার পথে,/ মনে হয় যে ক্ষণে ক্ষণে/ মোর বাতায়ন হতে/ তোমায় যেন হেরি॥/ আমার স্বপন হল সারা/ এখন প্রাণে বীণা বাজায় ভোরের তারা।/ দেবার মতো যা ছিল মোর/ নাই কিছু আর হাতে,/ তোমার আশীর্বাদের মালা/ নেব কেবল মাথে/ আমার ললাট ঘেরি॥'

এই গানটিও সুদর্শনার ভাষ্য কিন্তু সুরঙ্গমার কণ্ঠে। রাজার মিলন পিয়াসে সুদর্শনা উন্মুখ। পথে রাজা বিক্রমের সাথে দেখা। দুজনই আজ প্রাসাদের সোনা রুপা ফেলে ধুলোর পথে বের হয়েছে রাজার খোঁজে। এই ধুলোমাটিতেই রাজার সাথে পদে পদে মিলন হচ্ছে। ভোরে তারা প্রাসাদে পৌঁছায়। প্রাসাদের চূড়ায় সোনার শিখর। ঠাকুরদা জানায় অভ্যর্থনায় কোন রথ নেই, বাদ্য নেই, সমারোহ নেই। সুদর্শনা বলে, 'বল কী সমারোহ নেই? ঐ যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ।' সকল খেলার অবসান হয়। সূর্য উঠার সাথে সাথে গান : 'ভোর হল বিভাবরী, পথ হলো অবসান/ শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরই গান।/ধন্য হলি ওরে পান্থ/ রজনীজাগরক্লান্ত,/ ধন্য হলো মরি মরি ধুলায় ধূসর প্রাণ॥/ বনের কোলের কাছে/

সমীরণ জাগিয়াছে;/ মধুভিক্ষু সারে সারে/ আগত কুঞ্জের দ্বারে ।/ হল তব যাত্রা সারা/ মোছ মোছ অশ্রুধারা,/ লজ্জাভয় গেল ঝরি, ঘুচল অভিমান ।/ ঘুচিলরে অভিমান ।'

সব অভিমান, লজ্জা ভুলে রানী ভোরবেলা এসেছেন রাজার রাজ্যে মিলনের জন্য। গানে সেই বাণীই ধ্বনিত হচ্ছে। এখন শুধু প্রাপ্তি আর মিলন। আবারো অন্ধকার ঘরে রাজার সাথে রানীর দেখা। রানী রাজার চরণের দাসী হিসেবে সেবা করার অধিকার চান। রাজা জানতে চায়, তাকে সহ্য করতে পারবে নাকি? সুদর্শনা বলেন, 'পারব রাজা পারব। আমার প্রমোদবনে, আমার রানীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই এমন বিরূপ দেখেছিলুম। সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে। তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।' রাজা অন্ধকার ঘরের দ্বার খুলে দিয়ে বলেন, এখানকার লীলা শেষ হলো। এসো এবার আমরা বাইরে আলোয় যাই। সুদর্শনা নাটকের শেষ সংলাপটি বলেন, 'যাবার আগে আমার অন্ধকার প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।' এরপর নাটকের সমাপনী গান :

> 'অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে,/ সে বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয়-মাঝে॥
> ভুবন আমার ভরিল সুরে,/ ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দূরে,
> সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে ॥'

পুরো নাটকের মূল তত্ত্বটি যেন এই একটি গানে প্রকাশ করা হলো। রূপের আড়ালেই অরূপের বাস। রাজা ছিলেন রূপহীন কিন্তু রূপের ভিতর দিয়েই তার প্রকাশ। সেই অরূপবীণা অন্তরে বাজলে জগৎ সুরে ভরে যায়। বিরহ মিলনের পার্থক্য আজ দূর হয়ে গেছে। সুদর্শনার সেই বোধ জাগ্রত হয়েছে। সিদ্ধি লাভ করেছে সে আজ।

'রাজা' নাটকটি 'অরূপরতনে' রূপান্তরিত হবার সময় সাংগীতিক দিক থেকে বড় রকমের পরিবর্তিত হয়েছে। 'রাজা' নাটকের প্রথম সংস্করণে গান ছিল মোট ২২টি, 'অরূপরতনে' আছে ৩৯টি গান। রচনাবলী বিশ্ব ও পর্ব সংস্করণে যে অরূপরতনটি পাওয়া যায় সেটি ১৬ বছর পর ১৩৪২ এর কার্তিক মাসে দ্বিতীয় সংস্করণ হিসেবে প্রকাশিত। বহুলাংশে পরিবর্তিত এই দ্বিতীয় সংস্করণে গানের সংখ্যা কমে যায়। কিছু পাল্টেও যায়। প্রবীরগুহ ঠাকুরতা বলেন, "এই পঁচিশটি গানের মধ্যে সুরঙ্গমার গানের সংখ্যাধিক্য দেখে মনে হয় যে মধ্যবর্তীকালে নারীকণ্ঠের গানের

প্রয়োগ ক্রমশ সহজসাধ্য হয়ে আসছিল।"৬৬

'রাজা' নাটকের রাজার কণ্ঠের দুটি গান এই নাটকে সুরঙ্গমার কণ্ঠে– 'খোল খোল দ্বার' এবং 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না'। তবে রাজা থেকে চরিত্র বদল হওয়া গানগুলোতে বাণীর কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয় চরিত্রের সাথে মিল রেখে। যেমন 'খোল খোল দ্বার' গানটি যখন সুরঙ্গমা গাইছে তখন 'এসেছি দুয়ারে এসেছি/আমারে বাহিরে রেখো না দাঁড়ায়ে' লাইন দুটি বর্জিত। এই নাটকটিতে সবগুলো গান গাওয়া হয়েছে যাত্রাপালার বিবেকের গানের আদর্শে। গানের দলের কোন কথা নেই। পাত্রপাত্রীরা কথা শেষ করে মঞ্চ ত্যাগ করেন এবং সেই কথার রেশ ধরে গানের দল প্রবেশ করে গান গেয়ে প্রস্থান করে। নাটকটিতে প্রথম সংস্করণের ৩৯টি গানের ৪টি গান প্রকৃতি বসন্ত পর্যায়ের এবং গ্রীষ্ম ও শরৎ ঋতুর গান রয়েছে। এছাড়াও ২০টি পূজা এবং ৬টি প্রেম পর্যায়ের গান রয়েছে। বাউল কীর্তন সুরে ১৪টি গান। অন্যদিকে প্রচলিত সংস্করণে ২৫টি গানের ২টি প্রকৃতি বসন্ত, পূজা পর্যায়ের ১৩টি এবং প্রেম পর্যায়ের ৩টি গান রয়েছে। বাউল ও কীর্তন সুরে রয়েছে ৮টি গান।

অরূপরতনে গুরুদেবের অভিনয়ের জীবন সমাপ্ত হয়েছিল। এরপর তিনি আর কোন নাটকে অভিনয় করেননি। ৭৪ বছর বয়সে তিনি ঠাকুরদার চরিত্রে অভিনয় করেন এই নাটকে।

৪. গৃহপ্রবেশ (১৯২৫)

'গৃহপ্রবেশ' নাটকটিতে এর মূল চরিত্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত যতীনের শারীরিক অবস্থা ক্রমশ অন্তিম পরিণামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের রাত্রি' গল্প থেকে এর বিষয়বস্তু নেয়া হয়েছে। শেষের রাত্রি গল্পে একটি গান ছিল। গল্পকে নাটকরূপে উপস্থাপিত করার সময় কয়েকটি গান যোজনা করা হয়েছে। 'গৃহপ্রবেশ' সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন :

> "গৃহপ্রবেশ - শেষের রাত্রি নামে রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পের নাট্যরূপায়ণ। গৃহনির্মাণ ও গৃহপ্রবেশের প্রসঙ্গটি গল্পে স্থান পায় নাই। তাছাড়া উকিল, অখিল ও ডাক্তারকে নূতন করিয়া নাটকে প্রবেশ করানো হইয়াছে। গৃহপ্রবেশ সমস্যার আনুষাঙ্গিক হিসাবে অখিলের অবতারণার প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রেমহীনা পত্নীর ঔদাসীন্য ও তাচ্ছিল্যে একটি রুগ্ন, মরণ পথযাত্রী, প্রেমিক, কবিপ্রাণ, উদারহৃদয় স্বামীর মানসিক আলোড়ন ও ব্যর্থ প্রেমের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা এবং উদার ক্ষমায় তাহা ভুলিবার জটিল চিত্ত-দ্বন্দ্বই এই নাটিকার বিষয়বস্তু। এই দ্বন্দ্ব একান্তভাবে স্বামী যতীনের চিত্তলোকের সামগ্রী। বাহিরের অভিব্যক্তির মধ্যে প্রকাশের দ্বারা নাটকের ঘটনাপুঞ্জকে ইহা প্রভাবিত করে নাই। খন্ড খন্ড দুই একটি সংবাদ বা অনুমানের

মারফতে বা অবদমিত আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় রোগশয্যাশায়ী যতীনের মনে এই দ্বন্দ্বের উদ্ভব ও তাহার মৃত্যুতেই ইহার পরিসমাপ্তি। প্রতারিত হৃদয়ের মিথ্যা সন্তোষ ও সান্ত্বনা বঞ্চিত জীবনের স্তব্ধ বেদনার সহিত মিশিয়া একটি করুণ অশ্রুসজল সুর মূর্চ্ছনায় সমস্ত নাটকটিকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে।"[৬৭]

যতীনের শারীরিক অবস্থার দিন দিন অবনতি হচ্ছে– এ নিয়ে হিমি ও প্রতিবেশীনির মধ্যে কথা হচ্ছে। এরমধ্যে যতীনের স্ত্রী মণি ছাদ থেকে নেমে আসে। রোগীর ঘর থেকে আসছে নাকি জানতে চাওয়ায় সে জানায় ছাদে গাছে পানি দিতে গিয়েছিল। মাসিকে আসতে দেখে প্রতিবেশিনী চলে যায়। মণি অসুস্থ যতীনের ঘরে যেতে চায় না। যতীনের দৃষ্টি সে ভয় পায়, সাথে অসুখও। তাই যখন সে ঘুমায়, তখনই প্রবেশ করে। সন্ধ্যায় সেই ঘরে যেতে তার ভয় হয় কারণ সে ঘরে তার শ্বশুর মারা গিয়েছিলেন। যতীন মণির খোঁজ করলে জানানো হয় যে, সে পথ্য তৈরি করছে কিংবা ঘুমের সময় এসে দেখে গেছে। জীবজন্তুর প্রতি মণির ভালোবাসা কিন্তু অসুস্থ যতীনের প্রতি সে উদাসীন।

যতীন খুব ঘটা করে বাড়ির কাজে হাত দিয়েছিল কিন্তু অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় শেষ করতে পারেনি। আর আর্থিক সংকটের কারণে মাসিও কাজ আগাতে পারেনি। তাই যতীন যখনই বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করে, তাকে কষ্ট না দেয়ার জন্য জানানো হয় বাড়ির কাজ চলছে। তাকে জানানো হয় পদ্মফুলের আলপনা মেঝেতে, তার উপর মণি বিয়ের শাড়ি পরে বসে আছে। বিয়ের লগ্নের দিন যতীনের খুব ইচ্ছা হয় মণিকে দেখে আসতে কিন্তু শরীরে কুলোয় না। বাড়ির নাম সে মণিসৌধ রাখবে বলে জানায়। এরমধ্যে হিমিকে ডেকে আনে যতীন গান শোনবার জন্য : 'খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি/ মনের ভিতরে।/ কত রাত তাই তো জেগেছি/ বলব কি তোরে।/ পথে যে পথিক ডেকে যায়,/ অবসর পাই নে আমি হায়,/ বাহিরে খেলায় ডাকে যে- / যাব কি করে।'

এ যেন যতীনের মনের কথা। সে মনে মনে ঘর তৈরির স্বপ্ন দেখছে। ঘরের কোথায় কি হচ্ছে তা কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে। মিথ্যে আশ্বাসে সে ভুলে আছে। কতরাত জেগে সে পরিকল্পনা করেছে কোথায় কি হবে, মনে মনে তা সাজাচ্ছে। যতীনের নিজের তৈরি ঘরটি আজ খেলাঘর রূপেই দেখা দেয়। কারণ সে মনের মধ্যে তা গড়ে তুলছে, গিয়ে দেখতে পারছে না– 'পথে যে পথিক ডেকে যায়/অবসর পাইনে আমি হায়/বাহিরের খেলায় ডাকে যে/যাব কি করে।' বাইরে খেলা চলছে তাতে যোগ দেবার জন্য পথিকেরা ডাকলেও অবসর নেই যাবার। যতীনের অসুস্থতা তাকে

অবসর দিচ্ছে না। ঘর মজবুত করে বানানো হলেও এক সময় তা ভেঙে যায় খেলাঘরের মতো, শেষ পর্যন্ত টেকে না। মনে হয় পুরানো ঢেলা দিয়ে ঘর তৈরি হয়েছিল, টিকলো না। পরমেশ্বর নিত্য খেলছেন আমাদের সাথে। তারই তৈরি এই সিংহাসন। তিনি গড়েন, ভাঙেন, আবার জোড়াও লাগান। আমরা নিমিত্ত মাত্র।

ডাক্তার এসে গান শুনে খুশি হয়ে যায়, কারণ গান ঔষুধের চেয়ে ভালো কাজ করে। এ সময় রোগীর মন ভালো রাখা সবচেয়ে জরুরি। যতীন জানায় খুব শীঘ্রই তার বাড়ির গৃহপ্রবেশ। ডাক্তার হিমিকে পাশের ঘরে গিয়ে গান গাইতে বলে, যতীনের অনুরোধে বিয়ের লগ্নে সে গান গায় : 'বাজো রে বাঁশরী বাজো।/ সুন্দরী, চন্দনমাল্যে/ মঙ্গলসন্ধ্যায় সাজো।/ আজি মধুফাল্গুন মাসে,/ চঞ্চল পান্থ কি আসে।'

গানটি বিয়ের লগ্নের ও আনন্দের। বধূ সজ্জায় ব্যস্ত তার চঞ্চল পান্থের সাথে মিলনের অপেক্ষায়। এ যেন প্রকারন্তে যতীনেরই মনের কথা। তাকে বলা হয়েছে মণি বিয়ের শাড়ি পরে আল্পনা আঁকছে। দরজার দু ধারে মঙ্গলঘট রাখা হয়েছে ঠিক যেমনটি সে চেয়েছিল। সে কল্পনায় তাই দেখতে পাচ্ছে। একদিকে যতীন মণির কল্পনায় বিভোর, অন্যদিকে মণি বাস্তবতার থেকে বহুদূরে।

ড. করুনাময় গোস্মামী বর্ণনায় বলেন :

> "যে মণির কথা মনে করে যতীন এই গানটি গাইতে বলে, বিয়ের সময়কার লাল চেলি পরে ত্রিতলের নতুন কোঠার সৌন্দর্যকে আরও সুন্দর করে তুলছে ফুল দিয়ে সাজিয়ে, মাসি যেমন করে মণির কথা জানান, সে যে কী অনাগ্রহী রোগী যতীনের ঘরে যেতে বা তাকে দেখতে বা তার কথা শুনতে, সে পরিস্থিতির সঙ্গে এ গানটি মিলিয়ে শুনলে এক ঘোরতর অভিজ্ঞতা হয়। বৈপরীত্যকে একটি গান যে কী তীব্র করে তুলতে পারে, আনন্দশব্দ যে বেদনাবিদ্ধ শব্দের চেয়েও দীর্ণ হয়ে উঠতে পারে, শুধু পরিস্থিতির জন্যে, হিমির এ গান প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।"[৬৮]

পাশের ঘরে মাসিকে ডেকে ডাক্তার তাকে যে কোনকিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে জানায়। আর মাত্র অল্প কয়টা দিন, ঔষুধে আর কাজ হবে না, মনটাকে প্রফুল্ল রাখতে হবে। মণিকে রোগীর পাশে থাকতে বলে। যদিও মণির রোগীর প্রতি কোন আগ্রহ নেই, সে কথা মাসি জানান না।

যতীন অ্যালবামের একটি ছবি খুঁজছে; হিমি ঘরে প্রবেশ করায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বালিশের নিচ থেকে ছবিটি বের করে দেয়। বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিম গাছের তলায় মণির সাথে তোলা ছবি।

যতীনের সেদিনকার কথা মনে পড়ে যায়, সে যেন আর-জন্মের কথা। সেই নিমগাছের তলায়, মণি পরেছিল কুসমি রঙের শাড়ি। ঘাড়ের কাছে নিচু করে বাঁধা ছিল খোঁপা। কোথা থেকে একটা বউ-কথা-কও ডেকে ডেকে অস্থির হচ্ছিল। নদীতে জোয়ার এসেছে, সে কী হাওয়া আর ঝাউগাছের ডালে ডালে ঝরঝরানি শব্দ! মণি ঝাউয়ের ফলগুলো কুড়িয়ে তার ছাল ছাড়িয়ে শুঁকে বলেছিল, আমার এই গন্ধ খুব ভালো লাগে। তার কী ভালো লাগে না, তাই যতীন বুঝতে পারে না। তারই ভালো লাগার ভিতর দিয়ে এই পৃথিবীটা সে অনেক ভোগ করেছে। সে দিন হিমি একটা গান করেছিল, যতীন সেই গানটি গাইতে অনুরোধ করে : 'যৌবনসরসীনীরে/ মিলনশতদল,/ কোন চঞ্চল বন্যায় টলমল টলমল।/ শরম-রক্তরাগে/ তার গোপন স্বপ্ন জাগে,/ তারি গন্ধকেশর-মাঝে/ এক বিন্দু নয়নজল।'

এই মুহূর্তে গানটি একটি নাটকীয় আবেদন তৈরি করে। বৈপরীত্য এই গানটিকে তীব্র করে তুলেছে। যখন গানটি গাওয়া হয়েছিল, তখন যতীন সুস্থ, সে আর মণি ঘুরে বেড়াত। কিন্তু এখন তার অবশিষ্টও নেই। যতীন যে কোন সময় চলে যাবে, মণিকে সে বুঝতে পারে না। তার ভয় হয় যদি কোন ভুল হয়, শঙ্কিত চিত্তে তার আঁখি ছলছল করে। যদি সে কষ্ট পায় কিছুতে। সে দিন এ গানে যেন গাছতলা কথা বলে উঠেছিল কিন্তু আজ যেন নিস্তব্ধতাই বড় প্রিয়। একই গানের দুই পরিবেশে দুইরকম আবেদন। গানের মাধ্যমে সেই দিনের স্মৃতি যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, ভাষায় তা প্রকাশ হতো না।

পাটের ব্যবসায় যতীনের লোকসান হয়েছে। পুরানো বাড়ি বন্ধক অখিলের মক্কেলের কাছে, সেই বন্ধকের টাকা দিয়ে গড়ে উঠছে যতীনের মণিসৌধ। অন্যদিকে মণির জ্যাঠাতো ভাই খবর নিয়ে আসে মণির ছোট বোনের অন্নপ্রাসন, সে যাবেই। মাসি কোনভাবেই তাকে মানাতে পারে না। যে কোন সময় যতীনের একটা কিছু হয়ে যেতে পারে। মণির বাবা এই অবস্থায় যতীনকে রেখে এসেছে শুনলে রাগ করবে জানালে মণি বলে মাসিকেই দুলাইন লিখে দিতে হবে যে সে গেলে ক্ষতি হবে না। যতীন মাসিকে ডেকে বলে মণিকে সীতারামপুরে বাবার বাড়ি পাঠাতে। সে অসুখের জালে মণিকে বেঁধে রেখেছে। কিন্তু মাসি জানায় বাড়ি যাবার কথা শুনলেই সে কাঁদে, যতীনকে রেখে যাবে না। শুনে যতীন খুশি হয়ে যায়। মিথ্যের জালে মাসি ভুলিয়ে রাখে। পাওনাদারদের চিন্তায়ও কিছুটা বিচলিত হলেও তার জন্য মণি কেঁদেছে ভেবে সে অদ্ভুত শান্তি পায়। হিমিকে ডেকে গান শুনতে চায় : 'আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী।/ নয়ন

আমার কাঙাল হয়ে মরে না ঘুরি ।/ চেয়ে চেয়ে বুকের মাঝে/ গুঞ্জরিল একতারা যে,/ মনোরথের পথে পথে বাজল বাঁশুরি/ রূপের কোলে ওই-যে দোলে অরূপ মাধুরী ।/ কূলহারা কোন রসের সরোবরে,/ মূলহারা ফুল ভাসে জলের পরে ।/ হাতের ধরা ধরতে গেলে/ ঢেউ দিয়ে তায় দিই-যে ঠেলে,/ আপন-মনে স্থির হয়ে রই, করি নে চুরি ।/ ধরা দেওয়ার ধন সে তো নয়, অরূপ মাধুরী ।'

গানটি বাউল সুরে । এখানে অরূপ মাধুরী মণি । তাকে দেখার জন্য যতীনের নয়ন কাঙাল হয়ে ঘোরে– একবার যদি সে আসে । তার পথ চেয়ে বুকের মাঝে, মনের মাঝে একতারা বাজে । সে থাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে, তাকে ধরতে গেলে ধরা দেয় না । মণিকে দেখার আশায় তার চোখ খুঁজতে থাকে কিন্তু সে তো আসে না । যখন সে ঘুমিয়ে থাকে তখন এসে দেখে যায়, একটু পাশে থাকে না, বসে না । যতীন মণির সাথে কথা বলতে চায় । সে মাসিকে জানায়, মণিসৌধ তৈরি শেষ হওয়ার খবরটা আপন মুখে তাকে দিতে চাই । গৃহপ্রবেশ তার নয়, গৃহপ্রবেশ মণিকে করতে হবে । তার জন্যেই তো যতীনের সৃষ্টি– ইটকাঠের বীণায় গান ।' দরজার বাইরে থেকে হিমি গান গাইবে - 'মোর জীবনের দান, / করো গ্রহণ করার পরম মূল্যে চরম মহীয়ান!'

সে কারো সাথে দেখা করবে না, কোন দেনা-পাওনা ব্যবসায়িক কথা সে শুনতে চায় না । হিমিকে ডেকে দিনু বাউলের গানটি শুনতে চায় : 'ওরে মন যখন জাগলি না রে/ তখন মনের মানুষ এল দ্বারে ।/ তার চলে যাবার শব্দ শুনে/ ভাঙল রে ঘুম/ ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে ।'

নাটকটির সবগুলো গানই যেন মণি কেন্দ্রিক । হিমি গাইলেও, যতীন তার মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা-ভাবনাগুলো যেন হিমির মুখ দিয়েই শুনতে চাচ্ছে । মণির মন জেগেছে শুনেও সে বিশ্বাস করতে পারছে না । রূপকার্থে বোঝাতে চাইছে । মন যেন তখনি জাগলো যখন চলে গেল, যখন কাছে ছিল তখন নয় । চলে যাওয়ার শব্দে ঘুমও ভাঙলো । ফিরে যাওয়ার শব্দে বুকের মাঝে যেই আলোড়ন হলো সেই অলোড়নই হাহাকার রবে তুফান তুলবে । গান শেষে নিজেই হিমিকে বলছেন হিমির কাছে শুনেছেন মণির মন জেগেছে, কিন্তু হিমি বুঝতে পারবে না যতীন কি বলতে চাইছে । হয়তো গানের মধ্যে সে বোঝাতে চাইছে মণির মন যখন জেগে উঠলো তখন তার যাবার সময় হয়ে এসেছে । মন জাগলো কি জাগলো না, জেগে উঠতে অনেক দেরি হয়ে গেলো । যতীন হিমির কাছে বাড়ির কাজের অগ্রগতি জানতে চায় । অন্যদিকে মণি সবার নিষেধ উপেক্ষা করে বাবার বাড়ি চলে যায় । ডাক্তার সেই খবরে রাগ করেন কারণ মণি হচ্ছে যতীনের

প্রাণভোমরা, সে চলে গেছে জানতে পারলে রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাবে। মাসি ডাক্তারকে অনুরোধ করেন মণির বাবাকে যতীনের শারীরিক অবস্থা জানিয়ে চিঠি লিখে দিতে। ডাক্তার হিমিকে যতীনের কাছে বসে পছন্দের গান গাইতে। এই মুহূর্তে গানই পারে তাকে সুস্থ রাখতে : 'ওই মরণের সাগরপারে চুপে চুপে/ এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপনরূপে ।/ কান্না আমার সারা প্রহর তোমায় ডেকে/ ঘুরেছিল চারি দিকের বাধায় ঠেকে,/ বন্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকূপে;/ আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে ।/ আজ কী দেখি কালোচুলের আঁধার ঢালা,/ স্তরে স্তরে সন্ধ্যাতারার মানিক জ্বালা ।'

মরণ সন্নিকটে। মরণসাগর পারেও যেন মণি ভুবনমোহিনী স্বপন রূপে বিরাজ করছে। তার বন্ধ জীবনের অন্ধকূপে তাকেই সে ডেকে বেড়ায়। মণির কালো আধার চুলের ঢালা, সন্ধ্যাতারায় মানিক জ্বেলে আকাশ গানের ব্যথায় ভরে দিয়েছে। মণিকে সে গানের মধ্যেই খুঁজে পায়। যতীন মণিকে দেখতে চায় কিন্তু সে তো সীতারামপুর চলে গেছে। মাসী এসে ছলনা করে যতীনের জন্য জানায় দুধ জ্বাল দিতে পুড়ে গিয়েছে, সেই নিয়ে অনেক কান্নাকাটি করায় মাসী তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে এসেছে। যতীন বলে উঠে সে বুঝতে পারছে দিন শেষ হয়ে আসছে, ওপারের সানাইয়ের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। হিমিকে গাইতে অনুরোধ করে : 'যদি হলো যাবার ক্ষণ ।/তবে যাও দিয়ে যাও শেষের পরশন ।/ বারে বারে যেথায় আপন গানে/স্বপন ভাসাই দূরের পানে,/ মাঝে মাঝে দেখে যেয়ো শূন্য বাতায়ন-/সে মোর শূন্য বাতায়ন ।'

পুরো গানটিতেই তার না থাকার অনুপস্থিতি। তার যাবার সময় হয়েছে মণি এসে যেন শেষ পরশন দিয়ে যায়। যতীন চলে যাবে শুধু রয়ে যাবে স্মৃতি। মণি তার কাছে আসে না, চলে যাবার পর যেন সে এসে তার শূন্য বাতায়ন দেখে যায়। তাকে সে মনে রাখবে কি না, সুন্দর প্রকৃতিচিত্রের মধ্যে মিলন বিরহ। সে বিরহ বাস্তবে আর মিলন স্বপ্নে। যতীন নিজেই জানায়, 'আমার সঙ্গে আমার কষ্টের ক্রমেই যেন বিচ্ছেদ হয়ে আসছে। বোঝাই নৌকোর মতো জীবন-জাহাজের সঙ্গে সে ছিল বাঁধা– আজ বাঁধন কাটা পড়েছে, তাকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার সঙ্গে সে আর লেগে নেই ।– এ তিন দিন মণিকে দিনে রাতে একবারও দেখি নি ।' মাসি জানায় কাল সন্ধ্যায় মণি তার কাছে এসেছিল। যতীন হিমিকে বলে গৃহপ্রবেশের সময় ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু সশরীরে সে থাকবে না, থাকবে হাওয়ায় হাওয়ায়, তারা তার উপস্থিতি বুঝতে পারবে।

সেই সময় যেই গানটি হিমি গাইবে সেটাও সে ঠিক করে রেখেছে। একবার গাইতেও অনুরোধ করলেন : 'অগ্নিশিখা, এসো, এসো,/ আনো আনো আলো।/ দুঃখে সুখে শূন্য ঘরে/ পুণ্যদীপ জ্বালো।/ আনো শক্তি, আনো দীপ্তি,/ আনো শান্তি, আনো তৃপ্তি,/ আনো স্নিগ্ধ ভালোবাসা,/ আনো নিত্য ভালো।/ এসো শুভ লগ্ন বেয়ে/ এসো হে কল্যাণী।/ আনো শুভ সুপ্তি, আনো/ জাগরণখানি।'

গৃহপ্রবেশের সাথে যেন পুণ্যদীপ সমস্ত অকল্যাণ দূর করে দেয়। শান্তি, দীপ্তি, তৃপ্তি, স্নিগ্ধ ভালোবাসায় আর নিত্য ভালো শূন্য ঘর ভরে দেয়। সে থাকবে না কিন্তু গৃহপ্রবেশ যেন মঙ্গলময় হয়। শম্ভুর কাছে যতীন জানতে পারে মণি তিনদিন আগেই বাপের বাড়ি সীতারামপুরে চলে গেছে, এতে তার অস্থিরতা বেড়ে যায়। তার কাছে মনে হচ্ছে বাড়িটাও তার থাকবে না। সে মাসির এবং মণির সাথে অনর্গল কথা বলা শুরু করে। হিমিকে আবার মনে করিয়ে দেয় গৃহপ্রবেশের গানটি। সে যেন ক্ষমা করে দেয়, আর মনে করে 'আমাকে দাদা চিরদিন ভালোবাসত, আজও বাসে।' একপর্যায়ে যতীন উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সবাইকে সরে গিয়ে মাসীকে পাশে বসতে বলে। তার চোখের উপর ঘোর লেগেছে। মনে হচ্ছে মণি এখনি আসবে। গোধূলিলগ্ন তার। এখানে মণি আর পরমেশ্বর যেন সমান্তরাল। বাসরঘরের দরজা খুলবে। হিমিকে ঐ গানটি গাইতে অনুরোধ করে : 'জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে/ বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে।/ এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে/ তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে,/ গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে/ তাহার পানে চাই দু'বাহু বাড়ায়ে।'

এখানে বন্ধু পরমেশ্বর কিংবা মণি। জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে। তার হৃদয়ের বিজন আকাশে মহাসন পাতা। গান পাগল যতীনের ভুবন আর পরজীবন মিলে যায় সুরের সাথে, সে গানের বেদনায় হারিয়ে যায়। অন্তিম মুহূর্তে মণি এসে উপস্থিত হয়, তার পায়ে এসে পড়ে কিন্তু ততক্ষণে যতীন জীবনমরণের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। গানের সাথে নাটকের পরিবেশ মিলে মিশে একাকার। গানের রেশ নিয়েই নাটকের সমাপ্তি। অত্যাসন্ন মৃত্যুর অসহশোক এই গানে তীব্র হয়ে উঠেছে। বস্তুত এই নাটকের সব বেদনাই গভীর হয়েছে গানে, এখানেই গানের উপযোগিতা। জীবন-মরণ দুই বিপরীত মেরুকে এক সমান্তরাল রেখায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন কবি।

এখানে গান আছে মোট নয়টি। একটি শুধু যতীনের কণ্ঠে। বাকিগুলো যতীনের অনুরোধে হিমি কণ্ঠে। গান হচ্ছে নাটকটির প্রাণ। অসুস্থ যতীন তার মনোভাব বা পরিস্থিতি সবকিছুর বর্ণনা করেছেন গানের মাধ্যমে। গান ছাড়া এই নাটকের কাহিনি অসম্পূর্ণ। গৃহে আবদ্ধ যতীনের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সবই প্রকাশ করেছে গানে।

গানই এই নাটকে ভাব প্রকাশের মাধ্যম। মণি যতীনকে ভালোবাসে না, তা বুঝতে পারে যতীন। মণিকে পাবার জন্য সে তার সবকিছু উৎসর্গ করে দেয়, তাও কেন যেন মণি আসে না তার কাছে। এই পাওয়া না পাওয়া, ভালোবাসা, জীবনের ব্যর্থতা সবকিছুই যতীন প্রকাশ করেছে গানে।

১৯২৫ সালে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সময় নাটকটিতে অনেক সংযোজন, বর্জন ও পরিবর্তন করা হয়। নাটকের এই রূপটি কোথাও মুদ্রিত হয়নি। অহীন্দ্র চৌধুরীর সৌজন্যে পাওয়া একটি ব্যবহৃত খন্ড এবং রবীন্দ্রভবনে পাওয়া একটি গ্রন্থের মাধ্যমে রচনাবলী পর্ব ১৬-গ্রন্থপরিচয়ে পরিবর্তনগুলি লিপিবদ্ধ করা রয়েছে। পরিবর্তনের মধ্যে ছিল টুকরি ও বোষ্টমী চরিত্র দুটির অবতারণা, সংলাপ ও নিচে উল্লেখিত গানগুলো :

গান	রাগ - তাল	পর্যায়
১. বল্ গোলাপ মোরে (হিমি)	পিলু - খেমটা	প্রেম
২. সে আসে ধীরে (হিমি)	দেশ - দাদরা	প্রেম
৩. মন রে ওরে মন (বোষ্টমী)	বেহাগ-বাউল - দাদরা	পূজা
৪. সে যে মনের মানুষ (বোষ্টমী)	পিলু-বাউল - দাদরা	পূজা

মোট ১৩টি গানের ৫টি গান পূজা এবং ৫টি গান প্রেম পর্যায়ের, ১টি বিচিত্র ও ২টি আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের গান রয়েছে। ৩টি গানের সুর বাউল পর্যায়ের। নাটকটি নাট্যকারের 'বলাকা' ও 'পূরবী' যুগের রচনা। সেসময় তিনি চিরচঞ্চল মনোভাব ছেড়ে নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করার কামনায় উন্মুখ ছিলেন।

৫. রক্তকরবী (১৯২৬)

নাটকের শুরুতেই নাট্য পরিচয়ে বলা হয়েছে যক্ষপুরীতে নন্দিনী নামে একটি মেয়ে কিভাবে যেন এসে পড়ে। মকররাজ যে বেড়ার আড়ালে থাকেন, সেইটিকে এই মেয়ে যেন টিকতে দেবে না। নাটকের আরম্ভেই রাজার জালের জানালার বাহির বারান্দায় এই কন্যাটির সঙ্গে দেখা হবে।

জানালাটির সুস্পষ্ট বর্ণনা করা অসম্ভব। যারা তার কারিগর তারাই তার কৌশল জানে। নাট্যঘটনা যতটুকু দেখতে পাওয়া যায় তা এই রাজমহলের জালের জানালার বাহির বারান্দায়। ভিতরে কী হচ্ছে তার অতি অল্পই জানা যায়।

নাটকটি যক্ষপুরীকে আশ্রয় করে। এখানকার শ্রমিকদল মাটির নিচ থেকে সোনা তোলার কাজে নিযুক্ত। সেখানে রাজা বাস করেন জটিল আবরণের আড়ালে। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একমাত্র দৃশ্য। নন্দিনী, কিশোর ও সুড়ঙ্গ খোদাইকর বালক। শুরুতেই নন্দিনী নন্দিনী বলে কিশোর ডাকতেই থাকে কারণ তার ভালো লাগে। সে তার জন্য 'রক্তকরবী' ফুল নিয়ে আসে জঞ্জালের ভিতর থেকে। সেজন্য তাকে যক্ষপুরীতে অনেক শাস্তি পেতে হয়, তবু এ-কাজটা সে করে তার মনের থেকে। তার কথা, 'সমস্তদিন তো কেবল সোনার তাল খুঁড়ে আনি, তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে' তার জন্য ফুল খুঁজে আনতে পারলে বেঁচে যাই। নন্দিনীর জন্য ফুল আনাই যেন তার শুষ্ক জীবনে প্রাণের ধারা। সে জীবনও দিতে প্রস্তুত এবং ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই সে প্রতিদিন ফুল নিয়ে আসবে। এর মধ্যে প্রবেশ করেন অধ্যাপক। তিনি নন্দিনীকে ডেকে বলেন, যক্ষপুরে সে হচ্ছে আচমকা আলো তাই তাকে দেখলে বিস্ময় জাগে। আর নন্দিনী জানায় পাতালের সুড়ঙ্গ খুঁড়ে তারা যে যক্ষের ধন বের করে আনছে, সে অনেক যুগের মরা ধন। পৃথিবী তাকে কবর দিয়ে রেখেছিল। সমস্ত শহরের মাটির তলায় কেবল মাথা ঢুকিয়ে অন্ধকার হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছে তারা। রাজাও রয়েছে এক অদ্ভুত জালের দেয়ালের আড়ালে। তার ইচ্ছে করে ঐ সুড়ঙ্গের অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে। আর ঐ বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে রাজাকে উদ্ধার করতে। নন্দিনীর জিজ্ঞাসা, তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু রঞ্জনকে আনেনি কেন? রঞ্জন হচ্ছে নন্দিনীর ভালোবাসা। অধ্যাপকের জিজ্ঞাসা, মরা ধনের মধ্যে প্রাণের ধনকে কেন আনতে চায়? নন্দিনী জানায়, সে এখানে আসলে মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠবে। সে রক্তকরবীর আভরণ পরে, কারণ রনঞ্জন তাকে আদর করে মাঝে-মাঝে রক্তকরবী ডাকে। এ রঙ রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ। তাই সে রঙ গলায়, বুকে, হাতে পরে। যক্ষপুরীরর কালো বাতাবরণে তার এই রক্তলাল পুষ্পাভরণ আশ্চর্য দেখায়।

নন্দিনী জালের দরজায় ঘা দিয়ে রাজাকে বলে সে ভেতরে আসতে চায়। আজ খুশিতে তার মন ভরে আছে, সে রাজার জন্য কুঁদফুলের মালা গেঁথে পদ্মপাতায় ঢেকে এনেছে। রাজা জানায় বারে

বারে না ডাকতে। বাইরে থেকে বলতে, তার কাছে শূন্যতাই শোভা। তার সময় নেই, সে ভিতরে আসতে দেবে না। নন্দিনী জানায় বাইরের গান শুনতে পাচ্ছে নাকি, পৌষের গান, ফসল কাটার গান হচ্ছে। ফসল পেকেছে, কাটতে হবে, তারই ডাক এসেছে : 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে- আয়রে চলে,/ আয় আয় আয়।/ ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,/ মরি হায় হায় হায়।'

এই সাথে আরও বলছে যে, পৌষের রোদ্দুর পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে মেলে দিচ্ছে : 'হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে/দিগবধুরা ধানের খেতে/ রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে/মরি হায় হায় হায়।'

নন্দিনী রাজাকে মাঠে নিয়ে যাবে বলে তাঁকে ডাকে : 'মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হলো / ঘরেতে আজ কে রবে গো। খোলো দুয়ার খোলো।'

রাজা জানতে চান, তিনি মাঠে যাবেন কোন কাজে? নন্দিনী জানায়, মাঠের কাজ যক্ষপুরীর কাজের চেয়ে সহজ। কিন্তু রাজা বলেন, সহজ কাজটি তার কাছে শক্ত। তিনি নন্দিনীকে চলে যেতে বলেন, বাইরে যাবার সময় নেই তার। রাজা প্রাণহীন ঐশ্বর্য নিয়ে অভিসম্পাতের ভিতর মেতে আছে, কিন্তু বাইরে রয়েছে আলোর জগৎ, মাটিতে পা দিলে পৃথিবী খুশি হয়ে উঠবে : 'আলোর খুশি উঠল জেগে/ ধানের শিষে শিশির লেগে,/ ধরার খুশি ধরে না গো, ওই-যে উথলে,/ মরি হায় হায় হায়।'

দ্রুত ছন্দে বাইরের এই গানটিতে রয়েছে নাটকের আসল তত্ত্ব। যক্ষপুরীর জীবন অসাড়, অন্ধকারময়, রাক্ষসপুরীর মতন, সেখানে নেই কোন প্রাণের সঞ্চার। সে রাজাকে বারবার ডাকছে বাইরের আলোতে, কিন্তু রাজার তাতে সাড়া নেই। গানের সুর ও ছন্দে আনন্দ। প্রমথনাথ বিশী গানটি সম্পর্কে বলেন :

> "নাটকখানি যে কর্ষণৎজীবী ও অকর্ষণৎজীবী সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক তাহা বুঝাইবার জন্য কবি আবহসংগীতরূপে ফসল কাটার গানটিকে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু যক্ষপুরীর কানে সে গান প্রবেশ করে না, যাহারা সর্বতোভাবে যক্ষপুরীর ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে তাহাদের কানে অন্তত প্রবেশ করে না। নাটকটির ঘটনার কাল পৌষ, ফসল কাটার সময়, নবান্নের পর্ব আসন্ন। শীতকাল যেমন ফসল কাটার সময়, তেমনি আবার খোদাই কার্যের পক্ষেও প্রশস্ত - কালের ধর্মের মধ্যেই দ্বন্দ্বের কারণ নিহিত, কবি তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।"[৬৯]

গানটিতে প্রকাশ পেয়েছে নাটকের দ্বৈততা। বাইরে নন্দিনী দেখছে পাকা সোনা ফসলের ক্ষেতে

আর যক্ষপুরীতে রাজা ব্যস্ত সোনা নিয়ে। একদিকে ধান্য অন্যদিকে ধন। দুটিই সোনা হলেও একেক জনের আবেদন একেক রকম। বলা যায় নাটকের সার্থক একটি আবহ সংগীত। এতকাল রাজার সময় ছিল না বাইরে যাবার কিন্তু হঠাৎ যেন নন্দিনীকে সে বলে রূপের মায়ায় আড়ালে নন্দিনী অপরূপ। যাকে ছিনিয়ে নিয়ে হাতের মধ্যে রাখলেও ধরে রাখা যায় না। রাজা নিজেই বুঝতে পারছে তার মধ্যে কেবল জোর, আর রঞ্জনের আছে প্রাণের জাদু। সে একবার নন্দিনীকে ধরতে চায়, আবার ভয়ে তাকে সেখান থেকে চলে যেতে বলে, বিপদের আশঙ্কা প্রকাশ করে। এরই মধ্যে চন্দ্রা ও ফাগুলালের প্রবেশ। তারা নন্দিনীকে নিয়ে কথা বলছিল। এরমধ্যে বিশুকে দেখে ডাক দেয় গান গাইতে। বিশু এসে গান ধরে : 'মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে।/ লাগলে পারে নেশার হাওয়া/ পাগল পরান চলে গেয়ে।/ আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা/ তোর দুলিয়ে দিয়ে না,/ তোর সুদূর ঘাটে চলরে বেয়ে।'

ভয়াবহ কঠিন এবং সেই সঙ্গে মনোরম কথাবার্তার দার্শনিক আবরণ ভেদ করে বিশুর ব্যক্তিগত স্বপ্নের গান একটা আকস্মিক সহজ আনন্দের আহ্বান নিয়ে আসে। স্বপনতরীর নেয়ে নন্দিনী। এখন সে সমগ্র যক্ষপুরীর প্রাণের একজন। যক্ষপুরীকে শত সংগ্রামের ভেরত দিয়ে মুক্তির ঘাটে পৌঁছাবে বলে সে সংকল্প করেছে। বিশু যে সুদূঢ় ঘাটে নৌকা বেয়ে যেতে বলেছে নন্দিনীকে, এখন তাকে একা নিয়ে যাওয়া নয়, সমগ্র যক্ষপুরীকে নিয়ে যাওয়া– একটি শোষণ জর্জরিত, জড়বুদ্ধিতে আবদ্ধ, উন্মুল মনুষ্য সমাজকে প্রাণময় লোকে উত্তীর্ণ করা। তোমার ঘোমটা খুলে দাও বলতে বিশু বোঝাচ্ছে মুক্তির অগ্রদূত হিসেবে নন্দিনী যে আবির্ভূত হয়েছে, সে রূপটি সে সবাইকে দেখাক, সবাই বুঝতে পারুক সে কল্যাণময়ী। নন্দিনীর হাসিতে বিশুর পরান ছেয়ে যাবে সত্যি, বৃহত্তর অর্থে সে হাসি যক্ষপুরীকে আনন্দিত করবে। আপাতদৃষ্টিতে এই গানটিকে বিশু-নন্দিনী বিষয়ক গান মনে করা হলেও, মর্মগতভাবে এটি যক্ষপুরী ও নন্দিনী বিষয়ক গান। এখানেই গানটির তাৎপর্য।৭০

যক্ষপুরীবাসীর কাছে নন্দিনী ভালো ঠেকছে না কিন্তু বিশুর কাছে সে সুন্দর, যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয়। নরকেও সুন্দর আছে কিন্তু সুন্দরকে কেউ সেখানে বুঝতেই পারে না, নরকবাসীর তাই বড় সাজা। তাদের ধারণা ওই মেয়ে বিশুকে ভুলিয়েছে। চন্দ্রা জিজ্ঞেস করছে, তারা মদ খায় কেন? বিশু উত্তরে জানায়, 'জীবলোকে মজুরি করতে হয়, আবার মজুরি

ভুলতেও হয়। মদ না হলে ভোলাবে কিসে? এখানে শুধু কাজ। একদিকে ক্ষুধা চাবুক মারে, তৃষ্ণা চাবুক মারে, শুধু জ্বাল ধরায় কাজ করো। যখন চাষের কাজে ছিল তখন বনের সবুজ মায়া, রোদের সোনা নেশা ধরিয়ে বলতো ছুটি ছুটি। এই নেশা প্রাণের মদের আর যখন এখানে পাতালে সিঁধকাটার কাজ করতে এলো তখন সেই সহজ মদ বন্ধ হয়ে গেল। হাটের মদে মাতামাতি শুরু করলো। প্রাণের রস শুকিয়ে যাওয়ায় মরণরসে পেয়ালা ভরেছে; আর মরণরস হলো এই মদ। গান গেয়ে জানায় : 'তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে,/তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে।/ সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা,/সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,/ সব শূন্যকে সে অট্ট হেসে দেয় যে রঙিন করে।'

যক্ষপুরীতে শুধু কাজ আর কাজ, সেখানে তাদের নাম ধরে নয়, সংখ্যা দিয়ে ডাকা হয়। বিশু এসেছিল চর হিসেবে কিন্তু একসময় সে যক্ষপুরীতে ঢুকে পড়ে। এখানে যে একবার আসে সে আর বের হতে পারে না। একমাত্র মৃত্যুতেই মুক্তি। বিশুকে নন্দিনী পাগলভাই বলে ডাকে। গানের মাধ্যমেই যেন বিশু নন্দিনীর কাছে আসতে পারে। তার কাছে গান শুনতে চাইলে সে গায় : 'তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ/ ওগো ঘুমভাঙানিয়া!/ বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক/ ওগো দুখজাগানিয়া!/ এল আঁধার ঘিরে,/ পাখি এল নীড়ে/ তরী এল তীরে,/ শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো/ ওগো দুখজাগানিয়া!'

বিশু নন্দিনীকে দুঃখজাগানিয়া নামে সম্বোধন করে। কারণ সে হচ্ছে তার 'সমুদ্রের অসম পারের দূতী'। যেদিন সে যক্ষপুরীতে এসেছে তার হৃদয়ে লোনা জলের হাওয়া এসে ধাক্কা দিয়েছে। এ গান যেন বিশুর অন্তরাত্মার কথা। যক্ষপুরীর শোষণ পীড়নের মধ্যে নন্দিনী এসেছে উত্তরণের দূত হিসেবে। তার জীবনের আকাশ সে হারিয়ে ফেলেছিল, এমন সময় সে এসে তার মুখের দিক এমন করে চাইলো যে বিশু তার ভিতরে আলো আছে তা সে বুঝতে পারছে। সে ঘুম ভাঙ্গাচ্ছে, পরাধীনতার দুঃখবোধও জাগাচ্ছে। সে একসময় রঞ্জনের দলে ছিল। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব নিয়ে খেলা করা রঞ্জনের সাথে কিন্তু একদিন বাজিখেলার ভিতর থেকে একলা বের হয়ে গেল। কোথায় হারিয়ে গেলো বিশুর কাছে নন্দিনীর জিজ্ঞাসা। বিশু জানায় : 'ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার দুঃখের পারাবারে,/ হল কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ওই পারে।/ আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন তাহার গেল খুলে,/ তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন অচেনার

ধারে।’

গানটির শেষে যেন বিশুই এই গানের ব্যাখ্যা দেয়। একজন মেয়ে তাকে এই ধুলোর মধ্যে এনে ফেলেছে। মেয়েটি তাকে বলেছিল সোনার চূড়ার নিচে তাকে নিয়ে যেতে পারবে কিনা। সেও স্পর্ধা করে বলেছিল পারবে, নিয়ে আসে চূড়ার নিচে। যখন ঘোর ভাঙল তখন সময় শেষ। আটকে গেল এখানে। চেনা কূলের তরীর বাঁধন খুলে এই অচেনার ধারে চলে এলো। নন্দিনী তাকে জানাচ্ছে এখান থেকে তাকে বের করে নেবে। নন্দিনী বিশুকে সঙ্গে নিয়ে রাজার সাথে কথা বলতে যায়। রাজার জিজ্ঞেস কওে, ও কে, রঞ্জনের জুড়ি নাকি? বিশু উত্তরে জানায়, সে রঞ্জনের উল্টাপিঠ, যে পিঠে আলো পড়ে না, অমাবস্যা। নন্দিনীকে সে গান শেখায়। নন্দিনী গেয়ে ওঠে : ‘ভালোবাসি ভালোবসি / এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।’

রাজা গান শুনে রেগে যান। বলেন নন্দিনীকে বিশুর সঙ্গছাড়া করে দেবেন। নন্দিনী জানায় রঞ্জন আসবে আজ, রাজাও নন্দিনী আর রঞ্জনকে একসাথে দেখতে চায়। রাজার এখানে দ্বৈত চরিত্র ফুটে ওঠে। এককবার সে নন্দিনীকে কাছে পেতে চায়, আবার তিনি দূর দূর করতে থাকেন। তিনি জানান, ‘তিনি হয় পাবেন, নয় নষ্ট করবেন।’ নন্দিনীকে দেখলে প্রাণের লীলা দেখতে পান তার চোখে মুখে। তিনি অস্থির। তিনি একবার গড়েন, একবার ভাঙেন। ঘুমাতেও তার ভয়। নন্দিনী আবার গান ধরে : ‘ভালোবাসি, ভালোবাসি/এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি।/ আকাশে কার বুকের মাঝে/ব্যথা বাজে/ দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।’

রাজা গান আর শুনতে চান না। তবুও নন্দিনী গেয়ে চলে : ‘সেই সুরে সাগরকূলে/ বাঁধন খুলে/ অকুল রোদন উঠে দুলে।/ সেই সুরে বাজে মনে/ অকারণে/ ভুলে-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদন হাসি।’

গান শুনে ভয় পেয়ে রাজা পালিয়ে গেছে। বিশু জানায়, ‘তার বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাঙটা সকলরকম সুরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে, গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছে করে। তাই ওর ভয় লাগে।’ রাজার ভিতর ভালোবাসা আছে। নন্দিনী তা টের পায় আর তাই রাজাকে সে জাগাতে চায়। নন্দিনী জানায় আজ রঞ্জন আসবেই কারণ সে বার্তা পেয়েছে। তার জানালার সামনে ডালিমের ডালে রোজ এক নীলকণ্ঠ পাখি এসে বসে। প্রতি সন্ধ্যায় ধ্রুবতারাকে প্রণাম করে সে

বলে, পাখিটির একটি পালক যদি উড়ে এসে তার ঘরে পড়ে, তো সে জানবে রঞ্জন এসেছে। আজ সকালে জেগে উঠেই দেখেছে উত্তরের হাওয়ায় পালক তার বিছানায় এসে পরেছে, সেটি সে বুকের আঁচলে ঢেকে রেখেছে। কপালে কুমকুমের টিপ পরেছে। এই তিলক সে রঞ্জনের চূড়োয় পরিয়ে দেবে। বিশু জানায় নীলকণ্ঠীর পাখায় জয়যাত্রার শুভচিহ্ন আছে। নন্দিনী জানায় রঞ্জনের জয়যাত্রা তার হৃদয়ের মাঝে। আজ বিশুকে কোন কাজ সে করতে দেবে না। গান শোনাতে বলে। গানটি বিশু গাইলেও গানের বাণী যেন নন্দিনীরই কথা : 'যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে ।/ সেই বুঝি মোর পথের ধারে রয়েছে বসে ।/ আজ কেন মোর পড়ে মনে কখন তারে চোখের কোণে/ দেখেছিলুম অস্ফুট প্রদোষে ।'

আজ নন্দিনীর দেখা হবে রঞ্জনের সাথে এই যক্ষপুরীতে। সেই আশায় তার দিন রাত কাটছে। মুখে একটা দীপ্তি। অপেক্ষা। সর্দার আর মোড়ল জানায় এখানে রঞ্জনকে আসতে দেয়া যাবে না। তার এক আশ্চর্য ক্ষমতা আছে, তাকে শিকলে বাঁধলেও পিছলে বেরিয়ে আসে। সর্দার আর মোড়লকে নিয়েই রাজা যক্ষপুরীতে শাসন শোষণ আর অত্যাচার চালান শ্রমিকদের উপর। আর রঞ্জন হচ্ছে প্রাণের আহ্বান। সে যেখানেই যায় নিয়ম ভাঙে। কঠিনকে করে তোলে কোমল, কাজকে করে তোলে আনন্দময়। আর প্রাণের সঞ্চার নিয়ে আসে পাথর জীবনে। নেচে গেয়ে উপভোগ করে জীবন। যা কিনা এই যক্ষপুরীর জীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত। রাজা কারো স্পর্ধা সহ্য করে না। বিশুকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় রঞ্জনকে চিনিয়ে দেবার জন্য। নন্দিনী জানলায় ঘা দিয়ে রাজাকে ডাকতে থাকে, বিশু কোথায় জানতে চেয়ে। রাস্তায় বিশুকে নিয়ে প্রহরীর প্রবেশ। বিশু জানায় আজ সে মুক্তি পেতে যাচ্ছে। সাথে কিশোরও যাচ্ছে। রঞ্জনকে পেলে কিছু বলতে হবে নাকি জানতে চাইলে নন্দিনী রক্তকরবীর এক গুচ্ছ দিয়ে দেয়। বিশু আশীর্বাদ করে এবার তাদের মিলন হবে এবং নীলকণ্ঠের পালক রঞ্জনের চূড়ায় পরিয়ে দেবার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আরও জানায়, নন্দিনী 'মনে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাতে ওর অন্তরের ধন সব প্রকাশ পেয়েছে। আর কী চাই'। ফসলকাটার গান শোনা যাচ্ছে : 'শেষ ফলনের ফসল এবার কেটে লও বাঁধো আঁটি,/ বাকি যা নয় গো নেবার মাটিতে হোক তা মাটি ।'

বিশু রাজার নির্যাতনগৃহ থেকে বেরিয়ে এসেছে। সে লাঞ্ছিত, গান গাইবার শক্তি নেই তার। সে জানে রঞ্জন এখানে এসেছে, রাজার নির্যাতন গৃহে সে আছে, সে স্পর্ধিত, রাজার নির্যাতনকে সে ভয় পায় না। এই পরিস্থিতিকে মনে রেখে বিশু নিজে তো গান গাইবার শক্তি পেতে পারে না।

আর গানে যে ইঙ্গিত দেয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ রঞ্জনের সর্বনাশ, তেমন শক্তি বিশুর নেই। তাই সে দূরে মাঠ থেকে ভেসে আসা কৃষকের গান শোনায়। ঠিক এ মুহূর্তেই গান কেন? তাও আংশিক? পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে গানটির সঙ্গে মিলিয়ে নিলে এই গীতকণিকার অর্থ পূর্ণ হয়। মাঠতো পাকা ধানে ভরে উঠেছে, এবার কাটবার পালা। এবার ফলনের ফসল, আঁটি বাঁধার সময়। অর্থাৎ সবই এবার শেষ হবে। মহাকাল তার আঁটি গুটিয়ে নেবে। এরমধ্যে কিছু এদিক সেদিক ছিটকে পড়বে। মহাকাল নন্দিনীকে উপলক্ষ্য রেখেই রাজাকে মুক্ত করবে। এটিই হচ্ছে ফসলের শেষ আঁটি বাঁধা। কিন্তু ঝরে পড়বে রঞ্জন, ঝরে পড়ছে বিশু, কিশোর, পালোয়ান, গ্রামের অনেকে। এদের নিপীড়নের ভেতর দিয়েই আসবে মুক্তি।[৭১]

নাটকের মোড় কোন দিকে যাচ্ছে তাই শোনা যাচ্ছে এই গানে। চূড়ান্ত কিছু ঘটতে যাচ্ছে তার আভাস পাওয়া যায়। গান শেষেই জানা গেল চিকিৎসক সর্দারকে বলছে রাজা নিজের উপর বিরক্ত। তার মনের রোগ হয়েছে। তিনি এমন লোক যিনি কিনা অন্যের ক্ষতি করতে না পারলে নিজের ক্ষতি করবে। লক্ষণে মনে হচ্ছে একটা কিছু হতে যাচ্ছে। নন্দিনী রাজার সাথে কথা বলতে চাইছে রঞ্জনের খোঁজে। কিন্তু ধ্বজাপুজোর সময় হয়ে যাওয়ায় রাজা দেখা করতে চান না। এক সময় দরজা খুলে দিলে নন্দিনী দেখতে পায় রঞ্জনের অসাড় দেহ রাজার ঘরে। রাজা রঞ্জনকে চিনতে পারেনি। তার সাথে স্পর্ধা দেখানোতে সে তাকে মেরে ফেলেছে। রাজা জাদু জানেন। নন্দিনী রঞ্জনকে জাগিয়ে দিতে বলেন। নন্দিনীর চিৎকারে রাজার মনে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। উপলব্ধি করেন এতদিন তিনি শুধু যৌবনকে মেরেছেন। নন্দিনীর সাথে বাক্যালাপে রাজা একবার কঠিন হচ্ছে আবার একবার তার ভিতরের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত হচ্ছেন। এক সময় তিনি নন্দিনীকে আহ্বান করেন তাকে সাথি করে নিতে। তিনি দেবতার ধ্বজা ভেঙে ফেলেন শুধু তাই না, তিনি বলেন যা ভাঙার বাকি আছে সব ভাঙবেন শুধু নন্দিনীকে থাকতে হবে দীপশিখার মতন তার সাথে। সর্দার বাঁধা দিচ্ছে কিন্তু চারদিকে ভাঙন শুরু হয়ে যায়, বন্দীশালা ভেঙে ফেলায় বিশু বের হয়ে আসে এবং নন্দিনীর খোঁজ করতে থাকে। ফাগুলাল জানায় নন্দিনী সকলের আগে এগিয়ে গেছে শেষ মুক্তিতে। ধুলায় লুটাচ্ছে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ, ডান হাত থেকে খসে পড়া। বিশু তুলে নেয়। নেপথ্যে গান : ‘পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে,/ আয় আয় আয়।/ ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,/ মরি হায় হায় হায়।’

‘ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে’ লাইনটি নাটকের শেষে হয়ে গেল ‘ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে।’ রূপক অর্থে ‘ধুলার’ ব্যবহার। ধুলাতে লুটাচ্ছে নন্দিনীর কঙ্কন, সে তার হাতখানি আজ রিক্ত করে দিয়ে চলে গেছে। রঞ্জন, সেও লুটিয়ে ছিল ধুলায়। রাজা তার দানবতাকে ঝেড়ে ফেলে মানবতার পথে এসেছে। এও তো এক অর্থে পাকা ফসল। টুকরো টুকরো ঘঁনায় ধুলার আঁচল পাকা ফসলে ভরে গেছে।

‘যাত্রী’ গ্রন্থে ‘পশ্চিমী-যাত্রীর ডায়ারি’ অংশে ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ রবীন্দ্রনাথ ‘রক্তকরবী’ সম্পর্কে বলেন, “নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তা হলে তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়। এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।”[৭২]

বাস্তবতা ও সত্যই রক্তকরবীর প্রেরণা, দৃশ্য ও সংলাপই এই নাটকের প্রধান ব্যাপার, তাই রক্তকরবীর গান সংগীতরূপেই বিরাজমান। রক্তকরবীর গান সংখ্যা ৭টি। ‘তোমার গান শোনাব তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখ’- একটি শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র সংগীত। ভালোবাসার একটি অসামান্য গান এটি। নন্দিনীর ‘ভালোবাসি ভালোবাসি/এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি’ গানটিও অসাধারণ। এই নাটকের নেপথ্য সংগীত ‘পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে’। এটি ফসল কাটার গান। নাটকের মর্মতল থেকে উৎসারিত এই ফসল কাটার গান। এই গানে নাটকের শুরু, এই গানেই নাটকের শেষ।[৭৩]

নাটকটিতে নানা সংস্করণ মিলিয়ে মোট ১৫টি গান রয়েছে। এরমধ্যে ৪টি গানের সুর অজ্ঞাত। পর্যায়ের দিক থেকে ৯টি প্রেমের গান, প্রকৃতির মধ্যে শীতের একটি গান রয়েছে। এছাড়াও আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে ফসল কাটার ১টি গান রয়েছে। বাউল সুরে রয়েছে ২টি গান ।

সময়ের কালস্রোতে কবির মনে পরিবর্তন আসে। যান্ত্রিকতার লোভ ও শক্তির নিষ্পেষণের প্রতি ঘৃণা ও মানবাত্মা মুক্তির স্বরূপ ফুটে উঠেছে ‘মুক্তধারা’ ও ‘রক্তকরবী’ নাটকে। নাটকটি যে ধনবাদী আমেরিকার প্রতি লক্ষ্য করে তা তিনি নিজেই “শিক্ষার মিলন” প্রবন্ধে জানিয়েছেন, “অনবিচ্ছিন্ন সাতমাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না।... আটলান্টিকের ওপারে ইঁট পাথরের জঙ্গলে বসে আমার মন প্রতিদিনই পীড়িত হয়ে বলেছে, তালের খচরমচরের অন্ত নেই; কিন্তু সুর কোথায়? আরো চাই, আরো চাই,

আরো চাই- এ বাণীতে তো সৃষ্টির সুর লাগে না।"[৭৪]

৬. শোধবোধ (১৯২৬)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ইংরেজ সাহেবদের অনুকরণ-প্রিয়, ফ্যাশন-সর্বস্ব, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের সাথে দেশীয় আদর্শ-ভাবাদর্শের নারী পুরুষের সংঘাত এবং তা নিয়ে সৃষ্ট বিচিত্র পরিস্থিতি এই নাটকের বিষয়বস্তু। রবীন্দ্রনাথ বাঙালিদের এহেন ইংরেজ প্রীতি ও অনুকরণ অপছন্দ করতেন। আর তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এই নাটকে।

তৎকালীন উচ্চভিলাসী মি. লাহিড়ীর কন্যা নলিনী বা নেলি। তিনি চাইতেন বিলেত ফেরত মিস্টার নন্দীর সাথে তার মেয়ের প্রণয় ঘটুক। তাই চাইতেন যতভাবে তাকে নন্দীর সামনে আধুনিক করে তার মনের মতন সাজানো যায়। প্রথম দৃশ্যে নলিনী তার বন্ধু চারুকে জানায় মিস্টার নন্দী চিঠি পাঠিয়েছেন যে তিনি আজ আসবেন। তাতে কি লেখা জানতে চাইলে সে গেয়ে ওঠে : 'সে আমার গোপন কথা, শুনে যা ও সখী/ভেবে না পাই বলব কী।/ প্রাণ যে আমার বাঁশি শোনে/ নীল গগনে,/ গান হয়ে যায় মনে মনে যাহাই বকি।'

ইংরেজ অনুকরণের বিদেশি চর্চার যুগে গানটি বড়ই সেকেলে ঠেকে চারুর কাছে। জন্মদিনের উপহার হিসেবে হীরের ব্রেসলেটসহ ছবি পাঠিয়ে আসার কথা জানিয়েছে। বিষয়টি অবগত করে গানের বাকি অংশ গেয়ে ওঠে নলিনী : 'সে যেন আসবে আমার মন বলেছে।/ হাসির পরে তাই তো চোখের জল গলেছে।/ দেখ লো তাই দেয় ইশারা/ তারায় তারা;/ চাঁদ হেসে ওই হল সারা তাহাই লখি।/ শুনে যা ও সখী।'

এরমধ্যে মিস্টার লাহিড়ী প্রবেশ করে ইংলিশ গান গাইতে বলে- 'love's golden dream is done/Hidden in mist of pian', কিংবা 'In the gloaming, O my darling', সব শেষে 'Good bye, sweetheart'।

অন্যদিকে সতীশ মন্মথ সাহেবের ছেলে। সতীশের পিতা বিদেশি অনুকরণের বিরোধী। ছেলেকে তিনি মধ্যবিত্ত সামর্থ্য অনুযায়ী সাধারণ বাঙালী জীবনযাপনে শিক্ষা দিতে চান। কিন্তু সতীশের আদর্শ লাহিড়ী পরিবার। সে নলিনীকে ভালোবাসে এবং মিস্টার নন্দীকে ছাপিয়ে যেতে চায়। তার এই আকাঙ্ক্ষায় ইন্ধন জোগায় তার মা বিধুমুখী ও নিঃসন্তান সুকুমারী। তারা তাকে বিদেশি

পোশাক ও প্রসাধন করিয়ে সাহেবী স্যুট পরিয়ে লাহিড়ী-পরিবারে মেলামেশা করতে উৎসাহিত করে। এজন্য মাসি অর্থ জোগান দিত। জন্মদিনে সতীশ একটি অ্যালবাম উপহার দেয়। অন্যদিকে নন্দীর সোনার ব্রেসলেট চোখে পড়ায় এবং চারুর ঠাট্টা মস্করাতে অ্যালবামটি নিয়ে যেতে উদ্দ্যত হয়। এসময় নলিনী এসে উপস্থিত হয় এবং সতীশ তাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করে। নন্দিনী গেয়ে ওঠে : 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা,/ নিয়ো হে নিয়ো ।/ হৃদয় বিদারি হয়ে গেল ঢালা/ পিয়ো হে পিয়ো ।/ ভরা সে পাত্র, তারে বুকে করে/ বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধরে-/ লও তুলে লও আজি নিশিভোরে,/ প্রিয় হে প্রিয় ।/ বাসনার রঙে লহরে লহরে/রঙিন হল ।/ করুণ তোমার অরুণ অধরে/ তোলে হে তোলে ।/ এ রসে মিশাক তব নিশ্বাস,/ নবীন উষার পুষ্পবাস-/ এরই পরে তব আঁখির আভাস/ দিয়ো হে দিয়ো ।'

এখানে দেখা যায় নন্দীর মন ভোলানোর জন্য নলিনী আধুনিক বেশভূষা করছে, ইংরেজি গান গাইতে চাচ্ছে, কিন্তু সতীশ বিদেশি অনুকরণের হলেও নলিনীর কণ্ঠে বাংলা গান শুনতেই সে বেশি পছন্দ করে। সতীশ নলিনীকে ভালোবাসে কিন্তু তার ধারণা সে তার যোগ্য নয় কারণ সে পোশাক-আশাক বা স্ট্যাটাস কোনদিক দিয়েই নলিনীর সমকক্ষ নয়। উপরন্তু নলিনী সারাক্ষণ তাকে কটাক্ষ করে। কিন্তু মনে মনে নলিনী তাকে ভালোবাসে যা সে বুঝতে পারে না। এই ভালোবাসা বোঝাতে না পারার জন্যই যেন গান। বেদনায় পেয়ালা ভরে গিয়েছে, সেই পাত্রখানা সে বয়ে বেড়াচ্ছে, প্রিয় যেন তুলে নেয়। তার ভালোবাসা বুঝতে পারে। কোথাও অপূর্ণতা রয়েছে। নবীন উষার পুষ্পসুবাসের সাথে আঁখির আভাস যেন দিয়ে যায়। নন্দীর ছবি সে ছিঁড়ে ফেলে। সতীশ নন্দীর অনুকরণে জন্মদিনে দামী নেকলেস উপহার দেবার জন্য বাপের লোহার সিন্দুক খুলে সোনার গড়া চুরি করে বন্দক রাখে। বিধুমুখী চুরি ঢাকবার জন্য ছলচাতুরী করলেও ধরা পড়ে যায়। সতীশের মেসো শশধরের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হলেও মন্মথ ছেলেকে চিনে নেন। কিন্তু দামী উপহার পেলেও নলিনী খুশি হয় না। সে জানায় একটি ফুল আনলেও সে খুশি হতো কিন্তু নন্দীর সমকক্ষ হবার জন্য দেনা করে এতো দামী উপহার আনার প্রয়োজন ছিল না। ঘটনাচক্রে নন্দীর ব্রেসলেট ফিরিয়ে দিয়ে সতীশের হারটি গলায় তুলে নেয়। সতীশ তাকে আরেকটি গান গাইতে অনুরোধ করে : 'উজাড় করে লও হে আমার সকল সম্বল ।/ শুধু ফিরে চাও ফিরে চাও ওহে চঞ্চল ।/ চৈত্র রাতের বেলায়/ না হয় এক প্রহরের খেলায়/ আমার স্বপনস্বরূপিণী প্রাণে দাও পেতে অঞ্চল ।/ যদি এই ছিল গো মনে,/ যদি পরমদিনের স্মরণ ঘুচাও চরম অযতনে,

/ তবে ভাঙা খেলার ঘরে/ না হয় দাঁড়াও ক্ষণেক তরে,/ ধুলায় ধুলায় ছড়াও হেলায় ছিন্ন ফুলের দল ।’

সতীশ তার মনের অব্যক্ত কথা নলিনীর কাছে শুনতে চাইছে । যদিও নলিনীরও মনের অভিব্যক্তি এই, কিন্তু সতীশ বুঝতে পারে না । উজাড় করে দেবার জন্যই সে বসে আছে । যদি স্বপনরূপিণী প্রাণে আসে । এরই মধ্যে মন্মথের মৃত্যুর খবর পায় । তিনি মারা যাবার আগে উইল লিখে গেছেন– সতীশকে সম্পত্তি না দিয়ে সমস্ত কিছু অনাথাশ্রমে দান করেছেন এবং স্ত্রীর জন্য মাসিক পঁচাত্তর টাকা বরাদ্দ করেছেন । নিঃসন্তান বিত্তশালী মাসি ও মেসো সতীশকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে বাড়ি নিয়ে যায় । কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে শীঘ্রই মাসির ঘরে ছেলে জন্ম নেয় । সাথে সাথে সতীশের প্রতি তাদের ব্যবহারও পরিবর্তন হয়ে যায় । তাকে তাড়ানোর জন্য নানা উপায় খুঁজতে থাকে, সাথে চলে কটুক্তি । মেসো তার বড়সাহেবকে ধরে সতীশের চাকরির ব্যবস্থা করে । কিন্তু মাসির বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে সে অফিসের তহবিল ভেঙে মাসির দেনা শোধ করে । তহবিল ভাঙায় তার জেলে যাবার উপক্রম হয়, সে এই লজ্জা থেকে বাঁচার জন্য আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয় । পিস্তল জোগাড় করে সে মাসির বাগানে প্রবেশ করে । সেখানে মাসির ছেলেকে দেখতে পেয়ে তাকেই মারতে উদ্যত হয় । কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মত পরিবর্তন করে জেলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় । ঐ দিকে সতীশ আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে নলিনীকে প্রথম থেকে তার সমস্ত কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছিল । সেই মুহূর্তে নলিনী তার সমস্ত গহনা নিয়ে উপস্থিত হয় এবং তা দিয়ে সতীশ উদ্ধার পায় । তাদের মিলন ঘটে ।

এ নাটকে নিম্নোক্ত ৩টি গান আছে, যেগুলো গান হিসেবে উৎকৃষ্টমানের বিবেচিত হয়–

গান	রাগ/সুর - তাল	পর্যায়
১. সে আমার গোপন কথা (নলিনী)	কীর্তন - দাদরা	প্রেম
২. বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা (নলিনী)	খাম্বাজ - তেওড়া	প্রেম
৩. উজাড় করে লও হে আমার (নলিনী)	দেশ - ত্রিতাল	প্রেম

উপর্যক্ত ৩টি গানই প্রেম পর্যায়ের । এরমধ্যে ১টি গান কীর্তন সুরে । নাটকে গানগুলোর তেমন প্রয়োজন না থাকলেও, কাহিনিবিন্যাসে বা মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য গানগুলোর ভূমিকা রয়েছে । প্রথম গানটি নলিনীর মনের কথা, দ্বিতীয় গানটি ‘বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা’ গাওয়া হয়েছিল

সতীশের অনুরোধে। পরের গানটিও তাই। সতীশ বেষভূষা চলনে বিদেশি অনুকরণ করলেও তার মধ্যে বাঙালিয়ানা রয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নাটকটিতে ধনশালী পরিবারের সাথে মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাবাদর্শের সংঘাত দেখিয়েছেন। তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন গান নির্বাচনের মাধ্যমে। বাংলা ভাষা ছাড়া যেন মনের ভাব ফোটে না, আর তাই এই গান।

৭. নটীর পূজা (১৯২৬)

নাটকটির সূচনা ভিক্ষু উপালীর গানের মধ্য দিয়ে : 'পূর্বগগনভাগে/ দীপ্ত হইল সুপ্রভাত, / তরুণারুণরাগে ।/ শুভ্র শুভ মুহূর্ত আজি/ সার্থক কর রে,/ অমৃতে তর রে,/ অমিতপুণ্যভাগী কে/ জাগে, কে জাগে ।'

রাজকন্যারা ঘুমিয়ে থাকায় কেবল রাজ নটী শ্রীমতী সেখানে প্রবেশ করে প্রণাম করে। ভিক্ষু তার কাছেই ভিক্ষা চায়। নটী ভিক্ষা দিতে প্রস্তুত হলেও তার কাছে এমন কিছু নেই যা সে দিতে পারে। তবুও ভিক্ষু খুশি হয়ে বলে যায়, ভগবান তাকে দয়া করেছে। তার পূজার ফুল গ্রহণ করা হবে এবং সে ভাগ্যবতী। এরমধ্যে রাজকন্যারা প্রবেশ করে ভিক্ষা দিতে কিন্তু ততক্ষণে ভিক্ষু চলে গেছে। ভিক্ষুদের গানটি ছিল জাগরণী গান। সুপ্রভাতে অমিতপুণ্যভাগীর সন্ধানে বের হয়েছে 'কে জাগে কে জাগে'। নাটকটির প্রথম অঙ্কে মগধপ্রাসাদ কুঞ্জবনে, মহারানী লোকেশ্বরী ও ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণার মধ্যে কথপোকথন। মহারাজ বিম্বিসার বসন্তপূর্ণিমার দিন ভগবান বুদ্ধের জন্মোৎসব পালন করবেন। রাজা রানীকে স্মরণ করেছেন। কিন্তু রানী ক্ষুব্ধ। কারণ তার পুত্র চিত্র ভিক্ষু হয়ে গেছে। তাই তার দারুণ বিতৃষ্ণা এবং আক্রোশ। সেই আক্রোশ গিয়ে পড়ে বুদ্ধের শিক্ষার উপর, কখনোবা রাজার উপর। সবসময় তিনি দগ্ধ হতে থাকেন তার পুত্রের বিচ্ছেদে। এরমধ্যে বীণা হাতে শ্রীমতী প্রবেশ করেন। আপন মনে গান ধরেন : 'নিশিথে কী কয়ে গেল মনে/কী জানি কী জানি ।/ সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে,/কী জানি কী জানি। '

ভিক্ষুর বলে যাওয়া বাণী তার মনে আশার সঞ্চার করেছে। তার পূজা গ্রহণ করা হবে। সে নটী তাই সে সামাজিক মর্যাদায় উচ্চ নয়। চারপাশের ধর্মসংঘাতের মধ্যে সে এগুচ্ছে। বুদ্ধ উপাসনাতেও বাধা আসে। কিন্তু সে ভিক্ষুর কথায় এক ঘোরের মধ্যে রয়েছে। তার চারপাশে সবাই নানা কথা বলে যাচ্ছে কিন্তু সে আপন মনেই গেয়ে যাচ্ছে : 'নানা কাজে নানা মতে/ ফিরি ঘরে, ফিরি পথে -/ সে কথা কি অগোচরে বাজে ক্ষণে ক্ষণে/ কী জানি, কী জানি!/ সে কথা কি

অকারণে ব্যথিছে হৃদয়-/ একি ভয়, একি জয় !'

শ্রীমতী ডাক শুনতে পেয়েছে। সেই ডাক দূরের ডাক। নানা কাজের মধ্যেও, পথে ঘরে সবখানে সে ডাক শুনতে পায়। অকারণে সেই কথা ক্ষণে ক্ষণে মনে বাজে, মন ব্যথায় ভরে যায়। পূজার ডাক আসবে, সেই আত্মনিবেদনের জন্য সে তৈরি। গানের পরে রানী লোকেশ্বরী প্রবেশ করেন। তিনি রাস্তায় বুদ্ধের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন, তা তার মর্মমূলে আঘাত হানছে। তিনি শান্ত হতে পারছেন না। তিনি এ মন্ত্র আর শুনতে চান না। এই মন্ত্রে রাজা চলে গেছেন, তার পুত্র মার কোল ছেড়ে চলে গেছে। অসহ্য তার কাছে এসব। উপালী নটীর কাছে ভিক্ষা নিতে এসেছেন শুনে তিনি রেগে যান। উপহাস করে তিনি বলেন পতিতা এখন পরিত্রাণের বাণী শোনাবে। সে শুনতে চায়, ভিক্ষু তাকে কি মন্ত্র দিয়েছে। শ্রীমতী করজোড় করে বলে ওঠে : 'ওঁ নমঃ বুদ্ধায় গুরবে/ নমঃ ধর্মায় তারিণে/ নমঃ সংঘায় মহত্তমায় নমঃ।'

আরেকটি মন্ত্রশ্লোক বলতে বললে সে বলে ওঠে : 'মহাকরুণিকো নাথো হিতায় সব্বপাণিনং/ পুরেত্বা পারমী সব্বা পত্তো সম্বোধিমুত্তমম।'

রানীও একসাথে উচ্চারণ করতে থাকে। এরই মধ্যে অনুচর জানায় রাজকুমার চিত্র এসেছেন রানীর সাথে দেখা করতে। অমনি বুদ্ধধর্মের প্রতি রানীর আস্থা চলে আসে। তার ধারণা হয় মন্ত্রপাঠই তাকে ফিরিয়ে এনেছে। বুদ্ধ যেদিন সকলের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, সেদিন শ্রীমতী যায়নি। কারণ হিসেবে জানায় সেদিন মলিন ছিল সে এবং নৈবেদ্য প্রস্তুত ছিল না। সে আরো জানায় অত সহজে তাঁর কাছে গেলে যাওয়া যে ব্যর্থ। তাকে চেয়ে দেখলে বা তার কথা শুনলেইকি শোনা হয়ে গেলো? অন্তর দিয়ে তাকে অনুভব করতে হয়। নন্দা জানায়, 'ভগবানকে দেখতে গিয়েছিলেম আমরা, ভগবান নিজে এসে দেখা দিয়েছেন শ্রীমতীকে, ওর অন্তরের মধ্যে'। শ্রীমতী গান ধরে : 'তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে/খুঁজিতে আপনারে?/ তোমারি যে ডাকে/ কুসুম গোপন হতে বাহিরায় নগ্ন শাখে শাখে,/ সেই ডাকে ডাকো আজি তারে।/ তোমারি সে-ডাকে বাধা ভোলে,/ শ্যামল গোপন প্রাণ ধূলি-অবগুণ্ঠন খোলে।'

গানের মধ্যেই সে খুঁজে বেড়াচ্ছে ভগবানকে। সে তার দ্বারে এসেছিল। তার প্রাণ জেগে উঠছে। উপালী তার প্রাণকে জাগিয়ে তুলেছে। বুদ্ধের উপস্থিতি অন্তর দিয়ে অনুভব করতে চাইছে। এরই মধ্যে ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণার প্রবেশ এবং সে আদেশ জানায়, 'আজ বসন্তপূর্ণিমায় ভগবান বোধিসত্ত্বের জন্মোৎসব। অশোকবনে তাঁর আসনে পূজা-নিবেদনের ভার শ্রীমতীর উপর'।

রাজকন্যাদের কাছে এ আদেশ ভালো লাগে না। শ্রীমতী পূজার শুরুতে অশোকবনের আসন বেদী ধোবার জন্য গেলে রাজকন্যারা ঠিক করে যে, শ্রীমতীকে দিয়ে বুদ্ধপূজা তারা সইবে না। মল্লিকা যেন কিছু করে।

দ্বিতীয় অঙ্কে রাজোদ্যানে লোকেশ্বরী ও মল্লিকা কথা বলছে। ছেলের সাথে দেখা করে তার মন ভরেনি। কেবলই মনে হচ্ছে এই ধর্মে মা-ছেলের পক্ষে অনাবশ্যক এবং স্ত্রীকে স্বামীর প্রয়োজন নেই। রাজকন্যারা কিছুতেই স্বীকার করতে চাইছে না শ্রীমতী পূজা দিবে। রানী আশ্বাস দেন এ পূজা হবে না, পূজাকে সে সমূলে উচ্ছেদ করবে। রত্নাবলী জানায়, যেখানে সে পূজারিণী হয়ে পূজা করতে যাচ্ছে সেখানেই তাকে নটী হয়ে নাচতে হবে। তবে এই প্রস্তাবে রানীর মন সায় দিচ্ছে না। কারণ সেখানে তিনি নিজের হাতে অনেক দিন পূজা দিয়েছেন। পূজার বেদী ভেঙে পড়বে সেও তিনি সইতে পারবেন কিন্তু রাজরানীর পূজার আসনে নটীর চরণাঘাত তিনি সহ্য করতে পারবেন না। লোকেশ্বরী দোটানায় পড়েছেন। একদিকে তার মনের ভিতর বুদ্ধের প্রতি আনুগত্য, অন্যদিকে স্বামী-পুত্র হারানোর মর্মবেদনা। তিনি ঠিক করেছেন, 'ভিতরের উপাসিকা আছে, সে ভিতরেই থাক, বাইরে আছে নিষ্ঠুরা, আছে রাজকুলবধূ, তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারেবে না।' ধূপ-দীপ-গন্ধ-মাল্য-মঙ্গলঘট প্রভৃতি পুজোপকরণ নিয়ে রাজবাটিতে একদল নারী প্রবেশ করে বনপথের পূজা সমাধা করতে। তারা বৌদ্ধমন্ত্র উচ্চারণ করে : 'বন্ন-গন্ধ-গুণোপেতং এতং কুসুমসন্ততিং/ পূজয়ামি মুনিন্দস্‌স সিরি-পাদ-সরোরুহে।'

পূজা শেষে তারা স্তুপমূলে যেতে চাইলে দেখতে পায় যাবার পথ বেড়া দিয়ে আটকানো। নন্দা জানায় বোধহয় রাজার নিষেধ। শ্রীমতী জানায় প্রভুর আদেশ আছে যেতেই হবে। গান ধরে : 'বাঁধন-ছেড়াঁর সাধন হবে।/ছেড়ে যাব তীর মাভৈঃ রবে।/ যাঁহার হাতের বিজয়মালা/ রুদ্রদাহের বহ্নিজ্বালা,/ নমি নমি নমি সে ভৈরবে।/ কাল-সমুদ্রে আলোর যাত্রী/ শূন্যে যে ধায় দিবসরাত্রি।/ ডাক এলো তার তরঙ্গেরি,/ বাজুক বক্ষে বজ্রভেরী/ অকূল প্রাণের সে উৎসবে।'

গানের মাধ্যমে শ্রীমতী শক্তি সঞ্চয় করছে। ভৈরবের শক্তিতে বাঁধন আজ ছিড়বে।। সে নিজে বজ্রভেরী বাজিয়ে বুদ্ধপূজার ব্রতে অগ্রসর হবে। তার তরঙ্গের ডাক এসেছে। রাজপরিবার থেকে যত বাঁধাই আসুক সে অগ্রসর হবেই। এই গানটিতে আরেকটি জিনিস রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন। বৌদ্ধ সংস্কৃতির সাথে হিন্দু সংস্কৃতির মিলন। তিনি বুদ্ধের কাছে শক্তি চাইবার সময় তাকে ভৈরবীরূপে ডাকছেন। অসামান্য একটি গান। যাবতীয় শঙ্কাকে পিছনে ফেলে শ্রীমতি

পূজায় যাচ্ছে। অন্তঃপুররক্ষিণী প্রবেশ করে তার পূজার থালা ছিনিয়ে নেয়। তাকে দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে দিবে না। কিন্তু সে রাজার বাঁধা মানবে না। এরই মধ্যে উৎপলপর্ণা এসে জানায় শ্রীমতীর উপর পূজার আদেশ বলবৎ আছে। তাই রাজার বাধা থাকলেও সে বাধা আপনিই পথ করে দেবে। রাস্তায় ক্রন্দন, গর্জনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, নগরে আগুন লেগেছে, উদ্যানের ভিতর কারা প্রবেশ করে ভাংচুর করছে। এরমধ্যে মালতীর অনুরোধে শ্রীমতী গান ধরে : 'আর রেখো না আঁধারে আমায়/দেখতে দাও।/ তোমার মাঝে আমার আপনারে/ আমায় দেখতে দাও।/ কাঁদাও যদি কাঁদাও এবার,/ সুখের গ্লানি সয় না যে আর,/ যাক-না ধুয়ে নয়ন আমার/ অশ্রুধারে,/ আমায় দেখতে দাও।/ জানি না তো কোন কালো এই ছায়া,/ আপন বলে ভুলায় যখন/ ঘনায় বিষম মায়া।/ স্বপ্নভারে জমল বোঝা,/ চিরজীবন শূন্য খোঁজা,/ যে মোর আলো লুকিয়ে আছে/ রাতের পারে/ আমায় দেখতে দাও।'

শ্রীমতী আঁধারের মাঝে দেখতে চায়। তাঁর মাঝে আপনারে সে দেখতে চায়। সুখের গ্লানি সে সইতে পারছে না, অশ্রুধারে সব ধুয়ে যাক, তাও যেন সে দেখতে পায়। বিপদের কালো ঘন ছায়া ঘনিয়ে এসেছে, নিজেকে ভুলিয়ে দিতে পারে। সে সত্যরূপকে দেখতে চায়। রাতের ওপারে যে আলো লুকিয়ে আছে, তাই সে দেখতে চাচ্ছে। রক্ষিণী এসে সেখান থেকে পালাতে অনুরোধ করে তাদের। কারণ মহারাজ অজাতশত্রু দেবদত্তের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন এবং অশোকবনে বুদ্ধের আসন ভেঙে দিয়েছেন এবং সেখানে যে আরতি করবে, স্তবমন্ত্র পড়বে, তার প্রাণদণ্ডের হুমকি দিয়েছেন। শ্রীমতী জানায় বুদ্ধের আসন অক্ষয়। রাজা তো শুধু পাথরের আসন ভেঙেছেন, মনের আসন ভাঙতে পারেননি। অন্য রক্ষিণী প্রবেশ করে জানায় দেবদত্তের শিষ্যেরা উৎপলপর্ণাকে হত্যা করেছে। এসময় রত্নাবলী রক্ষিণীদের সাথে প্রবেশ করে জানায়, রাজার আদেশ শ্রীমতী অশোকবনে আরতির বেলায় প্রভুর আসনবেদীর সামনে নাচবে। শ্রীমতী রাজি হয় এতে। এই পরিস্থিতিতে ভিক্ষুদল এসে অহিংস গান ধরে : 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব/ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ।/ নূতন তব জন্ম লাগি কাতর সব প্রাণী/কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,/ বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চির-মধুনিষ্যন্দ।/শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,/ করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন।'

এই গানটি শুধু নাটকটির মধ্যেই নয়, আমাদের বর্তমান সমাজের যে কোন হিংসার বিরুদ্ধে এবং অহিংসার পক্ষে এক অসাধারণ রচনা। বুদ্ধের অহিংসার বাণী যেন ধ্বনিত হচ্ছে এই গানে।

তৃতীয় অঙ্ক রাজোদ্যান। নাচের সাজে সেজেছে শ্রীমতী। মালতী জানায় উৎপলপর্ণার মৃতদেহ দাহ করবার জন্য যারা নিয়ে যাচ্ছে তার মাঝে সে তার মনের মানুষকে দেখতে পেয়েছে। সে তার কাছে যেতে চাইছে। শ্রীমতী জানায় যার কাছে সে ফিরে যাচ্ছে সে মুক্তপুরুষ, সেই পারে মালতীকে মুক্ত করতে। যাবার আগে মালতী শ্রীমতীর কাছে একটি পথের গান গাওয়ার অনুরোধ করলে সে গায় : 'পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে,/ পিছিয়ে পড়েছি আমি যাব কী করে !/ এসেছে নিবিড় নিশি,/ পথরেখা গেছে মিশি,/ সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে।'

পথের গানটিতে শ্রীমতী যেন উপালীকে স্মরণ করছে। সেই তো তাকে ডাক দিয়ে গেছে। উপালী চলে গেছে কিন্তু সে মনে করে তার কাছেই আছে। তবুও মনে ভয় আসে, সে আছে কিন্তু উপালী নেই কালি নিশিভোরে। তার মনে উপালী অক্ষয় হয়ে আছে। বাইরে আবারো গর্জন শোনা যায়। প্রচন্ড মারামারি। শ্রীমতী মালতীকে পৌঁছে দিতে প্রাচীরদ্বার পর্যন্ত যাচ্ছে। রত্নাবলী ও মল্লিকা হিন্দু-বৌদ্ধের হিংসা নিয়ে কথা বলে। মন্ত্র পড়লেই কেবল ভিক্ষু হওয়া যায় না। এই ভিক্ষুধর্ম রাজধর্মকে নষ্ট করছে। এদের একটাই কথা আজ অশোক চৈতের বুদ্ধ পূজা হবে এবং শ্রীমতীকে নাচতে হবে। বাসবী প্রবেশ করে জানায় সে প্রতিজ্ঞা করে এসেছে শ্রীমতীকে নাচতে হবে। মল্লিকা এসে জানায় অজাতশত্রু দেবদত্তের শিষ্যদের সামলাতে পারছেন না। সবাই অনুমান করছে ওরা পথের মধ্যে বিম্বসার মহারাজকে হত্যা করেছে। এমন সময় তারা শ্রীমতীকে দেখতে পায়, যেন স্বপ্নে সে চলছে মধ্যাহ্নের দীপ্ত মরীচিকার মতন, নিজের মধ্যে নেই সে। গান গাইছে : 'হে মহাজীবন, হে মহা মরণ,/ লইনু শরণ- লইনু শরণ !/ আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা/ পরাও পরাও জ্যোতির টিকা,/ করো হে আমার লজ্জাহরণ।'

রত্নাবলী শ্রীমতীকে ডেকেই যাচ্ছে কিন্তু কারো কথা তার কাছে পৌঁছাচ্ছে না। সে গেয়েই যাচ্ছে : 'পরশরতন তোমারি চরণ,/ লইনু শরণ লইনু শরণ,/ যা-কিছু মলিন, যা কিছু কালো/ যা-কিছু বিরূপ হোক তা ভালো,/ ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ।'

শ্রীমতী নিজেকে সমর্পিত করতে প্রস্তুত। আজ সে বুদ্ধের চরণ শরণ করে নিচ্ছে। নিজেকে সে আগেই সমর্পণ করেছে। যাই ঘটুক আজ সে মুখোমুখি হবে। রত্নাবলী অশোকবনে শ্রীমতীর অপমান দেখতে চায়, কিন্তু বাসবী নয়। বরং শ্রীমতীকে ক্ষমার মন্ত্র তাকে শিখিয়ে দিতে বলে : 'উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসুবরুত্তমং/ বুদ্ধে যো খলিতো দোসো বুদ্ধো থমতু তং মম।'

মন্ত্র শেখানো শেষ হলে শ্রীমতী গান ধরে : ‘হার মানালে, ভাঙিলে অভিমান/ ক্ষীণ হাতে জ্বালা/ ম্লান দীপের থালা/ হল খান খান ।/ এবার তবে জ্বালো/ আপন তারার আলো,/ রঙিন ছায়ার এই গোধূলি হোক অবসান ।/ এসো পারের সাথি-/ বইল পথের হাওয়া, নিবল ঘরের বাতি ।/ আজি বিজন বাটে/ অন্ধকারের ঘাটে/ সব-হারানো নাটে/ এনেছি এই গান ।’

শ্রীমতী বুঝতে পারছে সে পূজা দিতে পারবে না । তার পূজার থালা, প্রদীপ সব খান খান হয়ে গেছে । এবার তারার আলোয় রঙিন ছায়ায় আলো জ্বলবে । সে বুঝতে পারছে সে সব হারানোর নাটেই আবার ফিরে যাচ্ছে নটীর বেশে । সেই অন্ধকার ঘাটে, তবুও পারের সাথীকে শেষ নিবেদন । সবাই প্রস্থান করে এবং ভিক্ষুদল গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে : ‘সকল কলুষতামসহর,/ জয় হোক তব জয় ।/ অমৃতবারি সিঞ্চন কর’/ নিখিল ভুবনময় ।/ মহাশান্তি মহাক্ষেম/ মহাপুণ্য মহাপ্রেম!/ জ্ঞানসূর্য-উদয়ভাতি/ ধ্বংস করুক তিমিররাতি ।’

শান্তির বারতা নিয়ে আসে এই গান । সব মলিনতা, কলুষতা, দুর্দিন পার হয়ে আসুক মহাশান্তি, মহাক্ষেম, মহাপুণ্য মহাপ্রেম । অশোকতলে ভাঙা স্তূপে ভগ্নপ্রায় আসনদেবীর সামনে সকলে অপেক্ষা করছে কখন নটী আসবে, নাচ শুরু হবে । রত্নাবলী জানায় রানী লোকেশ্বর আসলে নাচ শুরু হবে । কিঙ্করীরা অধর্মের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে আছে । প্রভুর পূজার জায়গায় নটীর নাচ । রত্নাবলী জানায় বুদ্ধের পূজা এই রাজ্যে নিষিদ্ধ । রক্ষিণী সংশয়ে রয়েছে । কারণ শ্রীমতীকে তারা ভক্তি করতো কিন্তু সে তো নাচতে রাজি হয়েছে । কিঙ্করী জানায় তার মধ্যে তারা স্বর্গের আলো দেখেছিল । এরমধ্যে সজ্জিত শ্রীমতীর প্রবেশ । কিংকরী বলে উঠে পাপদেহে একশো বাতির আলো জ্বালিয়েছে । পাপিষ্ঠা শ্রীমতী ভগবানের আসনের সামনে নির্লজ্জভাবে নাচবে । তার পা দুখান আজ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল না কেন? শ্রীমতী জানায় তার উপায় নেই, আদেশ আছে । কিঙ্করীরা বলে, নরকে গিয়ে শতলক্ষ বছর ধরে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর তাকে দিনরাত নাচতে হবে । আপাদমস্তক যেসব অলংকার সে পরেছে, প্রত্যেকটি অলংকার আগুনের বেড়ি হয়ে তার হাড়ে মাংসে জড়িয়ে থাকবে, তার নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বালার স্রোত বইবে । এমন সময় মল্লিকা প্রবেশ করে জানায়, বুদ্ধপূজার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়েছে । পথে পথে দুন্দুভি জানিয়ে তারই ঘোষণা প্রচার হচ্ছে । আরো একটি সংবাদ হলো, মহারাজ অজাতশত্রু স্বয়ং এখানে এসে পূজা দেবেন । শ্রীমতীকে অপমান করতে রত্নাবলী আর দেরি করতে চায় না । তাই রানিকে তাড়াতাড়ি ডেকে আনতে বলে, কারণ রানি না আসলে নাচ শুরু হবে না । লোকেশ্বরী প্রবেশ করে শ্রীমতীকে

নিভৃতে ডেকে নিয়ে যায়। তাকে বিষ খেতে বলে। কারণ বুদ্ধের আসনের সামনে সকলের সামনে নাচলে তার অপমান হবে, রত্নাবলী এই আদেশ রাজার কাছ থেকে নিয়ে এসেছে যা খন্ডাবার নয়। কিন্তু শ্রীমতী বিষ খেতে রাজি নয়, সে নাচবেই। রত্নাবলী বার বার নাচ শুরুর জন্য তাড়া দিতে থাকে। একমুহূর্ত দেরি করা যাবে না, কারণ বিদ্রোহীরা যে কোন সময় রাজোদ্যানে ঢুকে পড়বে। শ্রীমতী গান ও নাচ শুরু করে : 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো -/ তোমায় স্মরি হে নিরুপম,/ নৃত্যরসে চিত্ত মম/ উছল হয়ে বাজে।/ আমার সকল দেহের আকুল রবে/ মন্ত্রহারা তোমার স্তবে/ ডাহিনে বামে ছন্দ নামে/ নব জনমের মাঝে।/ তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ/ সংগীতে বিরাজে।'

রত্নাবলী বিরক্ত এ কী রকমের নাচ! এর অর্থ কি। শ্রীমতী গানের মধ্যে আত্মনিবেদন করছে। নাচের তালে তালে ক্ষমা চাইছে। নৃত্যরসে আজ তার চিত্ত উছল হয়ে বাজছে। তার সকল দেহ আকুল হয়ে আছে মন্ত্রহারা স্তবে। আজ নাচের মাধ্যমে তার নব জন্ম হচ্ছে। আজ তার বন্দনা তার ভঙ্গিতে সংগীতে বিরাজ করছে। লোকেশ্বরী রত্নাবলীকে থামতে বলে। শ্রীমতী গেয়ে নেচে যায় : 'এ কী পরম ব্যথায় পরান কাঁপায়,/ কাঁপন বক্ষে লাগে।/ শান্তিসাগরে ঢেউ খেলে যায়,/ সুন্দর তায় জাগে।/ আমার সব চেতনা সব বেদনা/ রচিল এ যে কী আরাধনা,/ তোমার পায়ে মোর সাধনা/মরে না যেন লাজে।/ তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ/ সংগীতে বিরাজে।'

নাচের ভঙ্গিতে সে তার গায়ের গহনাগুলো খুলে ফেলে স্তূপে বিসর্জন দিচ্ছে। রত্নাবলী রেগে বলতে শুরু কওে, এ কি অপমান! এ তো সব রাজবাড়ির গহনা। এ তার নিজের গায়ের অলংকার। তখনই কুড়িয়ে মাথা ঠেকাতে বলে শ্রীমতীকে। লোকেশ্বরী রত্নাবলীকে থামতে বলে। জানায় এতে ওর দোষ নেই। এই নাচের অঙ্গই এভাবে আভরণ ফেলে দেয়া। সে জানায়, আনন্দে তার শরীরও দুলছে। রানী নিজের গলা থেকে হার খুলে ফেলে। গানে শ্রীমতী জানায় তার সব বেদনা, চেতনা আজ প্রভুর পায়ে সমর্পিত। আজ বন্দনা নাচের তালে গানের মাধ্যমে বিরাজ করছে। শ্রীমতীকে রানী থামতে নিষেধ করে। শ্রীমতী গেয়ে যায় : 'আমি কানন হতে তুলি নি ফুল,/ মেলে নি মোরে ফল।/ কলস মম শূন্যসম,/ভরি নি তীর্থজল।/ আমার তনু তনুতে বাঁধনহারা/ হৃদয় ঢালে অধরা ধারা,/ তোমার চরণে হোক তা সারা,/ পূজার পুণ্য কাজে।/ তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ/ সংগীতে বিরাজে।'

আগের গানে শ্রীমতী গহনা খুলে ফেলে, এ গানে বেশভূষা। নাচের পোশাক খুলতে ভিতর থেকে

বের হয় ভিক্ষুণীন পীতবস্ত্র। রত্নাবলী বলে ওঠে এতো পূজা করা হয়ে গেল। রক্ষিণীকে রাজার দন্ড পূজার নিষেধাজ্ঞা মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু রক্ষিণী জানায় সে তো পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করেনি। এ সময় শ্রীমতী বলে ওঠে : 'বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি/ধম্মং সরণং গচ্ছামি- ।'

রক্ষিণী শ্রীমতীকে থামতে বললেও সে থামে না। বলতেই থাকে : 'বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি/ধম্মং সরণং গচ্ছামি-/সংঘং সরণং গচ্ছামি ।'

মৃত্যুভয় শ্রীমতীকে স্পর্শ করে না। সে মন্ত্র পড়েই যায় এবং রানীও মন্ত্রপাঠ শুরু করেন। রত্নাবলী আবারো রাজার আদেশ স্মরণ করিয়ে দিলে রক্ষিণী মন্ত্র উচ্চারণরত শ্রীমতীকে অস্ত্রাঘাত করলে সে বুদ্ধের ভাঙা আসনের উপর লুটিয়ে পড়ে। রক্ষিণীরা এবার ক্ষমা করো ক্ষমা করো বলতে বলতে পায়ের ধুলো নিতে থাকে। লোকেশ্বরী শ্রীমতীর মাথা কোলে নিয়ে তার বসনের একপ্রান্ত মাথায় ঠেকিয়ে বলে উঠে এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি। রত্নাবলী ভয়ে ধুলায় বসে পড়ে। প্রতিহারিণী প্রবেশ করে জানায় রাজা পূজা নিয়ে কাননদ্বারে অপেক্ষা করছে, দেবীর সম্মতির জন্য। মল্লিকা প্রস্থান করে রাজাকে সম্মতি জানানোর জন্য। রত্নাবলী ছাড়া সবাই বুদ্ধমন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে। কিন্তু মহারাজ নটীহত্যার খবর শুনে আতঙ্কে ফিরে চলে যায় পূজা না দিয়ে। শ্রীমতির দেহ বহন করবার জন্য রত্নাবলী ছাড়া সকলকে নিয়ে পালঙ্ক আনতে যায় লোকেশ্বরী। সকলে চলে গেলে রত্নাবলী শ্রীমতীর পা স্পর্শ করে প্রণাম করে উচ্চারণ করে বুদ্ধমন্ত্র : 'বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি/ ধম্মং সরণং গচ্ছামি-/ সংঘং সরণং গচ্ছামি ।'

নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে বুদ্ধ পূজা সমাধা করে যেতে যেতে শ্রীমতী রত্নাবলীকেও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করে গেল।

রবীন্দ্রনাথের এক অপূর্ব রচনা এই নটীর পূজা। শ্রীমতীর অবিচল ভক্তি এবং আত্মত্যাগ এই নাটকের মূল বিষয়। নাটকের শুরু থেকেই রানীর মনে বুদ্ধের প্রতি ভক্তির ভাব-তরঙ্গের উত্থান-পতন ঘটেছে কিন্তু শেষে শ্রীমতীর আত্মত্যাগ তাকে ভক্তিতে ফিরিয়ে এনেছে। শ্রীমতী নাচতে এসে বুদ্ধপূজা করলো। নাচকেই সে মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে। নৃত্যের মাধ্যমে আরাধনা বা পূজা প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই ধারণাকে তুলে ধরেছেন। নাচ বলতে আমরা বুঝি অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে দর্শকের মনোরঞ্জন, ঠিক একই ভাবনায় রত্নাবলী প্রথম দিকে শ্রীমতীর নাচ বুঝতে সমর্থ হয় না। এই নৃত্যগীতিতে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের সূচনা হয়। রাজপুরীর আদেশে বুদ্ধের জন্মদিনে সম্পূর্ণ নতুন এক নৃত্যশৈলী প্রদর্শনের মাধ্যমে শ্রীমতী ভক্তির বিনম্র

প্রকাশের এক নতুন ধারার সূচনা করলো। এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ সমাজের উপেক্ষিত একটি শ্রেণিকেও গৌরবান্বিত করেছেন। সমাজের যে কোন মানুষের সমান স্বাধীনতা আছে ঈশ্বর আরাধনার। যে কেউ পুজো করতে পারে। সে দাসীই হোক বা হোক নটী। নৃত্যনাট্য 'চন্ডালিকা'তেও একই সুর দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীমতির গানগুলোও এক অমূল্য সম্পদ। গানের মাধ্যমে সে ঈশ্বরের আরাধনা করেছে। ভগবানের সাথে মিলনের আকুতি প্রথমে গানে এবং শেষে নৃত্যের মাধ্যমে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে। একটি ঐতিহাসিক ধর্মবিরোধের আবহাওয়া-সৃষ্টিতে, ঘটনার দ্রুতগতিতে, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের সম্মিলিত রূপ-বিভক্তিতে, আবেগময়, পরিমিত, ব্যঞ্জনামুখর ভাষণে, বাস্তবজীবন চেতনার মায়া সৃষ্টিতে এই নাটকটি সমগ্র রবীন্দ্রনাট্য-সাহিত্যের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। প্রকৃতপক্ষে গানই এ নাটকে মহান বক্তব্যের ধারক, নাচের মধ্য দিয়ে সেই বক্তব্যই যেন আরো মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। সংগীত ও নৃত্যের এমন গভীর ব্যবহার, আবৃত্তি ও গানের সাথে ছিল মূকাভিনয় এবং মণিপুরী নৃত্য। রবীন্দ্রনাথ নিজে ছাত্রীদের নির্বাচন করেন, তাদের অভিনয় শেখান এবং মহড়ার দায়িত্ব নেন। গান ও নাচের দায়িত্ব দেন যথাক্রমে দিনেন্দ্রনাথ এবং প্রতিমা দেবী ও নবকুমারকে। মহড়া চলাকালে রবীন্দ্রনাথ ১৪ বৈশাখ 'নটীর পূজা' সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীকে চিঠিতে লেখেন : "একটা নাটক আমার সমস্ত মন এবং অবকাশ অধিকার করে বসেছে। আগামী বৈশাখের মধ্যে লিখে শেষ করে অভিনয় করিয়ে চুকিয়ে দিতে হবে এই হচ্ছে ফরমাস। তাগিদে পড়ে লিখতে শুরু করেছিলেম কিন্তু এখন লেখার আভ্যন্তরিক তাগিদ তার বাহ্য তাগিদকে অতিক্রম করেছে। তার ফল হয়েছে সময়মতো নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।"৭৫

১৩৩৩ সালে (১৯২৬) ২৫ শে বৈশাখ সন্ধ্যাবেলা রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে নাটকটি প্রথম অভিনয় হয়। এ সময় নাটকটিতে উপালী চরিত্র ও সূচনা অংশটি ছিল না। জোড়াসাঁকোয় দ্বিতীয় অভিনয়কালে ১৩৩৩ সালের মাঘ মাসে সূচনা ও উপালী চরিত্র যোজিত হয়। উপালী চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজে অভিনয় করেন। নাটকের শেষ অংশে 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো' ভৈরবী রাগিণীতে রচিত গানটির সঙ্গে শ্রীমতী গৌরী দেবী মণিপুরী নৃত্যসহযোগে পরিবেশন করেন। গানটির সাথে "শ্রীমতী"র আত্মনিবেদনের প্রাণবন্ত অভিনয় সেদিন সকল দর্শককে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। গান ও নাচের মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধের উদ্দ্যেশে এইভাবে যে আত্মনিবেদন করা যায় তা সেবারই প্রথম অনুভব করেন। কলকাতা থেকে

আগত দর্শকেরা মুগ্ধ হয়ে বারবার রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করে যান নাটকটি কলকাতায় মঞ্চস্থ করার জন্য। ঋতুরঙ্গে মেয়েদের নাচ মূলত তৈরি হয়েছিল মণিপুরী এবং গরবা নাচকে ভিত্তি করে। একক ও সমবেত নৃত্যে ছিল ভাবাভিনয় বা সহজ নৃত্য-ছন্দে মূকাভিনয়ের প্রাধান্য। ১৯২৬ সালে নাটকটিতে শ্রীমতির নাচ মণিপুরী ঢঙে রচিত হয় কিন্তু ১৯৩১ সালে গুরুদেবের ৭০তম জন্মোৎসবের সময় যখন এটি আবার অভিনীত হয় তখন সম্পূর্ণরূপেই শ্রীমতির নাচটি নতুনভাবে মণিপুরীর সাথে কথাকলি নাচের সর্বপ্রথম মিলনে পরিবেশিত হয়। পর্যায়ের দিক থেকে গানে পূজা পর্যায়ের সংখ্যাধিক্য।

১৯২৭ সালে ১৪, ১৫ ও ১৭ই মাঘ নাটকটি কলকাতায় অভিনীত হয়। এই নাটকটি অভিনয়ের পূর্বে কলকাতার ব্যবস্থাপকেরা গুরুদেবের কাছ আবেদন করেন নাটকটিতে তাঁকে অভিনয় করতে। আর তাই তিনি এই অভিনয়ে একটি নতুন দৃশ্য সংযোজন করেন নাটকের ভুমিকায় এবং উপালী নামে একটি ভিক্ষু চরিত্রে তিনি নিজে অভিনয় করেন। কলকাতায় অভিনয়ের সময় দর্শকদের সুবিধার্থে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সেখানে নাটকের মোট ৯টি গানের মধ্যে ৫টি নতুন গান ও ৪টি পুরানো গান ছিল।[৭৬] এই নাটকের 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো' গানটি পরবর্তীকালে *মহুয়া* (১৯২৯) কাব্যগ্রন্থের 'বরণডালা' কবিতায় রূপান্তরিত করেন। কবিতার 'তরু হতে ফুল আনি নাই আমি' স্তবকটি গানের 'আমি কানন হতে তুলিনি ফুল' এর সাথে অনেকাংশে মিলে যায়।

৮. চিরকুমার সভা বা প্রজাপতির নির্বন্ধ (১৯২৬)

চিরকুমার সভার রূপান্তর প্রজাপতির নির্বন্ধ মূলত নাটকই। এতে গানের ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করা হয়নি। এর গানগুলি পূর্ণ কাব্যগীতি রচনার ঢঙে রচিত হয়নি, প্রহসনের প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত ও সংলাপধর্মী গান সন্নিবেশিত হয়েছে এখানে। তবে এই নাটকের কয়েকটি গান যেমন, 'অলকে কুসুম না দিও', 'কেন সারাদিন ধীরে ধীরে', 'তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়' প্রভৃতি কাব্যসংগীতের মর্যাদাও লাভ করেছে।

অক্ষয়কুমারের স্ত্রী পুরবালার ৩ বোন ছিল অবিবাহিত। নৃপবালা ছিল শান্ত ও স্নিগ্ধ, নীর কৌতুকে ও চাঞ্চল্যে ভরপুর এবং শৈল ছিল বিধবা। পিতৃ মাতৃহীন এই বালিকাদের একমাত্র অভিভাবক ছিল অক্ষয়। তার শ্যালিকাদের বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু যোগ্য পাত্র খুঁজে পাচ্ছিল না।

প্রথম দৃশ্যেই অক্ষয় ও পুরবালার মধ্যে বোনের বিয়ের কথা তুলতে কথার মধ্যে ঠাট্টায় অক্ষয় গেয়ে ওঠে : 'কী জানি কী ভেবেছ মনে/ খুলে বলো ললনে ।/ কী কথা হায় ভসে যায় ওই/ ছলছল নয়নে ।'

এর পরই গায় : 'পাছে চেয়ে বসে আমার মন/ আমি তাই ভয়ে ভয়ে থাকি ।/ পাছে চোখে চোখে পড়ে বাঁধা/ আমি তাই তো তুলি নে আঁখি ।'

একটা গম্ভীর পরিস্থিতিকে নিমেষেই গানটির মাধ্যমে হালকা করে দেয় । অক্ষয়কুমার জানায় সে চিকুমার সভার সভ্য হলেও মা কালির দয়ায় পুরবালার সাথে বিয়ে হয়েছে । এরমধ্যে শৈলবালা এসে জানায় মায়ের তাড়া খেয়ে রসিকদাদা কুলীনের ঘরের দুই ছেলের প্রস্তাব এনেছে, মা পারলে এখনি বিয়ে দিয়ে দেয় । শুনেই অক্ষয় গেয়ে ওঠে : 'বড়ো থাকি কাছাকাছি,/ তাই ভয়ে ভয়ে আছি ।/ নয়ন বচন কোথায় কখন বাজিলে বাঁচি-না-বাঁচি ।'

শৈলবালা জানায় বৈশাখের পরে আসছে বছরে অকাল পড়বে, আর বিয়ের দিন নেই । তাই বৈশাখেই বিয়ে দেবেন বলে জগত্তারিণী নির্ধারণ করেন । চিরকুমার সভা ছিল আজীবন কৌমার্যব্রতধারীদের প্রতিষ্ঠান । চিরকুমারত্ব ও সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে নিঃস্বার্থভাবে সমাজ ও দেশের জন্য কাজ করা এদের লক্ষ্য । অধ্যাপক চন্দ্রমাধববাবু ছিলেন এই সভার সভাপতি এবং শ্রীশ, বিপিন ও পূর্ণ ছিলেন সদস্য । শৈলবালার এখানকার বিপিনবাবু ও শ্রীশবাবুকে পাত্র হিসেবে পছন্দ । রসিকদাদার আনা সম্বন্ধের পাত্রপক্ষ দেখতে আসছে শুনে নীরবালা নৃপের সাথে আমোদে মেতে ওঠে । গান ধরে : 'না বলে যায় পাছে সে/ আঁখি মোর ঘুম না জানে ।/ কাছে তার রই, তবুও/ ব্যথা যে রয় পরানে ।'

গানটি নীরবালা ও অক্ষয়ের মধ্যে কথপোকথনের মতো করে গাওয়া হয় । ব্যঙ্গও আছে এতে । অক্ষয় এর উত্তরে গায় : 'না, না গো, না,/ কোরো না ভাবনা -/ যদি বা নিশি যায় যাব না, যাব না ।/ যখনই চলে যাই/ আসিব বলে যাই,/ আলো ছায়ার পথে করি আনাগোনা ।'

শালি-দুলাভাইয়ের হাস্যরস । শৈলবালা জানায় কুলীনের ছেলে দুটোকে তাড়াতে হবে । অক্ষয় উত্তর দেয় : 'দেখব কে তোর কাছে আসে-/তুই রবি একেশ্বরী, একলা আমি রইব পাশে ।'

যদিও এটি গান, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গাওয়া, তবু এটি পূর্ণ গানের মর্যাদা লাভ করে না ।

তাদের তাড়াতে পারলে শালিরা অক্ষয়কে 'শালীবাহন রাজা' খেতাব দিবে জানালে সে গেয়ে ওঠে : 'তুমি আমায় করবে মস্তলোক-/দেবে লিখে রাজার টিকে প্রসন্ন ওই চোখ ।'

এটিও একটি দুই লাইনের গান। এমন সময় পাত্র দারুকেশ্বর ও মৃতুঞ্জয় আসে এবং অক্ষয় তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা শুরু করে। এক পর্যায়ে বিয়ার খাবে নাকি জিজ্ঞেস করলে দারুকেশ্বর হুইস্কি আছে নাকি জানতে চাইলে অক্ষয় গানে জানায় : 'অভয় দাও তো বলি আমার wish কী/ একটি ছটাক সোডার জলে পাকি তিন / পোয়া হুইস্কি ।'

তারা যদিও ব্রাহ্মণ তবুও তাদেরকে আরো একটু উস্কে দেবার জন্য মুরগির কাকলেট ও মাটন চপের কথা তোলে এবং জানায় সেই রাতে খ্রিস্টান হতে হবে তাদের। অক্ষয় আসলে তাদেরকে নিয়ে মস্করা করছিলেন। তারা বায়না ধরে বিয়ের পর বিলেত পাঠাতে হবে। অক্ষয় জানায় তাহলে আজই তাদের ধর্ম পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু সে কাথায় রাজি না হওয়ায় তাদের জন্য শুধু সাদা পানি এবং সাধারণ নাস্তা আনা হয়। তখন দারুকেশ্বর জানায় মুরগি না খেয়েই ভারতবর্ষ আজ গেল। সাথে সাথে অক্ষয়ের গান এবং তাদেরকেও তিনি বাধ্য করেন গাইতে : 'কত কাল রবে বলো ভারত রে/ শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে ।/ দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন,/ ধরো হুইস্কি সোডা আর মুর্গি-মটন ।/ যাও ঠাকুর চৈতন চুটকি নিয়া,/ এসো দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিয়া ।'

এভাবে পাত্রের আসল রূপ বের হয়ে আসে যে তারা পানাহারে অভ্যস্ত এবং ব্রাহ্মণ হয়েও মুরগি মাটন খায়। পুরবালা ও জগত্তারিণী বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। শৈলবালা ঠিক করেন তিনি আচকান চাপিয়ে বেশ পাল্টে চিরকুমার সভায় যোগ দেবেন। অক্ষয় শুনে গান গায় : 'চির-পুরানো চাঁদ,/চিরদিবস এমনি থেকো আমার এই সাধ ।/ পুরানো হাসি পুরানো সুধা মিটায় মম পুরানো ক্ষুধা,/ নূতন কোনো চকোর যেন পায় না পরসাদ ।'

যে কোন পরিবেশেই অক্ষয়ের গান তৈরির ক্ষমতা রয়েছে। কোন একটি ঘটনা ধরেই উত্তর দেন গানে গানে। পুরুষের বেশে শৈল সভায় যেতে প্রস্তুত আর তাই অক্ষয় তাকে উদ্দেশ্য করে গায় : 'জয়যাত্রায় যাও গো, ওঠো ওঠো জয়রথে তব ।/ মোরা জয়মালা গেঁথে আশা চেয়ে বসে রব ।/ আঁচল বিছায়ে রাখি পথধুলা দিব ঢাকি-/ ফিরে এলে হে বিজয়ী, হৃদয়ে বরিয়া লব ।'

তিনি আশীর্বাদ করে দিচ্ছেন গানের মাধ্যমে- যেই কাজে শৈলবালা যাচ্ছে, তাতে যেন সিদ্ধি

লাভ করে। নীরবালাও যোগ দেয় গানে : 'আঁকিয়ো হাসির রেখা সজল আঁখির কোণে-/ নববসন্ত শোভা এনো এ শূন্যবনে।/ সোনার প্রদীপে জ্বালো আঁধার ঘরের আলো,/ পরাও রাতের ভালে চাঁদের তিলক নব।'

চন্দ্রবাবুর বাড়ি থেকে সভাটি অক্ষয় নিজের বাসায় স্থানান্তর করেন। তার বাসা দেখানোর জন্য চলে গেলে নেপথ্য থেকে গান ভেসে আসে : 'আমি ওগো, তোরা কে যাবি পারে।/ আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে।/ ও পারেতে উপবনে কত খেলা কত জনে,/ এ পারেতে ধুধু মরু বারি বিনা রে।/ এইবেলা বেলা আছে, আয় কে যাবি।/ মিছে কেন কাটে কাল কত কী ভাবি।/ সূর্য পাটে যাবে নেমে, সুবাতাস যাবে থেমে,/ খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যা-আঁধারে।'

গানটির একটি চমৎকার আবেদন আছে নাটকের পরিস্থিতিতে। এপারে নিরস জীবন। তাদের লক্ষ্য ঠিক নেই। কেউ কেউ বিয়ে করতে চাইলেও বা কাওকে পছন্দ করলেও ভয়ে স্বীকার করতে পারছে না। অন্যদিকে ঐ পারে যেন কত খেলা, আনন্দ! সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশ। এখনো বেলা আছে তাই কেউ চাইলে যেতে পারে। সময় চলে গেলে যাওয়া যাবে না। শ্রীশ জানান গানটা শুনে বোধ হচ্ছে পারে নিয়ে যাবে না, অতলে তলিয়ে দেবে। পূর্ণ চন্দ্রবাবুর ছাত্র ছিল, চন্দ্রবাবুর অবিবাহিত ভাগ্নি নির্মলাকে দেখে পূর্ণ প্রেমে পড়ে এবং নিয়মিত আসা যাওয়া করার জন্য সভার সদস্যপদ গ্রহণ করে। সভা অক্ষয়ের বাসায় স্থানান্তরিত হওয়ায় পূর্ণ আপত্তি পোষণ করে আর তাই নির্মলা সদস্য হবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। চন্দ্রবাবু সভার সম্মতি গ্রহণ করে নারী সদস্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং নির্মলা সভায় যোগদান করে। শৈল অবলাকান্ত ছদ্মনামে পুরুষের বেশে সভার সদস্য হয় এবং অবিবাহিত বৃদ্ধ রসিকও সভায় সদস্য হয়।

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে শুরুতেই নীরের গান : 'যেতে দাও গেল যারা।/তুমি যেয়ো না, যেয়ো না-/ আমার, বাদল গান হয়নি সারা।/ কুটিরে কুটিরে বন্ধ দ্বার,/ নিভৃত রজনী অন্ধকার,/ বনের অঞ্চল কাঁপে চঞ্চল-/ অধীর সমীর তন্দ্রাহারা।'

ঘরে নৃপও উপস্থিত ছিল। অক্ষয় জিজ্ঞেস করেন, তাদের দুই বোনের চিত্ত চঞ্চল কেন? নীরবালা উত্তর দেয়, দিদি নেই দেখে তারা মাঝে মাঝে দেখা দিতে আসে। অক্ষয় জানতে চায়, শূন্য হৃদয় চুরি করার জন্য শূন্য ঘরে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে নাকি : 'ওগো দয়াময়ী চোর! এত দয়া মনে তোর!/ বড়ো দয়া করে কণ্ঠে আমার জড়াও মায়ার ডোর!/ বড়ো দয়া করে চুরি করে লও শূন্য

হৃদয় মোর ।’

নীরবালা জানায়, অক্ষয়ের মন সেখানে নেই, তাই চুরির ভয় নেই । ৪৭৫ মাইল দূরে তার দিদির সাথে কাশী চলে গেছে । অক্ষয় গেয়ে উঠে : ‘চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া,/ বেগে বহে শিরা / ধমনী ।/ হায় হায় হায় ধরিবারে তায়/ পিছে পিছে ধায় রমণী । / বায়ুবেগভরে উড়ে অঞ্চল,/ লটপট বেণী দুলে চঞ্চল -/ এ কী রে রঙ্গ, আকুল-অঙ্গ/ ছুটে করঙ্গগমনী ।’

নৃপ অক্ষয়কে জিজ্ঞেস করে, তার দিদিকে নিয়ে কখনো গান করেছেন কিনা? তখন অক্ষয় তার রচিত গানটি গেয়ে শোনায় : ‘মনোমন্দিরসুন্দরী । / স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা / অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী ।/ রাষারুণরাগরঞ্জিতা / গোপনহাস্যকুটিল-আস্য- / কপটকলহগঞ্জিতা ।/ সংকোচনত-অঙ্গিনী ।/ চকিতচপল-নবকুরঙ্গ- / যৌবনবনরঙ্গিণী ।’

গানশেষে অক্ষয় তাদের চলে যেতে বললেও যেতে চায় না । এখনি লোক আসবে জানালেও রাজি হয় না । অক্ষয় জানায় যাদের ধ্যান তারা করে, তারা আসবে না । নীরবালা বলে দেবতার ধ্যান করলে উপদেবতার উপদ্রপ হয় : ‘ও আমার ধ্যানেরই ধন,/তোমার হৃদয়ে দোলায় যে হাসি রোদন ।/ আসে বসন্ত, ফোটে বকুল,/ কুঞ্জে পূর্ণিমা-চাঁদ হেসে আকুল -/ তারা তোমায় খুঁজে না পায়,/ প্রাণের মাঝে আছ গোপন স্বপন ।’

সহসা অবলাকান্তবাবুর খোঁজে শ্রীশের প্রবেশ এবং মেয়েদের দেখে ক্ষমা চেয়ে সাথে সাথে চলে যেতে উদ্যত হয় । নৃপ ও নীরব সবেগে চলে যায় । নৃপ একটি রুমাল অক্ষয়ের বৈঠকখানায় ফেলে যায় এবং শ্রীশ কুড়িয়ে পায় । রুমালের কোণে ‘ন’ অক্ষর সেলাই করে লেখা দেখে তার খুব আগ্রহ হয় এটি কার জানবার জন্য । একটি কাজে সে বের হয়ে যায় । এরমধ্যে নীরবালা আসে গানের খাতা নিয়ে । রসিকের অনুরোধে তার পছন্দের একটি গান ধরে : ‘জ্বলে নি আলো অন্ধকারে,/ দাও না সাড়া কি তাই বারে বারে ।/ তোমার বাঁশি আমার বাজে বুকে/ কঠিন দুখে, গভীর সুখে -/ যে জানে না পথ কাঁদাও তারে ।’

বিপিন ঘরে প্রবেশ করে এবং নীর দ্রুতবেগে পলায়ন করে । বিপিন নীরের গানের খাতা খুঁজে পায় এবং সেটা নিয়ে মেতে থাকে । শৈল ও রসিক এতে সায় দিতে থাকে । অক্ষয়ের বাসায় নৃপকে দেখে শ্রীশ এবং নীরকে দেখে বিপিন মুগ্ধ হয় । বিপিন গানের খাতায় গানের নির্বাচন দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় । একটি গান নিয়ে তার খুব কৌতূহল হয় :‘তরী আমার হঠাৎ ডুবে

যায়/কোন পাথারে কোন পাষাণের ঘায় ।/ নবীন তরী নতুন চলে,/ দিই নি পাড়ি অগাধ জলে,/ বাহি তারে খেলার ছলে কিনার কিনারায় ।/ তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায় ।/ ভেসেছিল স্রোতের ভরে/ একা ছিলেম কর্ণ ধরে -/ লেগেছিল পালের পরে মধুর মৃদু বায় ।/...মেঘ ছিল না গগন কোণে-/ লাগবে তরী কুসুমবনে ছিলেম সেই আশায় ।/ তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায় ।'

নাটকের এই পর্যায়ে এই গানটির গুরুত্ব রয়েছে। চিরকুমার সভার মূল প্রতিজ্ঞাই হচ্ছে তারা বিয়ে করবে না। দেশ ও দশের সাহায্যে কাজ করে যাবে। নারী সংশ্রব থেকে তারা দূরে থাকবে। চন্দ্রবাবুর বাড়িতে যখন মিটিং হতো, সে জায়গা বড় নিরস ছিল। কিন্তু যখনি অক্ষয়বাবুর বাসায় মিটিং শুরু হলো, সেখানে চারদিকে কেবল নারীদের উপস্থিতির ছাপ। মন কেমন যেন বিগলিত হয়ে যাচ্ছে কঠোরতা থেকে। শ্রীশের মন গলেছে রুমালে আর বিপিনের গানের খাতায়। গানটির মতোই তার তরী যেন আজ ডুবে যাচ্ছে। জীবনে স্থীর ছিল নারী সঙ্গ ত্যাগ করবে কিন্তু আজ নবীন তরী নতুনভাবে চলছে। অগাধ জলে কখনো পাড়ি দেননি, খেলার ছলে এতদিন কিনারে কিনারে ঘুরেছেন; আজ যেন সেই তরী ডুবে যাচ্ছে। এতদিন একা কর্ণধরে থাকলেও আজ যেন পালের পরে মধুর মৃদুমন্দ বাতাস লেগেছে। আপন মনে সুখেই ছিল, গগনকোণে মেঘ ছিল না, কুসুমবনে তরী ভিড়বে, সেই আশায় ছিল। কিন্তু আজ যেন তরী ডুবে যাচ্ছে। চিরকুমার ব্রতে দিক্ষীত হলেও কোথায় যেন আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে ব্রত বোধহয় ছুটে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে বিপিন গুরুদাসের কাছে বসে গলা সাধছে এবং গানের খাতার গানগুলোতে সুর বসাবার জন্য অনুরোধ করছে। এরমধ্যে একটি গান তার খুব ভালো লাগে : 'তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে সুন্দর হে/ জমল ধুলা প্রাণের বীণার তারে তারে সুন্দর হে ।/ নাই যে কুসুম, মালা গাঁথব কিসে ।/ কান্নারই গান বীণায় এনেছি সে,/ দূর হতে তাই শুনতে পাব অন্ধকারে সুন্দর হে ।'

মনে রঙিন পাল লেগেছে অর্থাৎ এই গানের থেকেই বোঝা যায় বিপিন প্রেমে পড়েছে। একদিন পূর্ণ চন্দ্রবাবুর কাছে নির্মলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। চন্দ্রবাবু বিব্রত বোধ করেন। রসিকের বুদ্ধিতে এবং সাজানো নাটকে আসল পাত্র রেখে শ্রীশ ও বিপিন নকল পাত্র সেজে নৃপবালা এবং নীরবালাকে দেখতে যেতে সম্মত হয়। পাত্রপক্ষের সামনে যেতে মেয়েদেরকে সাজিয়ে দিতে চাইলে তারা রাজি হয় না, কারণ পাত্র তাদের অপরিচিত। অক্ষয় গান গেয়ে উঠে : 'অলকে কুসুম না দিয়ো,/ শুধু শিথিল করবী বাঁধিয়ো ।/ কাজলবিহীন সজল নয়নে/ হৃদয়দুয়ারে ঘা

দিয়ো ।/ আকুল আঁচলে পথিকচরণে/মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো ।/ না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ/ নিদয়া নীরবে সাধিয়ো ।'

অন্যদিকে শ্রীশের মনেও যেন কবিতার সুরের আনাগোনা । তাই গাইছে : 'কেন সারাদিন ধীরে ধীরে/ বালু নিয়ে শুধু খেল তীরে ।/ চলে গেল বেলা, রেখে মিছে খেলা/ঝাঁপ দিয়ে পড়ো কালো নীরে ।'

চিরকুমার সভায় যাতায়াতের ফলে অবলাকান্তের প্রতি নির্মলার একটু আকর্ষণ জন্মেছিল তবে পূর্ণর জন্য যে আকর্ষণ ছিল না তা নয় । চন্দ্রবাবু চিরকুমার সভায় সদস্যদের কাছে কৌমার্যব্রত গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে দিতে প্রস্তাব করলে সবাই আগ্রহ নিয়ে সম্মতি দেয় । উদ্দেশ্য সফল হলে শৈল পুরুষের ছদ্মবেশ ছেড়ে নিজ বেশ ধারণ করে । নির্মলার সাথে পূর্ণর, নৃপের সাথে শ্রীশের এবং নীরের সাথে বিপিনের বিয়ের আর কোন বাধা রইলো না ।

অক্ষয়ের গাওয়া বেশিরভাগ গানই ছিল প্রহসনের গান । তবে তা পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়েই । কিন্তু কখনোই কোনো গান রীতিমতো সম্পূর্ণ করেন না । বন্ধুরা বিরক্ত হয়ে বলেন, 'তোমার এমন অসামান্য ক্ষমতা, কিন্তু গানগুলি শেষ কর না কেন?' অক্ষয় ফস করিয়া তান ধরিয়া দিতেন - 'সখা, শেষ করা কি ভালো?/তেল ফুরোবার আগেই আমি নিবিয়ে দেব আলো ।'

নাটকটিতে নাট্যগীতি রয়েছে ১৫টি । ১২টি প্রেম পর্যায়ের, ৩টি পূজা পর্যায়ের, ৪টি বিচিত্র পর্যায়ের এবং প্রকৃতি বর্ষার ১টি গান রয়েছে ।

৯. শেষ বর্ষণ (১৯২৬)

'শেষ বষর্ণ নাটকটির পটভূমিতে রয়েছে রাজ সভা । সেখানে উপস্থিত রাজা, পারিষদবর্গ, নটরাজ, নাট্যাচার্য ও গায়ক-গায়িকা । ঋতু-উৎসব আরম্ভ হবে । নটরাজ পালা গানের পুঁথি নিয়ে এসেছে 'শেষ বর্ষণ' । রচয়িতা সাথে নেই । পালার বিষয়বস্তু বর্ষাকে আহ্বান করা । তা জেনে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'আশ্বিনে বর্ষাকে আহ্বান'? উত্তরে নটরাজ জানান বর্ষাকে না জানলে শরৎকে চেনা যায় না । তিনি বর্ষাকে ডাকার অনুমতি চাইলেন রাজার কাছে । রাজা বললেন, 'বর্ষাকে ডাকা কী রকম? বর্ষা তো নিজেই ডাক দিয়ে আসে ।' নটরাজ জানান, 'সে তো আসে বাইরের আকাশে । অন্তরের আকাশে তাকে গান গেয়ে ডেকে আনতে হয় ।' তিনি গায়ক-গায়িকাদের ইশারা করলেন গান শুরু করতে, বর্ষাকে ডাকতে : 'এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে,/

এসো করো স্নান নবধারাজলে ।/ দাও আকুলিয় ঘন কালো কেশ,/ পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ;/ কাজল নয়নে যুথীমালা গলে/এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে ।'

বর্ষাকে আহ্বান করার অসাধারণ একটি গান। এটি শুধু নাটকের গান হিসেবেই নয়, পর্যায় ভিত্তিক গান হিসেবে, বর্ষা ঋতুর গান হিসেবে এক অনন্য স্থান জুড়ে রয়েছে রবীন্দ্র সংগীতে। বর্ষার এক অসামান্য বর্ণনা এবং আমন্ত্রণ। বৃষ্টির সময় ঘন কালো মেঘকে তুলনা করা হয়েছে কেশের সাথে। এবং নীল মেঘকে কেশ হিসেবে। এখানে মানবী সাজে সাজানো হয়েছে বর্ষাকে ।৭৭

নটরাজ মহারাজকে জানায় একবার ভিতরের দিক তাকিয়ে দেখতে, 'রজনী কারণ ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিমঝিম শব্দে বরিষে' । রাজা জানান ভিতরের পথই তো সবচেয়ে দুর্গম । নটরাজ জানায় গানের স্রোতে হাল ছেড়ে দিতে, তাহলে পথ সুগম হয় । সব গীতরসিককে আকাশের বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করে গান ধরতে বলে : 'ঝরো ঝরো ঝরো ভাদর বাদর,/ বিরহকাতর শর্বরী ।/ ফিরিছে এ কোন অসীম রোদন/কানন কানন মর্মরি ।/ আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ/ গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে ।/ হৃদয় একি রে ব্যাপিল তিমিরে/সমীরে সমীরে সঞ্চরি ।'

নটরাজ বলছেন শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী। বিদ্যুৎ চোখে আলুথালু তার জটা। সে বিরহীকাতর। তখন মহারাজকে আহ্বান জানালেন মেঘমল্লার শুনতে : 'কোথাও যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী/আজি ভরা বাদরে ।/ ঘন ঘন গুরু গরজিছে,/ঝরো ঝরো নামে দিকে দিগন্তে জলধারা,/ মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে/ অশান্ত বাতাসে ।'

পুবের আলো দেখে রাজা জিজ্ঞেস করে, আলো কোথাকার? রাজকবি জানায়, শ্রাবণের পূর্ণিমার। রাজা উপহাসের হাসি হেসে জানায় পূর্ণিমা তো বসন্তের। শ্রাবণের পূর্ণিমার পূর্ণতা কোথায়? নটরাজ জানায়, বসন্তপূর্ণিমাই বরং অপূর্ণ, তাতে মাত্র হাসি আছে, চোখের জল নেই। শ্রাবণের শুক্ল রাতে হাসি বলে আমার জিত, কান্না বলে তার। ফুল ফোটার সাথে ফুল ঝরার মালাবদল। গাওয়া হয় শ্রাবণের পূর্ণিমার গান : 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস বল,/হাসির কানায় কানায় ভরা কোন নয়নের জল ।/ বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে/যুথীবনের বেদন আসে,/ ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল ।'

শ্রাবণের পূর্ণিমার এক শান্ত সমাহিত বর্ণনা। সুরের দিক থেকেও গানটি বেশ শান্ত রসের। বাণীর

দিক থেকে রাজা ও নটরাজের কথপোকথনই ফুটে উঠেছে ' ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল ।' শরৎ আসবে আসবে করছে। রাজা জানায় গানটি 'মধুর' আর তাই নটরাজ মধুরের সাথে কঠোরকে মিলিয়ে শ্রাবণের গান ধরে : 'বজ্র-মানিক দিয়ে গাঁথা/ আষাঢ় তোমার মালা ।/ তোমার শ্যামল শোভার বুকে/বিদ্যুতেরই জ্বালা ।/ তোমার মন্ত্রবলে/ পাষাণ গলে, ফসল ফলে,/ মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা ।'

একদিকে আষাঢ়ের বিদ্যুতের চমক। অন্য দিকে সেই বৃষ্টিই মরুতে ফুল ফোটায়। সবুজ সুধার ধারায় তপ্ত ধরায় প্রাণ আনে, ভয়ংকরী বন্যার মরণ-ঢালাকে বামে রেখে। আষাঢ়ের দ্বৈত রূপ। একদিকে প্রাণের সঞ্চার, অন্যদিকে বন্যার মরণরূপী রূপ। রাজা জানতে চায় হাসির সাথে কান্নার, মধুরের সাথে কঠোরের, সব ধরনের ক্ষ্যাপামির গান হলো। এখন বাকি রইল কি? নটরাজ জানায় বাকি আছে 'অকারণ উৎকণ্ঠা', কালিদাসের ভাষায় 'মেঘ দেখলে সুখী মানুষও আনমনা হয়ে যায় ।' তাই সেই যে পথ চেয়ে আনমনা থাকা, তারই গান হবে। নাট্যাচার্যকে বললেন গান ধরতে : 'পুব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি ।/ হৃদয়-নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী ।/ পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে/ বিনা কাজে সময় কাটে,/ পাল তুলে ওই আসে তোমার সুরেরই তরী ।'

এই গানে বিরহীর বেদনার রূপ ফুটে উঠেছে। ঘনবর্ষার মেঘ আর ছায়া দিয়ে গড়া সজল সেই রূপ। অশান্ত বাতাসে ওর সুর পাওয়া যায় কিন্তু বাণীটি গায়কের কণ্ঠে, মধুরিকা। গাইলো : 'অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে ।/ আজি শ্যামল মেঘের মাঝে/ বাজে কার কামনা ।/ চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,/ ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে,/ করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা ।'

শুধু বেদনা বিচ্ছেদ নয়, মিলনের কামনা রয়েছে। রাজার কাছে বিরহের পালাটাই বড়ো বেশি হয়ে উঠছে। আর তাই অবনীর সঙ্গে গগনের মিলনের আয়োজনে নাট্যাচার্য গায় : 'পথিক মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণ-গগন-অঙ্গনে ।/ মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে ।/ দিক-হারানোর দুঃসাহসে/সকল বাঁধন পড়ুক খসে,/ কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা লঙ্ঘনে ।/ বেদনা তোর বিজুলশিখা জ্বলুক অন্তরে;/ সর্বনাশের করিস সাধন বজ্র-মন্তরে ।/ অজানাতে করবি গাহন,/ ঝড় সে পথের হবে বাহন,/ শেষ করে দিস আপনারে তুই প্রলয়রাতের ক্রন্দনে ।'

আবার ঘুরে ফিরে সেই 'অজানা' সেই নিরুদ্দেশ' । নটরাজ বলেন, 'বর্ষার রাতে সাথিহারার স্বপ্নে

অজানা বন্ধু ছিলেন অন্ধকার ছায়ায় স্বপ্নের মতো' । আজ তাই বুঝি শ্রাবণের প্রাতে চোখের জলে ধরা দিয়েছে । তাই হৃদয়ের কথা বলার জন্য ভৈরবীতে করুণ সুর লাগিয়ে গাইছে : 'বন্ধু, রহো রহো সাথে/ আজি এ সঘন শ্রাবণপ্রাতে ।/ ছিলে কি মোর স্বপনে/ সাথিহারা রাতে ।/ বন্ধু, বেলা বৃথা যায় রে ।/ আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে ।/ কথা কও মোর হৃদয়ে/হাত রাখো হাতে ।'

রাজার ভাষ্য 'কান্না হাসি বিরহ মিলন সব রকমই তো খন্ড খন্ড করে হল' । এইবার বর্ষার একটি পরিপূর্ণ মূর্তি তিনি দেখতে চান। শুরু হলো গান : 'ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে,/ জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে,/ ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,/ শ্যাম গম্ভীর সরসা ।/ গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে/ উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে,/ নিখিল-চিত্ত-হরষা/ ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা ।

ভরা বর্ষার গান। পরিপূর্ণ একটি রূপ। এবার রাজার ভালো লাগলো। বাদলের পালাই তিনি শুনতে চাচ্ছেন। কিন্তু নটরাজ বলে, 'মহারাজ দেখছেন না, মেঘে পালাই-পালাই ভাব ।' কেয়া ফুলের গন্ধে বিদায়ের সুর ভিজে হাওয়ায় ভরে উঠছে। কেতকী বলছে 'এবার আমার গেলো বেলা' । বর্ষা বিদায়ের আভাস গানে : 'একলা বসে বাদলশেষে শুনি কত কী ।/ এবার আমার গেল বেলা বলে কেতকী ।/ বৃষ্টি-সারা মেঘ যে তারে/ ডেকে গেল আকাশপারে,/ তাই তো সে যে উদাস হল/ নইলে যেত কি ।'

এখানে বর্ষা বিদায়ের সাথে শরতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। রাজার মন ভারি হয়ে উঠছে, তিনি চাইছেন না বাদলকে বিদায় দিতে। নটরাজ জানায় তাহলে কবির সাথে বিরোধ হবে কারণ তার পালায় বর্ষা এবার যাব যাব করছে। রাজা বলছেন, নটরাজ বিদ্রোহী দলের একজন হয়ে যাচ্ছে, কবির কথা মানছে কিন্তু রাজার কথা মানছে না। তিনি যদি যেতে না দেয় প্রশ্নে নটরাজ জানায় কবি আবারো তাই বলবে, সেও। আকাশে শরতের আলো আসছে খেলতে, আলোয় কালোয় যুগলমিলন হবে : 'শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া, নাই বা গেলে/ সজল বিলোল আঁচল মেলে ।/ পুব হাওয়া কয়,/ 'ওর যে সময় গেল চলে',/ শরৎ বলে 'ভয় কী সময় গেল বলে,/ বিনা কাজে আকাশমাঝে কাটবে বেলা/ অসময়ের খেলা খেলা ।/ কালো মেঘের আর কি আছে দিন ।/ ও যে হল সাথিহীন ।/ পুব হাওয়া কয়, 'কালোর এবার যাওয়াই ভালো'/ শরৎ বলে, 'মিলবে যুগল কালোয় আলো,/ সাজবে বাদল সোনার সাজে আকাশ মাঝে/ কালিমা ওর ঘুচিয়ে ফেলে ।'

পালা বদলের পালা। বর্ষার সাথে শরতের। শরতের প্রথম সকালে শুকতারা দেখা দিচ্ছে অন্ধকারের প্রান্তে। রাজার সাথে কথা বলে বোঝা গেল 'তিনি ছন্দরসিক, বাঁধার ছলে রস নিংড়ে বের করেন'। তাই আর নটরাজের ভয় রইলো না। গীতাচার্যকে বললেন গান ধরতে : 'দেখো দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায়/প্রভাতের কিনারায়।'

শুকতারার ডাক পৃথিবীর বনে পৌঁছেছে। শরতের প্রবেশ : 'ওলো শেফালি,/ সবুজ ছায়ায় প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি।/ তারার বাণী আকাশ থেকে/ তোমার রূপে দিল এঁকে/ শ্যামল পাতায় থরে থরে আখর রুপালি।'

রাজা জিজ্ঞেস করেন, শুকতারাতে শেফালিতে ভাগ করে করে শরৎকে কিভাবে দেখবে? নটরাজ জানায় কবি ফাঁদ পেতেছে। যে মাধুরী হাওয়ায় হাওয়ায় আভাসে ভেসে বেড়ায়, সেই ছায়ারূপটিকে কবি আপন গানে ধরেছ। সেই সুরটি সবার কণ্ঠে জাগাতে বলে গাইলেন : 'যে ছায়ারে ধরব বলে করেছিলেম পণ/ আজ সে মেনে নিল আমার গানেরই বন্ধন।/ আকাশে যার পরশ মিলায়/ শরৎ মেঘের ক্ষণিক লীলায়।'

শুভ্র শান্তির মূর্তি ধরে আসছে শরৎশ্রী : 'এসো শরতের অমল মহিমা,/ এসো হে ধীরে।/ চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে/ বিরহ-তরঙ্গে অকূলে সে যে দোলে/ দিকাযামিনী আকুল সমীরে।'

এরমধ্যে বাদললক্ষ্মীর প্রবেশ। মাথায় অবগুণ্ঠন। রাজা জানায় তার মানই রইলো। কবি তো শরৎকে আনতে পারলেন না। নটরাজ জানায় চিনতে সময় লাগে, ভোররাত্রিকেও ভ্রম করে নিশীরাত্রি মনে হয়। কিন্তু ভোরের পাখি ঠিক চিনতে পারে। বাদলের ছলনার ভিতর থেকে কবি শরৎকে চিনেছেন আর তাই আমন্ত্রণের গান : 'ওগো শেফালি বনের মনের কামনা/ কেন সুদূর গগনে গগনে/ আছ মিলায়ে পবনে পবনে/ কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া/ যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া/ কেন চপল আলোতে ছায়াতে/ আছ লুকায়ে আপন মায়াতে/ তুমি মুরতি ধরিয়া চকিতে নামো না।'

বাদললক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খোলার সময় হলো। 'বর্ষার ধারায় যার কণ্ঠ গদগদ, শিউলিবনে তারই গান, মালতীবিতানে তারই বাঁশির ধ্বনি' : 'এবার অবগুণ্ঠন খোলো।/ গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়/ তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হল।/ শিউলি-সুরভি রাতে/ বিকশিত জ্যোৎস্নাতে/ মৃদু মর্মর গানে তব মর্মের বাণী বোলো।'

দেখা গেল সে ছদ্মবেশিনী শরৎপ্রতিমা। নানাপ্রকাশে তাকেই দেখা যায়। নটরাজ বলেন, ‘একি রূপ, না বাণী? একি আমার সনেরই মধ্যে, না আমার চোখেরই সামনে?’ গেয়ে উঠে : ‘তোমার নাম জানিনে সুর জানি।/ তুমি শরৎপ্রাতের আলোর বাণী।/ সারাবেলা শিউলিবনে/ আছি মগন আপন মনে,/ কিসের ভুলে রেখে গেলে/ আমার বুকে ব্যথার বাঁশিখানি!’

শরতের বিশেষত্ব শিউলি ফুল। রাজার প্রশ্নে নটরাজ জানায় শরৎশ্রী ডাকছে সুন্দরকে। যা আলোর ফুল হয়ে কুঁড়ি থেকে ফুটলো। গানের ভিতর দিয়েই তাকে দেখা যাবে। সুন্দর এসে গানে জানালো : ‘কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে?/ ফুটে দিগন্তে অরুণ-কিরণ-কলিকা।/ শরতের আলোতে সুন্দর আসে,/ ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে।/ হৃদয়কুঞ্জবনে মঞ্জরিল/ মধুর শেফালিকা।’

নিশিভোরে প্রাণে বাঁশি বাজিয়ে সুন্দর এসেছে। শরতের আলোতে সুন্দর আসে, শিশিরে ভাসে ধরণীর আঁখি। রাজা জিজ্ঞেস করলে নটরাজ জানায় শরৎ ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মর্তে আসে। শিশির শুকিয়ে যায়, শিউলি ফুল ঝরে পড়ে, আশ্বিনের সাদা মেঘ আলোতে মিলিয়ে কাদিয়ে চলে যায়। এই আসা যাওয়ায় স্বর্গমর্তের মিলনপথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায় : ‘হে ক্ষণিকের অতিথি,/ এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া,/ ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া।’

নটরাজ এবার বলেন, এখন কবির বিদায় গান। সব থেমে যাবে শুধু স্মৃতি রয়ে যাবে : ‘আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে।/ বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে।/ তোমার বুকে বাজলো ধ্বনি/ বিদায়গাথা, আগমনী, কত যে,/ ফাল্গুনে শ্রাবণে, কত প্রভাত রাতে।’

রাজা জিজ্ঞেস করে, পালা কি একেবারেই শেষ হয়ে গেলো? কেবল দুদন্ডের জন্য গান বাঁধা, গান হলো! এতো সাধনা, এত আয়োজন, এতো উৎকণ্ঠা, তারপর? নটরাজ উত্তরে জানায়, ‘তারপর’ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। এ তো লীলার সৃষ্টি, কৃপণের পুঁজি নয়। আনন্দের অমিতব্যয়। মুকুল যেমন ধরে তেমনি ঝরে যায়, বাঁশিতে গান বাজলে কেউ শোনে, কেউ তর্ক করে, কেউ বা ভোলে, কেউ বা ব্যঙ্গ করে। তাতে কিছু আসে যায় না। চূড়ান্ত অনুভবই আসল : ‘গান আমার যায় ভেসে যায়,/ চাস নে ফিরে দে তারে বিদায়।/ সে যে দখিন হাওয়ায় মুকুল ঝরা,/ধুলায় আঁচল হেলায় ভরা,/ সে যে শিশিরফোঁটার মালা গাঁথা বনের আঙিনায়।/ কাঁদন-হাসির আলোছায়া সারা অলসবেলা,/ মেঘের গায়ে রঙের মায়া খেলার পরে খেলা।’

এই গানের মধ্য দিয়ে পালাটি শেষ। কথার মালায় গানের অয়োজন। যেন পালার ভেতর পালা রচনা করা হয়েছে কথপোকথন ও গানের মাধ্যমে। বর্ষার আগমন, বর্ষার রূপ সাথে বর্ষার বিদায় এবং শরতের আগমনী বর্ণনা সব গানে বিধৃত হয়েছে। এই পালায় অতি চমৎকার বর্ষা ও শরৎ ঋতুর গান স্থান পেয়েছে। নৃত্যগীতের মাধ্যমে এটি পরিবেশিত হয়। প্রথমে নতুন ও পুরাতন মিলিয়ে যে ২০টি গান পরিবেশিত হয়েছিল।

বহু বছর পূর্বে রচিত 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' কবিতাটিতে তিনি প্রথম সুর সংযোজন করে এই নৃত্যগীতে ব্যবহার করেন। নৃত্যভিত্তিক মূকাভিনয়ের মাধ্যমে নাটকটি পরিবেশন করা হতো। এই নাটকটি 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থ লেখার সময় ছাপানো হয়েছে। নাটকটিতে বর্ষা ঋতুর গানই বেশি, আর রয়েছে শরতের গান, কিছু প্রেম পর্যায়ের গান। বর্ষা ঋতুর গানগুলোতে মূলত বর্ষার রাগ ব্যবহার করেছেন, যেসন পিলু, মল্লার ও গৌড় মল্লার।

১০. নটরাজ ও ঋতুরঙ্গশালা (১৯২৭)

রবীন্দ্রনাথ নটীর পূজা অভিনয়ের শেষে শান্তিনিকেতন ফিরে এসে দোল উৎসবে 'ফাল্গুনী' নাটকটি অভিনয়ের কথা ভাবেন। মহড়া আরম্ভ হওয়া সত্ত্বেও সব চরিত্রের উপযোগী অভিনেতার অভাবে তা বন্ধ করে নৃত্যগীতের একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেন। নতুন করে ছয়টি ঋতুর গান ও কবিতা রচনা করে সমগ্র রচনাটিকে ৬টি ঋতু পর্যায়ে সাজিয়ে নাম দেন 'নটরাজ'। রবীন্দ্রনাথ নিজে এ সম্পর্কে বলেছেন :

> "নৃত্য গীত ও আবৃত্তি যোগে নটরাজ দোলপূর্ণিমার রাতে শান্তি নিকেতনে অভিনীত হইয়াছিল। নটরাজের তা-বে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখন্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। নটরাজ পালাগানের এই মর্ম।"[৭৮]

রবীন্দ্রনাথ 'নৃত্যের তালে তালে, হে নটরাজ' গানটি রচনা করেন এবং কার্যসূচির প্রথম গান হিসেবে রাখেন। নৃত্যগুরু নটরাজকে বিশেষভাবে বন্দনা করে ঋতুচক্রের গান ও কবিতা দিয়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই নাটকটির মাধ্যমে তিনি সকলকে জানিয়ে দেন উচ্চাঙ্গ শিল্পকলা হিসেবে নৃত্যকে তিনি সম্মানের চোখে দেখেন এবং নটরাজকে নৃত্যগুরু স্বীকার করে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন।

নাটকটিতে ৬টি ঋতুর গান রয়েছে। আর রয়েছে পূজা, প্রেম ও বিচিত্র পর্যায়ের গান। বর্ষার

গানগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বর্ষার রাগ মল্লার, মিশ্র মল্লার ও গৌড় মল্লার রাগ ব্যবহৃত হয়েছে। বেশ কিছু বাউল গানও রয়েছে।

১১. শেষরক্ষা (১৯২৮)

'গোড়ায় গলদ' (১২৯৯) প্রহসনের অভিনয়যোগ্য সংস্করণ হচ্ছে 'শেষরক্ষা' নাটকটি। এই নাটকটি ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসের মাসিক 'বসুমতী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ (১৯২৮) সালে। প্রবীর গুহঠাকুরতার 'রবীন্দ্রসঙ্গীত মহাকোষ ১'- এ একটি মজার তথ্য পাওয়া যায় এই নাটকের নামকরণ নিয়ে। তিনি জানান :

> "শিশিরকুমারের [ভাদুরী] অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ গোড়ায় গলদ নাটকটিকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন। তার নুতন নামকরণ করেছিলেন শেষরক্ষা।...নামটিও বদলে গেছে দেখে শিশিরকুমার মন্তব্য করেন, 'গুরুদেব, দর্শক আমার পক্ষে; গোড়ায় গলদ নামটি কিন্তু বেশ ছিল।' কবির চোখের কোণে চকিতে একটা মৃদু হাসির রেখা খেলে গেল। পরক্ষণেই যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে হতাশার ভান করে কবি বলেন, 'গোড়ায় গলদ ছিল, কেটেকুটে শেষরক্ষা করলাম, তাও তোমার মন পেলাম না শিশির।"[৭৯]

গোড়ায় গলদে সমাপ্তিতে 'যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক তোমরা সবাই ভালো' গানটি ছাড়া আর কোন গান ছিল না। তবে নাটকের প্রথম দৃশ্যে 'পাশের বাড়ি হইতে গানের শব্দ' এবং নেপথ্যে 'গান' লিখিত থাকলেও কোন গান তা বলা ছিল না। শেষরক্ষায় গানগুলো গাইবার ফলে নাটকের সংলাপ আরও অর্থবহ হয়ে ওঠে। নাটকটিতে মোট ৯টি গান ছিল। ড. অরুণকুমার বসু নাটকটির গানগুলো সম্পর্কে বলেন, "শেষরক্ষায় যে প্রেমসংগীতগুলি আছে, বাংলা নাটকে ব্যবহৃত প্রেমগীতির তুলনায় সেইগুলি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, পরিচ্ছন্ন এবং শালীন। প্রেমের সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য, মান-অভিমানের জটিল হৃদবৃত্তি, হৃদয়ভাবনার বহু দুস্প্রকাশ্যতা এই সকল সূক্ষ্ম সুরের সুন্দর প্রকাশে সার্থক হয়ে উঠেছে।" [৮০]

নাটকটির গানগুলো এটি রচনাকালেই লেখা হয়েছিল। গানগুলো মঞ্চে যেমন রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তেমনি পরিবেশনের সময় দর্শকদেরও আনন্দ দিয়েছিল। এই গানগুলোকে বিশুদ্ধ নাট্যসংগীত বলা যায়। ৯টি গানের ৫টি গানই প্রেম পর্যায়ের, ৩টি পূজা ও ১টি বিচিত্র পর্যায়ের গান রয়েছে।

১২. পরিত্রাণ (১৯২৯)

এই নাটকেও রাজশক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসহায় প্রজাদের পক্ষ নিয়ে ধনঞ্জয়, উদয়াদিত্য

রাজকুমার এবং সুরমা যুব-রাজমহিষীর বিপদ অগ্রাহ্য করে সত্য ও ন্যায়ের নির্দেশ পালন করেন। তারা বারবার কারাবরণ ও মৃত্যু পর্যন্ত স্বীকার করেছেন। যে সব ভীরু মূকপ্রজারা অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে পারে না, তাদের মুখপাত্র ও বাণীমূর্তি হিসেবে আবির্ভূত হন এই ধনঞ্জয়। তিনি বৈরাগী বলে সবাই তার আপন এবং ন্যায় ও সত্য তার ধর্ম। নাটকের বেশিরভাগ গানই ধনঞ্জয়ের কণ্ঠে। এই প্রসঙ্গে অশোক সেন বলেন, "ধনঞ্জয় বৈরাগী– আত্মপ্রকাশ করিয়া সমস্ত পরিবেশের মধ্যে একটা স্বর্গীয় ভাব পরিব্যাপ্ত করিয়াছে– সীমাহীনের সংগীত শুনাইয়া সকলকে মুক্তির আলোক দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছে– বদ্ধ আবহাওয়ার ভিতর হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের স্বাধীনভাবে নিজেদের বিকশিত হইবার শিক্ষা দিয়াছে।"[৮১]

রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার রচনা কাব্যগ্রন্থ '*মহুয়া*'। কবি নিজেই এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন, "আমি নিজে মহুয়ার কবিতায় দুটি দল দেখতে পাই। একটি হচ্ছে নিছক গীতিকাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গিতেই তার লীলা। তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আর-একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধনবেগই প্রবল।"[৮২]

বলা যায় এ কাব্যগ্রন্থে নরনারীর হৃদয়াবেগের বহু বৈচিত্র্যতাকে তিনি ভাষা দিয়েছেন। *মহুয়া*র 'সন্ধান' কবিতাটির রূপান্তরিত রূপই যেন নটীদের মুখের 'আমার নয়ন তোমার নয়নতলে' গানটি। কবিতাটিতে রয়েছে :

'আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়/মনের কথার কুসুমকোরক খোঁজে।
সেথায় কখন অগম গোপন গহন মায়ায়/পথ হারাইল ও-যে।'

আর গানের বাণী : 'আমার নয়ন তোমার নয়নতলে মনের কথা খোঁজে,/ সেথায় কালো ছায়ায় মায়ার ঘোরে পথ হারালো ও যে॥/ নীরব দিঠে শুধায় যত পায় না সাড়া মনের মতো,/ অবুঝ হয়ে রয় সে চেয়ে অশ্রুধারায় মজে॥'

'আমাকে যে বাঁধবে ধরে' গানটি 'মুক্তধারা' নাটকে তিনি রাগ শঙ্করা, তাল দাদরা এবং বিচিত্র পর্যায়ে রূপ দেন। অন্যদিকে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে পর্যায় 'প্রেম ও প্রকৃতি', রাগ খাম্বাজ। অন্যান্য গানের মধ্যে রয়েছে প্রেম, পূজা, বিচিত্র এবং প্রকৃতি পর্যায়ের গান। ১৪টি গান রয়েছে বাউল ও কীর্তন সুরে।

১৩. সুন্দর (১৯২৫/১৯২৯)

১৯২৯ সালে 'সুন্দর' নাটকটি রচনার পর সে বছর শান্তিনিকেতনে বসন্ত-উৎসবে আম্রকুঞ্জে

পরিবেশনের কথা থাকলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তা অনুষ্ঠিত হয়নি। এ নিয়ে শান্তিনিকেতন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হয় যে,

> "বিগত দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে 'সুন্দর' নামে ছোট একটি গীতি-ভূমিকা অভিনয় হইবার কথা ছিল। স্বয়ং গুরুদেব ছাত্র-ছাত্রীদের ইহার গানগুলি শিখাইয়াছিলেন। আম্রকুঞ্জে অভিনয়স্থলটি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করের তত্ত্বাবধানে সুচারুরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। অভিনয়ের দল ও অভিনয়ের স্থল যখন প্রস্তুত এমন সময় সন্ধ্যাকালে আকাশে মেঘে ভরিয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে বান-ডাকানো বৃষ্টিতে অভিনীত উৎসবের উপরে অকস্মাৎ জল-যবনিকা টানিয়া দিল।"[৮৩]

সেদিন বৃষ্টির ফলে অভিনয় পন্ড হলেও সে বছর চৈত্রসংক্রান্তির দিন আবার 'সুন্দর' নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের পত্রিকায় সে অভিনয়ের নিম্নরূপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে :

> "বর্ষণশেষের দিন রাত্রে উত্তরায়ণে গুরুদেবের বাড়িতে 'সুন্দর' নামে একটি গীতিকাব্য অভিনীত হয়। সবশুদ্ধ তেরটি গান অভিনয় করিয়া গাওয়া হইয়াছিল। তার মধ্যে এগারোটি গানই সম্পূর্ণ নতুন ছিল। আশ্রমবাসী ছাত্রছাত্রীগণ অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীগণ আলপনা দ্বারা এবং নানা প্রকার রঙীন কাপড় ও ফুল দ্বারা অভিনয় স্থলটি অতি সুন্দরভাবে সাজাইয়াছিলেন। অভিনয় এবং গান বেশ ভাল হইয়াছিল।"[৮৪]

এই নাটকের একটি সচিত্র সংগীত-সূচি রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে। মূল রচনাবলীতে 'সুন্দর' নাটকের ১৫টি গান অন্তর্ভুক্ত। ১৩৩৯-এ প্রকাশিত 'গীতবিতান ৩'-এর তালিকায় ৮টি গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৯২৯ সালে কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ির ১১ই মাঘের বসন্ত উৎসবের দুদিন পরেই জোড়াসাঁকোর পুজোর দালানে কলকাতার দর্শকদের দেখানোর জন্য টিকেট দিয়ে একটি নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়। নাটকটিতে পূর্বে রচিত নানা সময়ের বসন্তের গান বাছাই করা হয়। বিশেষ করে যে গানগুলোর সাথে মেয়েরা আগে অনেকবার নেচেছে, সেসব গান রাখা হয়। অনুষ্ঠানের নাম রাখা হয় 'সুন্দর'। কিন্তু এই সুন্দর ও ১৯২৫ সালের সুন্দরের মধ্যে কোন মিল ছিল না।[৮৫]

গানের পর্যায়ে প্রকৃতি বসন্তের গানই বেশি, রয়েছে শীত পর্যায়ের গান। আর পূজা, প্রেম ও বিচিত্র পর্যায়ের গান। বাউল ও কীর্তন সুরে ৭টি গান রয়েছে। নাটকটি 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের

পরবর্তী রচনা।

১৪. তপতী (১৯২৯)

'রাজা ও রানী'র অসংগতি, দুর্বলতা, সংশোধন ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ একই কাহিনি অবলম্বনে রচনা করেন 'তপতী'। প্রথমে নাম দেয়া হয় 'সুমিত্রা', পরে 'তপতী'। 'রাজা ও রানী' কাব্যনাট্য ছিল কিন্তু এটি লেখেন গদ্যে। বিষেশত 'রাজা ও রানী'র অন্তিম পরিণতি, ইলা ও কুমার সেনের উপকাহিনি প্রভৃতি এর বিষয়বস্তু পরিস্ফুটনের অন্তরায় হয়েছিল। 'তপতী'তে এই ভাবুলতার আতিশয্য ও অসংগতিগুলো পরিহার করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কুমার ও ইলার প্রেম বৃত্তান্তের পরিবর্তে তপতীতে স্থান পেয়েছে নরেশ বিপাশার প্রেম উপাখ্যান। 'রাজা ও রানী'তে ইলা সখীবৃন্দ ও কাঠুরিয়া প্রমুখের মুখে মোট ৭টি গান সুর পেয়েছে। অন্যদিকে 'তপতী'তে ১০টি গানের ৯টিই বিপাশার জন্যে রচিত। বিশেষত 'রাজা ও রানী'র নাট্যকাহিনির পদ্যরীতি তপতীতে গদ্য রীতিতে রূপান্তরিত করেছে। এ নাটকে সুমিত্রার মৃত্যু দৃশ্য মঞ্চের বাইরে সংঘটিত হয়েছে। এমনকি সুমিত্রার মৃত্যুতে বিক্রমের হৃদয়ে অনুশোচনা কিংবা আসক্তির অবসান হলো কিনা তাও সুস্পষ্ট নয়। মৃত্যুর পরিবর্তে নবজীবনের উন্মোচন 'তপতী'তে প্রাধান্য পেয়েছে।

কাহিনির শুরুতেই ভৈরবমন্দির প্রাঙ্গণে দেবদত্ত ও উপাসকের গান : 'সর্বখর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ,/ হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্তপানে চাহো।/ দূর করো মহারুদ্র,/ যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র,/ মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ।/ দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত/ শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত।/ তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে/ নির্ঝরিয়া গলিবে যে,/ প্রস্তর-শৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ।'

শুরুর গানটিই ভৈরবের কাছে শক্তি আহ্বান করে। তিনি এমন শক্তি চাইছেন যেন মৃত্যুকে জয় করতে পারে। নাটকের সূচনা সংগীত এটি। জালন্ধরের রাজা বিক্রম কাশ্মীরের রাজকন্যা সুমিত্রাকে রানীরূপে পাবার জন্য কাশ্মীর আক্রমণ করেন। সেসময় যুবরাজ কুমারসেন তার অভিষেকের পুণ্য জল আনবার জন্য মানসসরোবরে গিয়েছেন। তার পিতৃব্য চন্দ্রসেনের লোভ ছিল কাশ্মীর রাজ্যের উপর। কুমারসেনের অনুপস্থিতিতে বিক্রমের রাজ্য আক্রমণের পূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন এবং কুমারসেনের প্রতিনিধিরূপে জালন্ধর রাজের সাথে যুদ্ধের ভান করে সন্ধির প্রস্তাব পাঠান এই শর্তে যে রাজকন্যা সুমিত্রা বিজয়ী বিক্রমের কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং

চন্দ্রসেনকে কাশ্মীরের রাজা হিসেবে স্বীকার করতে হবে। সুমিত্রা এই খবর পেয়ে আগুনে আত্মহুতি দিতে প্রস্তুতি নেয় কিন্তু পুরবৃদ্ধরা এই কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করে তাকে। শেষে দেশের মঙ্গলের জন্য, বিক্রমের লুণ্ঠন হতে কাশ্মীরকে রক্ষা করার জন্য সুমিত্রা জালন্ধরের রানী হতে সম্মতি প্রদান করেন। রাজা বিক্রম সুমিত্রাকে রানী হিসেবে পেয়ে রাজকার্যে অবহেলা করতে লাগলেন। রানী খুশি হবেন ভেবে কাশ্মীর অভিযানে যেসব বিশ্বাসঘাতক কাশ্মীরি তাকে যুদ্ধে সহায়তা করেছিলেন, তাদের তিনি নিজ রাজ্য জালন্ধরের উচ্চ রাজকর্মচারী পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু এইসব বিদেশি অতিথিদের অত্যাচারে রাজ্যের লোক অতিষ্ঠ হয়ে রাজার কাছে অভিযোগ করলেও রাজা তা বিবেচনায় আনেন না। রানী এই সংবাদ পেয়ে লজ্জিত হন এবং প্রতিকারের জন্য রাজার কাছে যান। কিন্তু রাজা তাকে রাজকার্যে হস্তক্ষেপ না করে অবিলম্বে মীনকেতনপূজার জন্য বেশ পরিবর্তন করে উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হতে বলেন। রানী বুঝতে পারেন যে রাজ্যের অত্যাচার অনাচার নিবারণের বা কোন রাজকার্যে অংশ নেবার অধিকার তার নেই। তিনি তখন রাজার মোহাবিষ্ট প্রেমের কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্য একাকী গৃহত্যাগ করে মার্ত-দেবেরে মন্দিরে চলে যান।

রানী সুমিত্রার সাথে তার সখী বিপাশাও এসেছিল কাশ্মীরের থেকে। বিপাশা নাচে গানে পারদর্শী। তাকে রাজা বিক্রমের বৈমাত্রেয় ভাই নরেশ পছন্দ করতো। এরপর দ্বিতীয় গানটি বিপাশার কণ্ঠে, নরেশের অনুরোধে। নরেশ বিপাশাকে জানায় সে বিক্রমের তৈরি চাল বুঝতে পেরেছে– কিভাবে সে কাশ্মীর জয় করেছে। বিপাশারকে অনুরোধ করে একটি গান গাইতে, তবে বীররসদীপ্ত গান শুনতে চায় না। সে জানায় তেজ বস্তুটা তার রক্তে আছে, কেবল বিপাশার গানের মাধুর্য মনে বহন করতে চান। এরপর বিপাশা জানায় উৎসবে যখন গাইবে তখন শুনে নিতে। কিন্তু নরেশ বলে, 'যা সকলেই পাবে তাতে আমার কেবল একটা মাত্র ভাগ। একটি সম্পূর্ণ দান আমাকে দাও, যা কেবল আমার একলারই।' বিপাশা গায় : 'মন যে বলে, চিনি চিনি/ যে গন্ধ বয় এই সমীরে।/ কে ওরে কয় বিদেশিনী/চৈত্ররাতের চামেলিরে ?/ রক্তে রেখে গেছে ভাষা/ স্বপ্নে ছিল যাওয়া-আসা।'

এরপরে বিপাশা যখন নরেশের পরিচয় পায় তখন বীরের কণ্ঠে মালা পরায় এবং তাকে উদ্দীপিত করবার জন্য গান গায় : 'আলোক-চোরা লুকিয়ে এলো ওই,/ তিমিরজয়ী বীর, তোরা আজ কই।/ এই কুয়াশা-জয়ের দীক্ষা/কাহার কাছে লই।/ মলিন হল শুভ্র বরণ,/ অরুণ সোনা করল

হরণ,/ লজ্জা পেয়ে নীরব হল/ ঊষা জ্যোতির্ময়ী।

বিপাশা এই গানের প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে বলে, 'কাশ্মীরে মার্ত-দেবের মন্দিরে আমরা এ গান গাই হেমন্তে গিরিশিখরে যখন আলোকরাজ্যে অরাজকতা আসে।' এরপর নরেশকে আলোকের দূত অভিহিত করে, তার জন্য রুদ্রভৈরবের নির্মাল্য আনবার কথা বলে। সে জানায় অন্য স্থানে যিনি ভৈরব, কাশ্মীরে তিনিই মার্ত-, তাকে দেবতাকে প্রসন্ন করার অনুরোধ করে গায় : 'জাগ হে রুদ্র জাগো।/ সুপ্তিজড়িত তিমিরজাল/ সহে না সহে না গো।/ এসো নিরুদ্ধ দ্বারে/ বিমুক্ত করো তারে,/ তনুমনপ্রাণ ধনজনমান/ হে মহাভিক্ষু মাগো॥'

এরই পর নরেশ বিপাশাকে জানায় রানী চিঠি লিখে গেছেন যে তিনি কাশ্মীর চলে গেছেন , ধ্রুবতীর্থে মার্ত-মন্দিরে আশ্রয় নিতে। বিপাশা জানায় রানীকে শিকল পরাতে না পেরে খাঁচায় রেখেছিল আর তাই তাকে কেউ পায়নি পাবেও না। তিনি আজ ছাড়া পেয়েছেন পাষাণের বুকফাটা নির্ঝরের মতো। তাই নটরাজের একটি অসামান্য গান গেয়ে ওঠে বিপাশা : 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে/ হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে।'

বিপাশা জানায় তারা এই গান গায় পাহাড়ে যখন বসন্তে বরফ গলতে থাকে, ঝরনাগুলো বেরিয়ে পড়ে পথে-পথে। এই তো তার সময়– ফাল্গুনের স্পর্শ লেগেছে পাহাড়ের শিখরে শিখরে, হিমালয়ের মৌন গেছে ভেঙে। বিপাশা ও নরেশ বেরিয়ে পরে রানীর খোঁজে। নরেশও রাজ্যের অত্যাচারের প্রতিকার খুঁজে পাচ্ছিল না। সেও মনে মনে ক্ষুব্ধ ছিল। রানী প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেছেন শুনে নরেশ ও বিপাশা খুঁজতে বের হয়ে যায়। রাজা যখন শুনতে পেলেন রানী কাশ্মীরের দিকে রওনা হয়েছেন, তখন দুর্বার আক্রোশে সসৈন্যে রওনা দেন কাশ্মীরের দিকে রানীকে ফিরিয়ে আনার জন্য। উদয়পুরে সে সময় কুমারসেনের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন চলছিল। ও দিকে কুমারের অভিষেকে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না গান গাইবার জন্য। সেখানে কবি ভেবে নরেশ ও বিপাশাকে নিয়ে আসা হয়। নরেশের অনুমতি নিয়ে বিপাশা গান ধরে : 'দিনের পরে দিন গেল আঁধার ঘরে।/তোমার আসনখানি দেখে মন যে কেমন করে।/ ওগো বঁধু, ফুলের সাজি/ মঞ্জরীতে ভরল আজি,/ ব্যথার হারে গাঁথব তারে রাখব চরণ-পরে।'

কুমারসেন প্রবেশ করলে আবার গান ধরতে বলে। বিপাশা আরেকটি গান গায় : 'তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর পূর্ণ করো,/ ওই যে দেখি বসুন্ধরা কাঁপল থরোথরো।/ বাজল তূর্য আকাশপথে,/

সূর্য আসেন অগ্নিরথে,/ এই প্রভাতে দখিন হাতে বিজয়খড়্গ ধরো।'

রাজ্য অভিষেকের গান। সুমিত্রা কোথায় জিজ্ঞাসে বিপাশা জানায় সে মুক্তি পেয়েছে। সুমিত্রা মার্তণ্ড-র মন্দিরাভিমুখে একা চলে গিয়েছেন। পথের পথিকদের বলেছেন তার নাম তপতী, তিনি তপস্যা করতে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে খবর আসে রাজা বিক্রম কাশ্মীরে প্রবেশ করে দেশ ছারখার করতে আসছেন এবং কুমারসেনকে বন্দী করার জন্য চর পাঠিয়েছেন। কুমারসেন জানতে পারেন রাজার সমস্ত আক্রোশ তার উপর, তিনি তখন সামান্য পথিকের ছদ্মবেশে মার্তণ্ড- মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করেন। সুমিত্রা সেই দিকে আছেন শুনে বিক্রম মন্দির অভিমুখে রওনা দেন, কিন্তু যাবার সময় পথে বীভৎস অত্যাচার চালান প্রজাদের উপর। ধ্রুবতীর্থে মার্তণ্ড-মন্দিরে বিপাশা গাইছে : 'জাগো জাগো/অলসশয়নবিলগ্ন।/ জাগো জাগো/ তামসগহননিমগ্ন।/ ধৌত করুক করুণারুণ বৃষ্টি/ সুপ্তজড়িত যত আবিল দৃষ্টি/ জাগো জাগো।'

শেষের দিকে বিক্রম যখন মার্তণ্ড-মন্দির আক্রমণ করে সুমিত্রাকে তুলে নিতে আসছেন, সেই সময় এই গানটি তাৎপর্যপূর্ণ। এ গান যেন সুমিত্রারই জীবনচিত্র। বিক্রমের জীবনদর্শনকে সুমিত্রা গ্রহণ করেননি। তিনি রুদ্রের উপাসক। তিনি অলসশয়নবিলগ্ন, তামসগহন নিমগ্নকে আহ্বান জানান জীবনের কঠিন ব্রতে সমর্পিত হতে, নিজে আশ্রয় নেন মার্তণ্ড-মন্দিরে ভৈরবের তপস্যায় নিজেকে শুচি করতে। রাজসখা তাকে সেই কাজে নিবৃত্ত করতে চাইলে তাকেও কারারুদ্ধ করেন। কারাগার থেকে পালিয়ে দেবদত্ত মার্তণ্ড-মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হন এবং মন্দিরের দ্বারপালদের সংশয় দূর করে রানীর কাছে পৌঁছান। মহারাজকে এই পাপের হাত থেকে রক্ষা করাই তার উদ্দেশ্য। কুমারসেন চান না তার বোন জালন্ধরে ফিরে যাক। সুমিত্রা সব শুনে রাজাকে সেখানেই নিয়ে আসতে চান। এই কথা শুনে সকলে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। রাজাকে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পুরোহিত ভার্গব মন্দিরের দ্বার বন্ধ রাখতে চান। কিন্তু রানী বলেন, 'দেবতার পথ রোধ করো না– যে পথ দিয়ে রাজার সৈন্য আসবে সেই পথ দিয়েই আমার দেবতা আমাকে উদ্ধার করতে আসবেন। যাও তুমি এখনই, মন্দিরের সিংহদ্বার খুলে দাও।' শংকরকে তার সংকল্প জানান, 'রুদ্রের কাছে বহুদিন পূর্বে আত্মনিবেদন করেছিলুম। ব্যাঘাত ঘটেছিল, সংসার আমাকে অশুচি করেছে। তপস্যা করেছি, আমার দেহমন শুদ্ধ হয়েছে। আজ আমার সেই অনেকদিনের সংকল্প সম্পূর্ণ হবে। তাঁর পরমতেজে আজ আমার তেজ মিলিয়ে দেব।' আর বিপাশাকে বলেন, 'আমার অগ্নিশয্যা অনেকদিন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে, তুমি দেখেছ বহুদুঃখের সেই আয়োজন। আজ সময়

হয়েছে, আনন্দ কর, জ্বলুক শিখা, বিলম্ব কোরো না ।' বিক্রম মন্দিরে আসার আগেই পদ্মের অর্ঘ্য হাতে সুমিত্রা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং তপতী বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে আত্মাহুতি দিলেন । এসময় রাজা, দেবদত্ত ও শংকরের প্রবেশ । কিন্তু সুমিত্রা তখন সকল স্পর্শের বাইরে । আগুনে প্রবেশকালে বিপাশা নাটকের শেষ গানটি গায় : 'শুভ্র নবশঙ্খ তব গগন ভরি বাজে,/ ধ্বনিল-শুভ জাগরণ-গীত ।/ অরুণরুচি আসনে চরণ তব রাজে,/ মম হৃদয়কমল বিকশিত ।/ গ্রহণ করো তারে/ তিমির পরপারে,/ বিমলতর পুণ্যকরপরশ-হরশিত ॥'

ভৈরবের বন্দনায় নাটকের শুরু এবং শান্তির কামনায় প্রার্থনায় নাটকের শেষ । বিপাশার গানগুলো নাটকটিতে একটি আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। ড. করুণাময় গোস্বামী বলেন : "গানের সাংকেতিক মাত্রাকেই তপতী নাটকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় বলে মনে হয় ।"[৮৬]

'রাজা ও রানী' কবির ২৮ বছর বয়সের রচনা (১৮৮৯) এবং ৪০ বছর পর তিনি পরিমার্জন করে ১৯২৯ সালে 'তপতী' রচনা করেন। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু পরিবর্তন করা হয়, বর্তমানে এটিই প্রচলিত । দ্বিতীয় সংস্করণের সূচনায় 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ' গানটি যুক্ত হয় । এ গানটি সম্পর্কে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

> "প্রেসিডেন্সি কলেজে ভাষণদানের অব্যবহিত পরে 'তপতী' অভিনয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন । নাটকের মহড়া শুরু হইল, কবি স্বয়ং সাতষট্টি বৎসর বয়সে বিক্রমের ভূমিকা গ্রহণ করলেন । মহড়া চলিতেছে দিনের পর দিন । এমন সময় একদিন সংবাদ আসিল লাহোর জেলে যতীন দাস নামে একজন বিপ্লবী যুবক অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; জেল-কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের প্রতিবাদে এই আত্মাহুতি ।...এই সংবাদ যেদিন আসিল, সেদিন তপতীর মহড়া জমিল না, কবিকে খুবই অন্যমনস্ক দেখা গেল । মনের এই অবস্থায় কবি লেখেন 'সর্বখর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ' গানটি । গানটি 'তপতী'র অন্তর্ভুক্ত করা হয় ।"[৮৭]

সুভাষ চৌধুরী *গীতবিতানের জগৎ*-এ 'তপতী' নাটকের একটি নতুন গানের সন্ধান দিয়েছেন । তাঁর মতে, এই গ্রন্থের একটি গান যা 'তপতী' গ্রন্থভুক্ত না হয়েও সূচীতে তপতী (১৩৩৬)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে বর্তমান খন্ডে মুদ্রিত আছে। আবার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, এটি কবির ৭৪ বছর বয়সের (১৩৪২) রচনা । একটি পান্ডুলিপিতে গানটির সংস্কার-সাধনের ফলে যে নতুন গানটির সৃষ্টি হল তা কেন কবির কোনো গীতগ্রন্থে স্থান পেল না, বোঝা যায় না । গানটি :

'প্রতীক্ষা মোর আঁধার ঘরে একলা চেয়ে আছে/লজ্জা জানায় ব্যর্থরাতের তারার কাছে

লাটে তার দাও গো আনি পরাণময় বিজয়বাণী/তোমার জ্যোতির্লিখন খানি এই সে যাচে ।'[৮৮]

নাটকের প্রথম গানটি ছাড়া সবই বিপাশার কণ্ঠে এবং নাটকের ভাব অনুযায়ী গাওয়া হয়েছে । শুরুর গানটিই ভৈরবের কাছে শক্তি আহ্বান করে । তিনি এমন শক্তি চাইছেন যেন মৃত্যুকে জয় করতে পারে । নাটকের সূচনা সংগীত এটি ।

প্রকৃতি বসন্ত, পূজা ও প্রেম পর্যায়ের গান রয়েছে নাটকটিতে । 'তপনী' নাটকটি রচিত হয় 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি রচিত হবার এক বৎসরের মধ্যে । দুই গল্পেরই মূলভাব এক যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের বীজ থাকলে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হয় বিচ্ছেদে বা মৃত্যুতে । উভয় গল্পেই স্বামীর কছে স্ত্রী ছিল কেবল ভোগের জন্য । সংসারে বা রাজ্যে কোন অধিকার ছিল না । 'তপতী' নাটকে মীনকেতন মদনের উৎসবের কথা উল্লেখ ছিল । তপতী রচনার কিছুদিন পরে তিনি 'উজ্জীবন' নামে যে কবিতাটি লেখেন তা *মহুয়া* কাব্যের প্রবেশক কাব্য হিসেবে ছিল । যাতে পুষ্পধনুর প্রতীক মীনকেতনের উল্লেখ ছিল ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছদ

১৯৩১–১৯৩৯ সাল পর্যন্ত রচিত নাটক

১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ৮টি নাটক রচনা করেন। এই দশকে কবি রচনা করেন *পুনশ্চ* (১৯৩২), *শেষ সপ্তক* (১৯৩৫), *পত্রপুট* (১৯৩৬) ও *শ্যামলী* নামে চারটি গদ্যকাব্যগ্রন্থ। এ পযার্য়ে কবির রোমান্টিকতা ও দার্শনিকতার মানসিকতার মানসপটে স্থান নেয় বাস্তবধর্মীতা। 'তাসের দেশ' নাটকটিতে *ক্ষণিকার* একটি কবিতা কিছুটা পরিবর্তন করে সংগীতে রূপান্তরিত করা হয়।

১. নবীন (১৯৩১)

'নবীন' নাটকটি মূলত বসন্তোৎসবের পালা গান। বসন্তকে আহ্বান এবং অভিনন্দনে এর শুরু এবং বিদায়ে এর শেষ। বসন্তঋতুই এখানে নবীন। 'বসন্ত' নাটকটির সাথে এই নাটকটির মূলতত্ত্ব ও উপস্থাপনে অনেক মিল রয়েছে। দুটি নাটকেই ঋতুনাট্যের মতন রাজসভায় অভিনয়ের জন্য এর স্থান নির্দেশ করা হয়নি এবং ব্যক্তি বিশেষের জন্য কোন কথোপকথন নেই। এর গদ্যাংশটুকু কেবল গানের ভাবব্যাখ্যা ও নাটকের যোগসূত্র ধরে রাখার কাজ করেছে। কোন নাটকীয়তা নেই সংলাপে। অভিনয়কালে এগুলি পাঠ করা হয়। এই ঋতুনাট্যের সাথে নাচও সংযোজিত ছিল। নানা ধরনের নাচের সমাবেশ ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ভাবের রূপের সাথে একটি রূপদানের চেষ্টা করেছিলেন। এরপর থেকেই তিনি নৃত্যনাট্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। শান্তিদের ঘোষ বলেন :

> "জানুয়ারীতে (১৯৩১) গুরুদেব দেশে ফিরে মার্চ মাসে বসন্ত উৎসবের জন্য 'নবীন'-এর আয়োজন শুরু করেন। পূর্বের 'বসন্ত' নাটিকার মতনই বসন্ত-ঋতুর নতুন গান তিনি অনেক রচনা করলেন। এর জন্য কোনো নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করেন নি। রাজা বা রাজসভা ছিল না। গুরুদেব রঙ্গমঞ্চের এককোণে বসে গানগুলির মর্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন নিজকণ্ঠে গানে, পাঠে ও আবৃত্তিতে। এই অভিনয়কালে শান্তিনিকেতনের বাঙালী ছাত্রেরা নাচে বিশেষ স্থান গ্রহণ করে। 'নবীন' এ মণিপুরী নাচের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবাঙলার বাউল, রাইবিশে ও ইউরোপের হাঙ্গেরী দেশের লোকনৃত্য ছিল আরো একটি প্রধান বিশেষত্ব। এইসব নৃত্যপদ্ধতিকে নানা গানে খুবি ভালোভাবেই খাপ খাওয়ানো গিয়েছিল।"[৮৯]

নাটকটিতে প্রথমে পূজা ও প্রকৃতি বসন্ত পর্যায়ের গান ছিল, পরে প্রেম পর্যায়ের গান সংযোজন করা হয়। একটি গ্রীষ্ম ঋতুর গান রয়েছে। সুরের দিক থেকে বেশ কয়েকটি গান বাউল ও কীর্তন সুরের।

২. শাপমোচন (১৯৩১)

'পুনশ্চ' গ্রন্থের একটি গদ্য-কবিতা থেকে নাটকটির কাহিনি নেয়া হয়েছে। এর আখ্যানবস্তুর সাথে 'রাজা' নাটকের আখ্যানবস্তুর মিল রয়েছে। ভূমিকাতে 'রাজা' (১৩১৭) নাটকের কথা বলে থাকলেও 'রাজা' নাটকের পরিবর্তিত রূপ 'অরূপরতন' (১৩২৬) এবং এই 'অরূপরতন'কে নাচে-গানে সমৃদ্ধ করে তৈরি করা হয়েছে 'শাপমোচন'। এটিকে প্রথম নৃত্যনাট্যও বলা হয়। গদ্য-কবিতা হতে আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্যে এর রূপ দেয়া হয়। এ গীতি-নাটিকাটির পুস্তিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন : ''যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে রাজা নাটক রচিত তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা করা হল : এর গানগুলি নানা গীতিনাটিকা হতে সংকলিত।''[৯০]

এই রচনায় গানের সঙ্গে নাচের সংযোগ বিষয়ে প্রতিমা দেবী লিখেছেন :

> ''শাপমোচন-এর যুগে আমরা প্রথম চেষ্টা করলুম নাচের মধ্যে নাটকের বিষয় আনতে। গুরুদেবের জয়ন্তী উৎসবের সময় য়ুনিভার্সিটির ছাত্রদের অনুরোধে তিনি শাপমোচনের কথাবস্তু লিখেছিলেন...। এই নাটকের গল্পাংশকে অনুসরণ করে নাচ দেয়া হয় এবং নাটকীয় সংঘাতকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য মূক অভিনয়ের দ্বারা ভাবকে ব্যক্ত করা হয়েছিল। সব জায়গায় প্রকৃত নৃত্যনাট্যের প্রকৃতি রক্ষা করতে না পারলেও সঙ্গীত ও মূক অভিনয় মিলিয়ে জিনিসটি মনোরম হয়েছিল।''[৯১]

শাপমোচন নাটকটির কাহিনি পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রথমেই ভূমিকার গান। গানের ভাব এই 'মনের নানা গভীর আকাঙ্ক্ষা কাহিনিতে রূপকে গানে রূপ নেয় ছন্দে বন্ধে, সঙ্গ রচনা করে কল্পনায়, বস্তুজগৎ থেকে ক্ষণকালের ছুটি নিয়ে কল্পজগতে করে লীলা। এরই ব্যাখ্যা দিয়ে গান : 'শুধু অলস মায়া- এ শুধু মেঘের খেলা,/ এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন,/ এ শুধু আপনমনে মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা,/ নিমেষের হাসি কান্না গান গেয়ে সমাপন।'

সুরসভায় গন্ধর্ব সৌরসেন গীতগায়কদের মধ্যে অগ্রণী। সেদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গিয়েছিল সুমেরুশিখরে সূর্যপ্রদক্ষিণে। সে কারণে সৌরসেন খুব উৎকণ্ঠিত ও বিরহী ছিলেন। আর তাই অন্যমনস্কতায় মৃদঙ্গের তাল কেটে গেলে নৃত্যে উর্বশীর সোমে বাধা পড়ে ভুল হয় এবং ইন্দ্রাণী

কপোল রাঙা হয়ে যায়। সমস্ত পরিস্থিতিটি ব্যাখ্যা করা হয় নিম্নের গানটিতে : 'পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়,/ পাছে ছিন্ন তারের জয় হয়।/ পাছে উৎসবক্ষণ তন্দ্রালসে হয় নিগমন,/ পুণ্য লগন হেলায় খেলায় ক্ষয় হয়,/ পাছে বিনা গানেই মিলনবেলা ক্ষয় হয়।'

সুসভার ছন্দ ভঙ্গ হবার কারণে অভিশাপে গন্ধর্বের দেহবিকৃত হয়ে অরুণেশ্বর নামে গান্ধাররাজগৃহে পুনর্জন্ম হয়। মধুশ্রী দুঃখে ইন্দ্রাণীর পাদপীঠে মাথা রেখে পড়ে থাকে এবং বলে 'ঘটিয়ো না বিচ্ছেদ দেবী, গতি হোক আমাদের একই লোকে একই দুঃখভোগে একই অবমাননায়।' শচী সকরুণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রের পানে তাকায় এবং ইন্দ্র তখন বলেন, 'তথাস্তু, যাও মর্তে, সেখানে দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে। সেই দুঃখে ছন্দপতন অপরাধের ক্ষয়।'

তাদেরকে বিদায় জনাবার জন্য গাওয়া হয় : 'ভরা থাক স্মৃতিসুধায়/ বিদায়ের পাত্রখানি,/ মিলনের উৎসবে তায়/ ফিরায়ে দিয়ো আনি।/ বিদায়ের অশ্রুজলে/ নীরবের মর্মতলে/ গোপনে উঠুক ফলে/ হৃদয়ের নূতন বাণী।'

মধুশ্রীর পুনর্জন্ম হয় মদ্ররাজকুলে কমলিকা নামে। স্বর্গলোক থেকেই অরুণেশ্বর আত্মবিস্মৃত বিরহবেদনা সাথে করে নিয়ে এসেছে এবং যৌবনে তার তাপ প্রবল হয়ে উঠেছে। সে খুঁজে বেড়ায় তার সঙ্গীনিকে। গেয়ে বেড়ায় : 'জাগরণে যায় বিভাবরী,/ আঁখি হতে ঘুম নিল হরি।/ যার লাগি ফিরি একা একা,/ আঁখি পিপাসিত নাহি দেখা,/ তারি বাঁশি ওগো তারি বাঁশি/ তারি বাঁশি বাজে হিয়া ভরি।'

অরুণেশ্বর তার পূর্বজন্মের প্রেমিকার আভাস পাচ্ছে এই জন্মে কিন্তু কোথায় আছে জানে না। তার বাঁশি হৃদয়ে বাজছে, বাণী ছাড়াই তার কানে কানে কে যেন কি বলে যায়, আভাস আসে। মিলনের জন্য সে উন্মুখ হয়ে আছে। তাপার্ত মন খুঁজে বেড়ায় অনাবৃষ্টিতে তৃষ্ণার জল, তাই বীণা বাজিয়ে গান করে : 'এসো এসো হে তৃষ্ণার জল,/ভেদ করো কঠিনের বক্ষস্থল, কলকল ছলছল।/ এসো এসো উৎসস্রোতে গূঢ় অন্ধকার হতে,/ এসো হে নির্মল, কলকল ছলছল।'

এরই মাঝে হঠাৎ কোথা থেকে কমলিকার ছবি এসে পড়ে গান্ধারে রাজ-অন্তপুরে। অরুণেশ্বরের মনে হলো যা হারিয়ে গিয়েছিল এই-জন্মের আড়ালে তাই যেন ফিরে ধরা দিল অপরূপ স্বপ্নরূপে। গেয়ে উঠল : 'ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে/ ধরা দিয়েছ যে আমার পাতায়

পাতায় ডালে ডালে ।/ যে গান তোমার সুরের ধারায় বন্যা জাগায় তারায় তারায়/ মোর আঙিনায় বাজল সে সুর আমার প্রাণের তালে তালে ।'

তার প্রাণে সুর বেজে উঠেছে প্রাণের তালে তালে । ছবিটি নিয়ে দিনের চিন্তা রাতের স্বপ্ন শুধু কল্পনাই রচনা করে যাচ্ছে : 'তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা ।/ ওই যে সুদূর নিহারিকা/ যারা করে আছে ভিড়/ আকাশের নীড়,/ ওই যারা দিনরাত্রি/ আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী/ গ্রহ তারা রবি,/ তুমি কি তাদের মতো সত্য নও -/ হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি !/ নয়নসম্মুখে তুমি নাই,/ নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই ।/ আজি তাই/ শ্যামলে শ্যামলে তুমি নীলিমায় নীল ।/ আমার নিখিল/ তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল ।/ নাহি জানি, কেহ নাহি জানে/ তব সুর বাজে মোর গানে,/কবির অন্তরে তুমি কবি -/ নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি ॥'

একটি ছবি দেখে হৃদয়ের আবেগ যে কত সুন্দর বর্ণনা করা যায়, প্রেমের প্রকাশ করা যায় তার একটি অনন্য সুন্দর উদাহরণ এই গানটি । রাজা চিত্ররূপিণীর উদ্দেশ্যে চিঠি লিখলেন : 'কখন দিলে পরায়ে স্বপনে ব্যথার মালা, বরণমালা ।/ প্রভাতে দেখি জেগে অরুণ মেঘে/ বিদায়বাঁশরী বাজে অশ্রুগালা ।/ গোপনে এসে গেলে, দেখি নাই আঁখি মেলে ।/ আঁধারে দুঃখডোরে বাঁধিলে মোরে,/ ভূষণ পরালে বিরহবেদন-ঢালা ॥'

চিঠি রাজকন্যার হাতে পৌঁছল । অজানার আহ্বানে তার মন উতলা হয়ে যায় । সখীদের নিয়ে বার বার সেই চিঠি পড়তে থাকে, মন ভরে না এবং বলে : 'দে পড়ে দে আমায় তোরা কী কথা আজ লিখেছে সে,/ তার দূরের বাণীর পরশমানিক লাগুক আমার প্রাণে এসে ।/ শস্যখেতের গন্ধখানি একলা ঘরে দিক না আনি,/ ক্লান্তগমন পান্থ হাওয়া লাগুক আমার মুক্তকেশে ।/ নীল আকাশের সুরটি নিয়ে বাজাক আমার বিজন মনে,/ ধূসর পথের উদাস বরণ মেলুক আমার বাতায়নে ।/ সূর্য-ডোবার রাঙা বেলায় ছড়াব প্রাণ রঙের খেলায়,/ আপন-মনে চোখের কোণে অশ্রু-আভাস উঠবে ভেসে ॥'

গান্ধারের দূত রাজকন্যার জন্যে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে মন্দ্ররাজধানীতে আসে । বিয়ের প্রস্তাবে রাজা বলেন, 'আমার কন্যার দুর্লভ ভাগ্য' । সখীরা রাজকন্যাকে প্রস্তাবের কথা জানাতে গায় : 'বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে ।/ হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে ।/ বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি,/ অধরে লাজহাসি সাজিবে ।/ নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল,/ সুখবেদনা মনে বাজিবে ।/

মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া/ সেই চরণযুগরাজীবে ।'

চৈত্রপূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে শুভলগ্ন স্থির করা হয় । বিয়ের রাত্রে একলা বসে রাজার বুকের মধ্যে রক্ত ঢেউ খেলিয়ে উঠল । তার শুধুই মনে হতে থাকে লোকান্তরে কারো সাথে এরকম জ্যোৎস্নারাত্রে সে এক দোলায় দুলেছিল । ভুলে-যাওয়া কুহেলিকার ভিতর থেকে তার মনে পড়ছে । একটা গান কেবলই মনে গুঞ্জরীয় উঠছে 'ভুলো না - ভুলো না - ভুলো না' : 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা ।/ সেই স্মৃতিটুকু কভু ক্ষণে ক্ষণে যেন জাগে মনে, ভুলো না ।/ সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জান/ আমার মনের প্রলাপ জড়ানো,/ আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমার হাসির তুলনা ।'

লগ্নের দিন রাজহস্তীর পিঠে রত্নাসনে রাজার প্রতিনিধি হয়ে অরুণেশ্বরের বক্ষোবিহারিণী বীণা পাঠানো হয় রাজার অশ্রুত আহ্বানের সঙ্গে । রাজকন্যার আবাহন গান গায় : 'তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে এল গো/ওগো পুরবাসী ।'

অন্তঃপুরিকারা বীণাকে বরণ করে নিয়ে যায় বিয়ের আসরে এবং নববধূকে আহ্বান করে গায় : 'বাজো রে বাঁশরী বাজো ।/ সুন্দরী, চন্দনমাল্যে মঙ্গলসন্ধ্যায় সাজো ।/ বুঝি মধুফাল্গুনমাসে চঞ্চল পান্থ সে আসে,/ মধুকরপদভরকম্পিত চম্পক/ অঙ্গনে ফোটে নি কি আজো ।'

বীণার সাথে রাজকুমারীর মালা বদল হলো । সখীরা এই বীণা সুন্দর করে উৎসর্গ করে গাইলো : 'লহো লহো তুলে রহো নীরব বীণাখানি,/নন্দননিকুঞ্জ হতে সুর দেহো তায় আনি/ ওহে সুন্দর হে সুন্দর ।'

রাজকন্যা পতিগৃহে যাবার সময় সখীরা সুন্দরকে প্রণাম করে গেয়ে ওঠে : 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার যাবার আগে ।/ আপন রাগে, গোপন রাগে,/ তরুণ হাসির অরুণ রাগে,/অশ্রুজলের করুণ রাগে ।'

রাজবধূ পতিগৃহে আসে । কিন্তু ঘর অন্ধকার । দীপ জ্বলে না । তিনি রাজাকে দেখতে পান না । এভাবেই প্রতিরাত চলে যায় । কমলিকা একদিন বলে ওঠে, 'প্রভু, তোমাকে দেখবার জন্য আমার দিন, আমার রাত্রি উৎসুক । আমাকে দেখা দাও ।' গেয়ে ওঠে : 'এসো আমার ঘরে,/ বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে ।/ দুঃখসুখের দোলে এসো,/ প্রাণের হিল্লোলে এসো,/ স্বপনদুয়ার

খুলে এসো অরুণ-আলোকে/ মুগ্ধ এ চোখে ।/ এবার ফুলের প্রফুল্লরূপ এসো বুকের পরে॥'

এতদিন রাজা ছিলেন মনের ভিতর। সামনে দেখা হয়নি। ভাব প্রকাশের আশ্রয়ে এ গান। রানী তাকে মুগ্ধ চোখে দেখতে চান। আর অন্তরে নয়। রাজা জানান, 'আমার গানেই আমাকে দেখো। আগে দেখে নাও অন্তরে, বাইরে দেখবার দিন আসবে তার পরে। নইলে ভুল হবে, ছন্দ যাবে ভেঙে।' রাজার ভয় তার কুশ্রী রূপ দেখে যদি রানী তাকে প্রত্যাখ্যান করে। ভালোবাসা তো কেবল রূপে নয়। গেয়ে ওঠে : 'কোথা বাইরে দূরে যায়রে উড়ে হায় রে হায়,/ তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায় ।/ ওগো হৃদয়ে যবে মোহন রবে বাজবে বাঁশি/ তখন আপনি সেধে ফিরবে, কেঁদে, পরবে ফাঁসি -/ তখন ঘুচবে ত্বরা , ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায় ।'

অন্ধাকারে বীণা বাজে। অন্ধকারেই গান্ধবীকলারে নৃত্যে বধূকে বর প্রদিক্ষণ করে। এক রাতে কমলিকা রাজার কাছে নিবেদন জানায় তাকে সেদিনই উষার প্রথম আলোকে প্রথম দেখার জন্য। নইলে সে অন্ধকারের বুকে কান্না রেখে বিদায় নেবে যতদিন না তিনি ফিরিয়ে ডেকে নিয়ে আসেন আলোর সভায়। রাজাকে দেখার আগ্রহ ব্যক্ত হয় গানে : 'আমি এলেম তোমার দ্বারে/ ডাক দিলেম অন্ধকারে ।/ আগল ধরে দিলেম নাড়া, প্রহর গেল পাই নি সাড়া,/ দেখতে পেলেম না তোমারে ।/ তবে যাবার আগে এখান থেকে/ এই লিখনখানি যাব রেখে ।/ দেখা তোমার পাই বা না পাই / দেখতে এলেম জেনো গো তাই,/ ফিরে যাই সুদূরের পারে॥'

এ গানে ধ্বনিত হয়েছে রানীরই বাণী। রাজা বলেন, 'প্রিয়ে না-দেখার নিবিড় মিলকে নষ্ট কোরো না, এই মিনতি। এখানো তুমি অন্যমনে আছ, শুভদৃষ্টির সময় তাই এল না ।' রাজা গেয়ে ওঠেন : 'আনমনা গো আনমনা,/ তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যখানি আনব না ।/ বার্তা আমার ব্যর্থ হবে, সত্য আমার বুঝবে কবে,/ তোমারে মন জানব না ।/ লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌনমধুর সাঁঝে,/ নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে,/ দেব তোমায় শান্ত সুরের সান্ত্বনা।

রানীর অভিমানে রাজা জানায়, চৈত্র সংক্রান্তিতে নাগকেশরের বনে নিভৃতে সখাদের সাথে তার নৃত্যের দিন। প্রাসাদশিখর থেকে রানী যেন তাকে দেখে চিনে নেয়। যেমন খুশি কল্পনা করে। এর পরেই গান, অনেকটা নেপথ্য সংগীতের মতন : 'হায় রে, ওরে যায় না কি জানা ।/ নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায়, পায় না ঠিকানা ।'

চৈত্রসংক্রান্তির দিন নাচ গান : 'আজি দখিন দুয়ার খোলা-/ এসো হে, আমার বসন্ত এসো ।/ দিব

হৃদয়দোলায় দোলা,/ এসো হে, আমার বসন্ত এসো ।/ নব শ্যামল শোভন রথে/ এসো বকুলবিছানো পথে,/ এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু/ মেখে পিয়াল ফুলের রেণু- / এসো হে, আমার বসন্ত এসো ।'

চৈত্রসংক্রান্তির রাতে মিলনে রানী জানায় নাচ দেখেছে সে– 'যেন চন্দ্রলোকের শুক্লপক্ষে লেগেছে তুফান' । কেবল একজন কুশ্রী রসভঙ্গ করেছে । সে যেন রাহুর অনুচর । কী গুণে সে যে প্রবেশের অধিকার পেল । রাজা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন । তারপর তাকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন– অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান । কিন্তু রানী কোনভাবেই মানতে রাজি নয় । তিনি রসবিকৃতি সইতে পারেন না । রাজাকে তিনি দেখার আশায় রইলেন । রাজা গেয়ে ওঠেন : 'বাহিরে ভুল ভাঙবে যখন/অন্তরে ভুল ভাঙবে কি ।/ বিষাদ বিষে জ্বলে শেষে/রসের প্রসাদ মাঙবে কি ।/ রৌদ্রদাহ হলে সারা নামবে কি ওর বর্ষাধারা,/ লাজের রাঙা মিটলে হৃদয়/প্রেমের রঙে রাঙবে কি ।'

রানী স্তব্ধ । রাজা জানায় তোমার কথা রাখছি কিন্তু তাতে তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে না । জ্বলে উঠল আলো, আবরণ ঘুচে গেল, দেখা হলো দুজনায় । টলে উঠল দুজনার সংসার । 'কী অন্যায়, কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা' বলতে বলতে রানী ঘর থেকে ছুটে পালায় । রাজা তার জগৎ থেকে ডেকে

গায় : 'না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো ।/ মিলনপিয়াসি মোরা, কথা রাখো ।/ আজও বকুল আপনহারা, হায় রে,/ ফুল ফোটানো হয়নি সারা, সাজি ভরে নি,/ পথিক ওগো, থাকো থাকো ॥'

রানী চলে যায় বহুদূর । রানী রাত্রি দুইপ্রহরে শুনতে পায় রাজার বীণায় বেজে ওঠা আর্তরাগিণী । স্বপ্নে বহুদূর থেকে ভেসে আসে আভাস । তার কাছে সেই সুর চিরচেনা মনে হয় । চিরবিরহের সঞ্চিত অশ্রু যেন বুকের মধ্যে উছলে ওঠে । রানীর মনের অবস্থা ফুটে ওঠে গানে : 'সখী, আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না ।/ কিসের পিয়াসে কোথা যে যাবে সে, পথ জানে না ।/ ঝরঝর নীরে, নিবিড় তিমিরে, সজলে সমীরে গো,/ যেন কার বাণী কভু প্রাণে আনে কভু আনে না ॥'

রাতের পর রাত যায় । তরুতলে অন্ধকারে যে মানুষের ছায়া মতো নাচে তাকে চোখে দেখা যায় না কিন্তু হৃদয়ে অনুভূত হয় । তার মন মিলন পিয়াসে অধীর । মনে মনে ভাবে যখন সে এসেছিল তখন ছিল কৃষ্ণসন্ধ্যা । যখন চাঁদ উঠল তখন তার মালাখানি রইল, সে রইল না : 'যখন

এসেছিলে অন্ধকারে/ চাঁদ ওঠেনি সিন্ধুপারে ।/ হে অজানা, তোমায় তবে/ জেনেছিলেম অনুভবে,/ গানে তোমার পরশখানি বেজেছিল প্রাণের তারে ।'

রানীর মনে হতাশা বিরহ জাগায় । বীণা বাজতে থাকে কেদারা, বেহাগ, কালাংড়া রাগে । বাহিরের বীণাধ্বনি তার অন্তরের তন্তুতে তন্তুতে বাজতে থাকে : 'ওই বুঝি বাঁশি বাজে বনমাঝে মনোমাঝে ।'

বাঁশি শুধু বনমাঝেই নয়, তার মনোমাঝেও বাজছে । বীণার গুঞ্জরণ আকাশে মেলে দেয় অন্তহীন অভিসারের পথ । রাগিণীবিছানো সেই শূন্যপথে বেরিয়ে পড়ে তার মন– দেখার আগে যাকে চিনেছিল, দেখার পরে যাকে ভুলেছিল তারই দিকে । একদিন নিমফুলের গন্ধ অন্ধকার ঘরে নিয়ে এলো অনির্বচনীয়ের আমন্ত্রণ । রানী এসে দাঁড়ায় বাতায়নের কাছে । নীচে সেই ছায়ামূর্তির নাচ, বিরহের সেই ঊর্মিদোলা । 'ও কি এল, ও কি এল না, বোঝা গেল না ।/ও কি মায়া কি স্বপনছায়া, ও কি ছলনা । / ধরা কি পড়ে ও রূপেরই ডোরে,/ গানেরই তানে কি বাঁধিবে ওরে,/ ও যে চিরবিরহেরই সাধনা ।/ ওর বাঁশিতে করুণ কী সুর লাগে/ বিরহমিলনমিলিত রাগে ।'

রানীর সমস্ত দেহ কাঁপছে । ঝিল্লিঝংকৃত রাত । কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ দিগন্তে । অস্পষ্ট আলোয় অরণ্য যেন স্বপ্ন কথা বলছে । তিনি কখন যে নাচতে আরম্ভ করলেন নিজেও জানেন না । এ নাচ কোন জন্মান্তরের, কোন লোকান্তরের । বীণায় বাজছে পরজের বিহ্বল মীঢ় । কমলিকা আপন মনে বলে, 'ওগো কাতর, ওগো হতাশ, আর ডেকো না । আর দেরি নেই আর দেরি নেই ।' রানী উঠে দাঁড়ায়, বলে ওঠে, 'যাব আজ । আর ভয় করি নে আমার দৃষ্টিকে' । পথের শুকনো পাতা পায়ে পায়ে বাজিয়ে দিয়ে সে অশথতলায়, যেখানে বীণা বাজছে : 'মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি/ কোন নব চঞ্চল ছন্দে ।/ মম অন্তর কম্পিত আজি/ নিখিলের হৃদয়স্পন্দে ।'

রাজা বীণা থামিয়ে দেন । মহিষী থমকে দাঁড়ান । রাজা ভয় পেতে নিষেধ করে । রানী জানান, 'কিছু ভয় নেই আমার, জয় হল তোমারই ।' এই বলে তিনি আঁচলের আড়াল থেকে প্রদীপ বের করলেন । ধীরে ধীরে তুলে ধরলেন রাজার মুখের কাছে । কণ্ঠ দিয়ে কথা বের হতে চায় না । চোখের পলক পড়ে না । বলে ওঠেন, 'প্রভু আমার, প্রিয় আমার, এ কী সুন্দর রূপ তোমার!' অন্তরের রসে তাকে চিনে নিল । নাটকটি শেষ হয় গান দিয়ে : 'বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে ।/কোথা হতে এলে তুমি হৃদমাঝারে ।/ ওই মুখ ওই হাসি কেন এত ভালোবাসি,/কেন

গো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে ।/ তোমারে হেরিয়া যেন জাগে স্মরণে,/ তুমি চিরপুরাতন চিরজীবনে ।/ তুমি না দাঁড়ালে আসি হৃদয়ে বাজে না বাঁশি,/ এই আলো এই হাসি ডুবে আঁধারে ।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা', 'অরূপরতন' ও 'শাপমোচন' একই সূত্রে গাঁথা । রাজা নাটকের গানের কলেবর বেড়ে যায় 'অরূপরতনে' এসে । আবার 'শাপমোচন'-এর বিষয়বস্তু এক হলেও তার গদ্যাংশ কমে যায় এবং গানের সংখ্যা বেড়ে যায় । সব নাটকেরই একই সুর– বাহ্যিক রূপ নয়, অন্তর দিয়ে চিনতে পারাই হলো আসল প্রেম, আসল ভালোবাসা ।

অভিনয়কালে যে কোন নাটকেই রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তন আনতেন । কখনো নাটক রচনার পর মহড়া চলাকালে, কখনো অভিনয়ের আগের দিন বা একরাত্রির পওে, কখনো বা কয়েক মাস বা বছর পরে । আবার যখন একই নাটকে অভিনয় করাতেন, তখন তার ব্যাপক পরিবর্তন করতেন । 'শাপমোচন'র অভিনয় যতবার হয়েছে, প্রতিবারই তিনি গদ্যের পরিবর্তন না করে গানের পরিবর্তন করেছেন । প্রথম অভিনয়ে (১৫-১৬ পৌষ ১৩৩৬) গানের সংখ্যা ছিল ২১টি, কিন্তু মুদ্রণে ১৯টি গান ছিল । অতিরিক্ত যুক্ত হয় 'পরবাসী চলে এসো ঘরে' এবং 'দে পড়ে দে আমায় তোরা'– এই গান দুটি ।

সব মিলিয়ে গানের সংখ্যা ২৪, যা প্রথম অভিনয়ে ছিল ২১ । তৃতীয় অভিনয় হয় ১৯৩৩ সালের ১৩ মার্চে শান্তিনিকেতনে । রবীন্দ্রনাথ নিজে কবিতার অংশ পাঠ করেন । এই নাটকটির পরবর্তী অভিনয়গুলিতে নিয়মিত গানগুলির পরিবর্তন করা হয় । তৃতীয় অভিনয়ের পরে ১৯৩৩ সালের ২৯-৩০ মার্চে কলকাতায় 'এম্পায়ার থিয়েটারে' পুনরায় অভিনীত হয় । সেখানে সূচনা সংগীত হিসেবে যুক্ত হয় 'এ শুধু অলসমায়া' । গানটির ভূমিকায় লেখা হয়, 'ভূমিকার গান । ভাবটাই এই, মনের নানা গভীর আকাঙ্ক্ষা কাহিনিতে রূপকে গানে রূপ নেয় ছন্দেবন্ধে, সঙ্গে রচনা করে কল্পনায়, বস্তুজগৎ থেকে ক্ষণকালের ছুটি নিয়ে কলাজগতে করে লীলা ।'
বলাকার ৬ সংখ্যক কবিতা, সবুজপত্রে (অগ্রহায়ন ১৩২১) 'ছবি' শিরোনামে প্রকাশিত দীর্ঘ কবিতা 'তুমি কি কেবলই ছবি'কে গীতরূপ দেন ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে এবং শাপমোচনে ব্যবহার করেন । গানটির প্রসঙ্গে শান্তি দেব ঘোষ লিখেছেন :

> "শাপমোচনের জন্যে নতুন গান রচনার সময় তিনি পান নি ।...তাঁর পূর্বরচিত গান থেকে একগুচ্ছ বেছে নিলেন । কেবল দুটি পুরানো কবিতার অংশ বিশেষ সুর যোজনা করে দিলেন নাটকটিতে ব্যবহারের জন্যে । গান দুটি হলো 'তুমি কি কেবলই ছবি' এবং 'আনব না, তোমার

কাছে আমার গানের মাল্যখানি আনব না' ।"[৯২]

৩. বাঁশরী (১৯৩৩)

একটি বিশেষ সমাজের পটভূমিকায় নারী-পুরুষের চিন্তা-ভাবনা, প্রণয়, জীবন সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকে। বাঁশরী সরকার বিলিতি ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করা ছাত্রী। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, "রূপসী না হলেও তার চলে। তার প্রকৃতিটা বৈদ্যুতশক্তিতে সমুজ্জ্বল, তার আকৃতিটাতে শান-দেওয়া ইস্পাতের চাকচিক্য।"[৯৩]

পার্টি হচ্ছে সুষমা সেনদের বাসায়। বাঁশরীর সাথে সাহিত্যিক ক্ষিতীষের আলাপ আলোচনাকালে জানা যায় সুষমা সেনের সাথে শম্ভুগড়ের রাজা সোমশংকরের এনগেজমেন্ট চলছে। এই সম্বন্ধ এনেছে পুরসুন্দও সন্ন্যাসী, যার পিতৃদত্ত নাম কেউ জানে না। তিনিই সুষমাকে কলেজে পড়িয়েছেন আপন ইচ্ছায়। এরমধ্যে দুই সখীর প্রবেশ। তারা আলোচনা করছিল সোমশংকরের বেশভূষার পরিবর্তনের পেছনে বাঁশরীর হাত থাকা নিয়ে। কারণ যখন তিনি প্রথম এলেন খাঁটি মধ্যযুগীয় ছিল। ঝাঁকড়া চুল, কানে বীরবৌলি, হাতে মোটা কঙ্কণ, কপালে চন্দনের তিলক, বাংলাও ঠিক বলতে পারতো না। বাঁশরীর হাতে যখন পড়লো তখন তার মডার্ন সংস্করণ হলো। দেখতে দেখতে তার অনেক রূপান্তর ঘটলো। সবাই ভেবেছিল বাঁশরীর সাথেই বিয়ে হবে। কিন্তু ছেলের বাবা প্রভুশংকর খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি আধুনিকতার কবল থেকে টেনে নিয়ে সরিয়ে নিলেন। পরে পরসুন্দর রাজার ছেলেকে এনে ব্রাহ্মসমাজে আংটি বদল করায় সুষমার সাথে। তিনি তরুণ-তাপস-সংঘ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেখানে তার আদর্শ অনুযায়ী প্রবৃত্তিমুক্ত নিষ্কাম দম্পতি কর্ম-সাধনা করবে। এই তার ব্রত।

দ্বিতীয় দৃশ্যে শচীন, তারক, অর্চনা, শৈল, লীলা সবাই আছে, কথপোকথন চলছে। হাসি ঠাট্টায় গল্প চলছে। ক্ষিতীশের কপালে ছোটবেলাকার বটির উপর পড়ে কেটে যাওয়া মস্ত দাগের প্রতি শৈলর মায়া দেখে সতীশ জানায় তার নিজেরই কপালে বঁটি মারতে ইচ্ছে হচ্ছে– যদি তার উপরও মায়া হয়। শচীন উত্তরে বলে, 'মেয়েরা অযোগ্যকেই দয়া করে।' শৈলকে খ্যাপাতে লীলা গান ধরে: 'বলেছিলে ধরা দেব না, শুনেছিল সেই বড়াই।/ বীরপুরুষের সয়নি গুমোর, বাধিয়ে দিয়েছে লড়াই।/ তারপরে শেষে কী-যে হল কার,/কোন দশা হল জয়পতাকার -/ কেউ বলে জিত, কেউ বলে হার, আমরা গুজব ছড়াই।'

এরপর সোমশংকরের সাথে বাঁশরীর কথা হয় । নতুন এনগেজমেন্টের পুরানো জঞ্জাল সাফ করে দেবার জন্য তার কাছে সোমশংকরের দেয়া যে গহনাগুলো ছিল সব ফেরত দেয় । সোমশংকর লজ্জিত হয়ে জানায়, বাঁশরী তাকে মানুষ করে দিয়েছে, যে ঋণ শোধ হবার নয় । বাঁশরীর উত্তর, 'আমার তখন প্রথম বয়েস, তুমি এসে পড়লে সেই নতুন-জাগা অরুণরঙের দিগন্তে । ডাক দিয়ে আলোয় আনলে যাকে তাকে লও বা না লও নিজে তো তাকে পেলুম । আত্মপরিচয় ঘটল । বাস, দুই পক্ষে হয়ে গেলো শোধবোধ । এখন দুজনেই অঋণী হয়ে আপন আপন পথে চললুম । আর কী চাই ।' সোমশংকর গহনাগুলো ফোয়ারার জলাশায়ে ফেলে দেয় । এরমধ্যে সুষমার বোন এসে সোমশংকরকে ডেকে নিয়ে যায় ।

বাঁশরী ক্ষিতীশকে জানায় সুষমা পুরনন্দকে ভালোবাসে । এই পুরনন্দ সম্পর্কে কেউ ঠিকভাবে জানে না । কেউ তাকে দেখেছে কুম্ভমেলায়, কেউ বা গারো পাহাড়ে ভালুক শিকারে । কেউ বলে ও ইউরোপে অনেককাল ছিল। সে গল্ফ খেলা শেখায়, গ্রেটইস্টারন হোটেলে ডাক্তার উইলকক্সকে পড়ায় যোগ-বাশিষ্ঠ, কখনো যোগ দেয় পোলো খেলার টুর্নামেন্টে, কখনো রোশেনাবাদের নবাবের অনুরোধে পড়ে তুর্কি বাদশার সাজ সাজে । তিনি কলেজের ভালো ভালো ছাত্রীকে নিজের ইচ্ছায় বিনা বেতনে পড়াতেন । সুষমা সে রকম এক ছাত্রী ছিল । সুষমা তাকে ভক্তি করতো এবং সেই ভক্তি ক্রমে ভালোবাসায় রূপ নেয় । সুষমার মায়ের কথায় বাঁশরী গিয়েছিল পুরনন্দকে সেই ভালোবাসার কথা জানাতে । কিন্তু পুরনন্দ জানায়, 'সুষমা আমার ছাত্রী, তার ভার আমার 'পরে আর আমার ভার তোমার 'পরে নয় ।'

বাইরে থেকে ক্ষিতীশ আর বাঁশরী সোমশংকর ও সুষমার আংটি বদল দেখছে । 'সুষমার মুখের উপর পড়েছে রোদের রেখা । স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, শান্ত মুখ, জল ঝরে পড়ছে দুই চোখ দিয়ে । বরফের পাহাড়ে যেন সূযার্স্ত, গলে পড়ছে ঝরনা' । সোমশংকর যেন 'সুখ না দুঃখ, বাঁধন পরছে না ছিড়ছে?' আর পুরনন্দ যেন ঐ সূর্যেরই আলো । তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে লক্ষ যোজন দূরে, মেয়েটার মনে যে অগ্নিকান্ড চলছে তার সঙ্গে কোন যোগই নেই । অথচ তাকে ঘিরে একটা জ্বলন্ত ছবি বানিয়ে দিলে' । অনুষ্ঠান শেষে সবাই বাইরে বের হয়ে আসে। পুরনন্দ নতুন যুগলকে আশীর্বাদ করে । সুষমা নন্দাকে গান গাইতে অনুরোধ করে : 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়,/ তেয়াগিলে আসে হাতে,/ দিবসে সে ধন হারায়েছি আমি/ পেয়েছি আঁধার রাতে ।/ না দেখিবে তারে পরশিবে না গো,/ তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো, / তারায় তারায় রবে তারি বাণী,/

কুসুমে ফুটিবে প্রাতে॥/ তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল/ বীণাবাদিনীর শতদলে/ করিছে সে টলমল ।/ মোর গানে গানে পলকে পলকে / ঝলসি উঠিছে ঝলকে ঝলকে,/ শান্ত হাসির করুণ আলোকে/ভাতিছে নয়নপাতে॥'

পুরনন্দর জন্যই যেন এ গান। সুষমা তাকে সাধনা করলেও হারিয়ে ফেলছে। দিবসে সে আর ধরা দিবে না। মনে মনেই তাকে সাধতে হবে। কীর্তন অঙ্গের গানটি একটি খাঁটি প্রেমের গান। না পাওয়ার মাঝে পাওয়া। ঠিক একইভাবে নাটকের শেষে বাঁশরী ও সোমশঙ্করের সম্পর্কের ব্যাখ্যা এই গানটি। পুরনন্দ চলে যাবে শুনে সুষমা অনুরোধ করে, 'দয়া করো প্রভু, ত্যাগ করো না আমাকে। নিজের ভার আমি নিজে বহন করতে পারব না। তুমি চলে গেলে আমার সমস্ত শক্তি যাবে তোমারই সঙ্গে।' পুরনন্দ জানায়, সোমশংকরের মহত্ব আপন অন্তর থেকে চিনতে পারলে সেই মহত্বকে সেবা দিয়ে মূল্যদান করে গৌরবান্বিত করাই তার কাজ।

দ্বিতীয় দৃশ্যে বাঁশরী সোমশংকরের কাছে আসে উত্তর চাইতে যে, সুষমা তাকে ভালোবাসে না তা সে জানে কিনা? সোমশংকর ইতিবাচক জবাব দিয়ে বলে, সে জানে, সে এও জানে যে সুষমার একটি ব্রত আছে, ওর জীবনে সমস্ত দরকার তাই নিয়ে। সেজন্য তাকে সাধ্যমত সার্থক করা তারও ব্রত। বাঁশরীর ধারণা এই মতের পেছনে রয়েছে পুরনন্দ। পুরনন্দকে দেখেই তাকে প্রশ্ন করে যে, কেন এমন মেয়ের ভার দেয়া হলো সোমশংকরের উপর যে ওকে ভালোবাসে না। পুরনন্দ জানায়, তিনি অনেকদিন থেকেই এমন দুজন নারী-পুরুষকে খুঁজছিলেন– মেয়েটি ব্রতকে নিষ্কামভাবে পোষণ করবে এবং নিষ্কামভাবে প্রয়োগ করবে পুরুষ। দৈবাৎ তাদের পেয়ে গেছেন এবং তিনি আরও জানান বাঁশরীর সৃষ্টির চেয়ে তার সৃষ্টি অনেক উপরে। তাই নির্মম হয়ে তার সুখ ছারখার করে দেবে। সুষমাকে সামনে পেয়ে বাঁশরী জিজ্ঞেস করে, কেন সে কেড়ে নিতে এসেছে তার চিরজীবনের আনন্দ? সোমশংকর এসে বাঁশরীকে শান্ত হতে বলে, তাকে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু বাঁশরী স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে ওঠে। অপমান মুছে ফেলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে চলে যায়। সন্ন্যাসী সোমশংকরকে জিজ্ঞেস করে, কেন সে সুষমাকে বিয়ে করেছে? উত্তরে সোম জানায়, "এতদিনের তপস্যায় এই নারীর চিত্তকে তুমি যজ্ঞের অগ্নিশিখার মতো ঊর্ধ্বে জ্বালিয়ে তুলেছ, আমারই পরে ভার দিলে এই অনির্বাণ অগ্নিকে চিরদিন রক্ষা করতে।"[৯৪]

সন্ন্যাসী আশীর্বাদ দিয়ে চলে যায়। সোমশংকর গান গায় : 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।/ একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো।/ দুন্দুভিতে হলো রে কার

আঘাত শুরু,/ বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরু গুরু,/ পালায় ছুটে সুপ্তিরাতের স্বপ্নে-দেখা মন্দ ভালো ।/ নিরুদ্দেশের পথিক, আমায় ডাক দিলে কি-/ দেখতে তোমায় না যদি পাই নাই-বা দেখি ।'

বাউল সুরের গানটি পুরানো স্মৃতি পুড়িয়ে আগুন জ্বালাতে বলছে। সোমশংকরের প্রেম ছিল বাঁশরীর সাথে। আজ সেই প্রেম ব্যর্থ। নতুন জীবন শুরু হতে যাচ্ছে সুষমার সাথে। ভিতর থেকে আজ সব চাওয়া পাওয়া ঘুচে গেছে। ভাবনাতে তার ঝড়ের হাওয়া লেগেছে। সে পুরনন্দকে জানিয়েছে কেন সে সুষমাকে বিয়ে করছে। কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই আজ। বজ্রশিখায় এক পলকে যেন সব সাদা কালো মিলিয়ে দিল। বাঁশরী এসেছে বজ্রশিখার মতন। নাটকের এই মোড়ে এসে গানটি এক অনন্য সংযোজন। সোমশংকরের মানসিক একটা রূপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই গানটিই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গানে স্থান পেয়েছে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এখানে গানটি প্রেমের গান মনে হচ্ছে। গান শেষে তারকের প্রবেশ। এসে সোমশংকরের গাম্ভীর্য দেখে। সে জানায় লক্ষ্মীছাড়ার দল আসছে। তাদেরকে ঠান্ডা করতে হবে। এরই মধ্যে তারা এসে উপস্থিত হয়। সুধাংশু জানায় তারা গান শোনাতে এসেছে। গেয়ে ওঠে : 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল/ ভবের পদ্মপত্রে জল/ সদাই করছি টলোমল,/ মোদের আসা যাওয়া শূন্য হাওয়া,/ নাইকো ফলাফল ।/ নাহি জানি করণ কারণ, নাহি জানি ধরন ধারণ/ নাহি মানি শাসন বারণ গো-/ আমরা আপন রোখে মনের ঝোঁকে ছিঁড়েছি শিকল/ আমরা এবার খুঁজে দেখি অকূলেতে কূল মেলে কি,/ দ্বীপ আছে কি ভবসাগরে-/ যদি সুখ না জোটে দেখব ডুবে কোথায় রসাতল ।'

লক্ষ্মীছাড়ার দল এসে যেন সমস্ত পরিবেশটা পাল্টে দিল। ভাবগম্ভীর পরিবেশ নিমেষেই কলরব কোলাহলে ভরে গেল।

তৃতীয় অঙ্ক শেষ দৃশ্যে বাঁশরীর কছে সুষমার ছোট বোন সুষীমা এসেছে বোনের বিয়ের উপহার হিসেবে কেনা থলির উপর ছবি একে দিতে, ঠিক যেমনটি শংকরদাদার সিগারেটের কেসের উপর আছে। বাঁশরী তাকে শংকরের কাছ থেকে কেসটি চাইতে বললে সে জানায় দাদা সেটা বুক পকেটে রেখেছে। চাইলে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবুও বাঁশরী তাকে চাইতে অনুরোধ করে। ক্ষিতীশ এসে কথায় কথায় বাঁশরীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। তখন বাঁশরী দুই তিন দিনের মধ্যে বিয়ে সম্পন্নের প্রস্তাব করে। তবে অতিথি কেউই থাকবে না। শুধু সোমশংকর আসতে পারে আর সেই নিমন্ত্রণপত্র সে নিজের হাতে লিখে দেয় রাজার দারোয়ানের কাছে দিয়ে আসবার

জন্য। লীলা আসলে তাকে বাঁশরী জানায় বিয়ে পাকা করে ফেলেছে। এরমধ্যে শংকর আসে বাঁশরীকে নিমন্ত্রণ জানাতে। কথায় কথায় বাঁশরী জিজ্ঞেস করে আজও সেদিনের মতো তাকে ভালোবাসে কিনা। শংকর উত্তরে জানায় ততখানিই। বাঁশরী বলে ওঠে, আর কিছুই তার চাইবার নেই, সুষমাকে নিয়ে সে পূর্ণ করুক তার ব্রত। ভালোবাসর চিহ্ন হিসেবে শংকর একদা জলে ফেলে দেয়া অলংকারগুলো তুলে এনে তার কাছেই দিয়ে দেয় এবং নিজ হাতে পরিয়ে দেয়। এরমধ্যে ভৃত্য প্রবেশ করে বাঁশরীর বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি নিয়ে। বাঁশরী তা পড়তে না দিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। সিগারেট কেস চেয়ে পাঠানোর কারণ জানতে চাইলে উত্তর দেয় আবার ঐ পকেটে রাখবে বলে, দ্বিতীয়বারকারের দান। সন্ন্যাসী আসবে বলে সোমশংকর চলে যায়।

লীলাকে দিয়ে বাঁশরী ক্ষিতীশকে চিঠি লেখায় যে সে আর বিয়ে করছে না। সোমশংকর এখনো তাকে আগের মতনই ভালোবাসে, শুধু ব্রতের কারণে আজ সুষমার হতে যাচ্ছে জানতে পেরে আজ তার খুশি বাঁধ মানছে না। সে নিজেই স্বীকার করেছে তার সাথে বিয়ে করলে হয়তো ব্রতকে বড়ো করে দেখতো না, ব্রতের সাথেই তার শত্রুতা তাই সন্ন্যাসী ঠিকই করেছেন। লীলা চলে গেলে পুরনন্দের প্রবেশ। সে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে তাই বিদায় নিতে এসেছে। সুষমা তাকে ভালোবাসে এবং সেও ভালোবাসে জানার পরও সোমশংকরের সাথে বিয়ে দিয়েছে। কারণ বাঁশরীকে না পাবার বঞ্চনাই তাকে শক্তি দেবে। বাঁশরী শেষ মুহূর্তে তার সব প্রণাম একসাথে সন্ন্যাসীর পায়ে দেয় এবং সন্ন্যাসী যাবার সময় একটি গান দিয়ে যায়, কণ্ঠে গ্রহণ করার জন্যে :

> 'পিনাকেতে লাগে টংকার-/বসুন্ধরার পঞ্জরতলে কম্পন জাগে শঙ্কার।
> আকাশেতে ঘোরে ঘূর্ণী/সৃষ্টির বাঁধ চূর্ণী
> বজ্রভীষণ গর্জনরব প্রলয়ের জয়ডঙ্কার।'

নাটকটি শেষ হয় গান দিয়ে। এতে রয়েছে অসামান্য এক প্রেমকাহিনি। সব সময় মিলনেই যে প্রেমের পরিণতি তা নয়, বিরহের মাঝে স্বীকৃত প্রেমেরও একটি রূপ আছে। প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে ভাবাদর্শ, প্রেম-বিরহ-মিলন পারস্পরিকতার সম্বন্ধ বিষয়ে তার যেই ভাবনা তাই এই নাটকটিতে প্রকাশ পেয়েছে একটি সমাজের পটভূমিতে এই চরিত্রগুলোর মাধ্যমে।

গানগুলোর বিশেষ একটি মর্যাদা রয়েছে নাটকটিতে পটভূমির ব্যাখ্যায়। 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়' গানটিতে যেন বিরহ প্রেম সবই আছে, যাকে সাধলে পাওয়া যায় না তাকে ত্যাগে অর্জন করা যায়। এই পাওয়া না-পাওয়ার দ্বন্দ্বই পুরো নাটকটিরই মূলভাব।

কাব্যগ্রন্থ 'বিচিত্রতা' প্রকাশের সমসাময়িক এই নাটকটি। 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ' নামক গল্পগ্রন্থের ভাবানুবর্তন এই নাটকটি।

৪. তাসের দেশ

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ৬ বছরে 'তাসের দেশ' নাটকটি মোট নয়বার অভিনীত হয়। নাটকটির শুরুতে একটি গান রয়েছে : 'খর বায়ু বয় বেগে,/ চারিদিক ছায় মেঘে,/ ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।/ তুমি কষে ধরো হাল,/ আমি তুলে বাঁধি পাল-/ হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।'

এই গানটির প্রাসঙ্গিকতার নানাদিক সম্পর্কে ড. করুণাময় গোস্বামী বলেন :

> "এ গানটি রবীন্দ্রনাথের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় রচনা। প্রধানত শিশুরা এ গান গায়। সারি গানের দৃষ্টান্তে রচিত এই গানের যে সরল-প্রবল সুর, উত্থান-পতনের যে চমৎকার আবহ, নৃত্যদোদুল ছন্দ যোজনা, তাতে শিশুরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এ গান গায়। তবে শিশু সংগীত এটি নয়। এটি রাজনৈতিক গান। ভারতবর্ষের আকাশে পরাধীনতার যে কালো মেঘ জমেছে, সংগ্রামের যে তুফান উঠেছে, তাতে কান্ডারীগণ যেন সঠিকভাবে নৌকা চালিয়ে যান, যেন সেটি ডুবে না যায়, সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টান্তে স্বাধীনতা সংগ্রামী জননেতাদের রবীন্দ্রনাথ সাবধান করেছেন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেন লক্ষ্যচ্যুত না হয়। এ গানেও ভৈরব প্রসঙ্গ আনলেন কবি। ভারতবর্ষের আকাশে মহাকাল ভৈরব যদি উদ্দাম জটাজাল এলিয়ে বিষম নৃত্য শুরু করেন, তাতে কেউ যেন ভয় না পায়, যেন সেই ভৈরবের জয়গান গাওয়া হয়। যে একটি আষাঢ়ে গল্পকে অবলম্বন করে এই নাটক রচিত এবং এর আষাঢ়ে বিষয়, তাতে ভূমিকা সংগীত হিসেবে 'খরবায়ু বয় বেগে' গানটি ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করা হয়েছে, সেজন্যেই এই গানের ব্যবহার এমন ভাবলে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।"[৯৫]

প্রথম দৃশ্যে রাজপুত্র সওদাগরপুত্রকে জানায় তার রাজবাড়ির একঘেঁয়ে জীবন ভালো লাগে না। সবকিছু তার কাছে মেকি মনে হয়। সবই অভিনয়। পত্রলেখাকে দেখে সওদাগরপুত্র তাকে রাজকুমারের অভিপ্রায় জানতে বলে। রাজপুত্র এবং পত্রলেখার মধ্যে কথপোকথন হয় গানে

গানে : 'গোপন কথাটি রবে না গোপনে,/ উঠিল ফুটিয়া নীরব নয়নে -/ না না না, রবে না গোপনে।/ বিভল হাসিতে/ বাজিল বাঁশিতে,/ স্ফুরিল অধরে নিভৃত স্বপনে -/ না না না, রবে না গোপনে।'

রাজপুত্র জানায় তার গোপন কথাটি গোপনে রবে না। তার নয়নে ফুটে উঠবে। সেই গোপন কথা রয়েছে দূরের আকাশে। সে বসে থাকে সমুদ্রের ধারে পশ্চিম দিগন্তের দিক চেয়ে। সেইখানে তার অদৃষ্ট যক্ষের ধনের মতো গোপন করে রেখেছে যা, সে তারই সন্ধানে যাবে। রাজপুত্র তার গোপন কথা জানায় আরেকটি গানে : 'যাবই আমি যাবই, ওগো/ বাণিজ্যেতে যাবই।/ লক্ষ্মীরে হারাবই যদি/ অলক্ষ্মীরে পাবই।'

সওদাগর বলেন এ তো তার মন্ত্র। রাজপুত্র উত্তর দেয় : 'সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি/ বসিয়ে হাজার দাঁড়ি/ কোন পুরীতে যাব দিয়ে/ কোন সাগরে পাড়ি।/ কোন তারকা লক্ষ্য করি/ কূল কিনারা পরিহরি/ কোন দিকে যে বাইব তরী/ বিরাট কালো নীরে-/ মরব না আর ব্যর্থ আশায়/ সোনার বালুর তীরে।'

সে বাণিজ্যেতে যাবে কিন্তু দিকের ঠিক নেই। কোথায় যাবে তারও ঠিক নেই। সদাগর জানায় অকূলের নাবিকগিরি করে নিরুদ্দেশ কোন বাণিজ্যের রাস্তা নয়। কোন খবর পেয়েছে কিনা সেই প্রশ্নে রাজপুত্রের উত্তর, 'পেয়েছি বৈকি। পেয়েছি আভাসে, পেয়েছি স্বপ্নে' : 'নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ/ প্রবাল দিয়ে ঘেরা।/ শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে/ সাগর বিহঙ্গেরা।/ নারিকেলের শাখে শাখে/ ঝোড়ো হাওয়া কেবল ডাকে,/ ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে/ বইছে নগনদী।/ সাত রাজার ধন মানিক পাবই/ সেথা নামি যদি॥'

সওদাগর জানায় গানের সুরে বোঝা যাচ্ছে এ সওদাগরি মানিক নয়। রাজপুত্র জানায় সে নবীনের সন্ধানে যাচ্ছে : 'হে নবীনা, হে নবীনা।/ প্রতিদিনের পথের ধুলায় যায় না চিনা।/ শুনি বাণী ভাসে/ বসন্তবাতাসে,/ প্রথম জাগরণে দেখি সোনার মেঘে লীনা।'

রানীমা প্রবেশ করলে তাকে জানানো হয় রাজপুত্র মরীচিকাকে জাল ফেলে ধরবেন, রূপকথার দেশের সন্ধান পেতে চান। রাজপুত্র জানায় সে রাজপ্রাসাদের পরিবেশে হাঁপিয়ে উঠেছে। রানীমা বলেন, পাওয়া জিনিসে রাজকুমারের বিতৃষ্ণা জন্মেছে, চাইবার সুযোগ তার কখনো হয়নি। না পাবার আগেই পেয়ে গেছে সবকিছু। রাজপুত্র গানে জানায় : 'আমার মন বলে, 'চাই চাই গো/ যারে নাহি পাই গো।'

রানী আর আটকাতে চান না যুবরাজকে। তিনি বলেন তোমাকে রাখতে গেলেই হারাব। আরামের বোঝা আর সেবার বন্ধন তার উপর বোঝা। তাকে আর বাঁধা দেবে না যেতে। ললাটে

শ্বেতচন্দনের তিলক, শ্বেত উষ্ণীষে শ্বেতকরবীর গুচ্ছ পরাবে। সন্ধ্যার সময় আরতির কাজল পরাবে চোখ যাতে পথে দৃষ্টির বাধা কেটে যায়। রানীমা তাকে সাজিয়ে দেবে। তিনি প্রস্থান করলে রাজপুত্র গান গেয়ে জানায় : 'হেরো, সাগর উঠে তরঙ্গিয়া/ বাতাস বহে বেগে।/ সূর্য যেথায় অস্তে নামে/ ঝিলিক মারে মেঘে।/ দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই,/ ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই,/ যদি কোথাও কূল নাহি পাই/ তল পাব তো তবু।/ ভিটার কোণে হতাশ মনে/ রইব না আর কভু।/ অকূল-মাঝে ভাসিয়ে তরী/যাচ্ছি অজানায়।/ আমি শুধু একলা নেয়ে/ আমার শূন্য নায়।'

সওদাগর পুত্রকে নিয়ে সে নিরুদ্দেশের পথে নৌকা ভাসিয়ে দেয়। তরী সাগরের মাঝখানে ডুবে যাওয়ায় তারা এক নতুন ডাঙায় ভেসে আসে। রাজপুত্র নতুনের সন্ধানে খুশি কিন্তু সওদাগরের মন অস্থির, নতুনকে তার ভয়, পুরানোতেই আরাম। রাজপুত্র জানায় যমরাজ রাজতিলক মহাসমুদ্রের জলে মুছে দিয়ে হুকুম করেছেন, নতুন রাজ্য নতুন শক্তিতে জয় করে নিতে হবে। নতুন দেশে তাই তারা গান ধরে :'এলেম নতুন দেশে/তলায় গেল ভগ্ন তরী, কূলে এলেম ভেসে।/ অচিন মনের ভাষা/শোনাবে অপূর্ব কোন আশা,/ বোনাবে রঙিন সুতোয় দুঃখসুখের জাল,/ বাজবে প্রাণে নতুন গানের তাল,/ নতুন বেদনায় ফিরব কেঁদে হেসে।/ নাম না জানা প্রিয়া/ নাম-না-জানা ফুলের মালা নিয়া/ হিয়ায় দেবে হিয়া।/ যৌবনেরি নবোচ্ছ্বাসে/ ফাগুনমাসে/ বাজবে নূপুর ঘাসে ঘাসে, মাতবে দক্ষিণবায়/ মঞ্জরিত লবঙ্গলতায়/ চঞ্চলিত এলোকেশে॥'

রাজকুমার নতুন দেশে এসে খুশি। অচিন ভাষা শুনতে পাবে, নতুন কোন আশার সঞ্চার হবে, প্রাণে নতুন গানের তাল বাজবে, নতুন বেদনা, নাম না জানা নতুন প্রিয়া হিয়ায় দেবে হিয়া নাম না জানা ফুলের মালা দিয়ে। কিন্তু সওদাগরের কাছে এই দেশ যৌবনের নবীন রূপ মনে হচ্ছে না। চারদিক ঘুরে এসে মনে হচ্ছে এ যেন ছুতোরের তৈরি কাঠের কুঞ্জবন। তার ভাষায়, 'দেখলুম, ওরা চৌকো চৌকো কেঠো চালে চলেছে, বুকে পিঠে চ্যাপটা, পা ফেলছে খিটখুট খিটখুট শব্দে, বোধ করি চৌকুনি নূপুর পরেছে পায়ে, তৈরি সেটা তেঁতুল কাঠে। এই মরা দেশকে কি বলে নতুন দেশ।' রাজপুত্র জানায় এর থেকেই বোঝা যায় এটা বানানো, উপর থেকে চাপানো, এদের দেশের প-িতদের হাতে গড়া খোলস। সে এসেছে এই খোলস খসিয়ে দিতে, ভিতর থেকে কাঁচা রূপ বের করে আশ্চর্য করে দেবে। কিন্তু সওদাগরের ভাষ্য, এই ছাইয়ের থেকে আগুন বের হবে না। ফুঁ দিতে দিতে দম শেষ হয়ে যাবে। এরই মধ্যে গান গেয়ে তাসের

দলের প্রবেশ : 'তোলন নামন,/ পিছন সামন,/ বাঁয়ে ডাইনে/ চাই নে চাই নে,/ বোসন ওঠন,/ ছড়ান গুটন,/ উলটো-পালটা/ ঘূর্ণি চালটা-/ বাস বাস বাস ।'

ছক্কা ও পঞ্জার সাথে তাদের কথা হয় । সওদাগরের হাসি শুনে তারা রেগে ওঠে । জানায় এই তাসের দেশ নিয়মের দেশ । তাসবংশের আদিকবি ভগবান তাসরঙ্গনিধি দিনের চারপ্রহর ঘুমিয়ে স্বপ্নের ঘোরে প্রথম যে ছন্দ বানালেন সেই ছন্দের মাত্রা গুনে গুনে তাদের সাড়ে-সাঁইত্রিশ রকমের পদ্ধতির উদ্ভব । একটি নিয়ম রাজকুমার জানতে চাইলে পঞ্জা মুখ ফেরাতে বলে এবং ছক্কাকে ঠুং মন্ত্র পড়ে একটা ফুঁ দিয়ে দিতে বলে । তাসের দল গান ধরে : 'হা-আ-আ-আই/ হাতে কাজ নাই ।/ দিন যায় দিন যায় ।/ আয় আয় আয় আয় ।/ হাতে কাজ নাই॥'

রাজকুমার মুখ ফিরিয়ে দেয়ায় পঞ্জা বলে ওঠে, মন্ত্র ভেঙে অশুচি করে দিল । এখন এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে । পাড়ির উপর তারা কি করছিল জানতে চাইলে তারা জানায়, যুদ্ধ করছিল অতি বিশুদ্ধ নিয়মে তাসবংশোচিত আচার-অনুসারে । গানে জানায় : 'আমরা চিত্র, অতি বিচিত্র,/ অতি বিশুদ্ধ, অতি পবিত্র ।/ আমাদরে যুদ্ধ-/ নহে কেহ ক্রুদ্ধ,/ ওই দেখো গোলাম/ অতিশয় মোলাম ।/ নাহি কোরো অস্ত্র,/ খাকি-রাঙা বস্ত্র ।/ নাহি লোভ,/ নাহি ক্ষোভ,/ নাহি লাফ,/ নাহি ঝাঁপ ।/ যথারীতি জানি,/ সেইমতে মানি,/ কে তোমার শত্রু, কে তোমার মিত্র,/ কে তোমার টক্কা, কে তোমার ফক্কা ।'

রাজকুমারদের উৎপত্তির কথা জানতে চাইলে জানায় : 'আমরা নূতন যৌবনেরই দূত,/ আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত ।/ আমরা বেড়া ভাঙি,/ আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি,/ ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই,/ আমরা বিদ্যুৎ ।/আমরা করি ভুল ।/ অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে/ যুঝিয়ে পাই কূল ।/ যেখানে ডাক পড়ে/ জীবন-মরণ-ঝড়ে/ আমরা প্রস্তুত॥'

ছক্কা-পঞ্জা জানায় এ চলবে না, তারা নিয়ম ভাঙতে পারে না । রাজপুত্র জানায় বেড়ার নিয়ম ভাঙলেই পথের নিয়ম আপনিই বেরিয়ে পড়ে, নইলে এগুনো যাবে না । কিন্তু ছক্কাদের কথা চলতে পারবে না । শুধু নিয়ম চলবে । নিয়মের গান : 'চলো নিয়ম মতে ।/ দূরে তাকিয়ো নাকো,/ ঘাড় বাঁকিয়ো নাকো,/ চলো সমান পথে ।'

রাজপুত্র জানায় : 'হেরো অরণ্য ওই,/ হোথা শৃঙ্খলা কই,/ পাগল ঝরনাগুলো/ দক্ষিণ পবর্তে ।' তাসের দলের উত্তর : 'ওদিক চেয়ো না চেয়ো না,/ যেয়ো না যেয়ো না -/ চল সমান পথে ।'

তারা কোনভাবেই নিয়মের বাইরে যাবে না। এখানে সভা হবে, রাজাসাহেব ও রানীবিবি আসছেন। নিয়ম মতে ভুঁইকুমড়োর ডাল নিয়ে ঈশান কোণে মুখ ফিরিয়ে বসতে হবে। রাজপুত্র স্তব গান গায় : 'জয় জয় তাসবংশ-অবতংস,/ তন্দ্রতীর নিবাসী,/ সব অবকাশ ধ্বংস।'

যদিও গানটিতে তাদের নিয়মমতে সভা ভেঙে গেল কিন্তু রাজা জানান যেহেতু তারা বিদেশি তাই নিয়ম তাদের বেলায় খাটে না। একবার ঠাঁই বদল করে দোষ কাটিয়ে তাসসভার জাতীয় সংগীত গাইতে বলে। সকলে গেয়ে ওঠে : 'চিঁড়েতন, হর্তন, ইস্কাবন-/ অতি সনাতন ছন্দে/করতেছে নর্তন/ চিঁড়েতন হর্তন।/ কেউ-বা ওঠে কেউ পড়ে,/ কেউ-বা একটু নাহি নড়ে,/ কেউ শুয়ে শুয়ে ভুঁয়ে/ করে কালকর্তন।'

গান শেষে রাজপুত্র রাজার জিজ্ঞাসায় তার পরিচয়ে জানায় সে সমুদ্রপারের দূত এবং ভেট হিসেবে এনেছে উৎপাত। সে আগাতে চায়। দুদিনে এখানকার হাওয়া বদল করে দিতে পারে বলে ছক্কা জানালে রাজা, ছক্কা, গোলাম কেউই এই হাওয়া বদলে রাজি নয়। তারা কোন অনিয়ম হতে দেবে না। রাজপুত্রের কোন আবেদন আছে নাকি জানতে চাইলে সে জানায় তার আবেদন রাজকুমারীদের কাছে। অনুমতি নিয়ে গেয়ে ওঠে : 'ওগো, শান্ত পাষাণমুরতি সুন্দরী,/ চঞ্চলেরে হৃদয়তলে লও বরি।/ কুঞ্জবনে এসো একা,/ নয়নে অশ্রু দিক দেখা,/ অরুণরাগে হোক রঞ্জিত/ বিকশিত বেদনার মঞ্জরী॥'

রানী গান শুনে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। রাজা নির্বাসন দিতে চাইলে তিনি অমত করেন। টেক্কাকুমারীরাও না করে। গান শুনে রানীর যেন কেমন বোধ হচ্ছে। গোলাম ভয় দেখালেও তিনি ভীত হন না। রাজা সেখানে নিরাপদ অনুভূত না করায় স্থান ত্যাগ করেন। রাজপুত্র এর ভিতরেই প্রাণের সঞ্চার অনুভব করেন এবং সওদাগরকে জানালে তিনিও দেখতে পান সমুদ্রপারের মন্ত্র লেগেছে। তৃতীয় দৃশ্যে প্রসাধনরত ইস্কাবনী, টেক্কানী প্রবেশ করে গান ধরে : 'বলো, সখী বলো তারি নাম/ আমার কানে কানে/ যে নাম বাজে তোমার বীণার তানে তানে।/ বসন্তবাতাসে বনবীথিকায়/ সে-নাম মিলে যাবে,/ বিরহী বিহঙ্গ-কলগীতিকায়/ সে-নাম মদির হবে-যে বকুলঘ্রাণে।'

ইস্কাবনী জানায় তাসের দেশে একি হলো। বিদেশিরা কি খ্যাপামির হাওয়া নিয়ে আসলো, মন যে কেবলই টলোমলো করছে। টেক্কানীও জানাচ্ছে দুদিন আগে কে জানতো তাসেরা তাদের আপন জাত খুঁইয়ে মানুষের মতন চলাফেরা করবে। তাসের দেশে মেয়ে মহলে পরিবর্তনের

হাওয়া লেগেছে। হরতনী ঠিক যেন মানুষের মতন দাঁড়ায়, চিঁড়েতনীর গাল টুকটুক করছে রঙে রঙিন হয়ে। টেক্কানী সখীকে নিয়ে বকুলতলায় বসে দিনরাত কানে কানে ফিসফিস করছে যেসব কিনা সাতজন্মের তাসের দেশের শাস্ত্রে লেখো ছিল না। গোলাম বেচারা হায় হায় করছে।
চতুর্থ দৃশ্যে হরতনী টেক্কার প্রবেশ। হরতনী গান গাইছে : 'আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে,/ জানি নে কী ছিল মনে।/ এ তো ফুল তোলা নয়, এ তো ফুল তোলা নয়,/ বুঝি নে কী মনে হয়,/ জল ভরে যায় দু নয়নে॥'

হরতনী বনে এসেছে, রুইতনের সাহেব তাকে খুঁজতে বের হয়ে বনে দেখে অবাক। তাকে জানায় রাজসভার গরাবুম-ল ডাকছে। হরতনী জানায় সে হারিয়ে গেছে। রুইতন তাকে জিজ্ঞেস করে, সে এই বনে কেন, এখানে আসা মানা, নিয়ম নেই। হরতনী জানায় 'নিয়ম তো নেই, কিন্তু কার নিয়মে বর্ষাবিহীন তাসের দেশে আজ এমন ঘনঘটা? সকালে উঠেই দেখি, নীল মেঘ আকাশ জুড়ে। এতদিন তোমার দেশের ময়ূর পা গুনে গুনে পা ফেলত, নাচত সাবধানে, আজ কেন এমন অনিয়মের নাচ নাচল, সমস্ত পেখম ছড়িয়ে দিয়ে।' রুইতন জানায় ঘর হতে যার আঙিনা বিদেশ, সেও আজ ফুল তুলতে বেরিয়েছে, এত বড়ো অদ্ভুত কাজ তার মাথায় আসলো কি করে।' হরতনী বলে হঠাৎ তার মনে হয়েছে আর জন্মে সে মালিনী ছিল, ফুল তুলতো। আজ পুবের হাওয়াতে সেই জন্মের ফুলের গন্ধ এলো। সেই জন্মের মাধবীবন থেকে ভ্রমর এসেছে মনের মধ্যে। গান গেয়ে ওঠে : 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।/আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।/ আলোতে কোন গগনে মাধবী জাগল বনে,/ এল সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে।/ সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে।/ কেমনে রহি ঘরে মন যে কেমন করে,/ কেমনে কাটে যে দিন দিন গুনিয়ে।/ কী মায়া দেয় বুলায়ে দিল সব কাজ ভুলায়ে,/ বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে॥'

অসাধারণ একটি রবীন্দ্র সংগীত। একটি চমৎকার প্রেমসংগীত। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যাচ্ছে যে, হরতনীর মন পরিবর্তিত হয়েছে। তার মন কেমন অস্থির হয়ে আছে, ঘরে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না। তার মানসিক পরিস্থিতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে গানটির মধ্যে। বিবিসুন্দরীদের খোঁজ করলে হরতনী জানায় তারাও এইখানে নদীর ধারে ধারে গাছের তলায় তলায় সাজ পরিবর্তন করছে। ছক্কা পঞ্জা শাসাতে এসে খ্যাপার মতন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনকি গুনগুন সুরে বেসুরে গান গাচ্ছে। রুইতন যতই শুনছে, ততই অবাক হচ্ছে ভেবে যে এই বিদ্যে কে

শেখালো। তারা চলে গেলে বিবিরা প্রবেশ করে। নেচে নেচে গায় : 'অজানা সুর কে দিয়ে যায় কানে কানে,/ ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে।/ বিস্মৃত জন্মের ছায়ালোকে/ হারিয়ে-যাওয়া বীণার শোকে/ কেঁদে ফিরে পথহারা রাগিণী।/ কোন বসন্তের মিলনরাতে তারার পানে/ ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে॥'

হরতনী যেমন মনে করছে সে আর জন্মে মালিনী ছিল তেমনি বিবিদেরও কানে কে যেন অজানা সুর দিয়ে যায়। তাদের ভাবনা গানে গানে ভেসে যাচ্ছে কোন বসন্তের মিলনরাতে তারার পানে। রুইতন জানায় গান শুনে তারও গাইতে ইচ্ছা হচ্ছে। হরতনী সাবধান করে দেয়, সম্পাদক যেন শুনতে না পায়, পেলে স্তম্ভে চড়াবে। বনের খবর নেয়ার জন্য সে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রুইতন জানায় তার ভয় ঘুচে গেছে। হুকুম করলে সে দুঃসাধ্য কিছু একটা করে ফেলতে পারে। হরতনী জানায় গান বন্ধ করে তার জন্য জবা তুলে আনতে, সে ফুলের রসে পায়ের তলা রাঙাবে। রুইতন আবার গেয়ে ওঠে : 'তোমার পায়ের তলায় যেন গো রঙ লাগে,/ আমার মনের বনের ফুলের রাঙা রাগে।/ যেন আমার গানের তানে/ তোমায় ভূষণ পরাই কানে,/ যেন রক্তমণির হার গেঁথে দিই প্রাণের অনুরাগে॥'

হরতনী গান শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, এই গান কবে বেঁধেছে, তার জন্যই নাকি? রুইতন জানায় যেমন করে সে বেণী বাঁধল, তেমনভাবেই বেঁধেছে। হরতনীর মনে হচ্ছে কোন এক যুগে সে তার গানে নেচেছিল। রুইতনও উত্তর দেয় তারও মনে আসছে কিন্তু এতদিন কী করে ভুলে ছিল তাই ভাবছে। গেয়ে ওঠে : 'উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে।/ দোলা লাগে, দোলা লাগে/ তোমার চঞ্চল ওই নাচের লহরীতে/ যদি কাটে রসি,/ যদি হাল পড়ে খসি,/ যদি ঢেউ উঠে উচ্ছ্বসি,/ সম্মুখেতে মরণ যদি জাগে,/ করি নে ভয়, নেবই তারে নেবই তারে জিতে।'

রুইতনের মন ছটফট করছে যমরাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে। চোখের সামনে সে দেখতে পাচ্ছে যে হরতনী তার কপালে জয়তিলক পরাচ্ছে এবং রুইতন বেরোচ্ছে বন্দিনীকে উদ্ধার করতে, বন্ধ দুর্গের দ্বারে ভেরী বাজিয়ে। কানে আসছে বিদায়কালে যে গান হরতনী গেয়েছিল : 'বিজয়মালা এনো আমার লাগি।/ দীর্ঘ রাত্রি রইব আমি জাগি।/ চরণ যখন পড়বে তোমার মরণকূলে/ বুকের মধ্যে উঠবে আমার পরান দুলে,/ সব যদি যায় হব তোমার সর্বনাশের ভাগী॥'

হরতনী রুইতনকে বলে, চলো বীর বেরিয়ে পড়ি। এখানে কেন আছি? অর্থহীন দিন, প্রাণহীন

রাত্রি। ব্যর্থতার আবর্তন মুহূর্তে মুহূর্তে। রুইতন জানায় সাহস আছে তার। অজানাকে ভয় করবে না। হরতনী বলে, ভাঙতে হবে এই অলসের বেড়া, এই নির্জীবের গন্ডি। ঠেলে ফেলতে হবে এই-সব নিরর্থকের আবর্জনা। ছক্কা পঞ্জার প্রবেশ। তারা লজ্জিত, এতদিনের পরে তাদের মনে হচ্ছে এসব অর্থহীন। দহলা পন্ডিতকে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করে, এতকাল যে এসব ওঠাপড়া-শোওয়াবসার কোটকেনা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল, তার অর্থ কী? দহলা তাদেরকে ভয় দেখালেও তারা মানতে রাজি নয়, শান্তিভঙ্গ করার পণ করেছে তারা। হরতনী প্রবেশ করলে দহলা অনুযোগ করে ছক্কা পঞ্জার নামে। কিন্তু হরতনী জানায়, 'আমাদের শান্তিটা বুড়ো গাছের মতো। পোকা লেগেছে ভিতরে ভিতরে, সেটা নির্জীব, তাকে কেটে ফেলা চাই।' দহলা এ কথায় ছি ছি করে উঠে বলে, তুমি নারী, তুমি শান্তি রক্ষা করবে, আমরা পুরুষ, রক্ষা করব কৃষ্টি। কিন্তু হরতনী জানায় অনেকদিন তাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে পন্ডিত, আর নয়। তাদের শান্তিরসে হিম হয়ে গেছে রক্ত, আর ভুলবে না। দহলা তাসের দেশ ভেঙে যাওয়ার অশঙ্কায় তাড়াতাড়ি প্রস্থান করে। হরতনীর কাছে ছক্ক-পঞ্জা পথের নির্দেশ চায়। অশান্তির মন্ত্র চেয়ে সকলে বেরিয়ে পড়ে।

ইস্কানী ও টেক্কানীকে ফুল তুলতে দেখে দহলানী ব্যঙ্গ করে ওঠে, 'মরে যাই। কী ছিরি করেছ! মানুষ সেজেছ বুঝি? লজ্জা নেই?' উত্তরে তারা জানায় দৈবাৎ সাজ খসে গেছে একটা হাওয়ায়। প্রথমে রাগারাগি করলেও একসময় দহলানী জানায় সেও রাতে স্বপ্নে দেখেছে সে মানুষ হয়ে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। তারা আলাপ অলোচনাকালে জানায় এ তো দেখি পবনদেবের উল্টোপাল্টা খেলা। তাসীরা হতে চায় রঙ খসিয়ে মানুষ আর মানুষ রঙ মেখে তাসী হতে চায়। কিন্তু তাদের ভয় মানুষের অনেক দুঃখ। টেক্কানী জানায় দুঃখের নেশা ছাড়তে চায় না। থেকে থেকে চোখ জলে ভেসে যায়, কেন ভেবে পায় না। গান ধরে : 'কেন নয়ন আপনি যে ভেসে যায়,/ মন কেন এমন করে -/ যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে,/ মনে পড়ে না গো তবু মনে পড়ে।'

সম্পাদককে আসতে দেখে সকলে পালিয়ে যায়। রাজাসাহেব প্রবেশ করেন। রাজার মাঝেও পরিবর্তন এসেছে। আকাশে কথা শুনতে পাচ্ছে, ফুলের গন্ধ আসছে, বাতাসে সুর উঠছে। অনেক কষ্টে মনকে শান্ত রেখেছেন। রানীবিবিকে ঘরে রাখা শক্ত হয়ে গেছে, তিনি নেচে বেড়াচ্ছেন ভূতে পাওয়ার মতন। সভ্যগণের চেনা যাচ্ছে না। সভার সাজ নেই। সকলে জানালো তাদের দোষ নেই। আপনা আপনি সাজ ঢিলে হয়ে খুলে পড়ে গেছে রাস্তায়। গোলামও জানায়

আজ সম্পাদকীয়র স্তম্ভ ভরাতে গিয়ে দেখে কবিতা বের হচ্ছে লেখনীতে। পঞ্জা রাজপুত্রকে জিজ্ঞেস করে, সমুদ্রপারের ছন্দ তাদের কানে দিতে পারবে কিনা? রাজপুত্র সম্মতি জানিয়ে গান ধরে : ‘গগনে গগনে যায় হাঁকি/ বিদ্যুৎবাণী বজ্রবাহিনী বৈশাখী,/ স্পর্ধাবেগের ছন্দ জাগায়/ বনস্পতির শাখাতে ।/ শূন্যমদের নেশায় মাতাল ধায় পাখি,/ অচিন পথের ছন্দ উড়ায়/ মুক্ত বেগের পাখাতে ।’

রাজা তাসের দলকে জিজ্ঞেস করেন কিছু বুঝতে পেরেছে কিনা। বুঝতে না পারলেও তাদের মন মেতে উঠেছে বলে তারা জানায়। রাজা বলেন, সেটা তো ভালো নয়। বিদেশিকে জিজ্ঞেস করেন, তারা তাসদ্বীপময় অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছে, জলে ডুব দিচ্ছে, পাহাড়ের মাথায় চড়ছে, কুড়ুল হাতে বনে পথ কাটছে– এসব কেন? রাজপুত্র পাল্টা প্রশ্ন করে, রাজাসাহেব তোমরা যে কেবলই উঠছ, বসছ, পাশ ফিরছ, পিঠ ফেরাচ্ছ, গড়াচ্ছ মাটিতে– সেইবা কেন? রাজা উত্তর দেয় সে তাদের নিয়ম। রাজপুত্র জানায় ওটা তাদের ইচ্ছে। ইচ্ছে শুনে রাজা ভাবে এতো সর্বনাশ, এই তাসের দেশে ইচ্ছে! সবাইকে জিজ্ঞেস করলে ছক্কা-পঞ্জা জানায় তারা এই ইচ্ছে মন্ত্র নিয়েছে। গেয়ে শোনায় : ‘ইচ্ছে/ সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে,/ সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে ।/ সেই তো আঘাত করছে তালায়,/ সেই তো বাঁধন ছিঁড়ে পালায়/ বাঁধন পরতে সেই তো আবার ফিরছে॥’

সকলেই বিচলিত। রানী বনবাসে যেতে রাজি, এমনকি নির্বাসনেও। সবাই নির্বাসনে যেতে রাজি, তবু এই নিয়মের রাজ্যে আর নয়। রাজাও শেষ পর্যন্ত রাজপুত্রের কাছে জানতে চায় তারা মানুষ হতে পারবে কি না। রাজপুত্র জানায় নিশ্চয়ই। রাজাও পারবেন কারণ রানী আছেন তার সাথে। সকলে মিলে গান করে : ‘বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও,/ বাঁধ ভেঙে দাও ।/ বন্দী প্রাণমন হোক উধাও ।/ শুকনো গাঙে আসুক/ জীবনের বন্যার-উদ্দাম কৌতুক;/ ভাঙনের জয়গান গাও ।/ জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক,/ যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক ।/ আমরা শুনেছি ওই/ ‘মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ’/কোন নূতনেরই ডাক ।/ ভয় করি না অজানারে,/ রুদ্ধ তাহারি দ্বারে/ দুর্দাড় বেগে ধাও॥’

নাটকের শুরুও গানে, শেষও গানে। গানের মাধ্যমেই নাটকের পরিবেশ, নাটকের পাত্রপাত্রীর মনোভাব, ঘটনার পরিবর্তন সবই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাই গানই এই নাটকের প্রাণ বললে ভুল হবে না। নাটকের মূল ভাবের সাথে অনেকটা ‘অচলায়তন’র মিল রয়েছে। সেখানেও কঠোর

নিয়ম থাকলেও এক সময় পরিবর্তনের হাওয়া এসে লাগে। নিয়ম শাসিত সমাজ, গতানুগতিক প্রথার অনুশাসন ভেঙে যায় পরিবর্তনের ছোঁয়ায়, যৌবনের আনন্দময়, ভয়হীন সজীব প্রাণশক্তির জোরে। নাটকের যেই মূল বক্তব্য সেটি ফুটে উঠেছে গানে সংলাপের অনুসরণে।

রবীন্দ্রনাথ নাটকটি রচনা করার সময় যে গানগুলো লিখেছেন, দেখা যায় প্রতিবারই মহড়া বা অভিনয়ের সময় হয় কিছু বাদ দিচ্ছেন নয়তো বা নতুন গান সংযোজন করছেন। নাটকটি প্রথম রচনার সময় মোট দুটি দৃশ্যে ভাগ করেছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের সময় তিনি এটিকে চার দৃশ্যের নাটকে পরিণত করেন। তাসের দেশ নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণে আমুল পরিবর্তন করা হয় গান সংযোজনে। প্রথম সংস্করণে গান ছিল ২২টি। দ্বিতীয় সংস্করণে ৪টি গান বাদ দেয়া হয় এবং ৮টি গান যুক্ত হয়।

প্রথম সংস্করণে ভূমিকা ছাড়া ২টি দৃশ্য ছিল, অন্যদিকে দ্বিতীয় সংস্করণ ৪টি দৃশ্যে বিন্যস্ত করা হয়। 'খরবায়ু বয় বেগে' গানটি নাটকের ভেতর থেকে ভূমিকায় চলে আসে। 'আমার মন বলে চাই চাই গো' গানটির পাঠান্তর ছিল 'তোমার মন বলে চাই চাই গো'। প্রতিমা দেবীকে লেখা চিঠিপত্রের মাধ্যমে জানা যায় পূর্বরচিত 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা' গানটি বোম্বাইতে অভিনয়কালে নাটকটিকে অবাঙালি দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় করতে নাচের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছিল। এ গানটি পূর্বে তাগাগাকির জুজুৎসু ও জুডোর প্রদর্শনীতে ব্যবহার করা হয়েছিল। গানটি জুডোর সঙ্গে ব্যবহৃত হওয়ায় প্রাথমিক ব্যায়ামের ভঙ্গির প্রভাব নাটকটিতে দেখা যায়।

'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থের 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' কবিতাটিকে কিছুটা পরিবর্তন করে সংগীতরূপে রাজকুমারের কণ্ঠে দেয়া হয়। কবিতার প্রথম দশ লাইন বাদ দিয়ে 'যাবই আমি যাবই ওগো' থেকে গানটি রচনা করা হয়। যেমন :

কাব্য	গান
তোমায় যদি না পাই তবু	লক্ষ্মীরে হারাবই যদি
আর কারে তো পাবই	অলক্ষ্মীরে পাবই।
কোন নগরে যাব দিয়ে	কোন পুরীতে যাব দিয়ে
অকূল কালো নীরে	বিরাট কালো নীরে
বালু মরুর তীরে	সোনার বালুর তীরে
সোনার রেণু আনব ভরি	সাত-রাজাধন মানিক পাবই

সেথায় নামি যদি	সেথায় নামি যদি
সাগরে উঠে তরঙ্গিয়া	হেরো সাগর উঠে তরঙ্গিয়া
ভিখারি তোর ফিরবে যখন।	ভিখারি মন ফিরবে যখন।

নাটকের প্রয়োজনে কথার কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। এছাড়াও 'অবিনয়' কবিতাটির পাঁচটি স্তবকের চারটি 'হে নিরুপমা' গানটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। এ বিষয়ে শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন : "'তাসের দেশ' অভিনয়ের সময়ে (১৩৪০) এই কবিতার 'প্রথম তিন কলিতে গুরুদেব সুর যোজনা করেছিলেন, রাজপুত্রের গান হিসেবে। চতুর্থ কলিতে সুর দিলেন পরে, দ্বিতীয়বারে বম্বেতে অভিনয়ের সময়।"[৯৬]

তাসের রাজদরবারের দৃশ্যে রাজা, রানী, তাসকুমারী ও অন্যান্য সভাসদ মঞ্চে প্রবেশ করতেন যন্ত্রসংগীতের ঢিমালয়ের ছন্দে কিন্তু প্রস্থানের সময় বাজনার লয় একটু দ্রুত হতো। সকলেই সেই লয়ে এক নিয়মে কুচকাওয়াজের পদ্ধতিতে মঞ্চ থেকে দ্রুত প্রস্থান করতেন। ১৯২৭ সালে জাভা দ্বীপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুখোশ পরা এক ধরনের অভিনয় দেখেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি জানান:

> "সেই সন্ধ্যাবেলাতেই রাজবাড়িতে আর-একটি ব্যাপার দেখলুম, মুকোশপরা নটেদের অভিনয়। আমরা জাপান থেকে যে-সব মুখোশ এনেছিলুম তার থেকে বেশ বোঝা যায় মুখোশ তৈরি এক প্রকারের বিশেষ কলাবিদ্যা।...সাধারণত, অভিনেতা ভাব অনুসারে অঙ্গভঙ্গি করে। কিন্তু মুখোশে মুখের ভঙ্গি স্থির করে বেঁধে দিয়েছে। এইজন্যে অভিনেতার কাজ হচ্ছে মুখোশের সামঞ্জস্য রেখে অঙ্গভঙ্গি করা। মূল ধুয়োটা তার বাঁধা; এমন করে তান দিতে হবে যাতে প্রত্যেক সুরে সেই ধুয়োটার ব্যাখ্যা হয়, কিচ্ছু অসংগত না হয়। এই অভিনয়ে তাই দেখলুম।"[৯৭]

এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি তাসের দেশ নাটকটি রচনা করেন। নাটকটি মুখোশ নৃত্যের উপোযোগী এবং গানগুলোও এমনভাবে সুরারোপ করা যে ভাববিকারহীন মুখোশ-ধারণকারী অভিনেতাদের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গ সঞ্চালনে অভিনয় করা সম্ভবপর। গানের পর্যায়ের মধ্যে বিচিত্র, প্রেম, নাট্যগীতি ও বসন্ত ঋতুর গান রয়েছে।

৫. চন্ডালিকা (১৯৩৩)

নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যের শার্দূল কর্ণবদানের ঘটনা থেকে রবীন্দ্রনাথ 'চন্ডালিকা' নাটকটির মূলভাব

গ্রহণ করেন। এই গদ্যনাটকটির ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> “রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দূল কর্ণবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাই থেকে এই নাটকটির গল্প গৃহীত। গল্পের ঘটনাস্থল শ্রাবন্তী। প্রভু বুদ্ধ তখন অনাথ পি-দের উদ্যানে প্রবাস যাপন করছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ একদিন এক গৃহস্থের বাড়িতে আহার শেষ করে বিহারে ফেরবার সময় তৃষ্ণা বোধ করলেন। দেখতে পেলেন এক চ-ালের কন্যা, নাম প্রকৃতি, কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছ থেকে জল চাইলেন, সে দিল। তাঁর রূপ দেখে মেয়েটি মুগ্ধ হলো। তাঁকে পাবার অন্য কোন উপায় না দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইলে। মা তার যাদুবিদ্যা জানত। মা অঙিনায় গোবর লেপে একটি বেদী প্রস্তুত করে সেখানে আগুন জ্বালল এবং মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে একে একে ১০৮টি অর্ক ফুল সেই আগুনে ফেলল। আনন্দ এই যাদু শক্তি রোধ করতে পারলেন না। রাত্রে তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তাঁর জন্য বিছানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তখন পরিতাপ উপস্থিত হোলো। পরিত্রাণের জন্য ভবগানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁর আলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধমন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চ-ালীর বশীকরণ-বিদ্যা দুর্বল হয়ে গেল এবং আনন্দ মাঠে ফিরে এলেন।”[৯৮]

এই মূল কথাকে কিছুটা পরিবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ নাটকে ব্যবহার করেছেন। বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দের কুহকজালমুক্ত হয়ে ফিরে আসার কথাটি নাটকে নেই। চন্ডালজাতি অস্পৃশ্য– সমাজের একদম নিম্নস্তরে তাদের স্থান। আনন্দ প্রকৃতির কাছে পানি চাওয়ায়, চন্ডাল পরিচয়েও নিরস্ত না হওয়ায় চন্ডালকন্যা প্রকৃতির জীবনে এক যুগান্তর নিয়ে আসে। সে অবিলম্বে আনন্দকে পেতে চায়। কারণ সে তাকে এ মর্যাদা দিয়েছে। চন্ডালিকার অনুরোধে তার মা জাদুমন্ত্রে আনন্দকে নিয়ে আসলেও চন্ডালিকা আনন্দের পরাজিত চেহারা দেখে অনুতপ্ত হয় এবং এই বোধ জাগ্রতকারী দেবতার পায়ে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য। তাঁর সেবা করার অধিকারের জন্য নিজেকে তাঁর পায়ে সমর্পণ করে।

নাটকটির সবগুলো গান প্রকৃতির কণ্ঠে। বলা যায় তার মনের বিভিন্ন ভাব ও ঘটনার বর্ণনাই প্রকাশিত হয়েছে গানের মাধ্যমে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, প্রেম, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য পর্যায়ের গান রয়েছে।

৬. শ্রাবণগাথা (১৯৩৪)

শ্রাবণগাথা শান্তিনিকেতনে ওই বছরের ২৬ ও ২৭ শ্রাবণ নাচ ও গানের সাথে প্রথম অভিনীত হয়। নাটকটি পূর্বরচিত 'বসন্ত' বা 'নবীন'-এর ঢঙের। শান্তিদেব ঘোষ এর বিবরণে লিখেছেন :

> "১৯৩৪-এর বর্ষামঙ্গলে গুরুদেব 'শ্রাবণগাথা' নামে একটি অনুষ্ঠান করালেন সিংহসদনে, ১১ই ও ১২ই আগষ্টে। এটি গান ও কথাযুক্ত একটি নাটিকা। নটরাজ, রাজা ও সভাকবি নামে তিনটি চরিত্র আছে এতে। নটরাজ চরিত্রে ছিলেন গুরুদেব নিজে, রাজা হয়েছিলেন হেমেন্দ্রলাল রায়, আর সভাকবি ছিলেন বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। নাটিকাটি পূর্বরচিত বসন্ত বা নবীন-এর ঢং-এর। গান ছিল বাইশটি। নটরাজ, রাজা ও সভাকবি, অনুষ্ঠানের সময় মঞ্চের এক পাশে বসে গান ও নাচের নানারূপ ব্যাখ্যা কথোপকথনের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছিলেন। 'শ্রাবণগাথা' অনুষ্ঠান দেখবার জন্যে কলিকাতার সাংবাদিক ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পত্রযোগে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। অনেকেই এসেছিলেন গুরুদেবের অভিনয় দেখবার আগ্রহে। সিংহসদনে স্থান সংকুলানের অভাবের কথা চিন্তা করে প্রথম দিন শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনবাসীদের দেখানো হয়, দ্বিতীয় দিনে দেখানো হয়েছিল অভ্যাগত অতিথিদের।"[৯৯]

শ্রাবণগাথা-য় ২২টি গান ছাড়া দুটি ক্ষেত্রে নির্দেশ আছে নাচের। প্রথমটি ছিল মৃদঙ্গের বোলের নাচ (আড়া চৌতাল), নেচেছিলেন নন্দিতা (কবি কন্যা মীরার কন্যা) এবং দ্বিতীয়টি মণিপুরী মন্দিরা, নেচেছিলেন যমুনা (শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা, নন্দলাল বসুর কন্যা) ও নন্দিতা।

'তৃষ্ণার শান্তি, সুন্দর কান্তি' গানটি 'শ্রাবণগাথা'য় গাইবার কিছুদিন পরে ব্যবহৃত হয় নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদায়', 'শেষ বর্ষণে'ও রয়েছে। 'এসো নীপবনে ছায়াবিথীতলে', 'ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে', ' পথিক মেঘের দল জোটে ওই' ও 'ভেবেছিলেম আসবে ফিরে' গানগুলোও 'শেষ বর্ষণে' ব্যবহৃত হয়েছে। কিছু কিছু গানের বাণী পরিবর্তন করা হয়। যেমন 'শেষ বর্ষণ' নাটকের 'ওগো (ও) আষাঢ়ের পূর্ণিমা আমার' 'শ্রাবণগাথা'য় হয়েছে 'ওগো শ্রাবণের পূর্ণিমা আমার'। 'বজ্রে তোমার বাজে বাশিঁ' গানের 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত নাচাও যে ঝংকারে' 'শ্রাবণগাথা'য় হয়েছে 'সপ্তসিন্ধু দিক্-দিগন্ত জাগাও যে ঝংকারে'। প্রকৃতি বর্ষার গানই বেশি। ১টি করে শরৎ ও বসন্ত ঋতুর গান রয়েছে। সুরের মধ্যে রয়েছে বাউল ও কীর্তন সুরের গান।

৭. পরিশোধ (১৯৩৬)

১৯৩৬ সালে ১০-১১ অক্টোবর কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে নৃত্য-সহযোগে 'পরিশোধ' নাটকটি পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মুদ্রিত পুস্তিকার পরিচয়-সূচক ভূমিকায় বলা হয় :

"'কথা ও কাহিনী'-তে প্রকাশিত 'পরিশোধ' নামক পদ্যকাহিনীটিকে নৃত্যাভিনয় উপলক্ষ্যে নট্যীকৃত করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্তই সুরে বসানো। বলা বাহুল্য ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়া, অসম্ভব ব'লে কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্য।"[১০০]

নাটকটি অভিনীত হবার পর 'পরিশোধ' নাট্যগীতিটিকে নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'য় রূপান্তর করা হয়। এ জন্য 'পরিশোধ' নাট্যগীতিকে নৃত্যনাট্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই নাটকের গানগুলোর স্বরলিপি 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা' পত্রিকায় পাওয়া যায় যা ১৩৪৩-৪৪ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এর স্বরলিপিকার শান্তিদেব ঘোষ। শান্তিদেব ঘোষ জানান 'পরিশোধ' নাট্যগীতিতে ভারতনট্যম, মণিপুরী, কত্থক, কথাকলি ও সিংহলের ক্যান্ডী নাচকে চরিত্রনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছিল। যেমন ১৯৩৮ এর সেপ্টেম্বর মাসের ৩ এবং ৪ তারিখে সিংহসদন ও পুরাতন গ্রন্থাগারের বারান্দায় এই নাটকটি পর পর দুদিন অভিনীত হয়। চরিত্রানুযায়ী শিল্পিরা ছিলেন :

চরিত্র	শিল্পী
বজ্রসেন	মৃণালিনী
শ্যামা	নন্দিতা
উত্তীয়	আশা ওঝা
প্রহরী	কেলু নায়ার
কোটাল	অনঙ্গলাল
সখীগণ	মমতা, সুকৃতি, অনিতা, সেবা ও সুজাতা

মৃণালিনী শান্তিনিকেতনে ছাত্রী হিসেবে ভর্তির আগে ভারতনাট্যম শিখে এসেছিলেন, তাকে বজ্রসেনের গানের সাথে ভারতনট্যমের নৃত্যভঙ্গীতে অভিনয় করার জন্য তৈরি করা হয়। নন্দিতা ও শ্যামার নাচ তৈরি করা হয় মণিপুরী নৃত্যে। আশা ওঝা জয়পুর ঘরাণার কত্থক নৃত্যে পারদর্শী ছিলেন। তাই তাদের চরিত্রের গানগুলো খাঁটি কত্থক নাচের অভিনয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। কথাকলি নৃত্যে প্রহরীর অভিনয় করেন কেলু নায়ার এবং সিংহলবাসী ছাত্র অনঙ্গলাল ক্যান্ডী নাচের আঙ্গিকে কোটালের চরিত্রে অভিনয় করেন। সখীদের নাচে মণিপুরী নাচের প্রাধান্য ছিল।[১০১]

নাটকে কথার সাহায্যে যে বক্তব্য বিবৃত করা সম্ভব নয়, গান দিয়ে খুব সহজেই তাকে ব্যক্ত করা যায়। কথা যেখানে শেষ হয়, গানের আরম্ভ হয় সেখানে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "ছন্দে শব্দে বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যকে সঙ্গীতের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। যা কোনো মতে বলা যায় না,

সঙ্গীতই তা ব্যক্ত করে। কথার মধ্যে বেদনাবোধ এই সঙ্গীতই সঞ্চার করে দেয়।"[১০২]

৩১টি গানের ১৪টি গান গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য পর্যায়ের। এবং রয়েছে পূজা ও প্রেম পর্যায়ের গান।

৮. মুক্তির উপায় (১৯৩৮)

'মুক্তির উপায়' নাটকটিতে ফকির সবসময় গুরু নাম জপ করতে থাকে এবং বৃদ্ধ পিতা বিশ্বেশ্বরের পেনসনের টাকা দিয়ে সংসার চালায়। স্ত্রী হৈমবতী তার নিজের পিতার থেকে পাওয়া টাকা পয়সা দিয়ে স্বামীর সৌখিন খরচ মেটায়। কিন্তু এভাবে টাকা দিয়ে অলসতা বাড়াতে বিশ্বেশ্বর তার পুত্রবধূকে নিষেধ করে। গুরু নানা ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে সোনার মোহর ও গহনা, নোট আদায় করে নেয়। এ বাড়িতে বেড়াতে আসা পুষ্পমালা কলেজে পড়া বুদ্ধিমতী মেয়ে। ফকিরকে এই পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য সে একদিন গুরুর বাড়িতে গিয়ে পুলিশের ভয় দেখায়। এতে গুরু ঝোলা ফেলে পালিয়ে যায়। শিষ্যগণ তাদের সোনাদানা ফিরে পায় কিন্তু ফকিরও কোথায় চলে যায়। হৈমবতী পুষ্পকে তার স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে বলে। এদিকে প্রতিবেশী ষষ্ঠী চরণের নাতি মাখন দুই বউয়ের অত্যাচারে অনেকদিন ধরেই বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ। তারাও পুষ্পকে অনুরোধ করে মাখনকে ফিরিয়ে আনার। মাখনের চেহারার বর্ণনা শুনে পুষ্প সখের থিয়েটারে হনুমান সাজার জন্য মাখনের আকৃতি ও চেহারার বর্ণনা দিয়ে লোক চেয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করে। বিজ্ঞাপন দেখে মাখন আসে, ফকিরও আসে। মাখনকে আত্মীয়-স্বজনের কাছে উপস্থিত করার আগেই ঝামেলার সৃষ্টি হয়। মাখনের দুই স্ত্রী ফকিরকে মাখন ভেবে টানাটানি করতে থাকে। সবশেষে পুষ্পর মধ্যস্ততায় হৈম এসে নিজের স্বামীকে চিনে ঘরে নিয়ে যায় এবং মাখনের দুই স্ত্রী তাদের স্বামীকে নিজেদের ঘরে নিয়ে যায়।

এই প্রহসনের জন্য রবীন্দ্রনাথ দুটি গান রচনা করেছিলেন– একটি নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে গুরুর গান 'গুরুপদে মন করো অর্পণ' এবং চতুর্থ দৃশ্যে ফকিরের গান 'শোন রে অবোধ মন'। গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্যই প্রণিধানযোগ্য : "গান লিখতে আমার নিবিড় আনন্দ হয় এমন আর কিছুতে হয় না। এমন নেশায় ধরে যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে যায়, বড়ো বড়ো দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়, কর্তব্যের দাবিগুলোকে মন একধার থেকে নামঞ্জুর করে দেয়।"[১০৩]

আর তাই রবীন্দ্রনাথ নাটক রচনার শুরু থেকেই গীত প্রয়োগের চিন্তা করেছিলেন। নাটকে

সংগীত যোজনার মাধ্যমে তিনি মঞ্চের নানা নাট্যঘটনার সাথে বিশেষভাবে জড়িত করে নাটকের ঘটনা, সংলাপ, পরিবেশ, চরিত্র, আলোকসজ্জা, দৃশ্যপট, প্রভৃতি মিশিয়ে দর্শকের জন্য এক উপযুক্ত মানসিক পরিবেশের সৃষ্টি করেন। সুধীর চন্দ বলেন : "গানই রবীন্দ্র-নাটকের পরশমণি। গান নাটকের মূল স্বরজের সুরটিকে ধরিয়ে দেয় এবং কবির চিন্তাধারায় 'স্বরজের সুর' কখনও স্বরস্থান-চ্যুত হয় না বলে আমরা দেখতে পাই একই গান বিভিন্ন অবস্থানে, বিভিন্ন কুশীলবের মুখে, বেশ বেশান্তরে, একবার এ নাটকে, আবার ও নাটকে হাজির হচ্ছে।"[১০৪]

অভিনয় যদি নাটকের প্রাণ হয়ে থাকে তবে রবীন্দ্রনাটকে গানের ভূমিকা হচ্ছে নাটকের বাহ্য ও আন্তর তাৎপর্য প্রকাশ করা। আর তাই তিনি কথার মাধ্যমে যে রস বা ভাবের প্রকাশ পূর্ণ হয় না, নাটকে সংগীতের বিকাশে তা প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গানের কালানুক্রমিক আলোচনা করলে দেখা যায় তার নাটকে উত্তরোত্তর গানের সংখ্যা বেড়েছে। কিংবা একটি নাটককে যখন প্রয়োজনে পরবর্তীকালে রূপান্তরিত করেছেন তাতে গানের সংখ্যা বাড়িয়েছেন। নাটকের সংস্করণ ভেদেও তাই দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত তার নাটকগুলো নিরবচ্ছিন্ন গানের মালায় পরিণত হয়েছে, শুধু মাঝে মাঝে এক গানের সঙ্গে অন্য গান জোড়া দেবার জন্য একটু করে গদ্য সংলাপ বা অভিনেতা অভিনেত্রীর উক্তি রাখা হয়েছে। গ্রিক নাটক শুরুতে গান সর্বস্ব ছিল, কালক্রমে তাতে সংগীতের প্রাধান্য কমে নাটকীয় অংশে বেড়ে যায় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকে তার বিপরীত বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। নাটকের মাঝে গানগুলো কখনো কখনো দর্শকের মনে স্বস্তি এনে দিয়েছে, যেমন 'রাজা ও রানী'তে প্রথম সৈনিকের গান 'ওই আঁখি রে'। গান কখনো নাটকে জনপ্রমোদের ভাবনার কাজ করেছে– বুঝিয়ে দেওয়ার চাইতে, দর্শকমনকে গানের প্লাবনে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, কখনো বা দর্শকের মনে স্বস্তি বিধানে কিংবা দৃশ্য পরিবর্তনে। তার নাটকে গান সৃষ্টি করেছে রসবৈচিত্র্যের, তেমনি মূল নাট্যরসকেও করেছে ঘনীভূত। তাই রবীন্দ্রনাটক হচ্ছে কাব্য, সংগীত, নৃত্যের সহায়তায় চিত্রযোজনা।

প্রথম জীবনের নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি একটি গল্প বলা শুরু করেন, সাথে গানও ছিল। সময়ের সাথে সাথে এর সূক্ষ্মভাব ফুটিয়ে তোলার জন্য গানের ব্যবহার বাড়াতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে সুর যেন ভাব প্রকাশের বাহন হয়ে গেল, সাথে নৃত্যের যোগ হলো। ভাবের পরিবর্তন ও পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নতুন নতুন বাহনের সন্ধান করেছেন। এইরূপ সন্ধানে তিনি কথা থেকে সুর, সুর থেকে নৃত্যের সংযোজন করেছেন। যেমন তিনি 'অচলায়তন' নাটকের মধ্য

দিয়ে সামাজিক কুপ্রথা, কুসংস্কার, আচার-বিচারকে আঘাত করেছেন। 'রক্তকরবী' নাটকের মধ্য দিয়ে কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবীর দ্বন্দ্বের তীব্রতাকে প্রকাশ করেছেন। 'মুক্তধারা' নাটক দিয়ে তিনি যন্ত্রসভ্যতার দাপটকে বিদ্রুপ করেছেন। মানুষের স্বাভাবিক ও সুস্থভাবে বাঁচার আনন্দ ব্যক্ত করেছেন 'ডাকঘর' নাটকে।

রবীন্দ্রনাটকের কিছু গান নাট্যপ্রবাহের উপর মন্তব্য করে। সেই গানগুলোকে অনেকে গ্রিক কোরাসের সাথে তুলনা করেছেন। গ্রিক নাট্যকলার কোরাসের মধ্যে যে নাট্যকারের কণ্ঠস্বর থাকে না তা নয়, কিন্তু সেই কণ্ঠস্বরকে সেখানে নাট্যকার স্বীয় ব্যক্তিমুক্ত একটি স্বাতন্ত্র্য দান করেন। যেমন 'রাজা ও রানী'র তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে কুমার চলে যেতে চাইলে সখীরা গেয়ে ওঠে 'যদি আসে তবে কেন যেতে চায়?' যেন নাটকের কাহিনির পরবর্তী কি হতে যাচ্ছে, দর্শকমনের প্রশ্নই সখীদের গানে জিজ্ঞেসিত। 'মুক্তধারা' নাটকে রাজার নির্দেশে সেনাপতি বিজয় পাল যখন অভিজিতকে রাজশিবিরের পথে নিয়ে গেল তখন বাউলের যে গান 'ওতো আর ফিরবে নারে, ফিরবে না আর, ফিরবে না রে' ঠিক যেন নাটকের ভবিষ্যতের আমোঘ বাণী বর্ণনা করছে। রাজা অভিজিতকে নিয়ে গেলে বাউলেরা গানটিতে তিনবার 'ফিরবে না রে' বলার মাধ্যমে যেন বার বার প্রাতষ্ঠিত করতে চাইছেন এই যাওয়াই শেষ যাওয়া। নাটকের সন্ন্যাসী, ঠাকুরদাদা, কবি, অন্ধ বাউল ও বৈরাগীর চরিত্র তাঁর অনেক নাটকে উপস্থিত। এই চরিত্রগুলো যেন গান ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। নাটকে অনেকটা যাত্রাপালার বিবেকের ভূমিকা পালন করেছে চরিত্রগুলো। নাটকে সামনে কি ঘটতে যাচ্ছে বা ঘটনাপ্রবাহের উপর মন্তব্য করছে গানের মাধ্যমে। যেমন 'মুক্তধারা' নাটকে বাউলের গান 'ও তো ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না রে' গানটিতে যেন নাটকের ভবিষ্যৎ বলে দিচ্ছে। গানের মাধ্যমে নাটকের কাহিনিকে সুপ্রতিষ্ঠত করাই যেন এসব চরিত্রের মূল উদ্দ্যেশ।

রবীন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, কথার থেকে সুরের ক্ষমতা বেশি। কথা যেখানে পৌছতে পারে না, গান সেখানে অনায়াসে পৌঁছে যায়। আর তাই এই প্রসঙ্গে "গান সম্বন্ধে" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেন :

> "গুনগুন করিতে করিতে যখনই একটা লাইন লিখিলাম 'তোমার গোপন কথাটি, সখী, রেখো না মনে', তখনই দেখিলাম - সুর যে জায়গায় কথাটা উড়াইয়া লইয়া গেল, কথা আপনি সেখানে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া পৌঁছিতে পারিত না। তখন মনে হইতে লাগিল, আমি যে গোপন কথাটি

শুনিবার জন্য সাধাসাধি করিতেছি তাহা যেন বনশ্রেণীর শ্যামলিমার মধ্যে মিলাইয়া আছে, পূর্ণিমারাত্রের নিস্তব্ধ শুভ্রতার মধ্যে ডুবিয়া আছে, দিগন্তরালের নীলাভ সুদূরতার মধ্যে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে - তাহা যেন সমস্ত জল-স্থল-আকাশের নিগূঢ় গোপন কথা।"[১০৫]

রবীন্দ্রনাথের নাটকে সংযুক্ত গানের এই ভূমিকা সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানন্দ তাঁর 'সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান' গ্রন্থে বলেন, "নাটকের প্রয়োজনে বা নাটকের সৌকর্য ও সৌন্দর্য সাধনে নাটকীয় সংগীতের সমাবেশ কর্মে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের তুলনা নাই। সময় সময় নাটকীয় সংগীতে সাংকেতিক ইঙ্গিত স্বপ্নলোককেও বাস্তবে রূপায়িত করে আবার বাস্তবের প্রত্যক্ষ রূপায়ণও কখনো কখনো শ্রোতা ও শিল্পীর মনে আঁকে স্বপ্নলোকের ছবি। নাটকীয় সংগীতের ও নাট্যজগতের ক্ষেত্রে তা সত্যই অতুলনীয়।"[১০৬]

পুনরুক্ত, রবীন্দ্রনাথ নাটকে গান ব্যবহার করেছেন মূলত নাটকের ভাবদর্শন কিংবা নাটকের কাহিনিকে সাবলীলভাবে এগিয়ে নিতে। ঠিক তেমনি গান কখনো কখনো দর্শকদের মনে স্বস্তিও এনে দিয়েছে। নাটকের গানগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রতিটি নাটকেই একটি-দুটি গান রয়েছে যাকে নাটকের 'key song' বলে আখ্যায়িত করা যায়। গানটিই যেন নাটকের সমস্ত কাহিনি বিবৃত করছে, নাটকের মূলমন্ত্র। যেমন 'রুদ্রচন্দ্র' নাটকের মূল গান হিসেবে 'তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল' গানটি বলা যায়। এ যেন অমিয়ার অবস্থান নাটকটিতে। শেষ পর্যন্ত ঝরে পড়ে বৃন্ত থেকে। নাটকে কি ঘটতে যাচ্ছে বা এখানে নায়িকা অমিয়ার অবস্থানটি গানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিংবা 'ভগ্নহৃদয়' নাটকটিতে 'বুঝেছি বুঝেছি সখা, ভেঙ্গেছে প্রণয়/ও মিছা আদর তবে না করিলে নয়?' গানটি। ভালোবাসার স্বরূপ কেউ বুঝতে পারে না। যখন বুঝতে পারে তখন অনেক দেরি হয়ে যায়।

প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকটিতে 'মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!' গানটি। এই নাটকে সন্ন্যাসী তাঁর সংসার ত্যাগী জীবন থেকে বাহিরের আহ্বান পাচ্ছেন। নাটকে এক পর্যায়ে সংসারজীবন ও জগৎজীবনের মধ্যে সীমারেখা অতিক্রম করছেন তিনি। গানে তারই প্রকাশ পেয়েছে। 'নলিনী' নাটকে 'মনে রয়ে গেলো মনের কথা' গানটি নাটকের মূল চাবি। প্রেমে অবগাহন করলেও কেউ কারো মনের কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না। বিদয়াত্মক সমাপনের মধ্যে মিলন ঘটে। 'রাজা ও রানী' নাটকে 'এরা পরকে আপন করে, আপনারে পর'। আপন পরকে পরস্পর চিনতে না পারাই যেন এ নাটকের মূল দ্বন্দ্ব।

‘শারদোৎসব’র ‘তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ/ দুখের অশ্রুধার/ জননী গো, গাঁথব তোমার/ গলার মুক্তার হার।’ এই গানটির ভেতর ঋণশোধের তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ‘ঋণশোধ’ নাটকে ‘দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া/ তোমায় আমায়/ জনম জনম এই চলেছে/ মরণ কভু তারে থামায়?’ গানটিতে জগতের সাথে, প্রকৃতির সাথে ঋণশোধের দেয়া-নেয়ার রূপটি ফুটে উঠেছে। ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকে ‘ রইল বলে রাখলে কারে?/ হুকুম তোমার ফলবে কবে?/ তোমার টানাটানি টিকবে না ভাই,/ রবার যেটা সেটাই রবে’ গানটিতে প্রকাশ পেয়েছে যে, মানবজীবনে যা কিছু ঘটাক না কেন, সৃষ্টিকর্তা যা ঠিক করে রেখেছেন শেষ পর্যন্ত তাই হবে। রাজার শক্তি খাটবে না।

‘রাজা’ নাটকের চাবি হিসেবে ‘আমি রূপে তোমায় ভোলাব না/ ভালোবাসায় ভোলাব’ গানটি। রাজা কাউকেই দেখা দেন না, এমনকি রানীকেও না। তিনি শেষ পর্যন্ত রানীকে রূপের বদলে ভালোবাসায়ই ভুলিয়েছিলেন। ‘অচলায়তন’ নাটকের ‘তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে/কেউ তা জানে না’ গানটিতে মর্মার্থ ফুটে উঠেছে। অচলায়তনের নিথর জীবনে পঞ্চক বাহিরের ডাক শুনতে পাচ্ছে এবং সবশেষে মুক্তি আসে নতুন করে গড়ার মাধ্যমে। ‘ফাল্গুনী’ নাটকের ‘তোমায় নতুন করে পাব বলে/হারাই ক্ষণে ক্ষণ’ গানটিতে ফুটে উঠেছে কোন কিছুই হারায় না। সে শুধু কিছুক্ষণের অদর্শন। জীবনের স্রোতে ফিরে আসে আবার। ‘অরূপরতন’-এ ‘আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে/তাই হেরি তায় সকল খানে’ রাজাকে সবাই খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু রাজা তো সবখানে বিরাজমান। ‘গৃহপ্রবেশ’ নাটকটিতে ‘জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে/বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে’– যতীন সারাদিন মণির অপেক্ষাতে থাকে, কিন্তু মণি একদন্ড পাশে এসে বসে না। অন্তিমকালে যতীনের মনে হয় মণি জীবনমরণের সীমানা ছাড়িয়ে মূর্তমান। আসন্ন মৃত্যুশোক এই গানে তীব্র। ‘নটীর পূজা’য় ‘আমি কানন হতে তুলি নি ফুল,/মেলে নি মোরে ফল’ গানটির মধ্য দিয়ে শ্রীমতি নিজেকে সমর্পিত করছে; গাইছে ‘তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ/সংগীতে বিরাজে’।

‘চিরকুমার সভা’ নাটকটিতে ‘তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়/কোন পাথারে কোন পাষাণের ঘায়’– তারা চিরকুমার থাকার সংকল্প গ্রহণ করলেও তাদের তরী যেন হঠাৎ ডুবে যাচ্ছে। ব্রত ছুটে যাবার এক আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ‘শাপমোচন’ নাটকটিতে রাজার গান ‘ বাহিরে ভুল ভাঙবে যখন/অন্তরে ভুল ভাঙবে কি।/বিষাদ বিষে জ্বলে শেষে/রসের প্রসাদ মাঙবে কি’। রানীর কাছে

রাজা অদর্শিত। দেখা হলে রাজার বিভীষিকাময় রূপ দেখে রানী যদি ভয় পেয়ে যায় তবে কি অন্তরের ভালোবাসও ফুরিয়ে যাবে? রাজার জিজ্ঞাসা।

'বাঁশরী' নাটকে 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়/তেয়াগিলে আসে হাতে' গানটিতে বাঁশরী ও সোমশঙ্করের সম্পর্ক মনে করিয়ে দেয়। বাঁশরী এবং সোমশঙ্কর একে অপরকে ভালোবাসলেও তাদের মিলন হয় না। কিন্তু বিচ্ছেদে যেন মিলন হয় কারণ সোমশঙ্কর জানিয়ে যায় বাঁশরীকে যে সে শুধু তার ব্রতের কারণে সুষমাকে বিয়ে করছে, বাঁশরীকে আগের মতোই ভালোবাসে। তাই বিচ্ছেদেও তাদের ভালোবাসা অটুট থাকবে এই আশ্বাসে বাঁশরী তার বাকি জীবন কাটিয়ে দেবে। এ যেন দিনের আলোতে না পেয়ে রাতের আঁধারে গোপন পাওয়া।

'শোধবোধ' নাটকটিতে 'উজাড় করে লও হে আমার সকল সম্বল/শুধু ফিরে চাও ফিরে চাও ওহে চঞ্চল।' গানটিতে সবকিছু বিলিয়ে পূর্ণতাকে খোঁজা। নাটকে সতীশ ঘটনার ধারাবাহিকতায় জেলে যায় এবং আত্মরক্ষার প্রাক্কালে নলিনী তার সমস্ত গহনা নিয়ে আসে এবং তার বিনিময়ে সতীশকে মুক্ত করে। এ যেন উজাড় করে সমস্ত সম্বল বিলিয়ে দেয়া এবং বিনিময়ে সতীশকে পাওয়া।

অনেক নাটকের প্রথম গানটিই নাটকের পুরোটা জুড়ে থাকতে দেখা যায়। নাটকের মর্মবাণীর আভাস দিয়েছেন গানের মাধ্যমে। যেমন 'রক্তকরবী' নাটকে 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে' গানটি, 'মুক্তধারা' নাটকে 'জয় ভৈরব, জয় শংকর' ও 'তিমিরহৃদবিদারণ' গান দুটি। অনেক গানে রয়েছে সংলাপের ব্যাখ্যা যেমন 'রাজা' নাটকে রাজা কোথায় জিজ্ঞাসে 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে', কিংবা রাজার রূপ দেখে রানীর প্রতিক্রিয়াতে রাজার গান 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' কিংবা 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে কারাগারে আগুন লাগার পর ধনঞ্জয়ের গান 'ওরে আগুন আমার ভাই'। কথার প্রতুত্যুরে গান। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে রাজা ধনঞ্জয়কে কারাগারে কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করলে গানে উত্তর দেয়, 'ওরে শিকল, তোমায় কোলে করে/ দিয়েছি ঝংকার।' 'নলিনী' নাটকে নলিনীর উত্তরে নবীনের গান 'ভালোবাসিলে যদি সে ভালো না বাসে/ কেন সে দেখা দিল', 'রাজা ও রানী' নাটকে কুমার যখন ইলাকে ছেড়ে যেতে চাইল তখন সখীদের গান 'যদি আসে তবে কেন যেতে চায়?' ইত্যাদি।

কোন কোন নাটকে গানের ব্যবহার করেছেন নেপথ্য সংগীত হিসেবে। যেমন 'শাপমোচন' নাটকে 'হায় রে, ওরে যায় না কি জানা' গানটি। অনেক গান এসেছে অনুরোধের ফলশ্রুতিতে।

'বাঁশরী' নাটকে সুষমার অনুরোধে নন্দার গান 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়'। 'গৃহপ্রবেশ' নাটকে প্রায় সব গানই যতীনের অনুরোধে হিমির কণ্ঠে গাওয়া। 'রক্তকরবী'তে বিশুর দুটি গান নন্দিনীর অনুরোধে গাওয়া– 'মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে' ও 'তোমায় গান শোনাব'।

নাটকের ভাবগম্ভীর পরিবেশকে সহজ করে দেবার জন্যও রবীন্দ্রনাথ গানের ব্যবহার করেছেন। যেমন 'বাঁশরী' নাটকে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে লক্ষ্মীছাড়ার গান 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল'। সংলাপেরই অংশ হিসেবে 'রাজা ও রানী' নাটকে তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে সখীদের গান 'বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে'। 'রাজা' নাটকে রাজা সবত্র বিরাজে, রাজায় ঠাসা উক্তির পর ঠাকুরদার কণ্ঠের গান 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'। 'মুক্তধারা'য় রনজিৎ-এর সাথে কথপোকথনে ধনঞ্জয়ের গান 'তোর শিকল আমায় বিকল করবে না'। কখনোবা তিনি নাটক শেষ করেছেন গান দিয়ে। যেমন 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে 'আমি ফিরব নারে, ফিরব না আর ফিরব নারে'। 'শারদোৎসব' নাটকটি শেষ হয় 'আমার নয়ন ভুলানো এলে' গানটি দিয়ে। 'ফাল্গুনী'তে 'আয় রে তবে মাতরে সবে আনন্দে', 'মুক্তধারা' নাটকটি 'জয় ভৈরব, জয় শংকর', 'রক্তকরবী'তে 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে', 'অরূপরতনে' 'অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে', 'ঋণশোধ' নাটকে 'হৃদয়ে ছিলে জেগে' প্রভৃতি নাটক ও গানের কথা উল্লেখ করা যায়।

তাঁর তত্ত্বনাটকগুলোতে অনুরোধের গানের তুলনায় স্বেচ্ছাগীতের গান বেশি, আর গানগুলোতে বাউল গানের প্রভাব বেশি। যেমন 'শারদোৎসব', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'রাজা', 'অচলায়তন', 'ফাল্গুনী', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি। অধিকাংশ গানই গেয়েছে বাউল, ঠাকুরদাদা, সুরঙ্গমা, বিশু, পাগল, পঞ্চক বা ধনঞ্জয়। ঋতুনাট্যগুলো মূলত গীতিকাব্য, এতে নৃত্যের আভাস আছে। রোমান্টিক নাটকগুলোতে গানের ব্যবহার করা হয়েছে নাটকের সৌন্দর্যবর্ধনে। প্রহসন নাটকের গানগুলোতে হাল্কা চটুল সুর ও পুরানো গীতরীতি ব্যবহার করছেন, গানের সংখ্যাও কম ছিল। গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যে গানই সংলাপ। তিনি তাঁর মনোভাব গাঢ়তম তীব্ররূপে প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গানকে ব্যবহার করেছেন। তিনি অন্তর্জীবনের সূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনাগুলিকে সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে সংস্কৃত নাটকের 'প্রস্তাবনা' বা 'নান্দ্যন্তে সূত্রধার' অংশের সাথে মিল পাওয়া যায়। যেমন সংস্কৃত নাটকে কাহিনিটিকে মঞ্চে প্রথম উপস্থাপন করার জন্য সূত্রধার একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'ফাল্গুনী' নাটকে সূত্রধারের অনুকরণে কবিশেখর চরিত্রটির মাধ্যমে ঠিক তেমনিভাবে নাটকের শুরু করেছেন। নাটকে কি ঘটতে যাচ্ছে তার একটা

আগাম আভাস পাওয়া যায় কথোপকথনের মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে। 'বসন্ত' ও 'শেষ বর্ষণ' নাটকেও কাহিনি উপস্থাপনের জন্য একই নিয়ম অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নাটক মূলত কাব্যের ভাবকেই অনুসরণ করে রচিত। আর তাই কাব্য ও নাটক পাশাপাশি পরস্পর পরিপূরক। তিনি মনে প্রাণে ছিলেন গীতিকবি আর তাই তাঁর নাট্যসম্ভারে রয়েছে তাঁর রচিত অসংখ্য গানের সুসংহত প্রকাশ।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঙ্গীতচিন্তা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৩, পৃ. ২২৩-২২৪

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৪৮৭

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ২৩শ খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৭, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭

প্রথম পরিচ্ছদ

৪. অরুণকুমার বসু, *বাঙলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্র সংগীত*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৩৩০

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ৯৫৩

৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী*, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ১৪১০, পৃ. ৯

৭. প্রবীরগুহ ঠাকুরতা, *রবীন্দ্রসংগীত মহাকোষ ১*, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ২০০৮, পৃ. ৪০৭-৪০৮

৮. নিতাই বসু, *রবীন্দ্রসংগীতের উৎস সন্ধানে*, সাহিত্যায়ন, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১০০

৯. করুণাময় গোস্বামী, *রবীন্দ্র নাট্যসংগীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২০

১০. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, দ্বিতীয় খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১০১

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

১২. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্র নাট্যধারা*, সংস্কৃতি প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ১২৬

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৯

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৯

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৯

১৬. অরুণকুমার বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৬

১৭. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা*, প্রথম খন্ড, শ্রী প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক, কলিকাতা, ১৩৭৩, পৃ. ৫

১৮. প্রবীরগুহ ঠাকুরতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১০

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৮

২০. নিতাই বসু, *রবীন্দ্রসংগীতের উৎস সন্ধানে*, সাহিত্যায়ন, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১০৮

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

২২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৪০, পৃ. ১৫১

২৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৭

২৪ প্রবীরগুহ ঠাকুরতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৩

২৫ সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খন্ড : রবীন্দ্রনাথ)*, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২৫২

২৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী প্রথম খন্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৭

২৭. প্রবীরগুহ ঠাকুরতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১২-৪১৩

২৮. নিতাই বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

২৯. আলো সরকার, *রবীন্দ্রনাট্যপ্রসঙ্গ : সাংগীতিক প্রয়োগ*, সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১১২

৩০. নীহাররঞ্জন রায়, *রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা*, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২৮৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

৩১. আলো সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, *দ্বিতীয় খন্ড*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ৭৮৭

৩৩. দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার, *রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১৪২

৩৪. নিতাই বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

তৃতীয় পরিচ্ছদ

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, *সপ্তম খন্ড*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ৬৩২-৬৩৩

৩৭. অরুণকুমার বসু, প্রবীরগুহ ঠাকুরতা, পৃ. ৩৫৫

৩৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, পঞ্চম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৪০, পৃ. ২১৩

৩৯. নিতাই বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮

৪০. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, দ্বিতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৪০, পৃ. ২১৩

৪১. করুণাময় গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

৪২. বিষ্ণু বসু, *রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার*, প্রতিভাস, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৮০

৪৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, *পঞ্চম খন্ড*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ৭৯৯

চতুর্থ পরিচ্ছদ

৪৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ৭৮০

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮৬

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮২

৪৭. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৬

৪৮. করুণাময় গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১-১২২

৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮৭

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮৭

৫১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৭৯,

Dhaka University Institutional Repository

পৃ. ২৭২-২৭৩

৫২. অরুণকুমার বসু, *বাংলা কাব্য সংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত*, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৩৭১

৫৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী সপ্তম খন্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩১

৫৪. আলো সরকার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪

পঞ্চম পরিচ্ছদ

৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪৩

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ ৭৪৩

৫৭. করুণাময় গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫

৫৯. অরুণকুমার বসু, *বাংলা কাব্য সংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত*, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৩৬৯

৬০. করুণাময় গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮

৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

৬২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ৪০৯

৬৩. শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্রসংগীত*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৪৯, পৃ. ১৫১

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১

৬৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী সপ্তম খন্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১

৬৬. প্রবীরগুহ ঠাকুরতা, *রবীন্দ্রসংগীত মহাকোষ ১*, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ২০০৮, পৃ. ৪৭৫

৬৭. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৭

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪

৬৯. শ্রী প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ দ্বিতীয়* খন্ড, মিত্রালয়, কলিকাতা, ১৯৫১, পৃ. ১৮৯

৭০. করুণাময় গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬-১৭৭

৭২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ৭৮৭

৭৩. প্রবীরগুহ ঠাকুরতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৫

৭৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০

৭৫. শান্তিদেব ঘোষ, *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৯০, পৃ. ২১ - ২২

৭৬. প্রবীরগুহ ঠাকুরতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯০

৭৭. করুণাময় গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২

৭৮. প্রবীরগুহ ঠাকুরতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯০

৭৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯০

৮০. অরুণকুমার বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৬

৮১. অশোক সেন, *রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা*, এ মুখার্জী এ্যা- কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৮২, পৃ. ২৬৫

৮২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৫

৮৩. রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, *রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ : সমকালীন প্রতিক্রিয়া*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ২০০

৮৪. রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, *রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ : সমকালীন প্রতিক্রিয়া*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ২০০

৮৫. প্রবীরগুহ ঠাকুরতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০

৮৬. করুণাময় গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮

৮৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, তৃতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৪০, পৃ. ৩৯২-৩৯৩

৮৮. সুভাষ চৌধুরী, *গীতবিতানের জগৎ*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৫৮-৫৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছদ

৮৯. শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্রসংগীত*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৪৯, পৃ. ১৫৪

৯০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা,

Dhaka University Institutional Repository

১৩৭৫, পৃ. ২২৯

৯১. নিতাই বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১

৯২. শান্তিদেব ঘোষ, *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২ - ১০৩

৯৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দ্বাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ২৬১

৯৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৫

৯৫. করুণাময় গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯

৯৬. শান্তিদেব ঘোষ, *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

৯৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঙ্গীতচিন্তা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬

৯৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, *দ্বাদশ খন্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩

৯৯. শান্তিদেব ঘোষ, *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫

১০০. প্রবীরগুহ ঠাকুরতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২১

১০১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২২

১০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঙ্গীতচিন্তা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪

১০৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬

১০৪. সুধীর চন্দ, *বহুরূপী রবীন্দ্রসংগীত*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ৩১

১০৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঙ্গীতচিন্তা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

১০৬. দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের গানের পর্যালোচনা

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত সংলাপ সুরে রচিত। এই ধারায় তিনি ৬টি গীতিনাট্য রচনা করেন। যথা 'বাল্মিকীপ্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা' ও 'চন্ডালিকা'। পরবর্তীকালে 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা' ও 'চন্ডালিকা' নাচের ভাষায় উপস্থাপন করে 'নৃত্যনাট্যে' রূপান্তরিত করা হয়।

মূলত রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে রচনা করেছেন গীতিনাট্য এবং শেষ বয়সে রচনা করেছেন নৃত্যনাট্য। তাই এই নাটকগুলোর মধ্যে দুটি যুগের সংগীতরচনা ও সুরযোজনার বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়।

গীতিনাট্য 'বাল্মীকিপ্রতিভা' এবং 'কালমৃগয়া'র গানগুলোতে তিনি নানা ধরনের রাগরাগিণীকে নানা ভাবের বাহন করে ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে বিলেত থেকে আসার কারণে পাশ্চাত্য সংগীতের এক অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়েছেন বাংলা গানের সাথে। 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে কিছু নিজস্ব রচনার গান আছে। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত তিনি গীতিনাট্য রচনা করেন। প্রায় এক দশক বলা যায় এই কালটিকে। এ সময়কে কাব্যরচনায় প্রাক-মানসী পর্ব বা রবীন্দ্রকাব্যের ভূমিকা বা প্রস্তুত পর্ব বলা যায়। অন্যদিকে শেষ বয়সে তিনি যখন গীতিনাট্যগুলোকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করার চিন্তা করেন তখন প্রত্যেকটি গানকে তিনি একটি সম্পূর্ণ রূপ দান করেন। নাটকের বাইরেও গানগুলো স্বতন্ত্র গান হিসেবে গাওয়া হতো। এ প্রসঙ্গে শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন :

> "১৩৪৫ সনে 'মায়ার খেলা' যখন শান্তি নিকেতনের ছাত্রীদের দিয়ে নৃত্যে অভিনয় করবার কথা হলো, তখন গুরুদেব এই নাটকটির আমূল পরিবর্তন করেন। বহু গান তিনি নতুন করে রচনা করেন।...শেষজীবনে তিনি 'মায়ার খেলা'র গানগুলি রচনা করেছিলেন প্রথম যুগের 'মায়ার খেলা'র আদর্শে। তাই দেখি এর প্রায় প্রত্যেকটি গানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ গানরূপেই তিনি রচনা করবার চেষ্টা করেছেন, এবং এর বহু গানকে নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েও সেগুলি গাইতে পারা যায়।"[১]

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের গানের পর্যালোচনাকে পরবর্তী পর্যায়ে দুটি পরিচ্ছদে বিন্যস্ত করে বিশ্লেষণ করা হলো।

প্রথম পরিচ্ছদ

গীতিনাট্য

গানের ভিতর দিয়ে নাটককে রূপ দেয়াই হচ্ছে গীতিনাট্যের মূল উদ্দেশ্য। সাধারণ নাটকের সাথে এর পার্থক্য হচ্ছে একটি সুরহীন বাণীর সাধারণ ভাষা, অপরটি সুরারোপিত বাণীকে আশ্রয় করে রচিত। গীতিনাট্যে সংলাপের ভূমিকা পালন করে গান। সাধারণ অভিনয়ের সব রীতি বজায় রেখে গানের মাধ্যমে অভিব্যক্ত করতে হয়। মূলত হাবার্ট স্পেনসরের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি গীতিনাট্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। গীতিনাট্যের গানগুলো যেহেতু অভিনয়ের মাধ্যমে গাইতে হয় তাই এগুলো গায়ন পদ্ধতি সাধারণ গানের মতন নয়। কথা ও অভিনয়ের সাথে মিলিয়ে বিনা তালে কিংবা ভাঙা তালে গানগুলো গেয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্যের মতন মূল পয়ার কাঠামোকে ভিত্তি করে আসল ভাবকে অনুসরণ করে অভিনয়ের সাথে গাওয়া হয়। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে গীতিনাট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো।

১. বাল্মীকিপ্রতিভা

'বাল্মীকিপ্রতিভা' গীতিনাট্যটির প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন : "বাল্মীকিপ্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা– অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোন স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি-প্রতিভা তাহা নহে– ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টা সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র– স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।"[২]

ব্রাইটনে অবস্থানকালে সেখানকার এক সংগীতশালায় রবীন্দ্রনাথ মাদাম নীলসনের গান শোনেন। কিন্তু সেই গান তাঁর পছন্দ হয়নি বরং 'যেন কণ্ঠস্বরে সার্কাসের ঘোড়া হাকাইতেছে' এবং স্থানে স্থানে 'পাখির ডাকের নকল' অত্যন্ত হাস্যজনক লাগে তাঁর। এই বিরূপতার বেড়া ডিঙিয়ে তিনি সে-দেশের প্রচুর গান শোনেন এবং তিনি উপলব্ধি করেন এটি মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করে প্রকাশ করছে। বিলেতে গিয়ে তিনি কবি ম্যুরের 'আইরিশ মেলডিজ'-এর গান শিখলেন এবং অন্যান্য বিলাতী গানও শিখলেন। দেশে ফিরে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনার সময় কবি দেশি ও বিদেশি সুরের মিশ্রণ ঘটালেন। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"এই দেশীও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি

অধিকাংশই দেশী, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকী মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে। উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছে তাঁহারা আশা করি এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে স্বীকার করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। সংগীতের এইরূপ বন্ধন-মোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকলপ্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল। বাল্মীকিপ্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকী গান-অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুর বসানো এবং গুটিতিনেক গান বিলাতী সুর হইতে লওয়া।"৩

কবি নিজের গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তি এই নাটকটিতে ছয়টি দৃশ্যে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। নাটকের মৌল আখ্যান কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ থেকে নেয়া হলেও বিষয় ও বক্তব্যে রয়েছে স্বতন্ত্রতা।

দস্যুদলপতি বাল্মীকির নির্দেশে তাঁর দলবল শ্যামাপূজার জন্য বলি সংগ্রহ করতে গিয়ে গভীর অরণ্যে হারিয়ে যাওয়া একটি বালিকাকে ধরে নিয়ে আসে। বালিকার করুণ গানে ও ক্রন্দনে বাল্মীকির কঠিন হৃদয় গলতে শুরু করে। তাঁর আদেশে বালিকাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। এরপর শিকারে গিয়ে বাল্মীকি তাঁর দলের দস্যুদেরকে হরিণশাবক শিকারে বাধা দিলে তারা বাল্মীকিকে পরিত্যাগ করে। তিনি শূন্য হৃদয়ে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এরই মধ্যে ব্যাধগণ প্রবেশ করেন এবং দুটি পাখি গাছে বসে আছে দেখে বধ করতে চাইলে বাল্মীকির মন কেঁদে ওঠে। তিনি না করা স্বত্ত্বেও তারা পাখি শিকার করতে বাণ ছুড়ে মারে। একটি পাখি বধ হয় এবং সাথে সাথেই বাল্মীকির মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় : 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শশ্বতীঃ সমাঃ।/ যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম॥'

নিজেই অবাক হয়ে যান এই বাণী নিঃস্বরণ করে। এমন সময় সরস্বতীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি বিমোহিত হয়ে যান। সরস্বতী চলে গেলে দেখা দিলেন লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর শত প্রলোভনের বাণীকে উপেক্ষা করে তিনি সরস্বতীর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় আবার সরস্বতী পুনরাবির্ভূত হলেন এবং জানালেন তিনিই বালিকার বেশ নিয়ে এসেছিলেন বাল্মীকির পাষাণ হৃদয় গলাতে। বাল্মীকিকে তাঁর বীণা উপহার দিয়ে তিনি বললেন : 'এই নে আমার বীণা উপহার/ যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহাই তার।'

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "বাল্মীকি-প্রতিভায় একটি নাট্যকথাকে গানের সূত্র দিয়ে গাঁথা হয়েছিল... বাল্মীকি-প্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হল তার অন্তরগূঢ় করুণা। এটাই ছিল তার স্বাভাবিক মানবত্ব, যেটা ঢাকা পড়েছিলো অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্দ্ব ঘটলো, ভেতরকার মানুষ হঠাৎ এলো বাইরে।"৪

বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' এর প্রভাব বাল্মীকি-প্রতিভার উপর বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ক্রৌঞ্চবধের চিত্রটি রবীন্দ্রনাথ 'সারদামঙ্গল' থেকে গ্রহণ করেছেন। বাল্মীকির হাতে সরস্বতীর বীণাদান এই কল্পনার মূলে আছে রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে রক্ষিত কবি ম্যুরের 'আইরিশ মেলোডিজ' গ্রন্থের উপর একটি বীণার চিত্র।

"আমাদের বাড়িতে পাতায় পাতায় চিত্রবিচিত্র করা কবি ম্যুরের রচিত একখানি আইরিশ মেলডিজ ছিল।...ছবিতে বীণা আঁকা ছিল, সেই বীণার সুর আমার মনের মধ্যে বাজিত।"৫

বিদ্বজ্জনসমাগম-সভার অধিবেশন উপলক্ষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ সাহিত্যরসিক ও মনীষী দর্শকদের সম্মুখে বাল্মীকি-প্রতিভা প্রথম অভিনীত হয় (১২৮৭ সাল, ফাল্গুন ১৬; ১৮৮১, ফেব্রুয়ারী ২৬, শনিবার)। ঐ সময়ে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই ক্ষুদ্রনাটকের সংগীত-অভিনয় সেদিনের বিদগ্ধ দর্শকম-লীকে যে মুগ্ধ করেছিল এবং তারা যে নুতন শক্তিশালী কবির আবির্ভাব অনুমান করেছিলেন তা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রশংসাসূচক গান রচনায় বোঝা যায়। অভিনয় দেখে এসে তিনি এই গানটি রচনা করেন - 'উঠ বঙ্গভূমি, মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর,/ অজ্ঞানতিমিরে তব সুপ্রভাত হল হেরো।/ উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,/ নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্বার।/ হেরো তাহে প্রাণ ভরে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে। / ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।'৬

'বাল্মীকিপ্রতিভা' প্রথম মুদ্রণে ১৩ পৃষ্ঠার একটি ছোট গীতিনাট্য ছিল। প্রথম মুদ্রণের সাথে পরবর্তী সংস্করণের অনেক পার্থক্য রয়েছে। পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করে দ্বিতীয় বর্তমান সংস্করণ ১২৯২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এখানে ২৭টি গান রয়েছে।

গান	রাগ - তাল	পর্যায়
১. আজকে সবে মিলে তবে	বাহার-খেমটা-তেওড়া	গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য
২. এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা	ঝিঁঝিট-পাশ্চাত্য প্রভাব-দাদরা	গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য

(এই গানটি ১২৮৩ বঙ্গাব্দে সঞ্জীবনী সভার যুগে রচিত 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গানটির

সুরে রচিত। গানটি ১৮৭৯ সালে ‘পুরুবিক্রম’ নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণে আছে এবং ১৩০৩ বঙ্গাব্দের তৃতীয় সংস্করণে বর্জন করা হয়েছে।)

৩. এখন করব কি বল — পিলু-বারোয়াঁ-খেমটা — গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য

৪. শোন্ তোরা তবে শোন — ঝিঁঝিঁট-কীর্তন-ঝাঁপতাল — গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য

৫. তবে আয় সবে আয় — পাশ্চাত্য প্রভাব-কাহারবা — গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য

(এই গানটিও ড. সেন অনুমান করেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা, কিন্তু এ বিষয়ে প্রশান্তকুমার পাল দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন এ গানটি স্টিফেন এ্যাডাম- ‘ন্যান্সী লী’র সুরে বসানো। মূল গানটি রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। ভাঙা গানটি রবীন্দ্রনাথের রচনা। মূল গানের কয়েকটি ছত্র হলো :‘অফ অল দ্য ওয়াইভ্স্ এ্যাজ এভার ইউ নো/ইয়েও হো! ল্যাড্স্ হো! ইয়েও হো! ইয়েও হো!/দেয়ার’স নান্ লাইক ন্যান্সী লী আই ট্রো,/ইয়েও হো! ল্যাডস্ হো! ইয়েও হো!’ এই সুরের উদ্দীপনাটুকু রবীন্দ্রনাথ দস্যুদলের মনের উত্তেজনার ভাবপ্রকাশের কাজে লাগিয়েছেন। তিনি মূল গানের ভাষা বা ভাব গ্রহণ করেননি। সুধীর চক্রবর্তী বলেছেন, “সতর্ক পাঠক লক্ষ্য করবেন ‘ইয়েও হো’ এবং ‘বলো হো’ এই ধ্বনি গঠনের সমতাটুকু। বলা বাহুল্য, বলো হো ভারতীয় বা বাঙালী দস্যুদরের ধ্বনিরীতির পক্ষে স্বাভবিক নয়।”)[৭]

৬. কালী কালী বলোরে আজ — পাশ্চাত্য ভাঙা সুর-দাদরা — গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য

৭. এ কি এ ঘোর বন! — দেশ মল্লার - ত্রিতাল — গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য

৮. পথ ভুলেছিস সত্যি বটে — যোগিয়া - খেমটা — গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য

৯. নিশুম্ভমর্দ্দিনী অম্বে — - — -

(এই গানটি দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত হয়ে তার পরিবর্তে অক্ষয়চন্দ্র রচিত ‘রাঙা-পদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা’ গানটি ব্যবহৃত হয়। ‘নিশুম্ভমর্দ্দিনী অম্বে’ গানটির সুর রক্ষিত হয়নি)

১০. দেখ হো ঠাকুর, বলি এনেছি — কাফি - খেমটা — -

১১. নিয়ে আয় কৃপাণ — আড়ানা-কাহারবা-দাদরা — গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য

১২. কি দশা হল আমার হায় — - — -

(এই গানটি সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী লিখেছেন “‘শ্যামা’র ‘হায়, এ কী সমাপন’ গানটির সুর ‘বাল্মীপ্রতিভা’র ‘হা, কী দশা হলো আমার’ থেকে নেয়া হয়েছে। এই সুরটির মূল আবার কর্তা দাদামশায়ের মুখে শোনা একটি ফার্সী গান– ‘হালমে রবে রবা’।”)[৮]

১৩.এ কেমন হল মন আমার	কাফি-কাহারবা	গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য
১৪.আরে, কি এত ভাবনা	পরজ বসন্ত-ত্রিতাল	গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য
১৫.শোন্, তোরা শোন্ এ আদেশ	ঝিঁঝিঁট-কীর্তন-ঝাঁপতাল	গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য
১৬.ব্যাকুল হয়ে বনে বনে	খাম্বাজ-ত্রিতাল	গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য

(এই গানটির সাথে জ্যোতিন্দ্রনাথের 'ব্যাকুল হয়ে তব আশে' ব্রহ্মসংগীতের মিল রয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে গানটির পাঠে সামান্য পরিবর্তন করা হয় ।)

১৭. আর না, আর না, এখানে আর	পাশ্চাত্যপ্রভাব-ঝিঁঝিঁট-বেহাগ-দাদরা	গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য
১৮.জীবনে কিছু হল না, হায়!	মিশ্র হাম্বীর-কীর্তন-ত্রিতাল	গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য
১৯.থাম্ থাম্! কি করিবি বধি	ভৈরবী-ঝাঁপতাল	গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য
২০.কি বলিনু আমি!	বাহার- ২+২ মাত্রা	গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য
২১.এ কি, এ কি এ, স্থিরচপলা	ভুপালী-কাহারবা	গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য
২২.কোথা লুকাইলে	ভৈরবী-ত্রিতাল	গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য
২৩. কেন গো আপনমনে	ভৈরবী-ঝাঁপতাল	গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য
২৪.আমার কোথায় সে উষাময়ী	ভৈরবী-কাহারবা	-
২৫.এই যে হেরি গো দেবী আমারি	বাহার-ত্রিতাল/দাদরা	গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য

(হিন্দি-ভাঙা এই গানটিতে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের 'জয় জয় পরব্রহ্ম' গানের নিম্নোদ্ধৃত অংশের কিছু প্রভাব রয়েছে :

<u>স্বপ্নপ্রয়াণ</u>	<u>বাল্মিকীপ্রতিভা</u>
'ছন্দে উঠে শশি-রবি,	ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনকরবি উদিছে
ছন্দে পুন অস্তাচলে যায় ।	ছন্দে জগ-ম-ল চলিছে
তারকা কনক-কুচি	জ্বলন্ত কবিতা তারকা সবে-)
জ্বলদ্-অক্ষয়-রুচি	
গীত-লেখা নীলাম্বর-পাতে ।'	

২৬. হৃদয়ে রাখ গো, দেবী, চরণ	দুর্গা'র ছায়া-কাহারবা/দাদরা	-

(এই গানটির অনেকগুলো ছত্র বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্যের প্রথম সর্গ থেকে নেওয়া। "সম্ভবত এই কারণে ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত 'গান' গ্রন্থে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র এই গানটি বর্জিত হয় এবং বর্তমানেও 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র প্রথম খন্ডে বা 'স্বরবিতান' ৪৯-এ

এই গানটি বা তার স্বরলিপি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। পরে অবশ্য ১৩৮০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'গীতবিতান' এর তৃতীয় খন্ডের নাট্যগীতি বিভাগে গানটি এবং 'স্বরবিতান' ৫১-এ ইন্দিরাদেবী-কৃত স্বরলিপিটি মুদ্রিত হয়েছে।"[৯] দীনহীন বালিকার সাজে। এটিকে নাটকে আবৃত্তি করা হয়।)

'বাল্মিকীপ্রতিভা'র কয়েকটি নাট্যগীতি সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। "এই নাটকের 'এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে' গানটি দস্যুদের জাতীয় গান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এরই সাথে 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গানটির মূল ভাব এক, কেবল প্রেক্ষাপটের কারণে তার রূপের বদল হয়েছে। কিন্তু সুর এক।"[১০]

এ নাটকে বনদেবীগণের গানগুলো একটু আলাদা ধরনের। কোরাস এবং বিলম্বিত লয়ে। অন্যান্য গানের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ভাবের গান। গানগুলো গাইবার সময় আবেগানুযায়ী কোথাও থামতে হয়, কোথাও বা তাড়াতাড়ি গাইতে হয়। 'সহে না সহে না' দাদরা তালে এক লয়ে গেয়। 'আঃ বেঁচেছি এখন' গানটিতে 'আঃ' বলে একটু থেমে 'বেঁচেছি এখন শর্মা' বলে আবার থামা, 'ওদিকে আর নয়, গোলেমালে ফাঁকতালে পালিয়েছি কেমন' একসাথে, এখানে কাহারবা ও দাদরা তালের ব্যবহার করা হয়েছে। 'লাঠালাঠি কাটা (একটু টেনে) কাটি', 'ভাবতে লাগে দাঁতকপাটি' (দ্রুত গেয়), 'তাই মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সটকেছি কেমন, আহা সটকেছি কেমন' তালে গেয়। বোঝার সুবিধার্থে গানটির স্বরলিপি দেয়া হলো :

আঃ বেঁচেছি এখন, শর্মা ও দিকে আর নন

সা -া II { [স]ধা ধা [ধ]ণা ধা । পা -া পা পধা I মা পা মা জ্ঞা । রা -া -া -জ্ঞরা I
আঃ ০ বেঁচে ছি এ খ ন্ শর্ মা০ ও দি কে আর্ ন ০ ০ ০ ন্

II

I সসা -া ররা -া । রাঃ -জ্ঞঃ মপা -া I রাঃ মঃ জ্ঞরা -া । সা -া সা -া } II
গোলে ০ মালে ০ ফাঁ ক্ তালে ০ পা লিয়ে ছি কে ০ । ম ন্ "আঃ ০"
[মা]

-া -া II { সা ধা -া । ধা ধা -া । ধা ণা -া । ধা পা -া I
০ ০ লা ঠা ০ লা ঠি ০ কা টা ০ কা টি ০

I ধা -া ণা । র্সা র্রা -া I র্সা -া ণা । ধা পা (-া) }I পা I

ভা ব্ তে লা গে ০ দাঁ ত্ ক পা টি ০ তাই

I মা -া পা । পা পা -া I মা -া পা । ধা পা -া I

মা ন্ টা রে খে ০ প্রা ণ্ টা ন য়ে ০

I{রা -া মা । জ্ঞা রা -া I সা -া (-া । পা পা -া)} I -া । -া -া -া I[১১]

স ট্ কে ছি কে ০ ম ০ ন্ আ হা ০ ০ ০ ন্ ০

এই নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করতেন। বাল্মীকির গান 'রাঙ্গা পদ-পদ্মযুগে' গানটি গাওয়া সম্পর্কে জানা যায়, দর্শকরা বিমোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। কেননা একে মধুর কণ্ঠ তাতে বাগেশ্রী রাগিণীর সুর ছন্দোবন্ধন সমস্ত দর্শকদের মুগ্ধ করে তোলে। গান গাওয়া শেষে তিনি মঞ্চ থেকে বের হবার সময় দর্শকরা 'এনকোর' 'এনকোর' বলে কোলাহোল করে ওঠে। সবাই আরেকবার গানটি শুনতে চান, একবার শুনে কারো মন ভরেনি। কবি আবার ফিরে আসেন এবং আবার পরিবেশন করেন।

'বাল্মীকিপ্রতিভা' যখন প্রথম জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রথম অভিনীত হয়, তখন দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, স্যার গুরুদাস, কবি রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ। নাকটির মঞ্চায়নের সাফল্য দেখে সকলেই আনন্দিত হয়েছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা 'বাল্মীকির জয়' সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "যাঁহারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাল্মীকিপ্রতিভা' পড়িয়াছেন বা অভিনয় দেখিয়াছেন, তাহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখনোই ভুলিতে পারিবেন না।"[১২]

মুগ্ধ রাজকৃষ্ণ রায়ও একটি কবিতা লিখেছিলেন 'বালিকা প্রতিভা'। তারপর 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র দ্বিতীয় সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া'কে ভেঙে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র নবরূপ দান করেন। বনদেবী-অংশ 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র প্রথম সংস্করণে ছিল না, ঐ অংশগুলি 'কালমৃগয়া' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। দেখা গেছে 'কালমৃগয়া' থেকে দশটি গান কোনোটি বিশুদ্ধ আকারে, কোনোটি কিছু পরিবর্তন করিয়া গৃহীত হয়েছে। 'কালমৃগয়া'র শিকারিদের প্রতি দশরথের আদেশ 'গহনে গহনে যা রে তোরা' গানটিকে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় দস্যুসরদার রত্নাকরের মুখে বসানো হয়। 'কালমৃগয়া'র রাজবিদূষক রূপান্তরিত হয় দস্যুতে। বনদেবীর অংশগুলি 'কালমৃগয়া' থেকে গৃহীত। তাদের মুখেও একটি নতুন গান যোজনা করা হয় : 'মরি ও কাহার বাছা'। আইরিশ সুরে গানটি বসানো হয়; এইরূপ পরিবর্তন ছাড়া কুড়িটি নতুন গান রচিত হয়।[১৩]

এইভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো (১২৯২, ফাল্গুন; ১৮৮৬, ২০ ফেব্রুয়ারি)। বর্তমানে প্রচলিত ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’ এই দ্বিতীয় সংস্করণ। বিলেতি গান ছাড়াও এ গীতিনাটকে হিন্দুস্তানি গানের প্রভাব আছে, তাছাড়াও রয়েছে বৈষ্ণব কবি, দাশরথি রায়, কালিদাসের অভিজ্ঞা শকুন্তলা, বিহারীলাল চক্রবর্তী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর প্রভাব। ‘তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী’, রিমঝিম ঘনঘনরে বরষে’ প্রভৃতি গানে বৈষ্ণব পদাবলীর, ‘এখনি মু- করিব খন্ড, খবর্দার রে খবর্দার’, ‘নিতান্ত তোমারে দেখি কৃতান্ত’ প্রভৃতিতে দাশরথি রায়ের প্রভাব বর্তমান। এই নাটকের ‘রাঙা পাদপদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা’ এবং ‘এতরঙ্গ শিখেছ কোথা’ গানদুটি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা। ‘কোথা সে ঊষাময়ী প্রতিমা’, ‘যাও লক্ষ্মী অলকায়’ প্রভৃতি ছত্রে সারদামঙ্গল কাব্যের অংশ বিশেষের প্রভাব আছে। ‘এই যে হেরিগো দেবী আমারি’ - গানটিতে দ্বিজেন্দ্রনাথের ‘স্বপ্ন-প্রয়াণ’ কাব্যের ‘জয় জয় পরব্রহ্ম’ গানটির কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বিলাতি যে-সব ভাঙা গান এই নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো হলো :

মূল গান	রবীন্দ্র সংগীত
১. Nancy lee	কালী কালী বলো রে
২. Go where glory waits thee	মরি ও কাহার বাছা

এই গানগুলির সুর তিনি মূল সুরের বিকৃতি না করে হুবহু অনুসরণ করেছেন।

সুর দিয়ে নাটকের কথাবস্তু-অভিনয়ের কথা রবীন্দ্রনাথের ভাবনাতে আসে হার্বাট স্পেন্সারের “দি অরিজিন অ্যান্ড ফাংশন অব মিউজিক” প্রবন্ধ থেকে। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন :

> “হার্বাট স্পেন্সারের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু-না-কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত রাগ, দুঃখ, আনন্দ, বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না– কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার আনুষাঙ্গিক সুরটাই উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে। স্পেন্সরের এই কথাটি মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়া ছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন? আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে; তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তালমান-সংগত রীতিমতো সংগীত নহে। ছন্দ হিসেবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ– ইহাতে তালের করাক্কর বাঁধন নাই– একটা লয়ের মাত্রা আছে, ইহার

একমাত্র উদ্দেশ্য কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা– কোনো বিশেষ রাগিণী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে। বাল্মীকি-প্রতিভায় গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই, তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাদিগকে দুঃখ দেয় না।"[১৪]

এই মতবাদ দ্বারা প্রভাবে তিনি এই নাটকের ক্রোধের গান 'অহোঃ আস্পর্ধা একি', কান্নার গান 'হা, কী দশা হলো আমার', বিস্ময়ের গান 'এ কী এ, এ কী এ, স্থির চপলা', হাসির গান 'হাঃ হাঃ ভায়া খাপ্পা' গানগুলো রচনা করেন। হাবার্ট স্পেন্সারের মত ছিল আমরা যখন কথা বলি তখন মনের ভাবের সাথে আমাদের কণ্ঠ ওঠানামা করে, তাকে একটু রূপান্তরিত করে নিলেই গানে পরিণত হতে পারে। নাটকটিতে তিনটি শ্যামা সংগীত রয়েছে। কারণ বাল্মীকির দস্যু জীবনচিত্রণে সে স্বাভাবিকভাবেই কালী সাধক। নাটকটির শ্যামা বিষয়ক গানগুলি উনিশ শতকের তৎকালীন প্রচলিত শ্যামা সংগীতর আদর্শে রচিত ছিল। গান তিনটি হলো :

১. রাঙা পদপদ্মযুগে

২. এত রঙ্গ শিখেছ কোথায়

৩. বীণা বীণাপাণি করুণাময়ী

গানগুলো নাটকের কাহিনির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই রচিত। পরবর্তীকালে 'বিসর্জন' নাটকেও তিনি শ্যামাবিষয়ক কয়েকটি গান লিখেছেন। নাটকটির সবগুলো গান গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য পর্যায়ের।

নাটকটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যযুগের সন্ধ্যাসংগীতের পরে লেখা হয়েছিল।

২. কালমৃগয়া

'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যটি প্রতিভা দেবী 'বালক' পত্রিকার ১২৯২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র, আশ্বিন, পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় প্রথম দৃশ্য থেকে চতুর্থ দৃশ্যের কিছুটা অংশ পর্যন্ত স্বরলিপি প্রকাশ করেন। পরে ইন্দিরাদেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ কোন কোন গানের স্বরলিপি করেন। ইন্দিরা দেবীর করা গীতিনাট্যের স্বরলিপি 'স্বরবিতান ২৯' এ ছাপানো হয় ১৩৬০ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে।

নাটকটির বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়েছে দশরথ কর্তৃক অন্ধ মুনির পুত্রবধের পরিচিত কাহিনিকে অবলম্বন করে। সরযূ নদীর তীরবর্তী গভীর অরণ্যের একপ্রান্তে একটি কুটিরে অন্ধমুনি তাঁর একমাত্র পুত্র সিন্ধুর সাথে বাস করেন। বনের ফলমূল ও সরযূর জল গ্রহণ করে এবং শাস্ত্র পাঠ

করে তারা দিনাতিপাত করে। নির্জন তপোবনে ঋষিকুমারের একমাত্র খেলার সাথী লীলা। এক ঘন দুর্যোগের দিনে অন্ধ পিতার শত নিষেধকে উপেক্ষা করে সিন্ধু সরযূ নদীতে গেলেন বাবার জন্য জল আনতে। অন্ধকারে বিপদসঙ্কুলান পথ, চলা কষ্টকর। অমঙ্গলের আশঙ্কায় বনদেবীগণও তাকে যেতে নিষেধ করলেন : 'এই ঘোর আঁধার, কোথা রে যাস!/ ফিরিয়ে যা, তরাসে প্রাণ কাঁপে।/ স্নেহের পুতুলি তুই,/ কোথা যাবি একা এ নিশীথে -/ কী জানি কী হবে,/ বনে হবি পথহারা।'

ঋষিকুমার জানায় : 'না করো না মানা, যাব ত্বরা।/ পিতা আমার কাতর তৃষায়,/ যেতেছি তাই সরযূনদীতীরে॥'

রাজা দশরথ তখন শিকার করতে এসেছেন ঐ বনে। এক হস্তিশাবকের পিছন পিছন আসতে গিয়ে তিনি এসে পড়লেন সরযূনদীর তীরে। ঋষিকুমার সে সময় কলসিতে জল ভরছিলেন। সেই শব্দকে হস্তিশাবকের জল পানের শব্দ ভেবে দশরথ নিক্ষেপ করলেন তাঁর শব্দভেদী অব্যর্থ বাণ। সেই মারণ বাণে ঋষিকুমারের দেহবসান হলো। দশরথ তার মৃতদেহ নিয়ে অন্ধমুনির কুটিরে উপস্থিত হলে শোকাহত মুনি তাঁর উদ্দেশ্যে নিদারুণ অভিসম্পাত বাণী উচ্চারণ করলেন। কিন্তু পরে অনুতপ্ত দশরথকে তিনি মাফ করে দেন। 'শোক তাপ গেল দূরে/ মার্জনা করিনু তোরে।'

পুত্রের প্রতি বললেন : 'যাও রে অনন্ত ধামে মোহ মায়া পাশরি-/ দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।/ জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে-/ কেবলই আনন্দস্রোত চলিছে প্রবাহি।/ যাও রে অনন্তধামে, অমৃতনিকেতনে-/ অমরণ লইবে তোমা উদার প্রাণে।'

এসময় যবনিকা পতন হয় এবং ঋষিকুমারের মৃতদেহ ঘিরে বনদেবীদের গান : 'সকলই ফুরালো স্বপনপ্রায়!/ কোথা সে লুকালো, কোথা সে হায়।/ '

এই নাটকের ৪৫টি গানের মধ্যে 'ও ভাই দেখে যা' গানটি ইন্দিরা দেবীর মতে 'দ্য ব্রিটিশ গ্রেনেডিয়ার্স' গানের সুর অবলম্বনে রচিত; 'ও দেখবি রে ভাই আয় রে ছুটে'র মূল গান 'দ্য ভাইকার অফ ব্রে'; 'কাল সকালে উঠব মোরা'র মূল গান 'অল্ড ল্যাঙ্গ সাইন' এবং একই সুরে রবীন্দ্রনাথ 'পুরানো সেই দিনের কথা' গানটিও লেখেন। 'মানা না মানিলি, তবুও চলিলি'র মূল গান 'গো হোয়ার গ্লোরি ওয়েটস্ দি' এবং এই আইরিশ মেলোডিজ-এর সুরে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত 'মরি ও কাহার বাছা' এবং ১২৯১ বঙ্গাব্দে মাঘোৎসবে গীত 'ওহে

নিখিল দয়াময়, নিখিল আশ্রয়' শীর্ষক ব্রহ্মসংগীতটি এবং 'মায়ার খেলা'র 'আহা আজি এ বসন্তে' গানগুলি রচিত হয়। গানগুলিতে তালের নির্দেশ দেয়া থাকলেও অভিনয়ের জন্য কখনো থেমে, কখনো টেনে, কখনোও বা সুর বা তাল ছাড়া গাওয়া হয়।

'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যে নিম্নলিখিত বিলাতি গানগুলির সুরে নেয়া হয়েছিল :

মূল গান	রবীন্দ্র সংগীত
১. The vicar of bray	ও দেখবি রে ভাই
২. The british grenadiers	তুই আয় রে কাছে
৩. The banks and braes	ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে
৪. Go where glory waits thee	মানা না মানিলি
৫. Robin adair	সকলি ফুরালো

এই গীতিনাট্যের অধিকাংশ গানের সুরই মার্গসংগীতের উপর ভিত্তি করে রচিত। মিশ্র ভূপালী, মিশ্র খাম্বাজ, ছায়ানট, গৌড়মল্লার, বাহার, দেশ– এইরূপ অনেক রাগ-রাগিণী এই নাটকে প্রযুক্ত হওয়াতে এর গানগুলি সুরপ্রধান হয়ে উঠেছে। ১২৯২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র দ্বিতীয় সংস্করণে 'কালমৃগয়া'র ন'টি গান গৃহীত হয়। অনেকগুলি গানের সুর অন্য এক বা একাধিক গানে বসানো হয়েছে। প্রশান্তকুমার পালের মতে "এইসব কারণেই রবীন্দ্রনাথ নাটকটির পুনঃপ্রচারে আগ্রহী হন নি।"[১৫]

নাটকটির ৩৬টি গানের ৩৫টি গানই গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য পর্যায়ের, মাত্র ১টি গান প্রেম পর্যায়ের। কালমৃগয়া আর স্বতন্ত্রভাবে রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশ হয়নি। সম্প্রতি রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহে তা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

৩. মায়ার খেলা

'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যটির প্রকৃতি স্বতন্ত্র। 'নাট্যের সূত্রে গানের মালা' ঘটনাস্রোতের পরে গীতিনাট্যটি নির্ভর নয়। হৃদয়াবেগই সেখানে প্রধান। নাটকটি গড়ে উঠেছে প্রমদা চরিত্রের ক্রম পরিবর্তনের ধারাকে কেন্দ্র করে। প্রমদা আপন অহংকারে গর্বিতা ছিলেন, কিন্তু সেই অহংকারের ভেতরে যখন জ্বলে উঠল ভালোবাসার আলো, তখন সে হয়ে উঠল প্রেমময় নারী। এই গীতিনাট্যটিতে রবীন্দ্রনাথ প্রেমেরই মায়ার কথা বলেছেন, প্রেমের বিচিত্র রূপের রহস্য উন্মোচন করেছেন। সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে কামনা বাসনাকে প্রশমিত করে একই নারীর

মধ্যে অনন্ত প্রেম উপলব্ধির স্বরূপকেই তিনি অভিব্যক্ত করেছেন গীতিনাট্যের মধ্যে। সাতটি দৃশ্যের মধ্য দিয়ে কবি নবযৌবন বিকশিত নরনারীর অন্তরের প্রেমবোধকে বিচিত্র সীমায় প্রকাশ করেছেন এবং গানগুলি সেই নম্রমধুর প্রেমচেতনা ও পলব হৃদয়াবেগ প্রকাশের পক্ষে সার্থক রূপ লাভ করেছে।

সখীসমিতিতে অভিনয়ের জন্যে ও সরলা রায়ের অনুরোধে 'মায়ার খেলা' রচিত হয়। প্রেমের চির বিচিত্র রহস্যময় রূপের উন্মোচন হয়েছে 'মায়ার খেলা'তে। রবীন্দ্রনাথ প্রেমেরই মায়ার কথা বলেছেন। তিনি 'নলিনী' রচনা করেন ১৮৮৪ সালে এবং এটি 'মায়ার খেলা'য় রূপান্তর করেন ১৮৮৮ সালে। 'নলিনী'র নীরদ 'মায়ার খেলা'য় অমর, নীরজা শান্তায় ও নলিনী প্রমদায় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় রবীন্দ্রনাথ শান্ত ও উগ্র প্রেমের এই দ্বৈতরূপের আভাস 'নলিনী ' নাটকে দিয়েছেন এবং 'মায়ার খেলা'য় তার পরিপূর্ণতার চিত্র এঁকেছেন। শান্তা, অমর, প্রমদা তিনজনই প্রেমিক কিন্তু প্রেমের রহস্য সকলের কাছে এক নয়। শান্ত স্নিগ্ধ-সমাহিত নম্র মধুর প্রেমের সাধনায় মগ্ন। তার প্রেমে উচ্ছ্বাস নেই, নেই উদ্বেলতা, আছে শাশ্বত প্রেমের বাণীরূপ। শান্তার গভীর প্রেমের সৌন্দর্যরূপকে অমর উপলব্ধি করতে পারেনি। সে প্রমদার দীপ্তরূপ মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়। প্রমদার অন্তরে অমরের প্রতি প্রেম সঞ্চার হলেও সখীদের ছলাকলা ও তাদের বিচ্ছেদ আশঙ্কায় প্রমদা অমরের কাছে নিজের প্রেমের রূপটিকে ব্যক্ত করতে পারে না। সখীদের লীলাচাপল্যে ও বাক্‌চাতুর্যে প্রমদাকে কাছে না পেয়ে অমর শান্তার স্নিগ্ধ-প্রেমমাধুর্যের মধ্যেই আপনার শান্তির আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। কিন্তু প্রমদা অমরকে না পাওয়ার শূন্যতা অনুভব করে এবং ব্যর্থ প্রেমে তার সমস্ত অন্তর হাহাকার করে ওঠে। অমর প্রমদার সেই আর্তি, সেই হৃদয়বেদনা সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিল, কিন্তু তার প্রত্যাবর্তনের পথ ছিল রুদ্ধ। তাই অশ্রুভরা বেদনার মধ্যে প্রমদা জাগরূক রইল শান্তা ও অমরের জীবনে। 'মায়ার খেলা' নাটকের ঘটনার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করলে এর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে : 'নরনারী- হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে।/ কত ভুল করে তারা, কত কাঁদে হাসে।/ মায়া করে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে, আনি মান অভিমান।'

মায়াকুমারীদের এই মায়া, এই ঘটনার ভিতরই এই নাটকের মূল রস। গ্রিক কোরাসের রীতি অনুসৃত হয়েছে এখানে। দ্বিতীয় দৃশ্যে অমর চলছে তার বাসনা অন্বেষণ করতে, এই সময়ই মায়াকুমরীগণের প্রবেশ এবং ধূয়া অনুযায়ী ও জীবনদর্শনের তত্ত্ব অনুযায়ী তারা গান করছে :

‘কাছে আছে দেখিতে না পাও,/ তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।’

নাটকের ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈপরীত্য জাগিয়ে পাঠক ও দর্শকের মনকে সচকিত করে তুলেছে, কৌতূহল জাগাচ্ছে। কিন্তু মায়াকুমারীদের গানের ভাব অমর বুঝতে পারেনি বা তার চিত্ত এখনো সেই পর্যায়ে উন্নীত হয়নি, তাই মায়াকুমারীদের গান শুনেও সে বলেছে : ‘কার সুধাস্বরমাঝে জগতের গীত বাজে/ প্রভাত জাগিছে কার নয়নে।’

তৃতীয় দৃশ্যে দর্শক ও পাঠক অন্য এক ঘটনায় এসে পড়ে, প্রমদাকে নিয়ে তার সঙ্গীদল মধুর বসন্তে আনন্দ করছে, প্রমদাও এই বসন্তে নতুন সাজে সাজতে বসেছে। তৃতীয় সখী যখন জিজ্ঞাসা করছে, কবে ‘মরমের আলো কপোলে ফুটিবে শরম-অরুণ রাগে‘, তখন প্রমদা মিথ্যা ভালোবাসাকে ধিক্কার দিয়েছে। কিন্তু এই ধিক্কার দেবার সাথে সাথেই মায়াকুমারীগণের সেই গান, ‘গরব সব হায় কখন টুটে যায়, সলিল বহে যায় নয়নে’। এখানে প্রমদাও অমরের মতো সত্য উপলব্ধি করতে পারেনি। তাই কুমার ও অশোক যখন প্রেম নিবেদন করতে এসেছে, প্রেমের ধারা জানে না বলেই প্রমদা তাদের অস্বীকার করেছে : ‘এ সুখ ধরণীতে কেবলই চাহ নিতে/ জান না হবে দিতে আপনা-/ সুখের ছায়া ফেলি কখন যাবে চলি,/ বরিবে সাধ করি বেদনা।/ কখন বাজে বাঁশি, গরব যায় ভাসি/ পরান পড়ে আসি বাঁধনে।’

চতুর্থ দৃশ্যে অশোক, কুমার, অমর এই তিনজনের তিন জীবনাদর্শ গড়ে উঠেছে। কুমার জীবনের তত্ত্ব বুঝেছে, আপন মনকেই বুঝতে পারা যায় না, পরের মন সেখানে কে কবে বুঝতে পেরেছে। আপন মন নিয়েই কেঁদে মরতে হয়। অশোকের সবচেয়ে বেদনা হচ্ছে যে সে প্রাণখোলা, তার প্রেমের হৃদয়বেদনা প্রমদাকে খুলে দেখাতে পারে না, সে জানে প্রেমে অমৃতের চেয়ে বিষই বেশি। জেনে শুনেই সে এই বিষ পান করেছে। অমরের অনন্ত বাসনা শুধু মনকে পীড়া দিতে থাকে– ‘আমি মিছে ঘুরি এ জগতে কিসের পাকে, মনের বাসনা যত মনেই থাকে।’ তারপরই তার সিদ্ধান্ত– ‘বুঝিয়াছি এ নিখিলে চাহিলে কিছু না মিলে’। এরই জন্য মনকে প্রবোধ দিতে হয়। তাদের কথোপকথনের পরই মায়াকুমারীগণের ইঙ্গিতময় গান এবং প্রমদাসহ সখীদের প্রবেশ ও প্রেম প্রত্যাখ্যান। কিন্তু কুমার ও অশোক থেকে অমরকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রমদার মনে এক কৌতূহল জেগেছে, হয়তো গোপনে প্রেমের নবোদ্গত সূর্যের আবির্ভাব প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে : ‘ওই আকুল অধর আঁখি কি ধন যাচে’। এই সময়ে মায়াকুমারীদের গান :

‘প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে/ দেখো দেখো সখী চাহিয়া ।/ দুটি ফুল খসে ভেসে গেল/ ওই প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া ।’

যা অজ্ঞাত অজানিত ছিল, কোরাসের মধ্যেই তা পূর্ণতা পেল । সখীদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও প্রমদার ঐকান্তিকতায় অমরকে প্রমদার কাছে এনেছে । অমরের কবিজনোচিত উক্তি শুনে প্রমদার সান্নিধ্যে চলে এসেছে সে । তারা বুঝেছে, ‘আপনি সে জানে তার মন কোথায়’! তাই ওকে বোঝা গেল না । কিন্তু তখনো প্রেমকুমারীদের গানে প্রেমের মিলনমাধূর্য বেজে চলেছে ।

পঞ্চম দৃশ্যে অমরের মনের স্বভাব ও স্বরূপ চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে, সে হৃদয়-অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার চোখে শুধু ঘুমঘোর, সে নিজের বাসনা ও মনকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি- ‘এত ভালোবাসি এতো যারে চাই/ মনে হয় নাতো সে যে কাছে নাই/ যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে/ তাহারে আনিবে ডাকি ।’

এরপরে অশোক আর কুমারকে নিয়ে সখীদের হাসি ঠাট্টায় প্রমদার মনে তীব্রতার জন্ম, যাকে সবই দিলাম, সেতো এলো না । এই বিরহ-গীতের প্রত্যক্ষ কারণ শোনা গেল মায়াকুমারীদের গানে, লজ্জার বাধাই মরম বেদনাকে প্রকাশ করতে দেয়নি, এই বেদনারই জীবন অতিবাহিত করতে হবে- ‘নিমেষের তরে শরমে বাধিল, মরমের কথা হল না ।জনমের তরে তাহার লাগিয়ে রহিল মরম বেদনা ।/ চোখে চোখে সদা রাখিবার সাধ-/ পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ-/ মেলিতে নয়ন মিলালো স্বপন, এমনি প্রেমের ছলনা ।’

প্রমদার হৃদয়ে প্রণভরা ব্যকুলতা, গোপন মর্মের ব্যথা জাগলেও সখীগণের বাক্‌চটুলতায়, তাদের বিচ্ছেদবেদনার আশঙ্কায়, প্রমদা প্রাণ খুলে হৃদয়বেদনা ব্যক্ত করে নিজেকে সমর্পণ করতে পারেনি এবং অমরও প্রমদার মন না বুঝতে পেরে শান্তার কাছে ফিরে যায় ।

ষষ্ঠ দৃশ্যে অমর শান্তার কাছে ফিরে এসেছে । শান্তার কাছেই শীতল স্নেহসুধা প্রার্থনা করেছে, আর প্রার্থনা করেছে প্রেম, শান্তি ও নতুন জীবন । এই সময়েই নাটক শেষ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মায়াকুমারীদের মায়ার আরও কিছু বাকি ছিল, প্রেমের আলো ছিল না বলেই শান্তার প্রেমকে চিনতে পারেনি – ‘এখন বিরহানলে প্রেমানল জ্বলিয়াছে ।’

এই দৃশ্যেই নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত চমৎকার ফুটে উঠেছে । অমর উৎকণ্ঠ প্রেম নিয়ে শান্তার হৃদয়ে স্থান চাইছে, কিন্তু শান্তা জানে অমরের এই প্রেম প্রকৃত নয়, তাই সে বলেছে সে যেন ভুল

করে তাকে না ভালোবাসে, সে তার বিরহজগতে সুখেদুখে ভালোভাবে দিন কাটাচ্ছে : 'আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভালো -/ কী হবে চির আঁধারে নিমেষের আলো ।'

কিন্তু অমর জানাচ্ছে যে তার স্বপ্ন ও ভুল ভেঙে গেছে, বাসনা কাঁটা প্রাণে বিঁধেছে, তাই আজ ওই প্রেমময় প্রাণেই অতল সাগরে আশ্রয় নেবে। এই পরিপূর্ণ প্রশান্তিতে পাঠকের দেহমন যখন বিশ্রাম লাভ করতে চাইছে, তখনি আবার প্রমদার সখীগণ প্রবেশ করে ফুলবাসমোদিত বনে প্রমদার বিরহ-রজনীকে দূর করবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানায়। মায়াকুমারীগণ আবার এসে সখীদের মনের স্বরূপকে প্রকাশ করে।

'বিদায় করেছ যারে নয়নের জলে/ এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো।

দুটি সোহাগের বাণী যদি হতো কানাকানি,/ যদি ঐ মালাখানি পরাতে গলে!'

এই পরিস্থিতিতে শান্তার মনে নবীন আশঙ্কার কালো ছায়াপাত হয়েছে। অমর কার প্রাণে ব্যথা দিয়ে এসেছে, কাকে না বুঝে তার পরানকে শূন্যতায় জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছে– এ কথার উত্তরে অমর শুধু জানিয়েছে : 'কেবলি তোমারে জানি, বুঝেছি তোমার বাণী,/ তোমাতে পেয়েছি কূল অকূল পাথারে।'

এই বলেই অমর প্রস্থান করে, কিন্তু শান্তা তখনও মঞ্চে, শান্তার সমুখেই ব্যর্থ-হৃদয়া প্রমদা প্রবেশ করে হৃদয়ের শূন্যতা ব্যক্ত করে সখীদের নিয়ে চলে গেল। এই ঘটনা ও মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে মায়াকুমারীদের গান : 'ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল/ চিরদিন তৃষাকূল পরান তলে।'

সপ্তম দৃশ্য আরম্ভ হয়েছে স্ত্রীপুরুষগণের বসন্তোৎসব গান দিয়ে, অমর ও শান্তার মিলনের পূর্বভূমিকা এখানে সূচিত হয়। কিন্তু নাট্যকার এখানে যবনিকা টানেন না, বসন্তের মিলনউৎসবে প্রমদা ও সখীগণ আবার তাদের ব্যর্থ হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করে মিলনের হাহাকারের অন্ধকারে বিবর্ণ ও ধূসর করে তুললো। শান্তা স্ত্রী পূরুষগণ সকলেই প্রমদার রূপে ও তার মলিনতায় কৌতূহলী হয়ে তার জীবনসম্বন্ধে জানতে উৎসূক হয়েছে। সকলেরই সমবেদনা প্রমদার প্রতি। কিন্তু শান্তা অমরের উচ্ছ্বসিত উক্তিতে বুঝেছে, প্রমদাকেই সে ভালোবাসে। সে তাদের কাছ থেকে সরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলে, অমর ও প্রমদার মিলনের জন্যে শান্তা আয়োজন শুরু করে। কিন্তু প্রমদা বুঝতে পারে, শান্তার কাছ থেকে অমরকে নিলে তারই মতো ব্যর্থ হাহাকারে তাকে পুড়তে হবে, নিজে স্বার্থক হতে গেলে অন্যজনকে ব্যর্থতা দিতে হবে। যে পাপ সে না বুঝে

করেছে, তারই প্রায়শ্চিত্ত করা ভালো। এরপর আর এক পাপ এলে জীবনের প্রায়শ্চিত্তের আর শেষ হবে না। তাই সে ম্লানমুখে ব্যর্থমুখে ব্যর্থহৃদয়ে চলে যাচ্ছে, প্রমদা তার মিলনমালা অমরকে দিয়েছে। কিন্তু অমর শান্তাকেও পায়নি, প্রমদাকেও না। আবার শান্তার কাছে পূর্ণ আশ্রয় লাভ করতে গিয়েও প্রমদার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছে। প্রমদাকে দেখতে পেয়েই অচেতন বিস্ময়ে বলে উঠেছে : 'একি স্বপ্ন! একি মায়া! একি প্রমদা! একি প্রমদার ছায়া!'

তাই কে তার হৃদয়কে গ্রহণ করবে এই ব্যথায় সে পাগল : 'এখন এ ভাঙ্গা প্রাণ লইয়া গেলে, নীরব নিরাশা কে সহিবে।'

করুণা-ধারায় শান্তা শূন্যহৃদয় অমরকে বরণ করে নেয়। এখানেই রবীন্দ্রনাথ মায়াকুমারীদের গান দিয়ে তাঁর প্রেমজীবনের দর্শনকে ব্যক্ত করেছেন : 'নয়ন সলিলে যে হাসি ফুটে গো,/ রয় তাহা রয় চিরদিন রয়।' এবং মায়াকুমারীদের গানেই নাটকের সমাপ্তি : 'প্রেমের কাহিনীগান হয়ে গেল অবসান/ এখন কেহ হাসে, কেহ বসে ফেলে অশ্রুজল।'

'মায়ার খেলা'য় রবীন্দ্রনাথ প্রেমেরই মায়ার কথা বলেছেন, সুখদুঃখের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বাসনাকে প্রশমিত করে একই নারীর মধ্যে অনন্ত প্রেম উপলব্ধিই তাঁর জীবনের কাম্য। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের স্বরূপ বিশ্লেষণে 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন :

> "ইহার অনেককাল পরে 'মায়ার খেলা' বলিয়া আর-একটি গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, 'মায়ার খেলা' যখন লিখেছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল।"[১৬]

এই নাটকে অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি প্রেমের গান ঋতুসংগীত পর্বে পৃথক গান হিসেবে রচিত হয়েছিল। মায়াকুমারীদের চরিত্র রচনায় গ্রিকনাটকের কোরাসের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এখানে বিরহেই প্রেমের গভীরতম উপলব্ধি। মায়ার খেলার প্রেমসংগীতসমূহের মূল ব্যাপারটিই তাই। সবই বিষণ্ন গান, সব গানেই মনোবেদনার অশ্রুব্যাকুল প্রকাশ। 'আমার পরাণ যাহা চায়', 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে', 'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান', 'ভালোবেসে যদি সুখ নাহি', 'সুখে আছি সুখে আছি', 'অলি বার বার ফিরে যায়', 'না বুঝে কারে তুমি', 'আহা আজি এ বসন্তে', 'মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে' প্রভৃতি অসামান্য সব প্রেমের ও প্রকৃতির গান এই গীতিনাট্যে

অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৬৩টি গানের ৩১টি গান গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য পর্যায়ের, ২৮টি গান প্রেম, প্রকৃতি বসন্ত পর্যায়ের ৩টি গান রয়েছে। গানগুলিতে তালের ব্যবহার হয়েছে গানের ভাবের সঙ্গে মিল রেখে। এই গানগুলির সুরের ও ভাবের দিক থেকে চটুলতা ফুটে উঠেছে। তবে তালের উল্লেখ থাকলেও রবীন্দ্রনাথ গানগুলি ভেঙে গাইবার নির্দেশ দিতেন, ভাবানুযায়ী গাইতে হতো। গীতিনাট্যটি রচনার সময় শিক্ষানবিশী ভাবটি রবীন্দ্রনাথ অনেকটা কাটিয়ে উঠেছিলেন আর তাই গানগুলো বেশিরভাগই অন্যদের প্রভাবমুক্ত। তবে কিছু গান ক্লাসিকাল সংগীত ও বিলেতি গানের দ্বারা প্রভাবিত। 'আহা আজি এ বসন্তে' গানটি টমাস ম্যুরের আইরিস মেলডিজ 'Go where glory waits thee' ভেঙ্গে ও 'বিদায় করেছ যারে' গানটি রচিত হয়েছে হিন্দুস্থানি 'বাজে ঝনন মোরি পায়েলিয়া' গানটি ভেঙে রচিত হয়েছে। আর পিয়ানোর গৎ ভাঙা গান হলো 'দে লো সখী দে'। রাগ পিলুতে 'দিবস রজনী' গানটি 'আশায় আশায় থাকি' সুরারোপে:

I ন্‌া ন্‌া -সা । রা রপা -া । -মা -জ্ঞমজ্ঞা -রা । সা -া -া I[১৭]

আ শা য় । আ শা য় । থা ০ ০ ০ ০ । কি ০ ০

সুরটিতে প্রতীক্ষার আকুলতা ফুটে উঠেছে বেহাগের সুরে। কীর্তনের মাধ্যমে নাটকীয়তা ফুটিয়ে তুলেছেন 'সখী বহে গেল বেলা', 'আমি তো বুঝেছি', 'ওকে বলো সখী', 'ভুল করেছিনু, ভুল', 'সুখে আছি, সুখে আছি', 'এত দিন বুঝি নাই' প্রভৃতি গান। এ নাটকের গানগুলোতে মানবিক প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে সুরে আর বাণীতে। আর তাই এই কিছু গান কথা ও সুরের মিলনে সার্থক এবং স্বতন্ত্রভাবে গাওয়া যায়, যেমন 'আমার পরাণ যাহা চায়', 'বিদায় করেছ যারে নয়নজলে', 'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান', 'দিবস রজনী আমি যেন কার', 'ওকে বলো সখী বলো', 'না বুঝে কারে তুমি', 'দেখো সখা ভুল করে', 'এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম', 'আহা আজি এ বসন্তে', 'অলি বার বার', 'পথহারা তুমি পথিক' প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ তার গীতিনাট্যগুলোতে আর-একটি জিনিসের পরীক্ষা করেছিলেন। সেটি হলো নাটকে ছন্দছুট গদ্যকাব্যের ব্যবহার, যার পরিণতি ও সার্থক রূপ আমরা নৃত্যনাট্যগুলোতে দেখতে পাই। যেমন এই নাটকে ছন্দছুট গদ্যকাব্যের দৃষ্টান্ত হলো :

'আয় লো সজনী, সবে মিলে-/ ঝরঝর বারিধারা,

মৃদু মৃদু গুরু গুরু গর্জন-/ এ বরষা দিনে

হাতে হাতে ধরি ধরি/ গাব মোরা লতিকা-দোলায় দুলে ।' (কালমৃগয়া)

'রাজা মহারাজা কে জানে, আমিই রাজাধিরাজ ।/ তুমি উজির, কোতোয়াল তুমি,

ওই ছোঁড়াগুলো বর্কন্দাজ ।/ যত সব কুঁড়ে আছে ঠাঁই জুড়ে,

কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে ।/ পা ধোবার জল নিয়ে আয় ঝট্,

কর তোরা সব যে যার কাজ ।' (বাল্মীকিপ্রতিভা)

১২৯৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে 'সখী, সে গেলো কোথায়', 'বিদায় করেছ যারে নয়নজলে', এবং 'কেন এলি নে, ভালোবাসিলি, ভালোবাসা পেলি নে' গান তিনটি ছাড়া সবগুলো গানই নতুন ছিল। এদের মধ্যে প্রথমটি *রবিচ্ছায়াতে*, দ্বিতীয়টি *কড়ি ও কোমলে* এবং তৃতীয়টি প্রথমে *পুষ্পাঞ্জলির* পাভুলিপিতে ও পরে 'রবিচ্ছায়া'য় সংকলিত হয়। 'দে লো দে পরাইয়ে গলে' গানটির পূর্বরূপ দেখা যায় 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যে ও 'মায়ার খেলা' রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের *মানসী* ও *সোনার তরী* রচনার যুগে আর তাই এই দুটির আত্মার যোগাযোগও বেশি। *মানসী* কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতার সাথে মায়ার খেলার ভাববস্তুর চমৎকার মিল রয়েছে। একটি 'হৃদয়ের ধন', 'মেঘদূত', পুরুষের উক্তি', 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি', 'প্রকাশবেদনা', 'নিষ্ফল কামনা', 'আত্মসমর্পণ'। নাটকটি রচিত হয় কড়ি ও কোমলের পরে। তার এসময়কার রচনায় রয়েছে 'মানসী'র বিষাদ ও সৌন্দর্য, আত্মলীন রোমান্টিকতার নির্বোধ অবস্থা, দুঃখতে পুড়েই প্রেমে সিদ্ধি লাভ করা যায়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, "মায়ার খেলা' 'মানসী' কাব্যযুগের রচনা। 'কড়ি ও কোমল' পর্বের যৌবন সৌন্দর্যপ্রতি কায়িক কামনা ও 'মানসী' পর্বের মানস-সুন্দরীরর 'অরূপমূর্তি' - অদর্শনজনিত বেদনা - এই দুই-এর মাঝে কবির মন যখন দোলায়িত – সেই সময়ে 'মায়ার খেলা' জীবনে অনুভব করেন।"[১৮]

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলোর বৈশিষ্ট্য বা সুর বিশ্লেষণে দেখা যায় তিনি বাল্মিকীপ্রতিভায় বিলেতি সুরের গান রচনা করলেও সব গানেরই রাগ নির্দেশিত ছিল। নাটকটির গানে ২৭ রাগ রাগিণী ব্যবহার করেছেন। এরমধ্যে ৮টি মিশ্র রাগ রয়েছে। এই সময়কার রচনাকে শান্তিদেব ঘোষ 'শিক্ষানবিশির যুগ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। গানগুলোতে বিলেতি সুরের প্রভাব রয়েছে। রাগরাগিণীর উপর গানগুলো রচনা করা হলেও নাটকের প্রয়োজনেই এগুলোকে নতুনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু কিছু গান নেয়া হয়েছে কোন-না-কোন পুরোনো গানের সুরে।

যেমন :

নতুন গান	পূর্ববর্তী গান/সুর
অহো! অস্পর্ধা একি	দারা দ্রিম তানা না
এই যে হেরি গো দেবী	মনকী কমলদল গোলিয়াঁ
রিম ঝিম ঘন ঘন রে	রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি
হা, কী দশা হল আমার	হাল মে রবে রবা
এই বেলা সবে মিলে	চতুরঙ্গ রসঘন
আয় মা আমার	মা একবার দাঁড়া গো হেরি চন্দ্রনন
থাম থাম কী করিবি	যে যাতনা যতনে
শ্যামা এবার ছেড়েছি মা	রামপ্রসাদী সুর
এই বেল সবে মিলে	তেলেনা গানের অনুসরণ
কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে	এ ভরাব বাদর
এনেছি মোরা এনেছি মোরা	ব্যান্ড সংগীতের আদর্শে

'বাল্মীকিপ্রতিভা'র গানগুলো রাগরাগিণী অবলম্বনে হলেও যেখানে যে গান ভাবের সাথে মিলে যায়, সেখানে তিনি সেইভাবে ব্যবহার করেছেন আর এখানেই সুরকারের সার্থকতা। অন্যদিকে 'কালমৃগয়া'ও তিনি একই আর্দশে রচনা করেন। এই গীতিনাট্যটির ৩৯টি গানের ৯টি গানই পরিবর্ধিত 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র মধ্যে স্থান পেয়েছে। এ নাটকের গানগুলোও রাগরাগিণীর অনুকরণে। বিলেতি গানের অনুসরণ ছাড়া অন্যান্য আদর্শানুসারে বা পূর্ববর্তী গানের সুরে যে গানগুলো রয়েছে তা উল্লেখ করা হলো :

গান	সুর
যাও রে অনন্তধামে	গুজরাটী
সঘন ঘন ছাইল	ইন্দহুঁকী অসবরী
কে জানে কোথা সে	সহে না যাতনা

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র সার্থকতায় তিনি এই নাটকটি রচনা করেন। গীতিনাট্যের ভাবের দিকে লক্ষ্য রেখেই সুরারোপ করা হয়েছে তাল ও ছন্দের ব্যবহারে। 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যটি এই দুই নাটক থেকে ভিন্ন। নাট্যটির ৬৩টি গানের মাঝে ৩৬টি গানে রাগ-

রাগিণী ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে মিশ্র রাগ রয়েছে ১৬টি। এই নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথ সৃজনী শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। নাটকটির গানগুলোর মধ্যে ঐক্য রয়েছে। একটি গানের শেষে আরেকটি গান কিংবা সংলাপের ধাঁচে দুটি গান কথাবলার মত করে ব্যবহার করা হয়েছে। গানগুলোতে রাগ-রাগিণী ও তালের মধ্য দিয়ে নাটকে গানগুলোতে অন্তর্নিহিত ভাবটি বজায় রাখা হয়েছে। এই নাটকের মূল রস প্রেম আর তাই গানে কোমল-ভাবাত্মক রাগরাগিণী যেমন ভৈরব, ভৈরবী, কাফি, পিলু বেহাগ ও বাহার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

নৃত্যনাট্য

নৃত্যনাট্যে নেপথ্য গান এবং মঞ্চে নাচের মাধ্যমে বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলা হয় । তবে গীতিনাট্যের যুগে নৃত্যের কথা রবীন্দ্রনাথ ভাবেননি । গদ্যনাটকের অভিনয় থেকেই গানের সাথে নানা ভঙ্গির নাচের প্রচলন করেন । বলা যায় তাঁর নাট্যরচনার ধারাবাহিকতার সাথে নাটকের গানে নাচ যুক্ত হতে থাকে । ১৯১১ সালের ২৬ বৈশাখ তিনি যখন 'রাজা' নাটকে অভিনয় করেন তখন অনেক সংগীত অনুরাগী এসেছিলেন । অনেকের মধ্যে 'প্রবাসী' পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে শ্রীযুক্তা সীতা দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় এই অভিনয় সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, "ছেলেদের গানগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল । তাহাদের মধ্যে ঠাকুর্দারূপী কবিবরের নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম । তিনি অতি সুন্দর নৃত্য করিতে পারিতেন ।"[১৯]

রবীন্দ্রনাথ 'শারদোৎসব', 'অচলায়তন', 'ফাল্গুনী', 'ঋণশোধ', 'বসন্ত', 'অরূপরতন', 'শেষ বর্ষণ', 'নটীর পূজা', 'ঋতুরঙ্গ নটরাজ', 'শাপমোচন' প্রভৃতি নাটকে গানের সাথে নাচ কম্পোজ করেছিলেন । ১৯২৭ সালে তিনি জাভা ও বালি দ্বীপের নৃত্যকলার সাথে পরিচিত হন । এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: "এ দেশে উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ ।...এক-একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক-একটি বিশেষ পথ থাকে ।...এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায় তখন সে নাচিয়ে তোলে । মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে ।"[২০]

গীতিনাট্য দিয়ে নাটক রচনা শুরু হলেও তাঁর নাটক রচনার সমাপ্তি ঘটে নৃত্যনাট্য রচনার মধ্য দিয়ে । নাচের এই উৎসাহ দেখা যায় 'শারদোৎসব', 'অচলায়তন', ও 'ফাল্গুনী'তে । তিনি শান্তিনিকেতনে এই নাটকগুলোতে বালকদের নাচতে উৎসাহ দিতেন । অভিনয়ের অঙ্গ হিসেবে কোথাও কোথাও হয়তো নৃত্যের ভঙ্গিমা ব্যবহৃত হয়েছিল । নৃত্যনাট্য রচনার আগে নৃত্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতায় তিনি জানান:

> "একদিন জাপানি নাচ দেখে এলুম । মনে হলো এ যেন দেহভঙ্গির সংগীত । এই সংগীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ । অর্থাৎ, পদে পদে মীড় । ভঙ্গি বৈচিত্র্যের পরপস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই, কিংবা কোথাও জোড়ের চিহ্ন দেখা যায় না; সমস্ত দেহ পুষ্পিত লতার মতো একসঙ্গে দুলতে দুলতে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি করছে। খাঁটি য়ুরোপীয় নাচ

অর্ধনারীশ্বরের মতো আধখানা ব্যায়াম, আধখানা নাচ; তার মধ্যে লম্ফঝম্প, ঘুরপাক, আকাশকে লক্ষ্য করে লাথি ছোঁড়াছুড়ি আছে। জাপানি নাচ একেবারে পরিপূর্ণ নাচ। তার সজ্জার মধ্যেও লেশমাত্র উলঙ্গতা নেই। অন্য দেশের নাচে দেহের সৌন্দর্যলীলার সঙ্গে দেহের লালসা মিশ্রিত। এখানে নাচের কোন ভঙ্গির মধ্যে লালসার ইশারামাত্র দেখা গেল না।"[২১]

'শারদোৎসব' নাটকটির পর্ব থেকেই গানের সাথে নৃত্যের আভাস ফুটে ওঠে। নটীর পূজা নাটকে এসে নৃত্যকে নাটকের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা গেল।

শাস্ত্রীয়ভাবে নৃত্যনাট্যের সংজ্ঞা হলো গীত বাদ্য ও নৃত্যের মাধ্যমে অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নৃত্যকলার ধারাতে প্রতিভাত হতেন। তাঁর ভাষায় :

"আমি পূর্বে দেশের নানা স্থানে বেড়াবার কালে নৃত্যকলা দেখবার সুযোগ পেয়েছি। জাভায়, বালীতে, শ্যামে, চীনে, জাপানে, আমাদের দেশে কোচিন মালাবার মণিপুরে। য়ুরোপের ফোকডান্স এবং অন্যান্য নাচের সঙ্গে আমি পরিচিত। এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আছে, বলবার অধিকার আছে, এই কথা আপনাদের বলতে দ্বিধা করে না যে আমাদের আশ্রমে নৃত্যকলার ভিতরে সকল ধারা মিশেছে, তার পিছনে সাধনা যে শিল্পবোধ রয়েছে এবং সমগ্রের সৌন্দর্য বিকাশ আছে তা যে-কোনখানেই দুর্লভ।"[২২]

মূখ্যত 'চিত্রাঙ্গদা', 'চন্ডালিকা' ও 'শ্যামা'– এই তিনটি নাটককে নৃত্যনাট্য বলা হয়। যদিও অনেকে বলে থাকেন 'নটীর পূজা' নাটকের শেষ দৃশ্যে শ্রীমতীর গাওয়া 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো নমো হে নমো' গানের সঙ্গে নাচের দৃশ্যেই নৃত্যনাট্যের সূচনা হয়। তবুও উল্লিখিত তিনটি নাটককে নৃত্যনাট্য বলার প্রধান কারণ হলো, এই কয়টি নাটকের সংগীতাংশ নৃত্যের বাঁধা ছন্দের ভিত্তিতে রচিত। শাপমোচনকেও তাঁর নৃত্যনাট্যের সূত্রপাতের নাটক হিসেবে গণ্য করা হয়।

১. নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। ১৮৯২ সালে এই নামে রচিত কাব্যনাট্যের বিষয়বস্তু ও তত্ত্ব অভিন্ন। মহাভারতের আদি পর্বে বর্ণিত অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার প্রেমের কাহিনির সূত্রেই এই নাটকের নানা ঘটনার বৈচিত্র্য সমাবেশ। নাটকটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :

"মণিপুররাজের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে তাঁর বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তৎসত্ত্বেও যখন রাজকুলে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হল তখন রাজা তাঁকে পুত্ররূপে পালন করলেন।

রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্বিদ্যা; শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজদন্ডনীতি।

অর্জুন দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করে ভ্রমণ করতে করতে এসেছেন মণিপুরে। তখনই এই নাটকের আখ্যান আরম্ভ।"[২৩]

এটির রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

"অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্র মাস হবে। রেললাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে, বেগুনি, সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা মনে এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে– তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরু প্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রস সঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্ভ ফলসম্ভারে। সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হলো সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার সুররূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ-যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তার দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে।...এই ভাবকে নাট্য আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনই মনে এল, সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী...।"[২৪]

রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের ভূমিকায় এবং ১৩৪২ সালের ফাল্গুন মাসে অভিনয়ের সময়ও মঞ্চে ব্যক্ত করেছেন :

'প্রভাতের প্রথম আভাস অরুণবর্ণ আভার আবরণে,
অর্ধসুপ্ত চক্ষুর 'পরে লাগে তারি আঘাত।
অবশেষে সেই অবরণ ভেদ ক'রে সে আপন নিরঞ্জন শুভ্রতায়
সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে জাগ্রত জগতে।
তেমনি সত্যের প্রথম আবির্ভাবসাজ-সজ্জার বহিরঙ্গে, বর্ণবৈচিত্র্যে,
তাই দিয়ে অসংস্কৃত চিত্তকে সে করে মুগ্ধ
অবশেষে নিজের সেই আচ্ছাদন যখন সে মোচন করে
তখন প্রবুদ্ধ মনের কাছে নির্মল মহিমায় তার বিকাশ।
এই কথাটিই চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্মকথা।
এই নাট্যকাহিনীর মধ্যে আছে, প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,

পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে

নিরলংকার সত্যের সহজ মহিমায় ।'

নৃত্যনাট্যটির কাহিনি পর্যালোচনায় দেখা যায়, অর্জুন বারো বছর ধরে ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করে ভ্রমণকালে মণিপুরে আসেন। সেখানে এসে পরিচয় হয় সখীদের সাথে বনে শিকার করতে আসা বালকবেশী চিত্রাঙ্গদার সাথে। বালকবেশে অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করে কিন্তু অর্জুন প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর আত্মপরিচয় রেখে অর্জুনকে প্রাণ-মন-দেহ নিবেদন করলেন চিত্রাঙ্গদা। কিন্তু ব্রহ্মচর্যের অজুহাতে অর্জুন সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত কুরূপা চিত্রাঙ্গদা মদনদেবের কাছ থেকে এক বছরের জন্য চেয়ে নেয় ললিত দেহসৌন্দর্য : 'পুরুষের বিদ্যা করেছিনু শিক্ষা/লভি নাই মনোহরণের দীক্ষা -/ কুসুমধনু,/অপমানে লাঞ্ছিত তরুণ তনু ।/ অর্জুন ব্রহ্মচারী/ মোর মুখে হেরিল না নারী,/ ফিরাইল, গেল ফিরে ।/ দয়া করো অভাগীরে -/ শুধু এক বরষের জন্যে/ পুষ্পলাবণ্যে/ মোর দেহ পাক তব স্বর্গের মূল্য/ মর্তে অতুল্য॥'

মদন বলেন : 'তাই আমি দিনু বর, / কটাক্ষে রবে তব পঞ্চম শর, / মম পঞ্চম শর- / দিবে মন মহি/ নারীবিদ্রোহী সন্ন্যাসীরে/ পাবে অচিরে,/ বন্দী করিবে ভুজপাশে/ বিদ্রুপহাসে ।/ মণিপররাজকন্যা/ কান্তহৃদয়-বিজয়ে হবে ধন্যা ।'

সুরূপা চিত্রাঙ্গদার রূপের আগুনে পুড়ে গেল অর্জুনের ব্রহ্মচর্যের কুড়েঁ ঘরখানি। একদিন গ্রামবাসীর কাছে চিত্রাঙ্গদার বীর্য ও করুণার কথা জানতে পেরে অর্জুন তারই প্রেমে পড়ে গেলেন। সুরূপা চিত্রাঙ্গদা তাকে তার নারীত্বের দৈন্যতার কথা জানালেও তিনি মোহভঙ্গ হন না। চিত্রাঙ্গদা বর্ষপূর্তির আগেই মদনের কাছ থেকে তার পূর্বরূপ ফেরত নিলেন : 'লহো লহো ফিরে লহো/ তোমার এই বর/ হে অনঙ্গদেব ।/ মুক্তি দেহো মোরে, ঘুচায়ে দাও/ এ মিথ্যার জাল,/ হে অনঙ্গদেব ।'

মদন বলেন : 'তাই হোক তবে তাই হোক,/কেটে যাক রঙিন কুয়াশা,/ দেখা দিক শুভ্র আলোক ।'

নিজস্ব কুরূপ নিয়ে চিত্রাঙ্গদা প্রকৃত আত্মপরিচয় দিলেন অর্জুনের কাছে। রূপসাগরে ডুব দিয়ে অর্জুন এতোদিন অরূপরতনের স্পর্শ পেয়েছেন। তাই রূপহীনা চিত্রাঙ্গদাকেই বরণ করে তিনি ধন্য হলেন।

এই নৃত্যনাট্যটিতে আগের কিছু রচিত গান ও কথা বদল করে কিছু পুরানো গান সংযোজন

করেছেন। নতুন গান রচনার বিষয়ে একটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। ড. নিতাই বসু জানান :

> "'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের রচনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন মেতেছিলেন, সেই সময় একদিন খুব ভোরবেলা শান্তিদেব ঘোষকে ডেকে পাঠালেন, সচরাচর তিনি এত সকালে কাউকে ডাকেন না। সচরাচর অত সকালে তিনি কাউকে ডাকতেন না। শান্তিদেব সেখানে দ্রুত উপস্থিত হয়ে দেখলেন তাঁর প্রাতরাশ শেষ হয়নি। তিনি শান্তিদেবকে বলেন একটা গান মাঝরাতে তাঁর মাথায় আসে ঘুমের মধ্যে। সেই যে ঘুম ভাঙ্গে, সারারাত আর ঘুমাতে পারেননি। কোন্ ভাষায় ও কী সুরে সেই গানের বাণীরূপ দেবেন তাই ভাবতে-ভাবতেই সারারাত কেটে যায়। সকালে উঠে আগে সেই গানটি লিখে তবে স্বস্তি পেয়েছেন। দুঃখ করে বললেন, রাত্রে গানটি তাঁর মাথায় যেভাবে এসেছিল, সকালে নানা বাধায় একটু এদিক-ওদিক হয়েছে সুর প্রয়োগের ক্ষেত্রে। গানটি হল, 'আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি'।"২৫

বেহাগে রচিত গানটি সাহিত্য, সংগীত ও নৃত্যে একটি অনন্য রচনা।

'চিত্রঙ্গদা'র আর একটি গানের উৎস হলো যুযুৎসু শিক্ষাকে নিয়ে। জাপান থেকে তাকাগাকিকে আনা হয়েছিল শান্তিনিকেতনে যুযুৎসু শিক্ষা প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে। এ-বিষয়ে দেশবাসীকে উৎসাহিত করার জন্য নানা স্থানে প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করেছিলেন। রানীচন্দ এক তথ্যে জানান,

> "কতখানি শিখল ছাত্রছাত্রীরা– একটা "শো" দেওয়া হলো তখনকার খেলার মাঠে। আশ্রমবাসীরা সকলে উপস্থিত সেখানে। মেয়ের দলও ঢোলা পাজামা কুর্তা পরে দাঁড়িয়েছে লম্বা সারি দিয়ে। গান হলো,
>
> 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমন,
> সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ'...
>
> মনে হলো যেন আমাদের একটা রুদ্ধ দিক খুলে গেল - যেখানে অজস্র আলো অবাধ হাওয়া। যেখানে দিন নাই রাত্রি নাই - খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে এই যে আমি আছি, ভয় নেই কারুর। এই দিনের এই অনুষ্ঠানের জন্যই এই গানটি লিখেছিলেন গুরুদেব। এই গান এই উদ্দীপনা আজও ছড়িয়ে দিচ্ছে সকলের মনে।"২৬

শান্তিদেব ঘোষ অবশ্য অন্য একটি তথ্য দিয়েছেন। যদিও তিনি বলেছেন যে, এই ধরনের শিক্ষা-প্রদর্শনীগুলির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এই গানটি রচিত হয়েছিল, তবে তাঁর মতে, এটি প্রথম গাওয়া হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে কলকাতার নিউ এম্পায়ায় রঙ্গমঞ্চে। কিন্তু ড. নিতাই বসু রানী চন্দের

অভিমতটি অধিকতর তথ্যনির্ভর মনে করেছেন। কারণ তিনি মনে করেন, গানটি রচনার উপলক্ষ্য হিসেবে যখন দুজনেই যুযুৎসু শিক্ষার প্রসঙ্গ তুলেছেন তখন সংগীতটি সেই সূত্রে রচিত হয়ে এক বছর পর গাইবার ঘটনার মধ্যে অসংগতি রয়ে যায়।[২৭]

'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা' গানটি লেখার ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। ড. নিতাই বসু জানান,

> "এই গানটি 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার যুগ্মনৃত্যের গান। গানটি লেখা হয়েছিল 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে' গানটির ছন্দকে অনুসরণ করে। 'চিত্রাঙ্গদা' লেখার কয়েক বছর আগে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের বিবাহ উপলক্ষ্যে তিনি গানটির সঙ্গে একটি যুগ্মনৃত্য রচনা করেন। গানের সঙ্গে নাচটি খুবই মনোরঞ্জক হয়েছিল। পরবর্তীকালে নাচটি 'চিত্রাঙ্গদা'য় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করলে রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা'র সঙ্গে কথা মিলিয়ে একই ছন্দে 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা' গানটি লিখলেন।"[২৮]

অন্যান্য পরিবর্তিত গানগুলোর মধ্যে 'আমার এই রিক্ত ডালি' গানটি নেয়া হয়েছে 'বাকি আমি রাখব না' থেকে। 'অশান্তি আজ হানল' এই সুরে আগের গান ছিল 'বসন্তে ফুল গাঁথল', 'বঁধু কোন মায়া লাগল চোখে' কথা বদলিয়ে রচনা করলেন 'কোন আলো লাগল চোখে'; 'আমি কি বলে করিব নিবেদন' পরিবর্তন করে ব্যবহার করেন 'আমি তোমারে করিব নিবেদন' গানটি। ইন্দিরা দেবীর মতে এই নাটকের 'ক্ষমা কর আমায়' গানটির সুর নেয়া হয়েছে একটি ব্রহ্মসংগীত 'জয় জয় ব্রহ্মন্ ব্রহ্মন্' থেকে।

অনেকের মতে, 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের রিহার্সেলের সময়ে প্রথম দিকে 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের 'সখী বহে গেল বেলা' গানটি রাখা হলেও পরে গানটি পরিবর্তন করে 'রোদন ভরা এ বসন্ত' গানটি ব্যবহার করা হয়।

প্রতিমা দেবী লিখিত এবং রবীন্দ্রনাথ অনুমোদিত "চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "চিত্রাঙ্গদা আর-একটি বিশেষ জিনিস হলো ছোট ছোট কবিতাগুলি, তারা মাঝে মাঝে সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে মূল ঘটনার, গান ও নাচ বন্ধ করে দর্শকের চিত্তকে বিশ্রাম দেওয়ার সঙ্গে নাটকের ঘটনাসূত্রের যোগ রাখাই হল তাদের কাজ, এই কবিতাগুলির ছন্দ দেহের নৃত্যলীলাকে বাঁচিয়ে রাখে। পরবর্তী নৃত্য যে আবার সেই ভঙ্গীর মধ্যে সাড়া দিয়ে উঠবে এ যেন তারই ভূমিকা।"[২৯]

'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে অর্জুনের নাচ পরিবেশিত হয় কথাকলির ভঙ্গীতে এবং এর বেশিরভাগ নাচ পরিবেশিত হয় মণিপুরী পদ্ধতিতে। তবে কোন কোন জায়গায় কথাকলির নাচ আছে, যেমন চিত্রাঙ্গদার শিকারি নৃত্যে। 'বঁধু কোন আলো লাগলো চোখে' গানটির সাথে মণিপুরী নৃত্য থাকলেও গানটির লয় যেখানে কমে যায়- 'অস্ফুট মঞ্জরী কুঞ্জবনে' সেখানে এর স্থলে জাভা নৃত্যের প্রয়োগ করা হয়। এছাড়াও কিছু লোকনৃত্যের ভঙ্গী মিশে ছিল। বহির্ভারতের নৃত্য পদ্ধতিও ব্যবহৃত হয়েছিল। যেমন ১৯৪৯ সালে 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়ের সময় 'মাকী' নামক এক জাপানি যুবক ছাত্র হিসেবে ছিলেন। তিনি সংগীতভবনে নৃত্য এবং যন্ত্রসংগীত শিখতেন। তাকে এই নাটকে মদনের ভূমিকায় নাচতে বলা হয়। সাথে বলে দেয়া হয় জাপানের প্রাচীন নৃত্য পদ্ধতিতে অভিনয় করতে। মাকী মহোৎসাহে গানগুলির সঙ্গে জাপানি নৃত্য পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল। রবীন্দ্রনাথসহ শান্তিনিকেতনের সকলেই সেই নৃত্যাভিনয় দেখে খুশি হয়েছিল। শান্তিদেব ঘোষ জানান :

> "চিত্রাঙ্গদা ১৯৩৬ সলে প্রথম যেবার অভিনীত হয়, তখন তাতে মণিপুরী পদ্ধতি ছিল প্রধান। তার সঙ্গে সামান্য কিছু কথাকলি ও লোকনৃত্য ভঙ্গি মেশানো ছিল। কিন্তু কথাকলির উপযুক্ত শিক্ষক পরে পাওয়া যাবার পর অর্জুনের অভিনয়ে কথাকলি নৃত্যপদ্ধতি বেশ খানিকটা প্রাধান্য পেল অন্যান্য নাচের সাথে।"৩০

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে, কলকাতা বা সে যুগে বাংলাদেশের বাইরে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানে কখনো মাইকের ব্যবহার করা হয়নি। একক কণ্ঠের গান প্রেক্ষাগৃহের শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতো না বলে চিত্রাঙ্গদার সবকটি গান অত্যধিক উঁচু স্বরে গাইতে হতো। গানগুলো গাওয়া হতো সাধারণত শুদ্ধ নি সুরকে খরজ সুর করে। ঐ স্কেলে গাওয়া হতো বলে গানের অত্যধিক উঁচু সুরের অংশ মেয়েরা গাইত না। নিচু সুরের অংশে মেয়েরা সহজে গাইতে পারার কারণে ছেলেরা তা অনেক সময় গাইত না। এই নাটকটি সম্বন্ধে তিনি বলেন :

> "নৃত্যকলার রাজ্যাভিষেকে সাহিত্যকে স্থান নিতে হয় সিংহাসনের পাদপীঠে। সংগীতে বাণী এবং সুর সমান গৌরবে পাশাপাশি বসতেও পারে যদিও সেখানে বাণীকে বসতে হয় বামে, স্ত্রীজনোচিত আত্মসম্বরণ করে। কণ্ঠের পথে বাণীতে এবং সুরেতে হাত ধরাধরি করবার সুযোগ পায় - কিন্তু নৃত্য হলো মূলত নির্বাকের ভাষা। বিশ্বভুবন মূক, মহেন্দ্রের সভায় তার আত্মনিবেদন নৃত্যে। নৃত্যের রঙ্গক্ষেত্র বিরাট, তৃণে তৃণে হাওয়ার হিল্লোল থেকে আরম্ভ করে তারায় তারায় ছন্দের মালা গাঁথা পর্যন্ত চলছে ভঙ্গিলীলার নিত্য মহোৎসব। মানুষের সুখ-দুঃখে

এই বিশ্বের ভাষাকে যখন আহ্বান করা হয় বাণী তখন কেবলমাত্র ছন্দের বাহনরূপেই তার সাহচর্য করে। কাব্যে গানে যে অনির্বচনীয়তার প্রকাশ ঘটে মুখ্যত সেটা বচনে নয়, সেটা ছন্দে।...আমরা যে-সব প্রদেশে চিত্রাঙ্গদার নৃত্যরঙ্গ নিয়ে গেছি সে সব জায়গায় বাংলা ভাষা নিরর্থক, সেই কারণেই প্রমাণ হয়ে গেছে, রসের প্রকাশে অর্থের সার্থকতা কম। ছাপার অক্ষরে চিত্রাঙ্গদা বইখানা সেই কারণে অত্যন্ত লজ্জিত– নৃত্যের ছন্দেই যার আব্রু, সেই বাণী এখানে নগ্ন।"৩১

চিত্রাঙ্গদার প্রথম দৃশ্যের শেষে বন্য অনুচরদের সাথে নাচের দৃশ্যটি একটি বিশেষ কারণে রাখা হয়। চিত্রাঙ্গদা ও সখীদের প্রথম দৃশ্যের সাজটি দ্বিতীয় দৃশ্যে পরিবর্তন করা হতো। প্রথম দৃশ্যের শেষে পাঁচ মিনিটের জন্য বিরতি থাকলেও সজ্জা পরিবর্তনের জন্য সময়টুকু অপ্রতুল ছিল। তাই অর্জুন ও বনচরদের ঐ নাচটিকে ঐ স্থানে রাখা হয়। চিত্রাঙ্গদার নৃত্যনাট্যের ২য় দৃশ্যে মেয়েদের সাজের ক্ষেত্রে প্রথমে প্রথম দৃশ্যের সাজের উপর সাজ পরানো হতো। অর্জুনের সহচর সহ নাচ ও বিরতির সময়ে উপরের সাজটি খুলে ফেলত। পশ্চিম ভারতের অভিনয়ের সময় এই সাজ পরিবর্তনের জন্য আরো কিছু সময়ের যখন প্রয়োজন দেখা দেয় তখন গুরুদেব স্থির করেন, দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরুতেই গান হবে। নতুন একটি গান রচনা করে সকলকে শিখিয়ে দেন। সমবেত কণ্ঠের গানটি ছিল 'যাও যাও যদি যাও তবে'।

পঞ্চম দৃশ্যের শেষে 'বিনা সাজে সাজি' গানটি রাখা হয়েছিল, দ্বিতীয় চিত্রাঙ্গদার সাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনে।

এই নাটকটি অনেক পরিণত এবং প্রায় সবগুলো গানই নাটকের কাহিনির সাথে মিল রেখে বা কাহিনির প্রয়োজনে রচিত মৌলিক গান। পুরানো গান খুব বেশি স্থান পায়নি। এই নাটকটির মূলতত্ত্ব অনেকটাই মিলে যায় 'রাজা' ও 'তপতী'র সাথে। গানের ভাষায় বলা যায় : 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না,/ ভালোবাসায় ভোলাব।'

সাহিত্যের দিক থেকে সমসাময়িক কাব্যগ্রন্থ *মানসী*। মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য ও অন্তর দুটি পৃথক সত্তা। বাহ্যিক সৌন্দর্য ক্ষণিকের– সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক। 'রাজা' নাটকে রাজার ছিল কুরূপ কিন্তু মনের আলোতে তিনি রানীকে জয় করে নেন। কিন্তু 'চিত্রাঙ্গদা'য় কুরূপা 'চিত্রাঙ্গদা' সুরূপে ফিরলেও কুরূপেই ফিরে যায়, কারণ বাহ্যিক সৌন্দর্য দিয়ে সে অর্জুনকে পেতে চায় না। *মানসী* কাব্যগ্রন্থের 'গুপ্ত প্রেম' কবিতাটিতে এরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় : 'তবে পরানে

ভালোবাসা কেন গো দিলে/ রূপ না দিলে যদি বিধি হে ।/ পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,/ পূজিব তারে গিয়া কী দিয়ে ।'

এই একই সুর 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের মূলে ও গানে । সে সুরূপা হয়ে অর্জুনকে পেতে চায় ।

২. নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা (১৯৩৬)

এটি নাটক 'চন্ডালিকা'রই নৃত্যনাট্যরূপ । ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে প্রতিমা দেবী 'চন্ডালিকা' গীতিনাট্যটিকে নৃত্যাভিনয়ে করার ইচ্ছায় কয়েকটি দৃশ্যে ভাগ করে সাজিয়েছিলেন । কাহিনির দিক থেকে গদ্যনাটক ও নৃত্যনাট্যর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই । 'চন্ডালিকার যে রূপান্তর, তা হলো রূপগত পরিবর্তন ও সংগীত প্রয়োগের মৌলিকতা । এছাড়া ফুলওয়ালী, দইওয়ালা, চুড়িবিক্রেতা প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্রের নতুন সংযোজনা রয়েছে ।

নৃত্যনাট্যটির কাহিনি অনুসারে চন্ডালিনীর ঝি বলে প্রকৃতিকে সবাই ঘৃণা করে । এমনকি ঘৃণায় ফুলওয়ালী, দইওয়ালা, চুড়িওয়ালা– এরাও তার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলে । এত অপমানের মধ্যে তাকে জন্ম দেয়ায় সে তার মাকে ধিক্কার দেয় । এমন সময় বৌদ্ধআশ্রম থেকে আনন্দ এসে তার হাতে জল পান করলেন । তাঁর কাছেই প্রকৃতি প্রথম পেল 'মানব'-এর স্বীকৃতি । এ যেন নতুন জন্ম হলো তার : 'এ নুতন জন্ম , নুতন জন্ম / নূতন জন্ম আমার ।'

আনন্দর করুণায় ও রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতি তাকেই দেহ-মন-প্রাণ নিবেদন করল । এমন সময় একদিন আনন্দ প্রকৃতিকে পাশ কাটিয়ে ভিক্ষুদলকে নিয়ে চলে যায় । এতে প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হয়ে তার অসাধ্য-সাধন-পটিয়সী মাকে বাধ্য করে তার সম্মোহন মন্ত্রের আকর্ষণে আনন্দকে তার সামনে টেনে আনতে । পরাভূত আনন্দের ব্যথাজর্জরিত মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে অনুতপ্ত প্রকৃতি তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন: 'প্রভু, এসেছ উদ্ধারিতে আমায়,/ দিলে তার এত মূল্য,/ নিলে তার এত দুঃখ ।/ ক্ষমা করো, ক্ষমা করো -/ মাটিতে টেনেছি তোমারে,/ এনেছি নীচে,/ ধূলি হতে তুলি নাও আমায়/ তব পুণ্যলোকে ।/ ক্ষমা করো ।/ জয় হোক তোমার জয় হোক ।'

শেষ পর্যন্ত যেতে দিল তাকে তার পুণ্যলোকে ।

নৃত্যনাট্য 'চন্ডালিকা'র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নৃত্যকলারসিক প্রতিমা দেবী বলেন :

> "চন্ডালিকার ভূমিকা হল খাঁটি সাহিত্য; একটি মানুষের মানসিক ক্রমবিকাশের পটভূমির উপর তার রচনা । মানুষের মধ্যে যা আদিম আকর্ষণ তারই আবেগ দিয়ে শুরু হয়েছে চন্ডালিকার নৃত্যকলা । দেহের যে আকর্ষণী মন্ত্র যা শিবের তপস্যাকেও টলাতে পেরেছিল প্রকৃতি-পুরুষের অন্তরের সেই

চিরন্তন দ্বন্দ্ব পৌঁছল চন্ডালিকার প্রাণে, তারই আঘাতে দোল-খাওয়া মন নৃত্যসংগীতের তালে তালে আপনাকে বিচ্ছুরিত করে অবসাদ-বিষাদ-করুণার অতিশয্যে। তালের ছন্দ ও সুরের প্রেরণায় মূক হৃদয়ের বাণী মুখরিত হয়েছিল বিচিত্র সুরের ব্যঞ্জনা। সুর চলেছে নদীর স্রোতের মতো– কখনো তার উদ্দাম মূর্তি, কখনো তার অবসাদের বিরাম, আর কোথাও বা সে অধৈর্যের ছন্দে ত্রস্ত। তারপর সে স্রোত পৌঁছল গিয়ে অগাধ সমুদ্রে। বাসনা তলিয়ে গেল প্রেমের অকূল পাথারে। ঝড় থামল, এল শান্তি। দেহের কামনা চিত্তের অন্তরতম তলায় প্রেমের মহিমাকে খুঁজে পেয়ে তৃপ্ত হল, পূর্ণ হল।”৩২

গদ্যনাট্য ‘চন্ডালিকা’কে নৃত্যনাট্যতে রূপান্তর করার সময় ভাষাগত পরিবর্তন করা হয়। নাচের কারণে গদ্যভাষাকে কাব্যভাষার ছন্দে নিয়ে আসেন। যেমন :

গদ্যনাট্য চন্ডালিকা	নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা
প্রকৃতি :	প্রকৃতি :
বললেন আমি চন্ডালের মেয়ে,	ক্ষমা করো প্রভু ক্ষমা করো মোরে
কুয়োর জলে অশুদ্ধ।	আমি চন্ডালের কন্যা।
তিনি বললেন, যে মানুষ আমি তুমিও সেই	মোর কুপের বারি অশুচি।
মানুষ। সব জলই তীর্থজল যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে,	সেই মানব তুমি কন্যা।
তৃপ্ত করে তৃষিতকে।	সেই বারি তীর্থবারি।
	যা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে।
আবার :	
আমি চাই তাঁকে। তিনি অচমকা এসে	আমি চাই তাঁরে
আমাকে জানিয়ে গেলেন, আমার সেবাও	আমারে দিলেন যিনি সেবিকার সম্মান,
চলবে বিধাতার সংসারে।	ঝরে-পড়া ধুৎরো ফুল
এত বড় আশ্চর্য কথা। সেবিকা আমি,	ধুলো হতে তুলে নিলেন যিনি দক্ষিণ
করে।	
এই কথাটি নিন তুলে ধুলোর থেকে	ওগো প্রভু, ওগো প্রভু
তাঁর বুকের কাছে, এই ধুতরো ফুলটাকে।	সেই ফুলে মালা গাঁথো,
	পরো পরো আপন গলায়।

এখানে শুধু ধ্বনির পরিবর্তন হয়নি, রূপান্তর হয়েছে সংহতি আর বিন্যাসের।

এই নাটকের জন্য একটি দক্ষিণী তালের নাচের কথা ভেবে 'আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা' গানটি লিখেছিলেন। নাচের তালে যে তেহাই পড়ে তাকেই মিলিয়ে দিলেন 'আয় তোরা আয়' কথাটিকে তিন বার গাইয়ে। এ সব মৃদঙ্গের তালগুলি কবির সামনে আউড়ে যেতেন শান্তিদেব ঘোষ। কবি সেই ঝংকার মিলিয়ে গান বেঁধেছেন। সিংহলের ক্যান্ডি নাচের তালের বোলের সাথে হুবুহু মিলিয়ে এই নাটকের 'যে আমারে এনেছ এই অপমানের অন্ধকারে' গানটি বেঁধেছেন।

এই নাটকের কিছু গান সংলাপের গদ্যভঙ্গীর সুরে বাঁধা হয়েছে। ছন্দ বজায় রেখে গদ্যধর্মী সংলাপ সংগীতে সাধারণত দেখা যায় না। উদাহরণস্বরূপ চন্ডালিকা নৃত্যনাট্যের দ্বিতীয় দৃশ্যের একটি গদ্য গানের উল্লেখ করছিঃ "সেদিন বাজল দুপুরের ঘন্টা, ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর, স্নান করাতেছিলাম কুয়োতলার মা-মরা বাছুরটিকে। সামনে এসে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, আমায় বললেন, জল দাও। শিউরে উঠল দেহ আমার চমকে উঠল প্রাণ। বল দেখি মা, সারা নগরে কি কোথাও নেই জল। কেন এলেন আমার কুয়োর ধারে, আমাকে দিলেন সহসা মানুষের তৃষ্ণা মেটানো সম্মান।"৩৩

নাটকে ১৬টি গান গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য পর্যায়ের। পূজা, প্রেম ও প্রকৃতি গ্রীষ্ম ও বসন্ত পর্যায়ের গান রয়েছে। এই নাটকে গানের সুর, তার ব্যবহার, গানের গতি বা লয়ের নানারকম বৈচিত্র্য ও নাট্যরসের সৃষ্টি করা হয়েছে। নাটকটির গতির সাথে সুরের লয় বা টেমপো পরিবর্তনের মাধ্যমে নাটকীয়তা কিভাবে পরিবর্তন হয় তার উদাহরণে নাটকটির প্রথম দৃশ্যে দুটি গানের কথা বলা যায়–

মা :

'কী যে ভাবিস তুই অন্যমনে/নিষ্কারণে-
বেলা বহে যায় বেলা বহে যায় যে।
রাজবাড়ি ঐ বাজে ঘন্টা ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং/বেলা বহে যায়।...
ত্বরা কর ত্বরা কর ত্বরা কর/জল তুলে নিয়ে তুই চল ঘর।'

প্রকৃতি :

'কাজ নেই কাজ নেই মা/কাজ নেই মোর ঘরকন্নায়

যাক ভেসে যাক যাক ভেসে সব বন্যায় ।'

প্রথম গানটিতে কথায় ও সুরে তাড়া দেবার একটা ইঙ্গিত দেখা যায়, যেমন 'ত্বরা কর ত্বরা কর' অংশে গানের দ্রুতগতি, আবার দ্বিতীয় গানটিতে প্রকৃতির উদাস ও বিষাদমাখা, গানের গতি শ্লথ। দুটি গানের কথা ও সুরের টেমপোতে দুজনের চরিত্রের মানসিক ভিন্নতা ও নাটকীয়তার ভিন্নতার পার্থক্য স্পষ্ট ধরা পরে ।

একই রাগে রবীন্দ্রনাথ দুই রসের গান সৃষ্টি করেছেন, যেমন ভৈরব রাগে রচিত প্রথম দৃশ্যের আনন্দের গান 'জল দাও আমায় জল দাও' এবং এর উত্তরে প্রকৃতির গাওয়া 'ক্ষমা কর প্রভু ক্ষমা কর মোরে' গানটির তুলনাতে দেখা যায়, আনন্দের গানটিতে শান্ত ও প্রশান্ত রস । সুরগুলো মধ্য সপ্তকের ভিতর, অন্যদিকে প্রকৃতির গানটি তার সপ্তকে চড়া সুরে বাঁধা আর্তনাদের সুরে ।

রাগের স্বার্থক রূপায়ণ করেছেন ভূপালী রাগের 'জাগেনি এখনো জাগেনি' গানটিতে । গানটি তৃতীয় দৃশ্যে প্রকৃতির মায়ের গাওয়া । ভূপালী রাগে মা নি বর্জিত কিন্তু এই গানটিতে কোথাও কোথাও 'নি' ব্যবহার করেছেন । স্বরলিপি দেয়া হলো বোঝার জন্য :

II র্গা র্গা র্রর্সা -া । -া -া -া -া I র্সা র্সা র্সা -া । ধা ধা পা -া I

জা গে নি০ ০ ০ ০ ০ ০এ খ নো ০ জা গে নি ০

I-পা -ধা -না -ধা । পা ধা পা পা I পা পা গা -পা । গা রা সা -া I

০ ০ ০ ০ র সা ত ল বা সি নী ০ না গি নী ০

I-সা -রা -গা -পা । -ধা -র্সা -র্রা -র্গা I র্গা র্গা র্রসা -া । -া -া -া -া I

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ জা গে নি০ ০ ০০০০।

* * * *

I র্গা র্গা র্গা র্গা । র্গা -া র্গা -া I -া -া -া -া । -া -া -া -া I

বেঁ ধে তা রে আ ন্ রে ০ ০০ ০০ ০০০০

I র্গা -র্ধা -র্ধা -র্পা । -র্গা -র্রা -র্সা -র্সা I -ধা -া -া -া । -া -া -া -া I[৩৪]

টা ন্ রে ০ ০ ০০০ ০০০ ০০ ০০০

ঔড়ব জাতীয় রাগ ভূপালী রাগের মা ও নি বর্জিত স্বর হবার কারণে স্বরগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে

চলে। রাগের এই লাফিয়ে চলাকে রবীন্দ্রনাথ নিপুণতার সাথে এই গানটি প্রয়োগ করেছেন। ড. দেবজ্যোতি মজুমদারের মতে, "গানটির স্বররূপের মধ্যে যেন উচাটন-বশীকরণ মন্ত্রের এক অদ্ভুত রস ও শক্তি ফুটে উঠেছে এবং গানটি শুনলেই যেন আমরা এরূপ অশুভ ও পাশব শক্তির প্রচ- আকর্ষণ ও দুর্বার শক্তি অনুভব করতে পারি।"[৩৫]

'ফুল বলে ধন্য আমি' গানটি রাগ ইমন কল্যানে রচিত। কিন্তু সঞ্চারীতে 'নয়ন তোমার নত করো' অংশে কোমল ঋষভের ব্যবহার করা হয়েছে :

II {সা -া ঋ -া । ঋা -া সা -ন্া । সা -া [স]পা -া । ঋা -া সা -া I[৩৬]

ন ০ য় ন্ তো০ মা র্ ন ০ ত ০ ক ০ রো ০

এই অংশের আত্মনিবেদনের ভাবটি স্বর কোমল ঋষভের প্রয়োগে ফোটানো হয়েছে। কথা ও সুরের সামঞ্জস্যের জন্য তিনি রাগরাগিণীর রূপের পরিবর্তনের সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে মিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

চন্ডালিকা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ "প্রবাসী" প্রবন্ধে লিখেছেন,

> "চন্ডালিকার ভূমিকা হল খাঁটি সাহিত্য; একটি মানুষের মানসিক ক্রমবিকাশের পটভূমির উপর তার রচনা। মানুষের মধ্যে যা আদিম আকর্ষণ তারই আবেগ দিয়ে শুরু হয়েছে চন্ডালিকার নৃত্যকলা। দেহের যে আকর্ষণী মন্ত্র যা শিবের তপস্যাকেও টলাতে পেরেছিল প্রকৃতি পুরুষের অন্তরের সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব পৌঁছাল চন্ডালিকার প্রাণে, তারই আঘাতে দোল-খাওয়া মন নৃত্যসংগীতের তালে আপনাকে বিচ্ছুরিত করে দিল অবসাদ বিষাদ করুণার আতিশয্যে।...এই যে প্রকৃতি-পুরুষের স্বভাবের মধ্যে মূলগত বিরুদ্ধতা, চন্ডালিকার সাহিত্য ও নৃত্যনাট্য সেই মানসিক জটিলতাকে সুর ও তালের ছন্দে প্রকাশ করতে চেয়েছে। দেহের অনুপম ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে মনোজগতের ইতিকথাকে নয়নগোচর করে তোলাই ছিল চন্ডালিকার আর্দশ।"[৩৭]

৩. নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা

১৯৩৯ সালের মার্চের ৫ তারিখে দোলপূর্ণিমায় 'মায়ার খেলা'র নৃত্যগীতের সাথে অংশবিশেষ শান্তিনিকেতনে অভিনিত হয়। রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'কে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করতে শুরু করেন ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরের দিকে। পুরানো গানগুলোকে নতুন করে বিন্যস্ত করেন, নতুন গান সংযোজন করেন এবং নৃত্যনাট্য হিসেবে নতুন করে পরিণতি দেন।

রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা'র নৃত্যাভিনয় নিয়ে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখেন :

"সম্প্রতি বৌমা স্থির করেছিল 'মায়ার খেলা'র নৃত্যাভিনয় করতে হবে। তাই তার পুনঃসংস্কারে লেগেছিল; যেখানে তার অভাব পূরণ করচি, কাঁচা ছিল শোধন করচি– গানের পরে গান লেখা চলছে এক– একদিনে চারটে পাঁচটা। যৌবনের তরঙ্গে মন দোদুল্যমান - জীর্ণ শরীরটাকে কোথায় দূরে ভাসিয়ে দিয়েছে। গানের সুরে যে রকম সৃষ্টির বদল করে দেয় এমন আর কিছুতে নয়।"৩৮

নৃত্যনাট্যটি গীতিনাট্য থেকে ছোট। তবে দুটি নাটকেই সাতটি দৃশ্য রয়েছে। নৃত্যনাট্যটির বেশিরভাগ গান প্রেম পর্যায়ের। গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা' থেকে নৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা'র গান অনেক পরিণত ছিল। যেমন গীতিনাট্যের 'আমি কারেও বুঝিনে, শুধু বুঝেছি তোমারে' গানটি বেহাগ রাগে রচিত। পরবর্তীকালে নাটকটিকে যখন নৃত্যনাট্যে পরিণত করলেন তখন এই গানটির আদলে রচনা করলেন 'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী তারে বুঝিতে পারিনি' গানটি। গান দুটির ভাবার্থে, ভাষা ও সুরের গঠনের দিক থেকে তুলনা করলে রবীন্দ্রনাথের রচনার দুই যুগের পার্থক্য ও তার পরবর্তী সংগীতসৃষ্টির রূপ বোঝা যায়। ভাষাগত ও ভাবগত পার্থক্য বোঝার জন্য গানদুটির কিছু অংশ আলোচনা করা হলো :

<u>গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'</u>	<u>নৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা'</u>
আমি কারেও বুঝিনে, শুধু বুঝেছি তোমারে।	যে ছিল আমার স্বপচারিণী
তোমাতে পেয়েছি আলো - সংশয় আঁধারে॥	তারে বুঝিতে পারিনি।
ফিরিয়াছি এ ভুবন, পাউনিতো কারো মন	দিন চলে গেছে খুঁজিতে খুঁজিতে।
গিয়েছি তোমরি শুধু মনের মাঝারে।	শুভখনে কাছে ভাবিলে লজ্জা আমার ঢাকিলে গো
	তোমারে সহজে পেরেছি বুঝিতে।

গীতিনাট্যের গানটির ভাষা ও ভাবের দিক থেকে খুব সহজেই বোঝা যায়। তাকে বুঝতে পারাটা খুব সহজেই স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু নৃত্যনাট্যের গানটিতে বুঝতে পারাটা নৈর্ব্যক্তিক রূপলাভ করেছে। যা আগের গানটি থেকে আলাদা। গানের এই ক্রমবিবর্তন ধারা সম্পর্কে 'সুর ও সংগতি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব-বাৎলাবার জন্যে, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন।"৩৯

গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'র শেষ অমর ও শান্তার মিলনে এবং প্রমদার অনুশোচনায়। মায়াকুমারীদের 'এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম' গানটির মধ্য দিয়ে শেষ হয়। নৃত্যনাট্যে শান্তা

আত্মত্যাগে ব্রতী প্রমদার জন্য এবং অমরকেও ত্যাগ করে। নৃত্যনাট্যের শেষ গান 'আজ খেলা ভাঙ্গার খেলা।'

৪. নৃত্যনাট্য শ্যামা

১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ এবং ৮ তারিখে কলকাতার শ্রী রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের অগে রবীন্দ্রনাথ 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্যের নাম পরিবর্তন করে 'শ্যামা' নাম দেন। তখন থেকেই এই নামে নৃত্যনাট্যটি সকলের কাছে পরিচিত। নৃত্যনাট্যটির কাহিনিতে দেখা যায়, বণিক বজ্রসেন সুবর্ণদ্বীপ থেকে ইন্দ্রমণির হার এনেছে। বন্ধু জানায় সে খবর রাজমহিষীর কানে চলে গেছে। সে জানায় : 'এ মানিক পেলেম আমি অনেক দেবতা পূজে,/ বাধার সঙ্গে যুঝে -/ এ মানিক দেব যারে অমনি তারে পাব খুঁজে,/ চলেছি দেশ দেশান্তর।'

শ্যামার সভাগৃহে উত্তীয়র প্রবেশ। শ্যামার প্রতি তার ভালোবাসার প্রকাশ : 'মায়াবনবিহারীণী হরিণী/ গহনস্বপনসঞ্চারিণী/ কেন তারে ধরিবারে করি পণ অকারণ।'

শ্যামা নিজ মোহে অন্ধ। উত্তীয়র প্রেম তাকে স্পর্শ করে না। সখীরা গেয়ে উঠে : 'জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা,/ কোরো না হেলা হে গরবিনী।'

এই গানটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "প্রবাসী" প্রবন্ধে বলেন : "আমার শ্যামা নাটকের জন্য একটা গান তৈরি করেছি ভৈরবী রাগিণীতে - 'জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা/গরবিনী !'

এই গরবিনীকে সংসারে দেখেছি বারম্বার, কিন্তু গানের সুর শুনলে বুঝবে এই 'বারম্বারে'র অনেক বাইরে সে চলে গেছে। যেন কোন চিরকালের গরবিনীর পায়ের কছে বসে মুগ্ধ মন অন্তরে অন্তরে সাধন করতে থাকে। সুরময় ছন্দোময় দূরত্বই তার সকলের চেয়ে বড়ো অলংকার।"[৪০]

বজ্রসেন দেশান্তরে যাবে এমন সময় প্রহরী তাকে ধরে নিয়ে চুরির অভিযোগে কারাগারে নিক্ষেপ করে। কারণ রাজকোষ থেকে চুরি হয়েছে। বজ্রসেনের অনিন্দ্যসুন্দর দেহকান্তি দেখে রাজনটী শ্যামা তার প্রেমে উন্মাদিনী হয়েছে : 'তোমাদের এ কী ভ্রান্তি-/কে ওই পুরুষ দেবকান্তি,/ প্রহরী মরি মরি।/ এমন করে কি ওকে বাঁধে।/ দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে।/ বন্দী করেছ কোন দোষে।'

সে কিছুদিন সময় চেয়ে নেয় এবং রাজ্যে কোন বীর আছে নাকি, যে পারবে নিরপরাধ বিদেশি

বণিককে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে। এর মধ্যে উত্তীয় প্রবেশ করে গান গাইতে গাইতে : 'ন্যায় অন্যায় জানি নে জানি নে জানি নে,/ শুধু তোমারে জানি ওগো সুন্দরী ।/ চাও কি প্রেমের চরম মূল্য- দেব আনি,/দেব আনি- ওগো সুন্দরী ।'

শ্যামাকে সে ভালোবাসত আর তাই শ্যামার সুখের কারণে নিজে চুরির অপবাদ কাঁধে নিয়ে বজ্রসেনকে মুক্ত করে নিজে মৃত্যুবরণ করে। বজ্রসেন ও শ্যামা নৌকায় করে পালিয়ে যায়। বজ্রসেন যখন তার মুক্তি লাভের নেপথ্য জানতে পারে তখন শ্যামাকে পরিত্যাগ করতে চায়। কিন্তু শ্যামা তাকে ছাড়তে চায় না : 'ক্ষমা করো নাথ ক্ষমা করো/ এ পাপের যে অভিসম্পাত/ হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর ।/ তুমি ক্ষমা করো, তুমি ক্ষমা করো ।'

আত্মধিক্কারে বজ্রসেন শ্যামাকে ত্যাগ করে কিন্তু তার প্রেমকে ভুলতে না পেরে আবার ফিরে আসে। সত্যই যখন শ্যামার পুনরাবির্ভাব হলো তখন বজ্রসেন আবার তাকে ফিরিয়ে দিলেন নিষ্ঠুরভাবে। বজ্রসেন গাইলো : 'ক্ষমিতে পারিলাম না যে/ ক্ষমো হে মম দীনতা,/ পাপীজনশরণ প্রভু ।/ প্রিয়ারে নিতে পারি নি বুকে,/ প্রেমেরে আমি হেনেছি,/ পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু/ পাপেরে ডেকে এনেছি ।/ জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে/ যে অভাগিনী পাপের ভারে/ চরণে তব বিনতা ।/ ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না/ আমার ক্ষমহীনতা/ পাপীজনশরণ প্রভু॥'

এ নৃত্যনাট্যটিতে রবীন্দ্রনাথ গদ্যধর্মী ও সংলাপভঙ্গী গান ব্যবহার করা হয়েছে। অনেকগুলো কাব্য সংগীত রয়েছে। গদ্যধর্মী গানের মধ্যে চতুর্থ দৃশ্যে শ্যামার গান : 'তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ/ আরো সুকঠিন আজ তোমারে সে কথা বলা/ বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম/ ব্যর্থপ্রেমে মোর মত্ত অধীর/ মোর অনুনয়ে তব চুরি অপবাদ নিজ 'পরে লয়ে/ সঁপেছে আপন প্রাণ ।'

গানটি থেমে থেমে কথার ভাবের সাথে টেনে কখনো তাল ছাড়া কখনো তালের সাথে গাওয়া হয়। সুরের ওঠানামা যেন কথাকেই সুরের মাধ্যমে ভাব অনুযায়ী ফুটিয়ে তোলা হয়। তবে এই গানগুলোকে নাটক থেকে বিচ্যুত করে গাওয়া যায় না। কিন্তু শ্যামার কিছু গান ব্যতিক্রম রয়েছে যেমন 'মায়াবন বিহারিণী', 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া' বা সখীর গান 'জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা' গদ্যগান হলেও গানগুলো একক গান হিসেবে অসাধারণ।

নাটকের ২৯টি গান গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য পর্যায়ের, ৯টি গান প্রেম পর্যায়ের এবং ২টি গান

বিচিত্র ।। নাটকে নাটকীয় ভাব প্রকাশের জন্য তিনি চমৎকারভাবে রাগরাগিণী প্রয়োগ করেছেন। যেমন চতুর্থ দৃশ্যে বজ্রসেন ও শ্যামার গান–

বজ্রসেন :

পা -সা II -র্সা -া না -া । ধপা -া -ক্ষ -া I পা -না -ধা র্সা । না -া -া -পা I
কাঁ ০ ০ ০ দি ০ । তে০ ০ ০ ০ হ ০ ০ ০ বে ০ ০ ০ ।
I পা-ক্ষ-পা -ক্ষ । -পা -া -গা -া I -া -া গা পা । গা -া -গরা -া I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ রে পা পি ০ ০ ষ্ ।
I সা -া -া -া । সা -ন্া সা -ন্া I সা -া মা -া । মা -া গা রা I
ঠা ০ ০ ০ জী ০ ব ০ নে ০ পা ০ বি ০ না ০
I সা -ন্া -রা -া । সা -া -া -া I সা -া সা -ন্া । সা -ন্ সমা -া I
শা ০ ০ ন্ তি ০ ০ ০ ভা ০ ঙি ০ বে ০ ভা০ ০
I মা - গা মা গা । পা -া পা -ক্ষা I পা -ক্ষা পা -ক্ষা ।-ধা -া ধপা -া I
ঙি ০ বে ০ ক ০ লু ০ ষ ০ নী ০ ০ ০ ড় ০
I র্সা -া -া -না । র্রা -া সা -া I র্সা -া না -পা ।-ধা -পা পা -সা I
ব ০ ০ জ্ জ্র ০ আ ০ ঘা ০ তে ০ ০ ০ কাঁ ০
I -র্সা -া না -া । ধপা -া -ক্ষা -া I পা -না -ধা র্সা । না -া -া পা I
০ ০ দি ০ তে০ ০ ০ ০ হ ০ ০ ০ বে ০ ০০
I পা -ক্ষা -পা -ক্ষা । -পা -া -গা -া I -া -া গা পা । গা -া -গরা -া I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ রে পা পি০ ০ ষ্
I সা -া -া -া । -া -া -া -া II
ঠা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

শ্যামা :

II {সা -ণা -া ণধা । মজ্ঞা -া রা সা I রা -া -জ্ঞা জ্ঞরা । সা -া -রা সন্া I
হে ০ ০ ক্ষ মা০ ০ ক রো I না ০ থ্ ক্ষ । মা ০ ০ ক I
I সা -া -া -া । -া -া -া -া} I মা মপা পা পা । পা -া পধা ধপা I
রো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ এ পা০ পে র যে০ অ ভি
I মা -া পা -া । -া -া -া -া I পমা -পা পা পনা । না -া না না I
স ম্ পা ০ ০ ০ ০ ত্ হো ক্ বি ধা০ তা র্ হা তে
I না নর্সা র্সরা সার্রি । না -ধনা র্সা -া I র্সা র্সর্রা র্রর্সা র্সা । ণর্সা -ণা -ণা -া I

নি দা০ ব্লু০ ণ ত ০ ও ০ তু মি০ ক্ষ মা ক ০ রো ০

I $^{\text{ণ}}$ধা ধর্সা $^{\text{র্স}}$ণা ণা । $^{\text{প}}$ধা -পা পা -া I পা পধা পা $^{\text{ধ}}$পা । মা -$^{\text{ম}}$গা রা -া I[৪১]

তু মি০ ক্ষ মা ক ০ রো ০ তু মি০ ক্ষ মা ক ০ রো ০ ॥

বজ্রসেনের গানটি শঙ্করা রাগে বাঁধা। গানটিতে অভিসম্পাতের কাঠিন্য ফুটিয়ে তোলার জন্য বিলাবল ঠাটের শুদ্ধ পর্দার শঙ্করা রাগ ব্যবহার করে তাতে কড়ি মাধ্যমের প্রয়োগ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হলে যেমন আমাদের কথাবার্তায় একটু উঁচু পর্যায় ও দ্রুত গতিতে উচ্চারিত হয়, এই গানটির বেলাতেও তাই। পুরো গানটিতেই এক ধরনের কাঠিন্য আছে। পাপিষ্ঠা হিসেবে শ্যামার ক্ষমা নেই, জীবনে কখনো সে শান্তি পাবে না, সুরের মাধ্যমে এই অভিসম্পাত অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে।

অন্যদিকে শ্যামার গানটি অনুনয়ের। ক্ষমা চাইবার জন্য তার যেই আকুলতা, তাকে কোমলভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যে কোমল নি যুক্ত কাফি-সিন্ধু রাগ ব্যবহার করা হয়েছে। গানটির গতি অনুরোধ প্রকাশ করার জন্য কমিয়ে দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে সখীর মুখে গাওয়া গান ‘জীবনে পরম লগন’ তে ভৈরবী রাগিণীকে ব্যবহার করেছেন শ্যামাকে সতর্কীকরণে। অন্যদিকে একই রাগে তৃতীয় দৃশ্যে শ্যামার গান ‘বলো না বলো না বলো না’ তে ভৈরবী রাগিণী ব্যবহৃত হয়েছে মর্মবেদনার ভাব প্রকাশের জন্য এবং চতুর্থ দৃশ্যে বজ্রসেনের গান ‘কেন এলি কেন এলি ’ গানটিতে ভৈরবী রাগিণী কঠোর তিরস্কারে ব্যবহৃত হয়েছে। একই রাগিণী তিনি ভিন্ন ভিন্ন রসে প্রয়োগ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ পর্বে এই বিস্ময়কর সৃষ্টি নৃত্যনাট্যগুলো রচনা করেছিলেন। গীতিনাট্যের গানগুলোতে তার প্রথম বয়সের ভাঙ্গা গান বা পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব পাওয়া যায়, কিন্ত নৃত্যনাট্যের গানগুলো সুরের দিক থেকে অনেকটাই পরিপূর্ণরূপে সংগীতের সাথে যুক্ত হয়ে নাট্যরস সৃষ্টি করে নৃত্যনাট্যগুলোকে একটি স্বতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

রবীন্দ্রনাথ এদেশে প্রচলিত ভরতনাট্যম, কথাকলি, মণিপুরী ও কথক ছাড়াও শান্তিনিকেতনে আর একটি ধারার নৃত্যশৈলী প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি কথাকলি, মণিপুরী ও কথ্যক এই তিনটি নৃত্যধারার সাথে সিংহলের ক্যান্ডি ও জাভার কিছু নাচের সমন্বয়ে নতুন একটি নৃত্যধারার সৃষ্টি করেছিলেন যাকে শান্তিনিকেতনী ধারার নৃত্যপদ্ধতি বলা হতো। এ বিষয়ে প্রতিমা দেবী

বলেছেন :

> “শান্তিনিকেতনের নাচে বাজনার বৈচিত্র্য তেমন হয়নি তার কারণ গুরুদেবের সংগীত ও সুর বাজনার অভাব পুরায়ে দেয়। তাছাড়া বাজনার অভাবে বা গানের আধিক্যে গানের কথা অর্থাৎ বিষয়বস্তু চাপা পড়ে যাবার আশঙ্কাও আছে। এখানে তার সুরের ও গানের সঙ্গে প্রাচীন নৃত্যের

> এক অভাবনীয় মিলন হয়েছে। এই ত্রিবেণী-সঙ্গমের ধারা এবং নৃত্য নতুন রসসৃষ্টির পথটিকে অনুসরণ করে। এই সংগীতে ও নৃত্যে অপূর্ব ঐক্য, এখানে কেউ কাউকে পূর্ণ প্রকাশের পথে বাধা না দিয়ে নিজের পরিধি ও শক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেছে।...বাংলার নতুন চিত্রকলা যেমন ভারতের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির সুর ফিরিয়ে দিয়ে চারুশিল্পজগতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করল বাংলার বা শান্তিনিকেতনের নাচ সেই কাজ করেছে নৃত্যকলা জগতে।"[৪২]

মণিপুরী নাচ ভাবপ্রকাশের বাহক, এতে বীর্য বা শক্তি প্রকাশ করার সুযোগ নেই। কথাকলির বৈশিষ্ট্য শক্তি ও তেজস্বিতার বিকাশ, আর কথকের বৈশিষ্ট্য ছন্দব্যঞ্জনা। ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথ 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে বজ্রসেন ও প্রহরীর অভিনয়ে কথাকলি, উত্তীয়র চরিত্রে কথক আর শ্যামা ও সখীদের চরিত্রে মণিপুরী নাচের প্রয়োগ করেন। এই স্বল্পসংখ্যক নৃত্যনাট্য রচনার মাধ্যমে তিনি কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, সমগ্র কাব্য নাটকে নৃত্য ও সুরযোজনার ক্ষেত্রে একটি নতুনতর পথের দিক নিদের্শনা দিয়েছেন। অমিয় সেন ও নীলিমা সেন বলেন :

> "নৃত্যনাট্য কথাটি যেমন তাঁরই উদ্ভাবিত, 'নৃত্যনাট্য' রূপে নতুন সাহিত্যসৃষ্টিও তাঁরই প্রতিভার দান। আঙ্গিকের সীমানা ছাড়িয়ে এগুলিতে নৃত্যকে তিনি 'দেহভঙ্গীর সংগীত' বলে উল্লেখ করেছেন। অভিনয় করার মধ্যে এই দেহভঙ্গীর সংগীতকে সমন্বিত করার প্রকাশের শ্রেষ্ঠ বাহন কণ্ঠের সংগীতকে তিনি পরিপূর্ণ মর্যাদায়ই রক্ষা করেছেন। শিল্পের তিনটি বাহনের এই সম্মিলনে তাঁর নৃত্যনাট্যগুলি রচিত হয়েছে।"[৪৩]

হার্বাট স্পেন্সারের প্রবন্ধে অনুপ্রাণিত রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টিতে গানের যথাযথ ভাব ফোটাবার জন্য মানুষের কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিকভাবে যে সব উঁচু-নিচু পর্দায় ওঠানামা হয়, তা সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করে সার্থক ও সফল ব্যবহার করিয়ে দেখিয়েছেন; সাথে ভাব প্রকাশের জন্য নানা ধারার নৃত্যরসে প্রভাবিত হয়েছেন। যেমন জাভা বালিদ্বীপের নৃত্যনাট্য, কথাকলি, কাঠিয়াবাদ ও গুজরাতি, মালাবারের অন্যান্য নৃত্য, মণিপুরী, বাউল, সাঁওতাল, কথক ভরতনাট্যম, পাঞ্জাব ও সিংহল প্রদেশের ক্যান্ডিনাচ ও পাশ্চাত্যর ব্যালে। তার এই প্রচেষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তার গীতিনাট্যে ও নৃত্যনাট্যে।

গীতিনাট্যে গান গাওয়া হয় ভাবানুযায়ী অভিনয়ের মাধ্যমে, তাই গানগুলো বাঁধাধরা তালে গাওয়া হয় না। এর মধ্যে অভিনয়ও করা হয়। কিন্তু নৃত্যনাট্যে গানগুলো নাচের তাল রাখার জন্য তালে গাইতে হয়। মাঝে মাঝে বিনা তালের গানও আছে। গানগুলোর লয় নাটকের ভাবানুযায়ী

বাড়ানো কমানো হয় যেমন চিত্রাঙ্গদা নাটকের গান :

দ্রুত লয়ে	মধ্য লয়ে	বিলম্বিত লয়ে
অর্জুন! তুমি অর্জুন!	ক্ষমা দিয়ে কোর না অসম্মান,	অর্জুন! তুমি অর্জুন!
ফিরে এসো ফিরে এসে	যুদ্ধে করো আহ্বান!	
	বীর হাতে মৃত্যুর গৌরব	
	করি যেন অনুভব-	

নৃত্যনাট্যগুলোতে লয়ের বৈচিত্র্য দেখা যায়। একই গানে ভাবানুযায়ী লয়ের তারতম্য করেছেন। নৃত্যনাট্যের গানগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্যই এই যে নাচের সুবিধার্থে লয়ের কম বেশি করা হয়েছে। তাতে গানের রস ক্ষুণ্ন হয়নি বরং আরো উপভোগ্য হয়েছে। গানের মধ্য দিয়ে নাট্যরস কতো গভীরভাবে ফুটানো যায় এই নৃত্যনাট্যের গানগুলো তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তালের দিক থেকে দাদরা, কাহারবা, ঝাঁপতাল, ঝম্পক ও তেওড়া তাল ব্যবহার করা হয়েছে। তবে গায়কীর নির্দেশে তালগুলি ভেঙে লয়ের তারতম্যে ছন্দবৈচিত্র্যের মাধ্যমে গানগুলো গাওয়া হয়। এই যুগের গানে মিশ্র রাগরাগিণীর ব্যবহার করেছেন। যেমন নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'র সুচনায় 'মোহিনী মায়া এলো' গানটিতে হাম্বীর, ভৈরব ও ভৈরবী রাগ ব্যবহৃত হয়েছে। এই গানটির শেষ অংশে 'এসো সুন্দর নিরলঙ্কার...স্বপ্নের দূর্গ হানো'-তে ভৈরব ও ভৈরবী রাগ পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়েছে সূক্ষ্ম নিপুণতার সঙ্গে। রয়েছে কীর্তনাঙ্গ ও বাউল ঢঙের গান।

'শ্যামা', 'চন্ডালিকা' এবং 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের সংগীত রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অভিব্যক্তি জানা যায় শান্তিনিকেতন থেকে ১৯৩৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত এক পত্রের মারফতে।[৪৪] উক্ত পত্রে দেখা যায়, উল্লিখিত ৩টি নাট্য রচনাকালীন বেশকিছু কাল ধরে রবীন্দ্রনাথের মন ছিল গুঞ্জনমুখরিত, আনন্দিত। সে আনন্দ ছিল নির্বস্তুক (abstract), তাই বিশুদ্ধ । গান দিয়ে তিনি যে রচনা করেছেন 'শ্যামা', 'চন্ডালিকা' এবং 'চিত্রাঙ্গদা', এর বিষয় বিশুদ্ধ স্বপ্নবস্তু নয়। তার সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ তীব্র। অকৃত্রিম ও নিবিড় তার বাস্তবতা।

তথ্যসূত্র

১. শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্রসংগীত*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৪৯, পৃ. ১৮৫

প্রথম পরিচ্ছদ

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, দে' পাবলিসার্স, কলিকাতা, ১২৮৮, পৃ. ২০২

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১-২০২

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০

৬. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ৩৭

৭. নিতাই বসু, *রবীন্দ্রসংগীতের উৎস সন্ধানে*, সাহিত্যায়ন, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৯৬

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান ৪৯*, *বাল্মীকিপ্রতিভা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৩৫, পৃ. ২৮

১২. বিষ্ণু বসু, *রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার*, প্রতিভাস, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৪৪

১৩. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩-২০৪

১৫. নিতাই বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, নবম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ৪৮৩

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান ৪৮*, *মায়ার খেলা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৩২, পৃ. ৮২

১৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৪০, পৃ. ২৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

১৯. শান্তিদেব ঘোষ, *গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স

প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৯০, পৃ. ২২২

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, দশম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ৫৩২।

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঙ্গীতচিন্তা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৩, পৃ. ২১১

২২. শান্তিদেব ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ১৪৭

২৪. দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার, *রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১৪৪

২৫. নিতাই বসু, *রবীন্দ্রসংগীতের উৎস সন্ধানে*, সাহিত্যায়ন, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১১১-১১২

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২-১১৩

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫৬

৩০. শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্রসংগীত*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৪৯, পৃ. ১৯৫

৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঙ্গীতচিন্তা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০

৩২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৭

৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খন্ড, পূর্বোক্ত, ১৩৭৫, পৃ. ১৭৬

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান ১৮ নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৪৫, পৃ. ১০৮

৩৫. দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান ১৮ নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬১

৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঙ্গীতচিন্তা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২

৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬৪

৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান ১৯ নৃত্যনাট্য শ্যামা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৪৬, পৃ. ৮৭-৮৮

৪২. দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪

৪৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬৪

পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের নাটকের মহড়া, মঞ্চায়ন ও রূপসজ্জা

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য, মঞ্চসজ্জা, মেকআপ ও অভিনয়ে পাশ্চাত্য নাট্যধারার অনুসরণ করেছিলেন। ১৮৮১ সালে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' গীতিনাট্যে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন। এই গীতিনাট্য রচনার পর থেকে পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি নিরলসভাবে নিজের লেখা বিভিন্ন ধরনের নাটকে অভিনয় করেছেন। গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, প্রহসন, সাংকেতিক নাটক, ঋতুনাট্য, নৃত্যনাট্য প্রভৃতি রচনার মধ্য দিয়ে তিনি নিরীক্ষা চালিয়েছেন সারাজীবন। সমকালীন নাটকের দুটি ধারা ছিল– একটি সৌখিন ও আরেকটি পেশাদার। রবীন্দ্রনাথের নাটকের সাথে কোনটিরই মিল ছিল না। পেশাদার রঙ্গালয়ের নাটকের সাথে রবীন্দ্রনাট্যকলার ব্যবধান ছিল। নাটকের বিষয়বস্তুই হোক বা প্রয়োগশিল্পেই হোক সম্পূর্ণ নিজস্বতা ছিল। তাঁর নাটকের মঞ্চস্থ সময়কালকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. গোড়ার ২০ বছর অর্থাৎ ১৮৮১-–১৯০১ সাল পর্যন্ত 'কলকাতা পর্ব'।

২. ১৯০২–১৯১৫ সাল পর্যন্ত ২০ বছরকে বলা যায় 'শান্তিনিকেতন পর্ব'।

৩. পরবর্তী ২৫ বছর 'মিশ্র পর্ব'। এই শেষ পর্বে তাঁর প্রযোজিত নাটকগুলো মঞ্চস্থ হয়েছিল কলকাতায় ও শান্তিনিকেতনে।

প্রথম পর্বে অংশ নিয়েছেন মূলত পরিবারের সদস্যরা বা বাড়ির লোকেরাই। দ্বিতীয় পর্বে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকেরা। শেষ পর্বে আত্মীয়বর্গ থেকে শুরু করে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী ও ঘনিষ্ঠ গুণীজনেরা।

নাচে গানে অভিনয়ে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের পারদর্শিতার কারণে 'মায়ার খেলা'র মতন নারীমুখ্য গীতিনাট্য প্রযোজনা করতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথকে অসুবিধায় পড়তে হয়নি। আবার শান্তিনিকেতনের পর্বের গোড়ার বছরগুলোতে যেহেতু ছাত্রী সহজে পাওয়া যেত না তাই নাটকগুলোতে পুরুষ নির্ভরতা ছিল। 'শারদোৎসব' থেকে 'ফাল্গুনী' পর্যন্ত তিনি নিজেই প্রশিক্ষণ দিতেন। শান্তিদেব ঘোষের মা মনোরমা দেবী জানান :

> "নাটক মঞ্চস্থ হবার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই চলত তার জন্য প্রস্তুতি। শেখাতেন রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ। গুরুদেব এত সুন্দরভাবে নিজে করে দেখাতেন যে তাঁর নটকুশলতায় আমরা

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেতাম। কথার কি ভঙ্গি! পুরুষের অংশ পুরুষের গলায়, মেয়ের অংশ মেয়ের গলায়, এ যে না শুনেছে তাকে বোঝানো যায় না।"[১]

মহড়া নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুবই কঠোর এবং নিষ্ঠাবান ছিলেন। লেখাপড়া বা পরীক্ষা থাকলেও রেহাই মিলত না। তার নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রীদের স্মৃতিকথায় এ সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা জানা যায়। এ সম্পর্কে শান্তিনিকেতনের একজন প্রাক্তন ছাত্রী শৈলনন্দিনী প্রদত্ত ভাষ্য থেকে জানা যায়:

" জয়ন্তী উপলক্ষে 'শাপমোচন' অভিনীত হবে কলকাতায়। শৈলনন্দিনী আছেন এ নাটকে। কিন্তু সামনে তাঁর ম্যাট্রিক পরীক্ষা, শিক্ষক মশাইরা এ ব্যাপারে বার বার সতর্ক করে দিচ্ছেন তাঁকে। তাই ভয় পেয়ে দুদিন রিহার্সেলে গেলেন না তিনি। কোনরকম তলব না পেয়ে ভাবলেন, 'পার পাওয়া গেল'। কিন্তু তারপরেই উত্তরায়ণের বাগানে ধরা পড়ে গেলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথের সামনে যেতেই বললেন : রিহার্সেলে আসিস না কেন? বললাম ধীরে ধীরে : এবার তো পরীক্ষা। বলেন : এখানে তো শুধু পরীক্ষা পাস করার জন্য আসিস নি। আজ থেকে রিহার্সেলে আসবি।"[২]

অভিনেতা-অভিনেত্রী তৈরি করার সময় তিনি প্রাণপণে দিনের পর দিন শ্রম দিতেন, কারণ তাঁর নাটকে কোন পেশাদার অভিনেতৃবর্গ ছিল না। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক ও কর্মী যাদের দিয়ে নাটক করা কল্পনাও করা যায় না, তাঁদের দিয়েই তিনি সফল নাটক মঞ্চস্থ করতেন। তিনি নিজে নাটকের কঠিন ও জটিল ভূমিকাগুলোতে অভিনয় করতেন। অভিনয়ের ব্যাপারে তিনি এতটাই একাগ্র ছিলেন যে, মনমতো নিখুঁত অভিনয় না হবার কারণে মহড়া হওয়া সত্ত্বেও সেই নাটক মঞ্চস্থ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ নাটকের চরিত্রের ভূমিকা বা গান যে-কোন সময় পরিবর্তন করতেন। মঞ্চে শিল্পী ওঠার আগ মুহূর্তেও তিনি গান কিংবা সংলাপ পরিবর্তন করে দিতেন। বিষ্ণু বসুর লেখায় জানতে পারা যায় :

"একবার 'শাপমোচন' মঞ্চস্থ হবার আগের দিনবিচিত্রার হল-ঘরে অভিনেতাদের ডেকে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ 'আজকের রিহার্সেল মনে করবি না। মনে করবি মঞ্চে অভিনয় করছিস।' চৌকির উপর বসেছেন রবীন্দ্রনাথ, হাতে নাটকটি। 'গভীর এক নিষ্ঠার ভাব তাঁর মুখে, তাঁর বসার ভঙ্গীতে। পাঠ শুরু করলেন তিনি। দৃশ্যের পর দৃশ্যে গান নৃত্য অভিনয় হতে লাগল। কোথাও কোন বাধা হল না সেদিন।' রিহার্সেল দেখে খুশী সবাই, অভিনেতারাও। কিন্তু পরদিন ভোরবেলা আলো ফোটার আগেই অমিতা সেনকে ডেকে পাঠালেন রবীন্দ্রনাথ।

রানী সেজেছিলেন তিনি। আগের দিন সন্ধ্যার মহলায় তাঁর একটি জায়গায় অভিনয় মনমতো হয়নি রবীন্দ্রনাথের। তাই অশান্তি নিয়ে ভালো করে ভোর হবার আগেই চলে এসেছেন তিনি। 'সখী আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না' গানে এক জায়গায় অমিতা সেনের ভাবটি ঠিকমতো ফুটে ওঠেনি বলে মনে হয়েছিল তাঁর। 'সেই জায়গাটি দেখাতে তিনি নিজে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি গাইছেন 'ঝর ঝর নীরে নিবিড় তিমিরে/সজল সমীরে গো।' গাইতে গাইতে স্বপ্নের ঘোরে যেন এক পা এক পা করে এগিয়ে চলছেন। তারপর একটু থেমে তিনি বললেন, 'মঞ্চের স্তম্ভে মাথা হেলিয়ে রেখে তুই যেন দূর থেকে ভেসে আসা কারও বাণী শুনতে পাচ্ছিস, গাইছিস– যেন কার বাণী কভু কানে আনে।' এই বলে তিনি নিজের মাথাটি এক জায়গায় হেলিয়ে সুদূরের দিকে দৃষ্টি মেলে গাইতে লাগলেন...কান পেতে যেন শুনতে পান সুদূর থেকে ভেসে আসা সুরের রেশ। তারপরই হতাশভাবে চৌকিতে বসে পড়ে কান্নায় যেন ভেঙে পড়েন।"[৩]

গোড়ায় ঠাকুরবাড়িতে মঞ্চসজ্জা ও রূপসজ্জা বিলিতি অনুকরণে হতো। মঞ্চসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন হরিশচন্দ্র হালদার। 'বাল্মিকীপ্রতিভা'র মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, একবার মহাসমারোহে স্টেজ সাজানো হয়। মাটি দিয়ে উঠোনের খানিকটা অর্ধচন্দ্রকারে ভরাট করেন। বটগাছ আগে থেকেই ছিল। আরো গাছ পঁতে বনজঙ্গল বানানো হয়। স্টেজে সত্যিকারের বৃষ্টি ছাড়া হবে তাই দোতালার বারান্দা থেকে টিনের নল সোজা স্টেজের ভিতর নিয়ে আসা হয়। নানারকম দড়ি দিয়ে গাছ উপর থেকে ঝুলিয়ে রাখে, যেন সিন অনুসারে সেগুলি নামিয়ে দেয়া হয়। পদ্মকন, সোলার পদ্মফুল, পদ্মপাতা বানিয়ে নেটের মতো পাতলা গজের পর্দা পরপর চার পাঁচটা স্তরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। প্রথমে ঝাপসা কুয়াসার মতো থাকবে, একটা একটা পর্দা উঠার সাথে সাথে আলো ফুটতে থাকবে এবং পদ্মবনে সরস্বতী ক্রমশ প্রকাশ পাবে। তখন ইলেকট্রিক বাতি ছিল না তাই গ্যাস বাতি, কার্বন লাইটের ব্যবস্থা করা হয়। লাল সবুজের মখমলের পর্দা দিয়ে স্টেজ সাজানো হয়। নাটকের প্রয়োজনে মঞ্চে বৃষ্টি নামানো হয় এবং গান শুরু হয় রিমঝিম ঘন ঘন রে বরষে, সেই সঙ্গে পিছনে আয়না দিয়ে নানারকম আলো ফেলে বিদ্যুৎ দেখানো হয়। ভেতর থেকে কড়মড় করে টিন বাজাচ্ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। দোতালার ছাদে দুটো ডাম্বেল গড় গড় করে গড়ানো হচ্ছিল একপাশ থেকে আরেক পাশে। বাস্তবতার চূড়ান্ত দেখে সাহেব মেম ও অন্যান্য দর্শকরা খুব খুশি হয়েছিলেন।[৪]

নাটকটির রূপসজ্জা সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, বাল্মীকির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বিরিতি রাজরাজড়াদের ম্যান্টলন্ডয়ের আদলে তাঁর পিঠের দিকে লম্বা জোব্বা ঝুলিয়েছিলেন। এ

পোশাকের সাথে গলায় ঝুলিয়েছিলেন রুদ্রাক্ষের মালা। তার গলায় চেনে বাঁধা শঙ্খ ঝুলতো, দস্যুসর্দার হিসেবে শঙ্খ বাজিয়ে তিনি ডাকাতদের ডাক দিতেন। দস্যুদলকে সাজানো হয়েছিল কাবুলিওয়ালার সাজে। ইয়া গোঁফ ও ইয়া পাগড়ির সমাবেশে ডাকাতদের ভীতিজনক রূপ ফুটিয়ে তোলা হতো। তাদের পরানো হতো ধুতি ও ফতুয়া, মাথায় মঞ্চের জন্য একটু রঙিন ফেটি বাঁধা হতো। অভিনয়কে আরো জীবন্ত করার জন্য দিনেন্দ্রনাথ তার পোষা ঘোড়ায় চড়ে ডাকাতদের মঞ্চে উপবিষ্ট হতেন। ডাকাতরা লুটের মাল ভাগ করতো এবং একজন ডাকাত এক ফাঁকে ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াতো।

আরেকবার মঞ্চ সাজানো হয় দুটো তুলোর বক কিনে এনে গাছে বসিয়ে, ক্রৌঞ্চমিথুন সাজিয়ে। তাছাড়াও খড়ভরা একটা মরা হরিণ বনের এক কোণে দাঁড় করিয়ে দেন, সিন আঁকেন, কচুবনে বন্যবরাহ লুকিয়ে আছে, মুখটা একটু দেখা যায়। সবসময়ই যে একভাবে মঞ্চ সাজানো হতো তা নয়, একবার তুলোর বক বসানো হয়নি, তাই ক্রৌঞ্চমিথুন আর দেখানো হয়নি, তা নেপথ্যেই রয়ে যায়। সেভাবেই অভিনয় হয়। ধনুকে তীর লাগিয়ে সবাই ছুড়েন এবং সঙ্গে গান গাইতেনম পাঁকাটির তীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং দর্শকরাও খুব খুশি হতেন।[৫]

ইন্দিরা দেবী লক্ষ্মীর ভূমিকায় ছিলেন, তিনি যখন মঞ্চে প্রবেশ করতেন তখন লাল আলোতে তাকে চমৎকার দেখাতো। সরস্বতীর ভূমিকায় ছিলেন প্রতিভা দেবী। সাদা সোলার পদ্মফুলে শুভ্র সাজে তিনি বীণা হাতে বসে থাকতেন, সবাই তা দেখে ভেবেছিলেন মাটির প্রতিমা। উটপাখির ডিমের খোল দিয়ে শঙ্খ করে একটি ছোট সেতার বানিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, তাতে মুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল রুপোলি রাংতা। সে বীণা হাতে সরস্বতীর রুপসজ্জায় প্রতিভা ঠাকুর গাইতেন 'এই নে আমার বীণা দিনু উপহার।'[৬]

'শারদোৎসব' শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনীত হয় ১৯০৮ সালে। শান্তিনিকেতনের একটি মাটির ঘরকে নাট্যঘর নাম দিয়ে তাতে নাটক অভিনীত হতো। তখন দৃশ্যপট ছিল না। নাট্যঘরের পূর্বদিকে উঁচু মেঝেই ছিল নাট্যমঞ্চ। এ সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে মঞ্চ দৃশ্যসজ্জা অভিনয় প্রভৃতি বিষয়ে নতুন ধারণা গড়ে উঠতে থাকে। এ সময় 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন :

> "নাট্যোক্ত কথ্যাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কবি তাহাকে যে হাসির কথাটি যোগান তাহা লইয়াই তাহাকে হাসিতে হয়, কবি তাহাকে যেই কান্নার অবসর দেন তাহা লইয়াই কাঁদিয়া সে দর্শকের চোখে জল টানিয়া আনে। কিন্তু ছবিটা কেন। অভিনেতার পশ্চাতে

ঝুলিতে থাকে, অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না; তাহা আঁকা মাত্র। আমার মতে তাহাতে অভিনেতার কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। এইরূপে যে উপায়ে দর্শকদের মনে বিভ্রম উৎপাদন করিয়া সে নিজের কাজকে সহজ করিয়া তোলে, তাহা চিত্রকরের কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনা।"[৭]

'শারদোৎসব' নাটকের মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানান : "সেকালে মঞ্চ সাজাতো ছেলেরাই। বাঙাল ছেলেরা সারা সকাল পুকুর থেকে পদ্মফুল তুলে আনে। নাট্যঘরের মঞ্চ অপরূপ সৌন্দর্যে মন্ডিত হয়ে ওঠে। সীন প্রভৃতি এঁকে ছেলেমি করার মনোভাব শান্তিনিকেতনে কোনদিনই দেখা যায়নি।"[৮]

১৩১৮ বঙ্গাব্দের ৬ আশ্বিন নাটকটি দ্বিতীয়বার অভিনীত হয়। পুনরায় কলকাতায় এটি ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৩১ ভাদ্র ও ১ আশ্বিন অভিনীত হয়। এসব অভিনয় কালে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি সংযুক্ত ছিলেন। মঞ্চস্থ্ নাটকের মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে ১৯২২ সালে ১৯ সেপ্টেম্বর 'দি ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ' পত্রিকায় বলা হয় :

"But a word must be said about the decoration of the stage which contributed not a little of its success. A screen of light lue with silver white borders symbolizing the autumn sky formed the simple but suggestive background of the stage. The king's of court arranged in tiers of seats ourplaid with richly embroidered curbets, the ladies in their shimmerning saries. The sannyasi in his flowing robe of saffron silk, the boys and girls in their gala attire of many colours, all went to highten the effect of the stage setting which was in the able hands of the well-known artists messrs, Nandalal Bose and Surendranath Kar."[৯]

রাজা নাটকের রূপসজ্জা সম্পর্কে জানা যায়, ১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদা সেজেছিলেন। তিনি আড়াল থেকেও রাজার ভূকিয়ও অভিনয় করেন। ঠাকুরদা সাজতে তাকে বিশেষ কষ্ট পেতে হয়নি। সদাসর্বদা যে গেরুয়া রঙের পোশাক তিনি পরতেন, তার উপর ফুলের মালা পরে তিনি মঞ্চে প্রবেশ করেন। রাজা-সেনাপতির বেশে তিনি যখন মঞ্চে প্রবেশ করেন তখন সাদা রেশমের পোশাকের উপর লাল কোমরবন্ধ পরে বের হলেন। দিনেন্দ্রনাথ কালিঝুলি মেখে আলখাল্লার উপর নানারঙের ন্যাকড়ার ফালি ঝুলিয়ে পাগল বেশে মঞ্চে প্রবেশ করেন।

'ফাল্গুনী' নাটকটি অভিনীত হয় ১৯১৫ সালের পৌষ মাসে। ইস্টারের ছুটিতে শান্তিনিকেতনে নাটকটি অভিনীত হয়। মঞ্চসজ্জার দিক থেকে এখানে অনেক কিছুই অভিনব ছিল। রঙ্গমঞ্চ ফুলে পাতায় একেবারে ঢেকে গিয়েছিল, দুই ধারে ছিল দুটি দোলনা। দুটি ছোট ছেলে দোলনায় দোল খেতে খেতে গান গেয়েছিল 'ও গো দখিন হাওয়া'। তাদের সঙ্গীরা গান গেয়েছিল মঞ্চে দাঁড়িয়েই। অন্ধ বাউল সেজে রবীন্দ্রনাথ উদাত্ত কণ্ঠে গেয়েছিলেন 'ধীরে, বন্ধু গো, ধীরে ধীরে' এবং 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে' গান দুটি।[১০] বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষে সাহায্য করার জন্যও কলকাতায় 'ফাল্গুনী' নাটক অভিনীত হয়েছিল। এবারের দৃশ্যসজ্জায় ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। কত কম খরচে নাটক করা যায়, সেই চেষ্টা তিনি করেছিলেন। ব্যাকগ্রাউন্ডে তিনি নীল মখমলের কাপড় ব্যবহার করেন। বটগাছ আগে থেকেই ছিল। বাদামগাছের ডালপালা এনে কিছু কিছু এখানে ওখানে দিয়ে স্টেজ সাজানো হয়, বাঁশের গায়ে দড়ি ঝুলিয়ে দোলনা টানানো হয়। উপরে একটু ডালপালা দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছিল যেন উঁচু ডালের সাথে দোলনা টানানো হয়েছে।[১১]

ফাল্গুনী নাটকের গ্রন্থপরিচয়ে এই নাটকটি ও বশীকরণ নাটকটির বেশভূষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের রূপসজ্জার আদেশের একটি তথ্য পাওয়া যায়। ১৩২২ সালে এটি অভিনয়ের পূর্বে শান্তিনিকেতন থেকে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্রে জানিয়েছেন :

> "'বশীকরণ' নাম বদলে 'বহুবিবাহ' করে দিয়েছি। তোমাদের রিহার্সেল কী রকম চলছে। মেয়ে সাজাবার সমস্যা কী রকম সমাধান করলে। ... বহুবিবাহে মনোরমা এবং মাতাজি একই লোককে সাজানো যেতে পারে মনে রেখো। মনোরমাকে একটিও কথা বলতে হয়নি– সে audience-এর দিকে পিঠ করে ঘোমটা দিয়ে চুপ করে বসে থাকবে– গোঁফ দাড়ি থাকলেও ক্ষতি হবে না, নেপথ্যে থেকে একজন কেউ ওর গানটা গেয়ে দেবে। অবশ্য মাতাজিকে স্পষ্ট করে দর্শন দিতে হবে। তাকে দিব্য করে ত্রিপুণ্ড্র প্রভৃতি এঁকে রুদ্রাক্ষের মালা জড়িয়ে হাতে এক ত্রিশূল দিয়ে ভৈরবী-গোছের চেহারা করে দিতে হবে- অথচ দেখতে ভালো হওয়া চাই। ফাল্গুনীর সর্দার যে সাজবে সে যখন গুহা থেকে বেরিয়ে আসবে তখন তার হাতে ধনুর্বাণ দিতে হবে। সেটা তৈরি রেখো। সর্দারকে একটু বেশ সাজানো চাই। অন্য যারা আছে তারা নানা রঙ-বেরঙের চাদর উড়িয়ে পাগড়ি জড়িয়ে বেশ সরগরম করে তুলবে। বাউলকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে ধবধবে সাদা করে দিও।"[১২]

১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে 'ডাকঘর' নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকটির মঞ্চসজ্জার পরিকল্পনা করেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ। স্টেজের উপর খাড়া করেছিলেন সত্যিকার একটি কুটির, তার খড়ের চাল, ছিটে বাঁশের বেড়া, আসবাব, আল্পনা সব মিলিয়ে সাদাসিধে অথচ সুন্দর এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। পিছনে গবাক্ষে গাঢ় নীল পর্দায় রুপোলি কাগজে চাঁদ কেটে লাগানো হয়। অভ্রের টাসেল দেয়া সিকেতে রং করা মাটির হাড়ি ঝুলিয়ে মাটির পিলসুজে প্রদীপ জ্বেলে রঙ্গমঞ্চকে এক অপূর্ব শ্রীতে পরিণত করা হয়।[১৩]

'তপতী' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৯৩৭ সালে, পরপর ৪ দিন। রাজার ভূমিকায় ৭০ বছর বয়স্ক বৃদ্ধকে যুবকে পরিণত করার জন্য প্রতিদিন প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছিল রূপকার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। দাড়িতে কালো রঙ লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ে নামতেন, কিন্তু রঙ তোলা নিয়ে ঝামেলা হতো। দাড়ির সাথে গালের চামড়া ও মুখের আশেপাশে কালো দাগ হয়ে যেত। ড্রেস রিহার্সেলের পর এ নিয়ে অনেক ভেবে অবনীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবীর কাছ থেকে কালো কাপড় নিয়ে আসেন। সেই কাপড় মাপসই গেলাপের মতন দাড়িতে লাগিয়ে কানের দুইপাশে বেঁধে দেয়া হলো। স্টেজে যখন আলোর মধ্যে গেলেন সকলেই তখন দেখলো চমৎকার কালো দাঁড়ি হয়েছে রাজার।[১৪]

১৯৩৩ সালে 'তাসের দেশ' নাটকটি প্রথম রচনার সময় মোট দুটি দৃশ্যে ভাগ করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের সময় তিনি এটিকে চার দৃশ্যের নাটকে পরিণত করেন। তবে কোন সময়ই প্রতি দৃশ্যের শেষে সামনের পর্দা ফেলা হতো না। যখন তিনি নাটকটির অভিনয়কাল দুঘণ্টা সময় বাড়িয়ে দিলেন তখন দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে একটা পর্দা ফেলার রীতি চালু হলো। মিনিট দশেক পর পরদা ওঠার সাথে সাথে তৃতীয় দৃশ্য শুরু হতো। অভিনয় শেষে পর্দা পড়ত। দৃশ্যানুযায়ী মঞ্চসজ্জার কোন পরিবর্তন হতো না। শান্তিদেব ঘোষের রচিত 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য' বই থেকে জানা যায়, 'তাসের দেশে'র রাজসভায় রাজা ও রানীর উপবেশনের উপযোগী স্থান প্রথম থেকেই এমনভাবে রাখা হতো যে চতুর্থ দৃশ্যের পূর্ব পর্যন্ত একে মঞ্চের সজ্জার একটি বিশেষ অংশ মনে হতো।

প্রথমবার শিল্পাচার্য নন্দলাল ও প্রতিমা দেবী নাটকটির সাজসজ্জার পরিকল্পনার ও রচনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ছেলেদের সাজের দায়িত্ব ছিল নন্দলালের উপর এবং মেয়েদের সাজ প্রতিমা দেবীর দায়িত্বে। পুরুষের চরিত্রের সাজগুলো নন্দলাল নিজের মনমতোই সাজিয়েছিলেন। প্রতিমা দেবী

পোশাক পরান জাভার (বর্তমানের ইন্দেনেশিয়ার) নৃত্যনাট্যের নানা প্রকার ছবির সঙ্গে মিলিয়ে। কিন্তু প্রথমবার অভিনয়কালে সেই সাজ পরে নাচ ও চলাফেরা করতে মেয়েদের অসুবিধা হচ্ছিল তাই পরদিন সকালের মধ্যেই নন্দলালবাবু, প্রতিমা দেবী ও সুরেনবাবু একত্রে ভেবে চিন্তে মেয়েদের সাজের আমূল পরিবর্তন করেন। এই সাজেই পরবর্তীকালে মেয়েদের সাজানো হতো। পিসবোর্ডের উপর সাঁটা নানা রঙের কাগজ ও কাপড়ের উপর, আল্পনায় প্রত্যেকটি চরিত্রের সাজকে অলংকারে পরিণত করেছিলেন। নানারকম রঙের সাজপোশাকে সবাই যখন মঞ্চে এসে দাঁড়াতো তখন একটি বিরাট ছন্দোময় রঙের জগৎ দর্শকদের সামনে এসে রূপ মেলে দাঁড়াত রূপকথার রঙিন জগতের মতো।

কলকাতায় যখন প্রথম 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের অভিনয় হয়, তখন সুরেন্দ্রনাথ কর কাঠের বাক্স, কাঠের তক্তাকে নানা রঙের নকশা কাটা কাপড় দিয়ে সাজিয়ে স্থাপত্যধর্মী একটি মন্দিরের প্রবেশদ্বার বানিয়েছিলেন। এটি বসানো হয়েছিল মঞ্চের মাঝামাঝি পিছনের উইংস দুটির সমান্তরালে। দরজা দিয়ে কখনো কখনো অভিনতো ও অভিনেত্রীরা প্রবেশ করতো আবার প্রস্থান করতো। দ্বারের দুই পাশে কাঠের বাক্স দিয়ে উপবেশনের উপযোগী সজ্জিত স্থান বানানো হয়েছিল নাটকের পাত্র-পাত্রীদের বসার জন্য। 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের জন্য নির্মিত এরকম আলংকারিক স্টেজ আর কোন নাটকের অভিনয়ের সময় তৈরি করা হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষের দিকে সাজপোশাক ও মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে একদম কৃত্রিমতা বর্জন করে সাধাসিধে মঞ্চসজ্জার আয়োজন করতেন। এ বিষয়ে তিনি নিজেই 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় বলেন :

> "আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাদনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে-প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। কালিদাস মেঘদূত লিখে গেছেন, ঐ কাব্যটি ছন্দময় বাক্যের চিত্রশালা। রেখাচিত্রকর তুলি-হাতে এর পাশে পাশে তাঁর রেখাঙ্ক-ব্যাখ্যা যদি চালনা করেন তাহলে কবির প্রতিও যেমন অবিচার, পাঠকের প্রতিও তেমনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। নিজের কবিত্বই কবির পক্ষে যথেষ্ট, বাইরের সাহায্য তাঁর পক্ষে সাহায্যই নয়, সে ব্যাঘাত এবং অনেক স্থলে স্পর্ধা।
>
> শকুন্তলায় তপোবনের একটি ভাব কাব্যকলার আভাসেই আছে। সে-ই পর্যাপ্ত। আঁকা-ছবির দ্বারা অত্যন্ত বেশি নির্দিষ্ট না হওয়াতেই দর্শকের মনে অবাধে সে আপন কাজ করতে পারে। নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয়

দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, স্থাণু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে-জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে-নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিইনে। কারণ বাস্তবসত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।"[১৫]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের রসটি যেন বাইরের আড়ম্বরের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে না যায় সেজন্য তিনি পোশাক, বাদ্যযন্ত্র এবং মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই নিজস্ব এক নতুন আঙ্গিকের সূচনা করেন যেখানে অভিনয় ছিল মুখ্য। এ-কারণে শেষের দিকে তিনি নাটকে ড্রপসিন ব্যবহার বন্ধ করে দেন, অভিনয়কেই বেশি প্রধান্য দিতে শুরু করেন।

তথ্যসূত্র

১. বিষ্ণু বসু, *রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার*, প্রতিভাস, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৩২

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬

৭. রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, *রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ : সমকালীন প্রতিক্রিয়া*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৯১

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষষ্ঠ খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ৭৯২

৯. বার্নিক রায়, *হ্বাগনের ও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য*, সিগমা, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ১৩৪

১০. নিতাই বসু, *রবীন্দ্র সংগীতের উৎস সন্ধানে*, সাহিত্যায়ন, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১২৫

১১. বিষ্ণু বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ১৫৭

১৩. বিষ্ণু বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ৬৩২-৬৩৩

উপসংহার

নাটকের শুরুর ইতিহাসে যে সকল নাটক রচিত হয় তা প্রাচীন মানুষের জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত ভাবগম্ভীর ও গুরুতর বিষয়বস্তু নিয়েই গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে থিয়েটারের সাথে হাস্য ও লঘু রসাত্মক উপাদানের সংযোগ ঘটে। প্রাচীনকালে মানুষের জীবনাচরণের প্রায় সমস্ত অংশই অলৌকিকত্ব ও অধিদৈবিকতা দিয়ে আচ্ছন্ন ছিল। আর তাই নাটকের উদ্ভবের মূলে প্রায় সব দেশেই ধর্মের প্রভাব দেখা যায়। ধীরে ধীরে মিশরীয় সভ্যতায় পৌরাণিক ও দেবজীবন-নির্ভর বিষয়বস্তু হলেও নাট্যানুষ্ঠানগুলো ছিল যথাসম্ভব বিস্তারিত ও বাস্তবধর্মী। ফলে মিশরীয় নাট্যকর্ম যেমন উদ্দেশ্যের দিক থেকে, তেমনি পরিবেশনায় ছিল ভাবগম্ভীর ও আন্তরিক; কোন রচনাতেই হাস্যরসাত্মক উপাদানের উপস্থিতি ছিল না। প্রাচীন মিশরীয়রা নাট্যাভিনয়কে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

ইউরোপের মধ্যযুগে রেনেসাঁসের সময়কাল থেকে দেবদেবীর কাহিনি পেছনে রেখে মানবজীবন ও মানবচরিত্রের রহস্যোদ্ঘাটনই নাটকের প্রধান অবলম্বন হয়। ভারতীয় নাট্যের উদ্ভবও ধর্মের আশ্রয়ে ঘটে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে একে ‘পঞ্চম-বেদ’ বলা হয়ে থাকে। বাংলা নাটকের সূচনা মুহূর্তকে সংস্থাপিত করা যায় চর্যাপদের সময়পর্বে। মধ্যযুগের বাংলা নাটককে পরিণতির দিকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে শ্রীচৈতন্যদেবের অভিনয়কর্ম। চৈতন্যদেবের পরে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রার সন্ধান পাওয়া যায়, যা কালীয়দমন নামে অভিহিত। এরপর যাত্রায় কালের সাথে নাটকের সমস্ত উপাদান ও গুণাবলি প্রবেশ করেছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যাত্রার স্থান দখল করে নেয় আধুনিক থিয়েটার। যাত্রার উৎস থেকে উৎসারিত হয়ে সংগীত বাংলা নাটকে জনপ্রমোদ বিতরণ করেছে রবীন্দ্রসমকাল পর্যন্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকের গান রচনার হাতে খড়ি মূলত অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নাটকগুলোতে গান সংযোজনের মাধ্যমে। তাঁর কাছ থেকেই রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনার সাথে পরিচিতি ঘটে। ধীরে ধীরে তিনিও মৌলিক রচনায় হাত দেন। হয়ে ওঠেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকবি, গীতধর্মী প্রতিভা। নাট্যমাধুর্যকে অবলম্বন করে তাঁর নাট্যরচনা বহু বিচিত্ররূপে বিকশিত হয়েছে। তিনি রচনা করেছেন গীতিনাট্য, গাঁথানাট্য, কাব্যনাট্য, রূপক, সাংকেতিক বা

তত্ত্বনাট্য, প্রহসনাত্মক নাট্য, সামাজিক নাট্য, রোমান্টিক ট্র্যাজেডি নাটক, ঋতু নাট্য ও নৃত্যনাট্য। আর প্রতিটি নাটকেই রয়েছে গান এবং নৃত্যের চমৎকার ব্যবহার। গান ছিল তাঁর কাছে রূপকল্পের প্রধান আশ্রয় এবং রচনার শেষের দিকে নৃত্য।

রবীন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, কথার থেকে সুরের ক্ষমতা বেশি। তাই তাঁর নাটকে সংযুক্ত গানের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নাটকের প্রয়োজনে কিংবা নাটকের সৌকর্য ও সৌন্দর্য সাধনে নাটকীয় সংগীতের সমাবেশ ঘটানোর ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব অতুলনীয়। কখনো যেমন নাটকীয় সংগীতে সাংকেতিক ইঙ্গিত স্বপ্নলোককেও বাস্তবে রূপায়িত করে, আবার বাস্তবের প্রত্যক্ষ রূপায়ণও কখনো কখনো শ্রোতা ও শিল্পীর মনে স্বপ্নলোকের ছবি আঁকে । তিনি যেমন নাটকে গান ব্যবহার করেছেন মূলত নাটকের ভাবদর্শন কিংবা নাটকের কাহিনিকে সাবলীলভাবে এগিয়ে নিতে, তেমনি গান কখনো কখনো দর্শকদের মনে এনে দিয়েছে স্বস্তি ও প্রশান্তি।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের গান পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, প্রতিটি নাটকেই একটি-দুটি গান রয়েছে, যাকে নাটকের 'মূল মন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করা যায়। গানটিই যেন নাটকের সমস্ত কাহিনি বিবৃত করছে। নাটকে কি ঘটতে যাচ্ছে তা গানেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁর অনেক নাটকের প্রথম গানটিই নাটকের পুরোটা জুড়ে থাকতে দেখা যায়। নাটকের মর্মবাণীর আভাস পাওয়া যায় এই গানের মাধ্যমে। আবার তিনি কোন কোন নাটকে গানের ব্যবহার করেছেন নেপথ্য সংগীত হিসেবে। নাটকের ভাবগম্ভীর পরিবেশকে সহজ করে দেবার জন্যও তিনি গানের ব্যবহার করেছেন। কখনোবা নাটক শেষ করেছেন গান দিয়ে। তাঁর তত্ত্বনাটকগুলোতে অনুরোধের গানের তুলনায় স্বেচ্ছাগীতের গান বেশি। এসব গানে বাউলের প্রভাব বেশি। ঋতুনাট্যগুলো মূলত গীতিকাব্য, এতে নৃত্যের আভাস আছে। রোমান্টিক নাটকগুলোতে গানের ব্যবহার করা হয়েছে নাটকের সৌন্দর্যবর্ধনে। প্রহসন নাটকের গানগুলোতে হাল্কা চটুল সুর ও পুরানো গীতরীতি ব্যবহার করছেন, গানের সংখ্যাও কম ছিল। গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যে গানই সংলাপ। তিনি তাঁর মনোভাব গাঢ়তম তীব্ররূপে প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গানকে ব্যবহার করেছেন। অন্তর্জীবনের সূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনাগুলিকে সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

তাঁর নাটকে, সর্বোপরি, যেমন রয়েছে প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিয়মকে ভেঙে এগিয়ে যাবার আহ্বান, সমাজের নিষ্পেষিত মানুষের অধিকারের কথা, নারীর আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার কথা,

ধর্মীয় গোড়ামির বিরুদ্ধে উচ্চারণ কিংবা নতুনকে বরণ করার মানসিকতা, ঠিক তেমনি নাটকে গানের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও রয়েছে প্রচলিত ঐতিহ্যকে অতিক্রমের সফলতা। তাঁর প্রথম দিকের নাটকের গানে নাট্যগীতি এবং প্রেম পর্যায়ের গান বেশি। বিসর্জন নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি পূজা পর্যায়ের গানের ব্যবহার শুরু করেন। এরপর থেকে তাঁর নাটকের গানে প্রকৃতি, স্বদেশ, বিচিত্র এবং কোথাও কোথাও আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের গানের ব্যবহার দেখা যায়। পরিবেশ পরিস্ফুটনে, চরিত্র প্রকাশে, ঘটনার অবশ্যম্ভাবী ইঙ্গিতে এবং পরিস্থিতির তাৎপর্য বোঝাতে গানগুলো নাটকের সাথে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে জুড়ে রয়েছে। সংলাপকে অতিক্রম করে সুরের মাধ্যমে উপলব্ধ তত্ত্বকে প্রকাশ করাই তাঁর নাটকের গানের মুখ্য ভূমিকা। তাঁর বিভিন্ন প্রকার নাটকের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে সুরসমন্বিত শব্দমাধুর্য।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলা গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য ও নাটকের গান কী হতে পারে এবং তা বাংলা নাটকের জন্য সাযুজ্যপূর্ণ হবে কিনা সে-সব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন ব্যাখ্যা করে গেছেন, অন্যদিকে নিজের গানকে আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলেছেন। বিভিন্ন নাটকের ক্ষেত্রে সংগীত রচনায় যে স্থির লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ উদ্গত যৌবনে সূচনা করেন, ক্রমে ক্রমে তিনি সেই কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সাংগীতিক সৌন্দর্য রচনায় রবীন্দ্র অভিপ্রায় ক্রমান্বয়ে সারল্য ও মাধুর্যে অভিব্যক্তিময় হয়ে ওঠে। এ-ক্ষেত্রে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, কীর্তন, বাউল প্রভৃতি পূর্ব প্রচলিত সংগীতরীতিকে তিনি গ্রহণ করেছেন নিজস্ব স্বকীয়তায়। নাটকে অসীম অভিব্যক্তিকে অনায়াসে সীমার মধ্যে আনতে, দুর্বোধ্যকে বোধগম্য করে তুলতে গান প্রয়োগ করে এক পলকেই তিনি সেই আবহকে আলোকিত করে তুলেছেন। এই গান নাটকের দর্শকের মনে নিয়ে আসে আনন্দ, নাটকের অন্তরলোকের জানালা খুলে দেয়, যা তাঁর কাছে ছিল ভীষণভাবে কাঙ্ক্ষিত। সংগীতের সঙ্গে বাণীর মিলনসাধনের যে আরব্ধ প্রচেষ্টা সেখানে তিনি পুরোপুরি সফল ও সার্থক। তাই নাটকে সংগীতের অনন্যতান্ত্রিকতায় প্রকাশসুষমার আশ্চর্য ব্যতিক্রমী গৌরবের অধিকারী একমাত্র রবীন্দ্রনাথ– তা দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করা যায়।

পরিশিষ্ট

সহায়ক গ্রন্থাবলি

লেখক/সম্পাদক/অনুবাদক	গ্রন্থ	প্রকাশক	প্রকাশকাল
অজিত কুমার ঘোষ	*নাটকের কথা ও সাহিত্যলোক*	কলিকাতা	১৯৮৬
অজিত কুমার ঘোষ	*নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ*	কলিকাতা	১৩৯৭
অজিত কুমার ঘোষ	*নাট্যতত্ত্ব পরিচয়*	জাতীয় সাহিত্য পরিষৎ	১৩৬০
অজিত কুমার ঘোষ	*বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস*	জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, কলিকাতা	১৯৭০
অজিত কুমার চক্রবর্তী	*কাব্যপরিক্রমা*	বিশ্বভারতী, কলিকাতা	১৯৭০
অজিত কুমার চক্রবর্তী	*রবীন্দ্রনাথ ও কাব্য পরিক্রমা*	মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা	১৩৯৫
অনীল কুমার সিংহ	*সূর্যাবর্ত*	নতুন সাহিত্য ভবন	১৩৬৮
অন্নদা শঙ্কর রায়	*রবীন্দ্রনাথ*	ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা	১৯৬২
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	*ঘরোয়া*	বিশ্বভারতী	১৩৫১
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	*বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী*	রূপা এন্ড কোম্পানি, কলিকাতা	১৯৯৬
অমল মিত্র	*কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশির কুমার*	টেগোর রিসার্স ইনস্টিটিউট	১৯৭৭
অরবিন্দ পোদ্দার	*রবীন্দ্র-মানস*	ইন্ডিয়ানা, কলিকাতা	১৯৬০
অরুণকুমার বসু	*বাঙলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত*	রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা	১৯৭৮
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	*রবীন্দ্র সমীক্ষা*	এ. মুখার্জী এন্ড কোং, কলিকাতা	১৩৬৮

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও স্বপন কুমার মজুমদার	*রঙ্গালয়ের ত্রিশ বছর*	প্যাপিরাস, কলিকাতা	১৯৯৮
অভিক কুমার দে	*রবীন্দ্রসৃষ্টির অলঙ্করণ*	পুস্তক বিপনী	১৯৯২
অমিতাভ চৌধুরী	*রবি ঠাকুরের পাগলা ফাইল*	কলিকাতা	১৩৮৬
অমিয় মজুমদার	*রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস*	রূপা এন্ড কোম্পানি, কলিকাতা	১৯৬৫
অশোক বিজয় রাহা (সম্পা.)	*রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা*	বিশ্বভারতী, কলিকাতা	১৯৬৮
অশোক সেন	*রবীন্দ্র-নাট্য পরিক্রমা*	এ. মুখার্জী এন্ড কোঃ, কলিকাতা	১৩৬৪
অশ্রুকুমার সিকদার	*বাক্যের সৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথ*	দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা	১৯৯৫
অশ্রুকুমার সিকদার	*রবীন্দ্র নাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য*	গ্রন্থনিলয়, কলিকাতা	১৩৭৪
অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	*সমালোচনার কথা*	মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা	১৯৯৫
অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	*সাহিত্য জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম খন্ড	করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা	১৩৮৯
অসিত কুমার হালদার	*রবিতীর্থ*	কলিকাতা	১৯৫১
অহীন্দ্র চৌধুরী	*নিজেরে হারায়ে খুঁজি*	ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কো., কলিকাতা	১৮৮৪
অহীন্দ্র চৌধুরী	*বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র*	বুকল্যান্ড প্রাঃ লিঃ	১৩৬৫
অহীন্দ্র চৌধুরী	*রবীন্দ্রনাথের অভিনয়*	শতবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসর্গ	১৯৬১
আনিসুজ্জামান (সম্পা.)	*রবীন্দ্রনাথ*	স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা	১৩৭৫
আলোক রায় (সম্পা.)	*সাহিত্যকোষ : নাটক*	কলিকাতা	১৯৬৩
আলো সরকার	*রবীন্দ্রনাট্য প্রসঙ্গ: সাংগীতিক প্রয়োগ*	নরেন্দ্রনগর, কলিকাতা	১৯৮৬

আবুল আহসান চৌধুরী	*টালা অভিনয়*	গণলোক প্রকাশনী, কুষ্টিয়া	১৯৭৯
আবুল কাশেম ফজলুল হক	*কালের যাত্রার ধ্বনি*	জাগৃতি প্রকাশনি, ঢাকা	১৯৯৯
আবু সয়ীদ আইয়ুব	*পান্থজনের সখা*	দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা	১৯৭৩
আবু সায়ীদ আইয়ুব	*আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*	দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা	১৯৭১
আবু সায়ীদ আইয়ুব	*পথের শেষ কোথায়*	দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা	১৯৯২
আশফাকুল আলম	*লেখক অভিধান*	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৯৮
আশরাফ সিদ্দিকী	*লোকসাহিত্য*, ১ম খন্ড	মুক্তধারা, ঢাকা	১৯৭৭
আশুতোষ ভট্টাচার্য	*বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খন্ড	এ. মুখার্জী এন্ড কোঃ, কলিকাতা	১৩৭৬
আশুতোষ ভট্টাচার্য	*বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খন্ড	এ. মুখার্জী এন্ড কোঃ, কলিকাতা	১৩৭৮
আশুতোষ ভট্টাচার্য	*রবীন্দ্র নাট্যধারা*	সংস্কৃতি প্রকাশন, কলিকাতা	১৯৯২
আহমদ শরীফ	*বিচিত চিন্তা*	চৌধুরী পাবলিশিং হাউস, ঢাকা	১৯৬৮
ইকবাল ভূঁইয়া	*বাংলাদেশের রবীন্দ্র সংবর্ধনা*	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৯৩
ইকবাল ভূঁইয়া	*রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র*	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৮৫
ইন্দ গোপাল সেন	*রবীন্দ্রনাথ ও সাম্যচিন্তা*	পুস্তক বিপণি, কলিকাতা	১৩৯১
ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী	*রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সংগম*	বিশ্বভারতী	১৩৬৭
উইলিয়াম পিয়রসন	*শান্তিনিকেতনের স্মৃতি*	বিশ্বভারতী, কলিকাতা	১৯৬৫
উজ্জ্বল কুমার মজুমদার	*রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির উজ্জ্বল স্রোতে*	কলিকাতা	১৪০০
উজ্জ্বল কুমার মজুমদার	*রাতের তারা দিনের রবি*	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., কলিকাতা	১৩৯৫

Dhaka University Institutional Repository

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	*রবীন্দ্রকাব্য জিজ্ঞাসা*	ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, কলিকাতা	১৩৭২
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	*রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা*	ওরিয়েন্ট বুক এন্ড কোং	১৩৭২
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	*রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা*	ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, কলিকাতা	১৩৭৯
ওয়াকিল আহমদ	*মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা*	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৯৪
কনক বন্দ্যোপাধ্যায়	*রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব নাটক*	এস ব্যানার্জী এন্ড কোং, কলিকাতা	১৯৯৭
করুণাময় গোস্বামী	*বাংলা গানের বিবর্তন*	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৯৩
করুণাময় গোস্বামী	*রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা*	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৯৩
করুণাময় গোস্বামী	*সঙ্গীত ও নৃত্যকলা*	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৯০
কাজী আবদুল ওয়াদুদ	*কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম খন্ড	ভারতী লাইব্রেরী, কলিকাতা	১৩৭২
কাজী আবদুল ওয়াদুদ	*কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ*, দ্বিতীয় খন্ড	ভারতী লাইব্রেরী, কলিকাতা	১৩৭৫
কানাই সামন্ত	*রবীন্দ্র প্রতিভা*	ইন্ডিয়ান পাবলিশিং কোম্পানি, কলিকাতা	১৩৬৮
কেতকী কুশারী ডাইসন ও সুশোভন অধিকারী	*রঙের রবীন্দ্রনাথ*	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., কলিকাতা	১৯৯৭
কুমার রায়	*নাট্য ভবিতব্য ও রবীন্দ্রনাথ*	কলিকাতা	১৯৮৭
কুমুদবন্ধু সেন	*গিরিশচন্দ্র*	জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স কোং প্রা. লি.	১৯৩৬
ক্ষিতিমোহন সেন	*ভারতের সংস্কৃতি*	বিশ্বভারতী, কলিকাতা	১৩৫০
ক্ষুদিরাম দাস	*চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র বাণী*	গ্রন্থনিলয়	১৩৭৩

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদিরাম দাস	*রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়*	বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা	১৩৬৬
গঙ্গাপদ বসু	*নাটক ও নাট্য আন্দোলন*	আনন্দধারা প্রকাশনা	১৯৭২
গোপালচন্দ্র রায়	*রবীন্দ্রনাথের স্ফুলিঙ্গ*	সাহিত্য ভবন, কলিকাতা	১৪০২
গোপাল হালদার	*বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা*, ১ম খন্ড	এ. মুখার্জী এন্ড সন্স, কলিকাতা	১৩৬৩
গোপাল হালদার	*বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা*, ২য় খন্ড	এ. মুখার্জী এন্ড সন্স, কলিকাতা	১৩৬৩
গোপিকানাথ রায় চৌধুরী	*রবীন্দ্রনাথ : ছোট গল্পের প্রকরণ ও শিল্প*	সাহিত্যলোক, কলকাতা	১৯৯৭
গোলাম মুরশিদ	*রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা*	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৮১
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	*রবিরশ্মি*, প্রথম খন্ড	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা	১৯৩৭
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	*রবিরশ্মি*, দ্বিতীয় খন্ড	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা	১৯৩৯
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	*রবিরশ্মি পশ্চিমভাগ*	এ মূখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা	১৩৪৬
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	*রবিরশ্মি পূর্বভাগ*	এ মূখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা	১৩৭৩
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য	*জয়ন্তী উৎসর্গ*	বিশ্ব ভারতী, কলিকাতা	১৯৩১
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.)	*রবীন্দ্র প্রসঙ্গ, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ খন্ড*	কলিকাতা	১৯৩২
জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী	*প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙ্গালীর উত্তরাধিকার*, প্রথম খন্ড	ডি এম লাইব্রেরী, কলিকাতা	১৩৭১
জিয়া হায়দার	*থিয়েটারের কথা*, প্রথম খন্ড	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

জীবন কুমার মুখোপাধ্যায়	*রবীন্দ্রনাথের ট্রাজেডি চেতনা*	কলিকাতা	১৯৭৩
জ্যোতির্ময় ঘোষ	*রবীন্দ্র বহ্নিলোক ও ঝড়ের পাখিরা*	দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা	১৯৯৯
জ্যোতির্ময় ঘোষ	*রবীন্দ্রমনন ও সৃষ্টিলোক*	দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা	১৯৯৮
তপন ঘোষাল	*প্রসঙ্গ : নাট্য সমালোচনা*	সুবর্ণা প্রকাশনী	১৯৯৯
তরুণ মুখোপাধ্যায়	*রবীন্দ্র-নাট্যকলাপ*	প্যাপিরাস, কলিকাতা	১৪১৩
তারকানাথ ঘোষ	*রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা*	ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা	১৩৬৯
দর্শন চৌধুরী	*বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস*	পুস্তক বিপনী	১৯৯৫
দিগ্বিজয় রায় চৌধুরী	*গ্রীক দর্শন*	কলিকাতা	১৯১৮
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	*বাঙ্গালীর রাগ সঙ্গীত চর্চা*	ফার্মা কে. এল. এম. প্রা. লি., কলকাতা	১৯৭৬
দিলীপকুমার রায়	*সাঙ্গীতিকী*	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা	১৯৩৮
দিলীপ রায়	*রবীন্দ্র নাটকাভিনয় ও রবীন্দ্র ভাবনা*	কলিকাতা	১৯৯০
দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ	*রবীন্দ্র মন ও রবীন্দ্র সাহিত্য*	কনটেমপোরারী পাবলিশার্স, কলিকাতা	১৯৬৪
দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	*বাংলার মঞ্চরীতি ১৭৯৫-১৮৭২*	সুবর্ণরেখা	১৩৯২
দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার	*রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন*	সাহিত্যলোক, কলকাতা	১৯৮৭
দেবীপদ ভট্টাচার্য	*রবীন্দ্র চর্চা*	কলিকাতা	১৩৯২
দেবেন্দ্রনাথ বসু	*শকুন্তলায় নাট্যকলা*	সারস্বত লাইব্রেরী	১৩৭৯
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	*কথা ও সুর*	বিশ্বভারতী	১৩৪৫

ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ	*রক্তকরবীর তত্ত্ব ও তাৎপর্য*	মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা	১৯৬২
নিতাই বসু	*রবীন্দ্রসংগীতের উৎস সন্ধানে*	সাহিত্যায়ন, কলিকাতা	১৩৯৭
নিমাইচন্দ্র পাল	*রবীন্দ্র নাটকের আঙ্গিক : রূপক সাংকেতিক*	রত্মাবলী, কলিকাতা	১৯৮৭
নির্মাল্য নাগ	*শিল্প চেতনা*	দীপায়ন, কলকাতা	১৯৯২
নীলিমা ইব্রাহিম	*বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*	কালচারাল প্রেস, ঢাকা	১৯৭২
নীহার রঞ্জন রায়	*রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা*	নিউ এজ পাবলিশার্স, কলিকাতা	১৩৬৯
নেপাল মজুমদার	*ভারতের জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*	বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলিকাতা	১৯৬৯
প্রণয় কুমার কু-	*রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য*	ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা	১৯৬৫
প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাস	*রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্ব সাহিত্য*	হেগেল দস্তিদার, কলিকাতা	১৯৯৯
প্রদীপ্ত সেন	*রবীন্দ্রনাথ ও ফ্যাসিবাদ*	পুস্তক বিপনী, কলিকাতা	১৯৯৭
প্রবীরগুহ ঠাকুরতা	*রবীন্দ্রসংগীত মহাকোষ ১*	দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা	২০০৮
প্রবোধচন্দ্র সেন	*রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা*	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা	১৯৮২
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	*গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী*	টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা	১৪১০
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়	*রবীন্দ্র জীবনী*, ১ম ও ২য় খন্ড	বিশ্বভারতী, কলিকাতা	১৩৫৫
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়	*রবীন্দ্র জীবনী*, ৩য় খন্ড	বিশ্বভারতী, কলিকাতা	১৩৬১
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়	*রবীন্দ্র জীবনী*, ৪র্থ খন্ড	বিশ্বভারতী, কলিকাতা	১৩৬৪
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়	*রবীন্দ্র জীবন কথা*	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাই. লি., কলকাতা	১৯৯৭

প্রমথনাথ বিশী	*রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহ*	মিত্র এন্ড ঘোষ, কলকাতা	১৪০৪
প্রমথনাথ বিশী	*রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ* (পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ)	ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা	১৯৬৬
প্রমথনাথ বিশী	*রবীন্দ্র সরণী*	মিত্র এন্ড ঘোষ, কলকাতা	১৪০০
প্রমথনাথ বিশী	*রবীন্দ্র সাহিত্য বিচিত্রা*	ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা	১৩৯১
প্রশান্ত কুমার পাল	*রবিজীবনী*, ১ম–৮ম খন্ড	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাই. লি., কলকাতা	১৯৯৮
প্রিয়নাথ সেন	*প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি*	কালিকা প্রেস, কলকাতা	১৩৪০
পুর্ণেন্দ্র পত্রী	*আমার রবীন্দ্রনাথ*	দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা	১৯৯৭
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	*জ্যোতিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি*	প্রজ্ঞা ভারতী	১৩৬৯
বার্ণিক রায়	*রবীন্দ্রনাথের নাটকের উৎস*	সিগমা, কলিকাতা	১৯৮৭
বিনাকেশ সরকার	*রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা*	প্যাপিরাস, কলকাতা	১৯৯৫
বিনায়ক সান্যাল	*রবিতীর্থে*	বেঙ্গল পাবলিশার্স	১৩৬৬
বিপিনবিহারী গুপ্ত	*পুরাতন প্রসঙ্গ*	বিদ্যাভারতী	১৩৭৩
বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়	*রবীন্দ্রনন্দন তত্ত্ব*	দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা	১৯৯১
বিশ্ব মুখোপাধ্যায় (সম্পা.)	*রবীন্দ্র সাগর সংগমে*	এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স	১৩৬৯
বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য	*রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য দর্শন ও অলংকার শাস্ত্র*	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাই. ডল., কলিকাতা	১৩৯৬
বিষ্ণু বসু	*বাংলা নাট্যরীতি*	পুনশ্চ, কলিকাতা	১৯৯৬
বিষ্ণু বসু	*রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার*	প্রতিভাস, কলিকাতা	১৯৮৭
বীরেন্দ্র ঘোষ	*ধর্মপথিক রবীন্দ্রনাথ*	বুকল্যান্ড প্রা.লি., কলিকাতা	১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

বীনা মুখোপাধ্যায়	*চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ*	নাভানা, কলিকাতা	১৩৭২
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	*বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস*	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা	১৩৬৮
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	*রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচয়*	সাহিত্য নিকেতন	১৩৫০
বুদ্ধদেব বসু	*কবি রবীন্দ্রনাথ*	দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা	১৯৮০
বুদ্ধদেব বসু	*রবীন্দ্রনাথ কথা সাহিত্য*	সুবর্ণ রেখা, কলিকাতা	১৩৯৫
বুদ্ধদেব বসু	*সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ*	এম, সি, সরকার সন্স	১৯৬৩
বুদ্ধদেব বসু	*সাহিত্য চর্চা*	ত্রিবেণী প্রকাশন, কলিকাতা	১৩৬৮
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	*সংসদ বাংলা নাট্য অভিধান*	কলিকাতা	২০০০
বৈদ্যনাথ শীল	*বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা*	এ কে সরকার এন্ড কোং	১৩৭৭
ভুজঙ্গ ভূষণ ভট্টাচার্য	*রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন*	বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলিকাতা	১৯৭৯
মঞ্জুশ্রী চৌধুরী	*রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটক*	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৮৩
মধুসূদন দত্ত	*মেঘনাদবধ কাব্য*	মর্ডান বুক এজেন্সি	১৯৫৮
মন্মথনাথ ঘোষ	*জ্যোতিরিন্দ্রনাথ*	আদি ব্রাহ্মসমাজ	১৩৭৪
মনসুর মুসা	*ভাষ চিন্তা : প্রসঙ্গ ও পরিধি*	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৯১
মনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	*রবীন্দ্র সংগীত প্রবেশিকা*	মধ্যম গ্রাম, কলিকাতা	১৯৯৪
মলিনা রায় (অনূ.)	*রবীন্দ্রনাথ এন্ড্রুজ পত্রাবলী*	বিশ্বভারতী, কলিকাতা	১৩৭৪
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	*বাংলা সাহিত্যের কথা*, ১ম খন্ড	রেঁনেসাস প্রিন্টার্স, ঢাকা	১৯৬৩
মুহম্মদ হাবিবুর রহমান	*মাতৃভাষার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ*	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৯৫
মুহম্মদ হাবিবুর রহমান	*রবীন্দ্র বাক্যে আর্ট, সঙ্গীত ও সাহিত্য*	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৮৬

মুহম্মদ হাবিবুর রহমান	*রবীন্দ্র রচনার রবীন্দ্র ব্যাখ্যা*	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৮৬
মৈত্রেয়ী দেবী	*বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ*	বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা	১৩৬৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	*রবীন্দ্র রচনাবলী*, ১ম-৮ম খন্ড	বিশ্বভারতী, কলিকাতা	১৩৬০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	*রবীন্দ্র রচনাবলী*, ৯ম-১০ম খন্ড	বিশ্বভারতী, কলিকাতা	১৩৬৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	*রবীন্দ্র রচনাবলী*, ১১শ খন্ড	বিশ্বভারতী, কলিকাতা	১৩৬৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	*রবীন্দ্র রচনাবলী*, ১২শ-১৪শ খন্ড	বিশ্বভারতী, কলিকাতা	১৩৬০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	*সঙ্গীতচিন্তা*	বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা	১৩৭৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	*স্বরবিতান ৪৮, মায়ার খেলা,*	বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা	১৩৩২
রুদ্র প্রসাদ চক্রবর্তী	*রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ : সমকালীন প্রতিক্রিয়া*	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাই. লিমিটেড, কলিকাতা	১৯৯৫
শঙ্কর ভট্টাচার্য	*বাংলা থিয়েটারে অভিনয়*	ডি এম লাইব্রেরী	১৩৭৩
শঙ্কর ভট্টাচার্য	*বাংলার রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান*	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ	১৯৮২
শঙ্খ ঘোষ	*কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক*	দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা	১৯৭৮
শঙ্খ ঘোষ	*রবীন্দ্রনাথ*	দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা	১৯৭৬
শচীন সেনগুপ্ত	*বাংলার নাটক ও নাট্যশালা*	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স	১৩৬৪
শচীন সেনগুপ্ত	*রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়*	রীডার্স কর্ণার, কলিকাতা	১৯৬১
শম্ভু মিত্র	*নাট্য ভাষা*	রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী	১৯৯৭
শম্ভু মিত্র	*প্রসঙ্গ নাট্য*	সংস্কৃত পুস্তক ভা-ার	১৯৭১
শশিভূষণ দাশগুপ্ত	*বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি*	কলকাতা	১৩৭১

Dhaka University Institutional Repository

শান্তিদেব ঘোষ	*গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য*	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাই. লিমিটেড, কলকাতা	১৩৯০
শান্তিদেব ঘোষ	*গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য*	ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং	১৯৮২
শান্তিদেব ঘোষ	*রবীন্দ্রসংগীত*	বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা	১৩৪৯
শান্তিদেব ঘোষ	*সংগীত বিচিত্রা*	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাই. লিমিটেড, কলকাতা	১৯৭২
শিশির কুমার ঘোষ	*নাট্যাচার্য শিশির কুমার রচনা সংগ্রহ*	শিশির কুমার রিসার্স ইনষ্টিটিউট, কলকাতা	১৯৮৭
শিশির কুমার ঘোষ	*রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য*	প্যাপিরাস, কলিকাতা	১৩৯৬
শিশির কুমার দাস	*কাব্যতত্ত্ব এরিষ্টটল*	প্যাপিরাস, কলিকাতা	১৯৯৮
শিশির কুমার দাস ও শ্যামা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	*শাশ্বত মৌচাক, রবীন্দ্রনাথ ও স্পেন*	প্যাপিরাস, কলিকাতা	১৩৯৪
শীতল ঘোষ	*বাংলা নাটকে ট্রাজেডি তত্ত্বের প্রয়োগ*	বর্ণালী, কলিকাতা	১৯৯৮
শেখর সমাদ্দার	*বিসর্জন : রূপ-রূপান্তর*	প্যাপিরাস, কলিকাতা	১৯৯২
শেখর সমাদ্দার	*রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক নাট্য*	প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড	১৯৯৮
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	*রবীন্দ্র সৃষ্টি-সমীক্ষা*	ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা	১৩৭৬
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	*বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা*	কলকাতা	১৯৫৯
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল	*রবীন্দ্রনাথের নাট্য প্রতিভা*	ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা	১৩৯১
সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়	*ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক*	সংস্কৃত পুস্তক ভা-ার	১৯৭৪

Dhaka University Institutional Repository

সজনীকান্ত সেন	*রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য*	শতাব্দী সাহিত্য ভবন, কলিকাতা	১৩৬৭
সন্‌জীদা খাতুন	*রবীন্দ্রনাথ : বিবিধ সন্ধান*	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৯৪
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	*আগুন ও অন্ধকারের নাট্য : রবীন্দ্রনাথ*	দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা	১৯৯৪
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	*আলো-আঁধারের সেতু : রবীন্দ্র চিত্রকল্প*	দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা	১৯৯৪
সাইদুল মুহম্মদ	*লোকনাট্য*- ২	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৯৩
সাধনকুমার ভট্টাচার্য	*নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা*	বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলকাতা	১৯৬৩
সাধন কুমার ভট্টাচার্য	*নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার*, ২য় খন্ড	পুঁথিঘর, কলিকাতা	১৩৫৭
সাধন কুমার ভট্টাচার্য	*নাটক লেখার মূলসূত্র*	জিজ্ঞাসা, কলিকাতা	১৩৫৭
সাধনকুমার ভট্টাচার্য	*নাটকের রূপরীতি ও প্রয়োগ*	জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা	১৩৬৯
সাধনকুমার ভট্টাচার্য	*রবীন্দ্রনাট্য সাহিত্যের ভূমিকা*	জিজ্ঞাসা, কলিকাতা	১৯৫৭
সাহানা দেবী	*মৃত্যুহীন প্রাণ*	মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা	১৩৭৭
সিদ্দিকা মাহ্‌মুদা	*রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা : চেতনা ও চিত্র কল্প*	মুক্তধারা, ঢাকা	১৯৮১
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (অনূ. ও সম্পা.)	*এরিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব*	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৮২
সীতা দেবী	*পুণ্য স্মৃতি*	জিজ্ঞাসা, কলিকাতা	১৩৬৬
সুকুমার সেন	*বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ৩য় খন্ড : *রবীন্দ্রনাথ*	ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা	১৩৫৭
সুকুমার সেন	*রবীন্দ্র শিল্পে প্রেম চৈতন্য ও বৈষ্ণব ভাবনা*	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাই. লিমিটেড, কলিকাতা	১৯৯৩

সুখরঞ্জন রায়	*রবীন্দ্র কথা-কাব্যের শিল্পসূত্র*	মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা	১৯৭৬
সুধাংশু বিমল বড়ুয়া	*রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*	সাহিত্য সংস, কলিকাতা	১৩৯৫
সুধীর চক্রবর্তী	*রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প*	কথা শিল্প, কলিকাতা	১৩৬৬
সুধীর চৌধুরী	*সাহিত্য শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব*	গোরাঙ্গচন্দ্র সান্যাল জয় দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা	১৯৯৯
সুধীর চন্দ্র	*বহুরূপী রবীন্দ্রসংগীত*	প্যাপিরাস, কলকাতা	২০০৫
সুধীর চন্দ্র কর	*শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা*	ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা	১৩৭৫
সুধীর চন্দ্র সরকার	*পৌরাণিক অভিধান*	এম.সি. সরকার এন্ড সন্স, কলিকাতা	১৪০৪
সুনীল দত্ত	*নাট্য আন্দোলনের ৩০ বৎসর*	জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা	১৯৭২
সুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পা.)	*কৃত্তিবাসী রামায়ণ*	দেব সাহিত্য কুটির, কলিকাতা	১৩৭৫
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত	*রবীন্দ্রনাথ*	এ মুখার্জী এ্যান্ড কোঃ, কলিকাতা	১৪০৪
সুবোধ সেনগুপ্ত	*রবীন্দ্রনাথ*, ৩য় সংস্করণ	এম. সি. সরকার এন্ড সন্স, কলিকাতা	১৯৭২
সুব্রত রুদ্র (সম্পা.)	*রবীন্দ্র সংগীত চিন্তা*	প্রতিভাস, কলিকাতা	১৯৯৩
সুপ্তি মিত্র	*সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ*	টেগোর রিসার্চ ইনিস্টিটিউট, শান্তিনিকেতন	১৯৮০
সেলিম আল দীন	*মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৯৬
সৈয়দ আকরাম হোসেন	*রবীন্দ্রনাথ : কাব্য বিচারের ভূমিকা*	ঢাকা	১৯৭৪
সৈয়দ জামিল আহমেদ	*হাজার বছরের বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*	শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	*কতিপয় প্রবন্ধ*	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৯২
সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	*রবীন্দ্র অভিধান*, ১ম খন্ড	বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা	১৩৬৮
সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	*রবীন্দ্র অভিধান*, ২য় খন্ড	বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা	১৩৬৯
সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	*রবীন্দ্র অভিধান*, ৩য় খন্ড	বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা	১৩৭০
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	*বঙ্গীয় শব্দকোষ*	বিশ্বকোষ প্রেস, কলিকাতা	১৩৩৩
হরিপদ চক্রবর্তী	*দশরথি ও তাঁহার পাঁচালী*	এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং, কলিকাতা	১৩৬৭
হেমেন্দ্রকুমার রায়	*সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ*	ইন্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবঃ কোঃ, কলিকাতা	১৩৫৮
A Aronson	*Rabindranath Through, Western Eyes*	Kitabistan, Allahabad	1943
Abu Sayeed Ayyub	*Tagore's Quest*	Papyrus, Calcutta	1980
B.C. Chakravorty	*Rabindranath Tagore His Mind and Art*	Young India Publication, New Delhi	1970
Edward Thomas	*Rabindranath Tagore - Poet & Dramatist*	Saraswasty Library, Calcutta	1932
Syed Jamil Ahmed	*Achin Pakhi Infinity : Indigenous Theatre of Bangladesh*	UPL, Dhaka	2000

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক পত্রিকা

লেখক	প্রবন্ধ	পত্রিকা	প্রকাশকাল
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	"আমাদের পারিবারিক সঙ্গীত-চর্চা"	*গীতবিতান বার্ষিক*	মাঘ ১৩৫০
অমিয় রতন মুখোপাধ্যায়	"বলাকার প্রসঙ্গে কবিগুরুর গান"	*শনিবারের চিঠি*	বৈশাখ ১৩৬৭
অমিয় রতন মুখোপাধ্যায়	"রবীন্দ্রনাটকে গানের মূল্য"	*সাহিত্যের খবর*	জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯
অহীন্দ্র চৌধুরী	"রবীন্দ্রনাট্য সমীক্ষা"	*গীতবিতান পত্রিকা*	বৈশাখ ১৩৬৮
ইন্দিরা দেবী	"রবীন্দ্রনাথের গান"	*সমকালীন*	পৌষ ১৩৬০
কানাই সামান্ত	"রবীন্দ্রনাট্য কল্পনার বিবর্তন"	*বিশ্বভারতী পত্রিকা*	বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬
ক্ষিতীশ রায়	"মায়ার খেলার স্মৃতি : ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী"	*গীতবিতান পত্রিকা*	বৈশাখ ১৩৬৮
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য	"নাটক ও সংগীত"	*সমকালীন*	ভাদ্র ১৩৬৯
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	"সংগীত বাংলার নাট্যশালা : গিরিশযুগ"	*রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা*	বৈশাখ ১৩৭৬
দেবেশ রায়	"রবীন্দ্রনাথের গান"	*পরিচয়*	বৈশাখ ১৩৬৮
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	"রবীন্দ্রনাট্যে গানের ভূমিকা"	*গীতবিতান পত্রিকা*	বৈশাখ ১৩৬৮
পবিত্রকুমার রায়	"নাটকে গান : সেক্সপিয়ার ও রবীন্দ্রনাথ"	*পূর্বাশা*	বৈশাখ ১৩৭১
পশুপতি শাসমল	"স্বর্ণকুমারী দেবীর গান"	*বিশ্বভারতী পত্রিকা*	বৈশাখ - আষাঢ় ১৩৭৫
প্রতিমা ঠাকুর	"নাট্যধারা"	*গীতবিতান বার্ষিকী*	ভাদ্র ১৩৫০

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	“কালমৃগয়ার বনদেবীগণ”	*কথাসাহিত্য*	বৈশাখ ১৩৭৮
প্রমথনাথ বিশী	“রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে একটি প্রশ্ন”	*শনিবারের চিঠি*	বৈশাখ ১৩৬৭
ভবতোষ দত্ত	“রবীন্দ্র নাটকের পূর্ব সূত্র”	*বিশ্বভারতী পত্রিকা*	শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৩
ভাস্কর মিত্র	“রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য সংগীত”	*বিশ্ববীণা*	আগস্ট ১৯৬৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	“অতীতের স্মৃতি”	*গীতবিতান বার্ষিকী*	মাঘ ১৩৫০
শান্তিদেব ঘোষ	“রবীন্দ্রনাথের গানে বিলাতি সংগীতের প্রভাব”	*বিশ্বভারতী পত্রিকা*	শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬
শান্তিদেব ঘোষ	“রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য”	*দেশ*	শ্রাবণ ১৩৪৮
শিশিরকুমার ভাদুড়ী	‘রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ”	*শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা*	শ্রাবণ ১৩৪৮
শ্রীমতী ঠাকুর	“রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য”	*সুরধুনী*	ভাদ্র ১৩৭২
সাহানা দেবী	“বিসর্জনে : রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে”	*আনন্দবাজার পত্রিকা*	বৈশাখ ১৯৬৮
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	“রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য”	*গীতবিতান পত্রিকা*	বৈশাখ ১৩৬৮
হিরণকুমার সান্যাল	“রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রযোজক ও অভিনেতা”	*পরিচয়*	আষাঢ় ১৩৬৮